গৃহস্থ-গ্রন্থাবলী—১২

বর্ত্তমান জগৎ

পঞ্চম ভাগ

নবীন এশিয়ার জন্মদাতা জাপান

প্রথম সংস্করণ

শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম, এ,

ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ, কলিকাতা

অগ্রহায়ণ, ১৩৩০

গৃহস্থ পাব্‌লিসিং হাউস

২৪, মিডিল রোড, ইটালি, কলিকাতা

[মূল্য ৪৲ চারি টাকা

নিবেদন

(১)

অনেক ভারতসন্তানই জাপান দেখিয়া গিয়াছেন। ভারতবাসীরা জাপান সম্বন্ধে কমবেশী আলোচনাও করিয়া থাকেন। কাজেই জাপান সম্বন্ধে এই কেতাব একমাত্র ভারতীয় রচনা নয়।

প্রথমবার জাপানে পৌছি হনলুলু হইতে,—১৯১৫ সালের জুন মাসে। কাটাইয়াছিলাম মাস তিনেক। দ্বিতীয়বার আসি ১৯১৬ সালে চীন হইতে। কাটিয়াছিল চার মাস (জুলাই—অক্টোবর)।

এই কেতাবে প্রথমবারকার বিবরণ আছে। কাজেই বইটাকে "জাপানে তিনমাস" রূপে বিবৃত করা চলে।

তখন ফরাসী বা জার্ম্মাণ জানিতাম না। জাপানী ভাষা ত কোনো দিনই জানি না। একমাত্র ইংরেজির উপর ভর করিয়া তিন মাসে জাপানের যতটুকু হজম করা সম্ভব তাহার বেশী এই গ্রন্থের সম্পত্তি নয়।

(২)

ভারতবাসী জাপান সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া থাকেন:—"জাপানীরা এশিয়ার মিত্র কি শত্রু?" এই প্রশ্নের জুড়িদার আর একটা প্রশ্ন তুলিলেই সমস্যাটা সহজ হইবে। জিজ্ঞাসা করা যাউক:—"জার্ম্মাণরা ইয়োরোপের শত্রু না মিত্র?" "ইংরেজরা ইয়োরোপের শত্রু না মিত্র?" "ফরাসীরা ইয়োরোপের শত্রু না মিত্র?"

এই ধরণের প্রশ্নের যে জবাব জাপান সম্বন্ধেও সেই জবাব। কেতাবের স্থানে স্থানে তাহার আলোচনা করা গিয়াছে।

(২)

জাপানীরা বৌদ্ধ বলিয়া বৌদ্ধ মাত্রেই জাপানকে বন্ধু বা মুরুব্বি বিবেচনা করিবে একথা বলিবে কেবল পাগলেরা। জাপান এশিয়ার একটা দেশ। তাই বলিয়া জাপানীরা সকাল বিকাল সন্ধ্যায় এশিয়ার হিত চিন্তা করিবে ইহাও কোন রাষ্ট্রনীতিবিৎ বিবেচনা করিতে পারে না।

রাষ্ট্র-মণ্ডলে "খৃষ্টীয় ঐক্য," "ইয়োরোপীয় ঐক্য," "পাশ্চাত্য ঐক্য," "শ্বেতাঙ্গ ঐক্য," ইত্যাদি তথাকথিত ঐক্যগুলা যেরূপ মিথ্যা কথা "বৌদ্ধ ঐক্য," "মুসলমান ঐক্য," "এশিয়ার ঐক্য," "প্রাচ্য ঐক্য," ইত্যাদি ঐক্যগুলাও সেইরূপ শব্দমান এবং মিথ্যা। খৃষ্টানের বিরুদ্ধে খৃষ্টান লড়িয়াছে ও লড়িবে; শ্বেতাঙ্গের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ লড়িয়াছে ও লড়িবে। খৃষ্টানের বিরুদ্ধে খৃষ্টান অ-খৃষ্টানের সাহায্য লইয়াছে ও লইবে, শ্বেতাঙ্গের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ অ-শ্বেতাঙ্গের সাহায্য লইয়াছে ও লইবে।

ঠিক সেইরূপ মুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমান, বৌদ্ধের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ, হিন্দুর বিরুদ্ধে হিন্দু লড়িয়াছে ও লড়িবে। আবার প্রয়োজন হইলে মুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমান অ-মুসলমানের, বৌদ্ধের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ অ-বৌদ্ধের, হিন্দুর বিরুদ্ধে হিন্দু অ-হিন্দুর সাহায্য লইয়াছে ও লইবে।

এই সকল কথা মনে রাখিয়া জাপানের পররাষ্ট্রনীতি আলোচনা করিতে অগ্রসর হইলে যুবকভারত পদে পদে ভুল করিয়া বসিবেন না। রঙের কথা, জাতের কথা, ধর্ম্মের কথা, ধামা চাপা রাখিয়া বর্ত্তমান জগতের জীবন-সংগ্রাম বুঝিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

(৩)

এই গ্রন্থে জাপানের ফ্যাক্টরী, রাষ্ট্রশাসন, সমাজ-কথা ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সকল অভিজ্ঞতা বিবৃত করা হইয়াছে তাহার অনেকাংশই আজ ১৯২৩ সালে অতি পুরাণা সেকেলে কথা। ১৯১৫-১৬ সালে দুনিয়ায় মহা লড়াই চলিতেছিল, তখন জাপান এশিয়ায় এবং দক্ষিণ আমেরিকায়

হুহু করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে বাড়িয়া চলিতেছিল। ১৯১৮ সালে লড়াই থামিবার পর হইতে সেই বাড়্‌তি থামিয়াছে।

অধিকন্তু ১৯২১ সালের নবেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওয়াশিংটনে যে বিশ্ব-সম্মেলন ডাকিয়াছিলেন তাহাতে প্রশান্ত মহাসাগরে ও চীনে জাপানকে যার পর নাই খর্ব্ব হইতে হইয়াছে। ইংরেজের সঙ্গে জাপানের যে সন্ধি ছিল সেই সন্ধির উপর বিশ্বাস রাখা জাপানের পক্ষে আর চলে না। প্রকৃত পক্ষে ইংরেজ এবং ইয়াঙ্কি দুইয়ে মিলিয়া জাপানকে কুপোকষা করিতে ব্রতবদ্ধ দেখা যাইতেছে।

এদিকে দুনিয়ার সর্ব্বত্র যেমন, জাপানেও বোলশেভ্বিক আন্দোলন দেখা দিয়াছে। শ্রমিকেরা ধনিকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে শিখিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক লেনদেনে জাপানী রাষ্ট্রকে এই কারণে অনেকটা দুর্ব্বলের মতন চলাফেরা করিতে হইতেছে।

তাহার উপর এই মাসের প্রথম সপ্তাহে জাপানকে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত সহিতে হইল। এক সঙ্গে ভূমিকম্প এবং অগ্নিকাণ্ড। লাখ লাখ লোকের মৃত্যু এবং কোটি কোটি টাকার ঘর বাড়ী ও যন্ত্রপাতির সর্ব্বনাশ। ১৯১৫-১৬ সালে যে তোকিও-ইয়োকোহামা দেখিয়া আসিয়াছি তাহার রূপ আগাগোড়া বদলাইয়া গেল মনে হইতেছে।

জাপানের ক্ষতিতে ইংরেজ এবং মার্কিনরা মনে মনে বেশ খুসী। ইহারা ভাবিতেছে,—"বাঁচা গেল। জাপানের ক্ষতিতে এশিয়াবাসী কিছুদিনের জন্য জগতে নরম হইয়া চলিবে। ভগবান ইয়োরামেরিকাকে আরও কিছু কালের জন্য দুনিয়ায়,—বিশেষতঃ এশিয়ায় বাধাহীন ভাবে চলাফেরা করার সুযোগ দিলেন। জাপানীরা নিজ ঘর সামলাইতে এখন ব্যস্ত থাকিবে। রাষ্ট্রমণ্ডলে জোরের সহিত কথা বলা জাপানের পক্ষে সহজ হইবে না।"

কিন্তু এই দৈব দুর্ব্বিপাকে জাপানের ক্ষতি ঠিক কতটা হইয়াছে তাহার আন্দাজ করিয়া উঠা সুকঠিন। তবে কোবে, ওসাকা, নাগোয়া ইত্যাদি শিল্প-প্রধান নগরের ফ্যাক্টরিগুলা সবই খাড়া আছে। কাজেই জাপান নেহাৎ একদম কাবু হইয়া পড়িবে না, বিশ্বাস করা চলে।

সকল দিক হইতেই ১৯২৩-২৪ সালের জাপান ১৯১৫-১৬ সালের জাপান হইতে পৃথক। সুতরাং জাপানী জীবনের সঙ্গে নয়া চোখে নয়া সম্বন্ধ পাতাইবার দিন আসিয়াছে। বস্তুতঃ জার্ম্মাণি এবং রুশিয়া এশিয়ার জীবন-স্রোতে আজকাল সম্পূর্ণ নয়ারূপে দেখা দিয়াছে। একমাত্র এই কারণেই এশিয়ায় জাপানের ঠাঁইটা বুঝিবার জন্ত নতুন অভিযান পাঠানো আবশুক।

(৪)

১৯১৫-১৬ সালে জাপানকে "নবীন এশিয়ার জন্মদাতা"রূপে অভিনন্দন করিয়াছি। তখনও জাপান সত্যসত্যই এশিয়ার একমাত্র স্বাধীন দেশ ছিল,—এইরূপও অনেক বার ভাবিয়াছি। আজ ১৯২৩ সালে এশিয়ার অবস্থা অনেকটা উন্নত দেখিতেছি। গ্রীসবিজয়ী কমাল পাশার নেতৃত্বে যুবক তুরস্ক এশিয়ার পূর্ব্ব সীমানায় প্রাচ্য মানবের স্বাধীনতার প্রহরীরূপে বিরাজ করিতেছে। তোকিও এখন আর স্বাধীন এশিয়ার একমাত্র রাজধানী নয়। আঙ্গোরাও এই স্বাধীনতার নবীন কেন্দ্র। এশিয়ার নবশক্তিলাভে জাপানীরাও খানিকটা শক্ত হইবে, যুবক ভারতের পক্ষে এইরূপ বিবেচনা করা অসঙ্গত নয়।

নানা তরফ হইতে জাপানকে বুঝিতে চেষ্টা করা ভারতের পক্ষে একান্ত আবশুক। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশগুলার প্রত্যেককেই এক একটা জাপানে পরিণত করিতে পারা যায় কি না সেই বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা করা উচ্চশিক্ষিত ভারতবাসীর এক প্রধান লক্ষ্য হওয়া

উচিত। জাপানীরা শিল্পে, বিজ্ঞানে, শিক্ষায়, সমাজে, রাষ্ট্রে যাহা কিছু করিয়াছে তাহার সমান যতদিন পর্য্যন্ত ভারত সন্তানেরা স্বচেষ্টায় সামলাইতে না পারিবেন ততদিন তাঁহাদের পক্ষে ইয়োরামেরিকার গণ্যমান্য দেশের উচ্চতর মাপকাঠি চোখের সম্মুখে রাখা মার্জ্জনীয় নয়।

জাপান এশিয়াকে পথ দেখাইয়া দিয়াছে। জাপানের পথে চলিতে অভ্যস্ত হইবার পূর্ব্বে এশিয়া ইয়োরামেরিকার সঙ্গে টক্কর দিতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। কাজেই জাপান নবীন এশিয়ার জন্মদাতা এবং উৎসাহদাতা মাত্র নয়। জাপান যুবক ভারতের, যুবক চীনের, যুবক আফগানের, যুবক পারস্তের, যুবক মিশরেরও দীক্ষাদাতা এবং শিক্ষাগুরু।

এই ক্ষুদ্র কেতাবে জাপানের পাহাড়, সাগর, বন, নদী, পল্লী, সহর সবই যথাসম্ভব সিনেমা-চিত্রের মতন পাঠকদের সম্মুখে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে। যাঁহারা "গৃহস্থ," "উপাসনা," "প্রবাসী," ইত্যাদি মাসিক পত্রে ভ্রমণ বৃত্তান্ত গুলা পড়িয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট পর্য্যটকের প্রত্যেক মুহূর্ত্তের প্রত্যেক দেখাশুনা অথবা কথাবার্ত্তা নিজ নিজ অভিজ্ঞতারই অঙ্গ স্বরূপ বিবেচিত হইবে। অন্ততঃ যাহাতে এরূপ বিবেচিত হয় সেই উদ্দেশ্যে পর্য্যটন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছি। "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থের প্রত্যেক খণ্ডেই দেশের প্রতি এই দায়িত্ববোধ জাগিয়া রহিয়াছে।

পর্য্যটকের ডায়েরিতে পাঠকেরা কখনো ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক দৃশ দেখিবেন, কখনো রাষ্ট্রীয় বিকাশের সমালোচনা পাইবেন, কখনো সাহিত্য সুকুমার শিল্পের নানা রূপের সহিত পরিচিত হইবেন, কখনো বা ব্যাঙ্কব্যবসায়ের ফ্যাক্টরির কলকারখানার তথ্যতালিকা পড়িবেন। কোন কোন কথা হয়ত পাঠকের পূর্ব্ব হইতেই জানা আছে। একদম নতুন কথাও হয়ত দুচারটা জুটিতে পারে। কোন কোন আলোচনায়

হয়ত একটা নতুন ব্যাখ্যা-প্রণালী পাওয়া যাইবে। আবার দু একটা নতুন গবেষণার ক্ষেত্রই হয়ত কোন কোন কাহিনীতে আবিষ্কৃত হইয়া পড়িবে।

কি জাপান, কি চীন, কি মিশর, কি ইংল্যাণ্ড, কি ইয়াঙ্কিস্থান—কোন দেশেই "এক চোখো" ভাবে পর্য্যটন করি নাই। সর্ব্বত্রই যথাসম্ভব পুরোপুরি ষোল আনা মানুষটাকে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি। কাজেই "বর্ত্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলীর প্রত্যেকটাই বহুত্বময়, নানা কথায় ভরা, "পাঁচ ফুলে সাজি" বিশেষ।

প্রত্যেক দেশকেই অবশ্য একমাত্র সুকুমার-শিল্প, কিম্বা একমাত্র ব্যবসা বাণিজ্য, কিম্বা একমাত্র শিক্ষা-পদ্ধতি, কিম্বা একমাত্র বিজ্ঞান-চর্চ্চা ইত্যাদি বিশেষ কোনো একটা তরফ হইতে যাচাই করিয়া দেখিবার দরকারও আছে। তবে সেই রূপ কোন এক তরফা বিশিষ্ট জরীপ করিবার ভার লইয়া বর্ত্তমান পর্য্যটক দুনিয়ায় বাহির হন নাই।

(৬)

ইয়োরোপীয়ান এবং আমেরিকান পণ্ডিতেরা দুনিয়ার নানা দেশ সম্বন্ধে পর্য্যটন-কাহিণী লিখিয়াছেন। তাহাদের কোন কোনটা অবশ্য ভারতে জানা আছে। লর্ড কার্জ্জন প্রণীত চীন ও পারশ্য বিষয়ক কেতাব ভারতবাসী পাঠ করিয়া থাকেন। মান্ধাতার আমলের হুয়েন্থ সাঙ ও মার্কো পোলো প্রণীত গ্রন্থাবলী ত সুপরিচিত বটেই।

কিন্তু এশিয়ান বা ভারতসন্তানপ্রণীত বিদেশ-বিষয়ক গ্রন্থ ভারতীয় সাহিত্যে অতি অল্পই আছে। বাংলা বা হিন্দী লেখকেরা সাহিত্যের এই বিভাগে যথোচিত দৃষ্টি দেন নাই। "বর্ত্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলীকে পাশ্চাত্য পর্য্যটক প্রণীত ভ্রমণ-সাহিত্য ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলে ভারতের নানা প্রদেশে নানা পণ্ডিত এক অভিনব সাহিত্য সৃষ্টি করিতে উৎসাহী হইতে পারেন। যুবক ভারতের স্বাধীন চিন্তা

বিকাশে এবং স্বাধীন রচনা প্রয়াসে বর্ত্তমান পর্য্যটকের অনুসন্ধান ও গবেষণা কথঞ্চিৎ সাহায্য করিবে এবং তাহার ফলে বর্ত্তমান জগৎকে যুবক ভারত শক্ত মুঠার ভিতর পাকড়াও করিতে সমর্থ হইবে। এই আশা সর্ব্বদাই পোষণ করিয়া আসিতেছি।

বার্লিন, সেপ্টেম্বর ১৯২৩ শ্রীবিনয় কুমার সরকার।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

জাপানী জাহাজে দশ দিন

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাধীন এশিয়ার রাজধানী

তৃতীয় অধ্যায়

এক সপ্তাহে অর্দ্ধ জাপান

চতুর্থ অধ্যায়

জাপানের দিল্লী

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাচীন জাপানে বৃহত্তর ভারত

ষষ্ঠ অধ্যায়

এশিয়ার ম্যাঞ্চেষ্টার

সপ্তম অধ্যায়

বৃহত্তর জাপান

১। জাপানী জাহাজ

India Press, Calcutta.

বর্ত্তমান জগৎ

পঞ্চম ভাগ

প্রথম অধ্যায়

জাপানী জাহাজে দশদিন

স্বাধীন এসিয়ার জাহাজ-কোম্পানী

হনলুলু পর্য্যন্ত ইয়াঙ্কি জাহাজে আসিয়াছিলাম। এখান হইতে জাপানী জাহাজে উঠিলাম। এই জাহাজ স্যান্ ফ্র্যান্সিস্কো ও এসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন বন্দরের মধ্যে যাতায়াত করে।

সর্ব্বসমেত দুইবার ফরাসী জাহাজে, দুইবার বিলাতী জাহাজে এবং চারিবার ইয়াঙ্কি জাহাজে পর্য্যটন করা হইয়াছে। এইবার এসিয়াবাসী জাহাজ-কোম্পানীর আশ্রয় লইলাম। জাহাজের নাম "টেনিও মারু"—কোম্পানীর নাম "তেয়ো কাইসেন কায়শা"। মারু শব্দের অর্থ জাহাজ, কায়শা শব্দের অর্থ কোম্পানী।

এই নাম দুইটা জাপানী ভাষায় ইংরাজি অক্ষরে লিখিত—ফরাসী জাহাজ-কোম্পানী এবং জাহাজের নামও ফরাসী ভাষায় লিখিত দেখিয়া-

ছিলাম; তাহা ছাড়া বিভিন্ন জাতির জাহাজে অন্য কোনও প্রভেদ দেখিতে পাই না। প্রাচ্য-প্রতীচ্য শ্বেতাঙ্গ-পীতাঙ্গ সকল কোম্পানীরই অর্ণবযান এবং নৌ-চালান একপ্রকার।

"টেনিও মারু"তে পোতাধ্যক্ষ জাপানী। তাঁহার কয়েকজন সহকারীও জাপানী; কিন্তু কতিপয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী আমেরিকান্। খালাসী, বাবরচি ইত্যাদির অর্দ্ধেক জাপানী এবং অর্দ্ধেক চীনা।

জাহাজের পতাকা যে জাপানী তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এই পতাকা না দেখিলে বাহির হইতে এই জাহাজের "জাতি" নির্ণয় করা অসম্ভব। ভিতরের বন্দোবস্তও ফরাসী, ইংরাজ, ইয়াঙ্কি-বন্দোবস্তেরই অনুরূপ। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা, নাচ-গানের ব্যবস্থা, ধূমপানের ব্যবস্থা, ক্রীড়া-কৌতুকের ব্যবস্থা, ধোপা-নাপিতের ব্যবস্থা—সবই অন্যান্য জাতীয় জাহাজে যেরূপ দেখিয়াছি পীতাঙ্গ-কোম্পানীর জাহাজেও সেইরূপ দেখিতেছি। এই জাহাজ দেখিলে "ঈষ্ট ইজ ঈষ্ট, য়্যাণ্ড ওয়েষ্ট ইজ ওয়েষ্ট" অর্থাৎ "পূর্ব্ব পূর্ব্বই থাকিবে পশ্চিমারা পশ্চিমাই থাকিবে। উভয়ের মিলন অসম্ভব!"—একথা বলা চলে না; বরং সর্ব্বদাই মনে হইতেছে, পূর্ব্বই বা কোথায় আর পশ্চিমই বা কোথায়? সর্ব্বত্রই ত একাকার দেখিতে পাইতেছি। সকলকেই এক শ্রেণীর অন্তর্গত বলা উচিত—সেই শ্রেণীর বা জাতির নাম "বর্ত্তমান," "নবীন" বা "আধুনিক"। প্রভেদ যদি করিতেই হয়, তবে রাষ্ট্রীয় পতাকা অনুসারে পার্থক্য করা যাইতে পারে। ইংরাজ-পতাকায় অধীন জাহাজও যেরূপ আধুনিক, ফরাসী, ইয়াঙ্কি, জাপানী-পতাকাসমূহের অধীন জাহাজগুলিও সেইরূপ আধুনিক। ইহাদের কোনটায় জাতীয় বিশেষত্ব কিঞ্চিন্মাত্র নাই। ভারতবাসীরাও যদি কোনদিন স্বকীয় বন্দরে জাহাজ প্রস্তুত করিয়া সাত সমুদ্রে জাহাজ চালাইবার উপযুক্ত হয়,

তাহা হইলে তখন তাহাদের ব্যবস্থাও অবিকল এই ধরণের হইবে। ভারতীয় স্বদেশী জাহাজ এবং দুনিয়ার অন্যান্য জাহাজে কোনপ্রকার প্রভেদ থাকিবে না।

কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, বিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রে চিরকাল এই রূপ সার্ব্বজনীনতাই দেখিতে পাই। বিদ্যার রাজ্যে দেশী, বিদেশী প্রভেদ নাই। যে কার্য্য-প্রণালী অবলম্বন করিলে, মানুষের সুখ বৃদ্ধি হয়, সেই কার্য্য-প্রণালী দুনিয়ার সর্ব্বত্রই সমাদৃত হইয়া থাকে। প্রাচীন ও মধ্য যুগে ভারতবর্ষের কার্য্য-প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন দেশে অনুসৃত হইয়াছে—আবার বহু বিদেশীয় কার্য্য-প্রণালী ভারতবর্ষে আমদানি করা হইয়াছে। হিন্দু-জ্যোতিষ-শাস্ত্রের কথাই ধরা যাউক। এই বিদ্যাটা কি ভারতবাসীর খাঁটি স্বদেশীয়? আমাদের আয়ুর্ব্বেদ, রসায়ন, বস্তুবিদ্যা ইত্যাদিও কি একমাত্র ভারতীয় পণ্ডিতগণেরই উদ্ভাবিত? গ্রীক্-জাতি হইতে, মুসলমান-জাতি হইতে, মঙ্গোলীয়-জাতি হইতে আমরা কত জিনিষই না গ্রহণ করিয়াছি? বরাহমিহির খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে তাঁহার বিখ্যাত "বৃহৎ-সংহিতা"-গ্রন্থে স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন—"ম্লেচ্ছ ঋষিগণও সর্ব্বথা পূজার পাত্র।" য়ুরোপীয় রসায়ন, গণিত, জ্যামিতি, শিল্প-কলা ইত্যাদির বিকাশেও ভারতীয় প্রভাব যথেষ্টই রহিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় জাহাজ যে প্রণালীতে নির্ম্মিত হইত, তাহা দেখিয়া ইংরাজ-জাতিও লাভবান্ হইয়াছে। ইহা ফরাসীদের মত। বস্তুতঃ মানব-সমাজে আদান-প্রদান, বিনিময় ও অনুকরণ অহরহঃ চলিতেছে। এরূপ চলিতেছে বলিয়াই দুনিয়ার সভ্যতা উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। কোন যুগেই কোন বিদ্যা বা কৌশল, ম্লেচ্ছ বা বিদেশীজ্ঞানে বর্জ্জিত হয় নাই।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজেরা বাষ্প-পোত ও বাষ্প-শকট আবিষ্কার

করিয়াছেন, ইয়াঙ্কিরা বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং ফরাসীরা 'এরোপ্লেন' আবিষ্কার করিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীতে জার্ম্মাণীরা 'জেপেলিন' প্রবর্ত্তন করিলেন; কিন্তু এগুলির প্রত্যেকটাই প্রত্যেক দেশে প্রবর্ত্তিত হয় নাই কি? জার্ম্মাণ-'জেপেলিন' ৮।১০ বৎসরের বালক মাত্র। অল্পকালের ভিতরেই দুনিয়ার সর্ব্বত্র এই সমুদয়ও দেখিতে পাইব।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে এই সকল নব নব আবিষ্কারের সূত্রপাত ও প্রথম প্রবর্ত্তন হয়। তাহার পূর্ব্বে ইংরাজ, ফরাসী, জাপানী, ভারতবাসী সকলেই আদিম ধরণের শিল্প-বাণিজ্য-বিজ্ঞানের অধিকারী ছিল; কিন্তু যখনই আবিষ্কারগুলির প্রভাব বুঝিতে পারা গেল, তখনই প্রত্যেক জাতি সেই আদিম ব্যবস্থা বর্জ্জন করিয়া নবীন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন সুরু করিল। ঠিক এই সময়েই এসিয়ার পীতাঙ্গ জাপানীও স্বদেশে বর্ত্তমান বা আধুনিক বিদ্যা প্রচার করিতে লাগিয়া যায়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইয়াঙ্কিদের এক জাহাজ জাপানী-বন্দরে প্রবেশ করে। ভারতবর্ষে এখনও সমুদ্র-যাত্রার বিরুদ্ধে অনুশাসন প্রচারিত। জাপানেও বহুকাল এই নিয়ম ছিল। সমুদ্র পাড়ি দিলে জাপানীদের প্রাণদণ্ড হইত। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও কালাপানির সঙ্গে সংশ্রব জাপানী সমাজে পাপ বিবেচিত হইত। কিন্তু ইয়াঙ্কি-জাহাজের ভয়ে জাপানীরা সাগরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়াছে। তখন হইতে জাপানীরা নবীন যুগের নবীন অস্ত্র-হাতিয়ার বুঝিতে অভ্যস্ত হয়। তাহার ফলে ১৯০৫ সালে বৌদ্ধ জাপান, খৃষ্টান্ রুষিয়াকে পদানত করে। আজ দেখিতেছি, জাপানী জাহাজে বর্ত্তমান যুগের সকল প্রকার সুখ-স্বচ্ছন্দতা, কার্য্য-ক্ষমতা, বিদ্যা-বুদ্ধি পুঞ্জীকৃত। ইংরাজের আবিষ্কার, জার্ম্মানের আবিষ্কার, ফরাসীর আবিষ্কার, ইয়াঙ্কির আবিষ্কার—সকল আবিষ্কারই বরাহমিহিরের সূত্র অনুসারে জাপানীরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছে।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমান যুগের বরাহমিহির এখনও আবির্ভূত হইতে পারেন নাই কেন? যে দেশে যুগে যুগে নূতন নূতন বরাহমিহিরের জন্ম হইয়াছে, সেই দেশে উনবিংশ শতাব্দী বন্ধ্যা হইয়া রহিল কি করিয়া? তথাকথিত জাতিভেদই কি ইহার একমাত্র কারণ?

জাপানী 'ভাইস্‌রয়ে'র পুত্র

জাহাজের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, শ্রেণীতে বহুসংখ্যক জাপানী-যাত্রী। তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য অগণিত জাপানী নর-নারী ফুলের মালা লইয়া 'ডকে'র উপর দণ্ডায়মান।

ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। একজন নাতিযুবক, নাতিপ্রৌঢ় জাপানী দেখিলাম, জলের ভিতর ভিক্ষার্থী বালকগণের জন্য ইয়াঙ্কি-টাকা, আধুলি ইত্যাদি ফেলিয়া দিতেছে। বালকেরা ডুবিয়া সেইগুলি সংগ্রহ করিতেছে। এই উপায়ে জাপানী প্রায় ৫।৭১ খরচ করিয়া ফেলিল। পরিচয়ে জানিলাম, ইনি একজন 'ব্যারণ'। ইঁহার পিতা বিজিত কোরিয়া-প্রদেশে জাপানের 'ভাইস্‌রয়' ও বড়লাট ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল, জাপান-দ্রোহী কোরিয়াবাসী তাঁহাকে হত্যা করে। স্লাভ-যুবক অষ্ট্রীয়ার ভাবী সম্রাট্‌কে যে উদ্দেশ্যে হত্যা করিয়া বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়াছে, কোরিয়ার স্বদেশ-সেবকও সেই উদ্দেশ্যেই 'প্রিন্স্‌' ইতোকে হত্যা করিয়াছিলেন। 'ব্যারণ' ইতো বলিলেন, "আজকাল কোরিয়ায় রাজদ্রোহ বা বিপ্লব নাই; সকল গণ্ডগোল মিটিয়া গিয়াছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, আপনার বংশ কি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ও ধনী ডাইমো-জমিদার-বংশসমূহের অন্যতম? আপনার 'ব্যারণ' উপাধি দেখিয়া সেইরূপ মনে হইতেছে।" 'ব্যারণ' বলিলেন—"না। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ নিতান্ত নগণ্য ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ছিলেন। আমার পিতা, স্বকীয় কার্য্য-ক্ষমতায় জাপান-রাষ্ট্রের উচ্চতম সোপানে পদার্পণ করিতে

২। জাপানী 'ভাইস্‌রয়'—রাষ্ট্রবীর প্রিন্স ইতো

India Press. Calcutta.

৩। জাহাজে সঙ্গীত-ভবন ও পাঠাগার

৪। জাহাজে গল্প-গুজবের আড্ডা

India Press, Calcutta.

এই কারণে আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা এই খেতাবের অধিকারী—তাঁহার পুত্রও 'প্রিন্স' নামে অভিহিত হইবে।" আমি বলিলাম—"দেখিতেছি, জাপানে বিলাতী 'লর্ড'-খেতাবের রীতি অনুসৃত হইয়াছে। ইংলণ্ডে 'লর্ড'দিগের একমাত্র জ্যেষ্ঠপুত্রই উপাধি ভোগ করেন—অন্যান্য সন্তানেরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে সমভাগ্যে গ্রথিত।" 'ব্যারণ' বলিলেন—"জাপানে আমরা বৃটিশ কন্‌ষ্টিটিউশন বা ইংরাজ-রাষ্ট্র-শাসন-প্রণালীর যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকি।"

'ব্যারণ' বহুদিন পূর্ব্বে একবৎসর বিলাতে কাটাইয়াছেন। আমেরিকা হইতে আসিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি জাপান সাম্রাজ্যের পর-রাষ্ট্র-বিভাগে কোন কর্ম্ম করেন?" ইনি উত্তর করিলেন—"আমি স্যান্ ফ্রান্সিস্কোর বিশ্বমেলায় আমাদের গবর্ণমেণ্টের একজন প্রতিনিধি ছিলাম। তিন চারিমাস পরে দেশে ফিরিতেছি।" আমি বলিলাম—"এত শীঘ্র যে?" 'ব্যারণ' বলিলেন—"স্ত্রীর অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে পারিলাম না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয়, আজকাল আপনাদের দেশে রাষ্ট্রীয় দল-বিভাগ, দলাদলি ত বেশ চলিতেছে। আপনি কোন্ দলের অন্তর্গত?" 'ব্যারণ' বলিলেন—"এখনও আমি কোন দলে প্রবেশ করি নাই। আট-দশ বৎসর-কাল স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়াইব, স্থির করিয়াছি। আমি মদ্যপান বড় ভালবাসি। অবশ্য, একদিন-না-একদিন দল পাকাইয়া দলপতি হইয়া বসিব।"

বিশ্বমেলায় দেখিয়াছিলাম—জাপানী-মহাল্লার ভিতর একটা ব্যাণ্ড-ষ্ট্যাণ্ড বা বাদ্যমঞ্চ আছে। তাহাতে জাপানী বাদকেরা যন্ত্র-সঙ্গীত করিত। এই সঙ্গীত শুনিয়া বড়ই বিস্মিত হইয়াছিলাম। "জার্ম্মাণ, ফরাসী ও ইতালীয়ান সঙ্গীত জাপানীরা আয়ত্ত করিল কি করিয়া?"

—এই প্রশ্নই মনে হইতেছিল। জাহাজেও দেখিতেছি, জাপানীরা ইয়োরামেরিকান সুরই আহারের সময় বাজাইয়া থাকে। রাত্রিকালে শ্বেতাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গিনীরা নৃত্য করিল—জাপানী বাদকেরাই যন্ত্র বাজাইল।

একজন ইয়াঙ্কি পাদ্রী-চিকিৎসক চীনের কোন খৃষ্টান-হাঁসপাতালে কর্ম্ম করিতে যাইতেছেন। ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয়, জাপানীরা বিদেশী সুর-তাল-মানে পারদর্শী হইতে পারিয়াছে কিরূপে? অথচ ইহারা গানের তাল হয় ত কিছুই বুঝে না।" ইনি বলিলেন, "গৎগুলি পুস্তকে যেরূপ লেখা আছে, অন্ধের মত এবং বধিরের মত ঠিক সেইরূপ বাজাইয়া গেলে সকলেই দক্ষতা লাভ করিতে পারে। আমাদের সমাজে সঙ্গীতবিদ্যা এই কারণে নিতান্ত সহজ হইয়া পড়িয়াছে। যে কোন ব্যক্তি পুস্তকের স্বরলিপি দেখিয়া সুর বাজাইয়া যাইতে পারে। তাল-মান-লয়ের জ্ঞান না থাকিলেও ক্ষতি হয় না। অবশ্য, অভ্যাস করিতে করিতে অবশেষে কান ঠিক হইয়া আসে।"

পীতাঙ্গ-জাহাজে জীবন-যাপন

প্রথম শ্রেণীর আরোহীদিগের মধ্যে অর্দ্ধাংশ মাত্র জাপানী—অপরার্দ্ধ শ্বেতাঙ্গ। একজনও চীনা বা ফিলিপিনো নাই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে অধিকাংশই জাপানী। এতগুলি জাপানী, হনলুলু ও হিলোর বন্দর ছাড়া পূর্ব্বে আর কোথাও দেখি নাই।

জাপানী-স্ত্রীলোকেরা ঘোম্‌টা দিয়া মুখ ঢাকিয়া চলে না; কিন্তু ইয়োরামেরিকান্‌দিগের স্ত্রী-স্বাধীনতা, জাপানী সমাজে নাই বোধ হইতেছে। এই জাহাজে জাপানী রমণী কয়েকজন আছেন দেখিতেছি; কিন্তু শ্বেতাঙ্গিনীদের পার্শে ইঁহারা নিষ্প্রভ। নীরবে নিঃশব্দে চলা-ফেরা করা জাপানী নারীদিগের স্বভাব দেখিতেছি। পাশ্চাত্য নারীর মুখরতা ও অসংযত চঞ্চলতা ইহাঁদের নাই। দেখিয়া-শুনিয়া ভবিতেছি, ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যতটা স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে, জাপানী সমাজেও হয় ত ততটুকু মাত্র।

আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করিলাম। প্রতিদিন যত শ্বেতাঙ্গসহযাত্রীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই সঙ্গে স্ত্রী দেখিয়াছি। অবশ্য, যাঁহারা অবিবাহিত, তাঁহাদের কথা ধরিতেছি না; কিন্তু বিবাহিত কোন শ্বেতাঙ্গকেই "অস্ত্রীক" দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ"—নিয়মটা শ্বেতাঙ্গমহলে যথেষ্টই প্রচলিত। সহধর্ম্মিণীকে দেশে রাখিয়া কোন ব্যক্তিই বাহিরে বেড়াইতে আসে না। পুরুষ যেখানে যাইবেন, স্ত্রীও সেইখানে যাইবেন—ইয়োরামেরিকান-সমাজের ইহা দস্তুর; কিন্তু এই জাহাজে বহুসংখ্যক গণ্যমান্য উচ্চপদস্থ ধনী জাপানী

দেখিতেছি—তাঁহাদের কাহারও সঙ্গে পত্নী নাই। সহধর্ম্মিণীকে ঘরে রাখিয়া স্বামীর বিদেশ-ভ্রমণ কি এসিয়াবাসীর রীতি?

এই জাহাজে আসর ভাল জমিতেছে না। এতদিন যতগুলি শ্বেতাঙ্গ-জাহাজ দেখিয়াছি, সেগুলি সর্ব্বদাই গুলজার হইয়া থাকিত। ফরাসীই হউক বা গ্রীক্-ইতালীয়ই হউক, জার্ম্মাণই হউক বা ইংরাজই হউক—আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই মিলিয়া-মিশিয়া সুখে সময় কাটাইত। ঐ সকল জাহাজে দুই-একজন কৃষ্ণাঙ্গ, পীতাঙ্গ নর-নারীর দুরবস্থা স্বাভাবিক; কিন্তু তাহা কাহারও চোখে পড়িত না।

আজ জাপানী জাহাজে গঙ্গা-যমুনার প্রভেদ যেন বুঝিতে পারিতেছি। জাপানীরা তাহাদের স্বদেশী জাহাজে চলা-ফেরা করিতেছে; সুতরাং তাহাদের দুরবস্থা এখানে বিন্দুমাত্র নাই। আর শ্বেতাঙ্গেরা ত অহঙ্কারী জাতি—তাহারা যেখানেই যাউক, কর্ত্তামি করিবে—কোন ভ্রূক্ষেপ নাই; সুতরাং জাপানী জাহাজে তাহাদেরও কোন অসুবিধার কারণ নাই। বিশেষতঃ ইয়োরামেরিকান্ সমাজের সকল প্রকার বিলাস-সামগ্রীই অন্যান্য জাহাজের মত এই জাহাজেও প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে।

তথাপি দেখিতেছি, জাহাজে সেই স্বাভাবিক উল্লাস-উচ্ছ্বাস, আমোদ-প্রমোদ নাই। শ্বেতাঙ্গেরা যেন অনেকটা নিস্তেজ ভাবে মুসরিয়া রহিয়াছে। যেন কোনমতে দিন কাটিতেছে মাত্র। প্রাণ খুলিয়া, মন ভরিয়া কথা-বার্ত্তা, চলা-ফেরা যেন শ্বেতাঙ্গ-সমাজের স্বভাব নয়। এদিকে জাপানীরা বড়ই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়। তাহারা একত্র বসিয়া জটলা করে—নিজেদের ভাষায় কথা বলিয়া নিজেদের মধ্যে গল্প করে—নিজেদের গণ্ডীর ভিতর তাস-দাবা খেলে। শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে পীতাঙ্গ মিশিতেছে না—পীতাঙ্গের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ মিশিতেছে না। তেলে-জলে কি মিশিবে না?

দ্বিতীয় শ্রেণীতে একজন ফিলিপিনো যুবকের সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি ম্যানিলায় শিক্ষকতা করেন। শুনিলাম, যুক্তরাষ্ট্র বহুসংখ্যক ফিলিপিনোকে স্যানফ্র্যান্সিস্কোর বিশ্বমেলা দেখিবার জন্য বৃত্তি দিয়াছেন। যুবককে ইয়াঙ্কি শাসন-কর্তাদের উপর সন্তুষ্ট দেখিলাম; কিন্তু ইনি বলিতে লাগিলেন—"ইয়াঙ্কিরা ফিলিপিন দ্বীপে আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করিয়া থাকেন; কিন্তু জাহাজে, রেলে, পথে দেখা হইলে, ইহাদের প্রাচ্য-বিদ্বেষ বাহির হইয়া পড়ে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম —"ইয়াঙ্কি-রাষ্ট্র আপনাকে যাওয়া-আসার খরচ, খাওয়া-খরচ ইত্যাদি দিয়াছেন; তথাপি আপনি ইয়াঙ্কি জাহাজে না আসিয়া জাপানী জাহাজে আসিলেন যে?" ফিলিপিনো বলিলেন—"ইয়াঙ্কি জাহাজে শ্বেতাঙ্গ আরোহী হইতে কাপ্তেন, খালাসী পর্য্যন্ত সকলেই এসিয়াবাসীর প্রতি দুর্ব্যবহার করে। তাহা ছাড়া, দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য কোম্পানীর ব্যবস্থা নিতান্ত জঘন্য; কিন্তু জাপানী জাহাজের দ্বিতীয় শ্রেণী অনেক জাহাজের প্রথম শ্রেণীর সমান এবং এখানে জাপানীরা পরজাতি-বিদ্বেষের প্রশ্রয় দেয় না। 'টেনিও মারু'তে বেশ মনের সুখে চলা-ফেরা করিতেছি। সহযাত্রীগণের সঙ্গে বন্ধুত্ব জন্মিয়া উঠিতেছে।"

আজ প্রথম শ্রেণীর 'ডেকে'র উপর জাপানী খালাসীরা কয়েকটা স্বদেশী অভিনয় করিল। জাহাজের দৈনিক সংবাদপত্রে এই অভিনয়ের কথা বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। নৈশ-ভোজনের পর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সকল আরোহীরা 'ডেকে' আসিয়া বসিলেন। 'ডেক' যথারীতি সাজান হইয়াছিল। একটা ক্ষুদ্র রঙ্গমঞ্চও প্রস্তুত ছিল। একজন নানাপ্রকার হাতের সাফাই দেখাইল। থলিয়া হইতে ডিম বাহির করা, মুখ হইতে সূতা বাহির করা, আগুন গিলিয়া খাওয়া ইত্যাদি নানাপ্রকার বাজি দেখান হইল। ভারতবর্ষে এই সব নূতন নয়।

ইয়াঙ্কিরা ভারতবর্ষের আর কোন কথা না জানিলেও, অন্ততঃ দেশটাকে ম্যাজিকের দেশ বলিয়া জানে।

এতদ্ব্যতীত কয়েকপ্রকার নাচ দেখান হইল। নাচের ঢং দেখিয়া আমাদের ভারতীয় কথাই মনে পড়িল। জাপানী বাজনাতে এবং গানের সুরেও ইয়োরামেরিকান রীতির কোন প্রভাব নাই। নর্ত্তক ও গায়কদিগের চেহারা না দেখিলে, মনে হইবে, ভারতবর্ষেরই অন্যতম প্রদেশবাসী জনগণের অভিনয় দেখিতেছি। নাচ, গান, বাজনায় ভারতে ও জাপানে ঐক্য আছে। দুই সমাজকে এক গোষ্ঠীভুক্ত করা সহজ।

ছোট ছোট দুইটা নাটকের কিয়দংশ অভিনীত হইল। অভিনয় দেখিয়া বিশেষ-কিছু বুঝা গেল না। ইংরাজিতে নাটকদ্বয়ের সারাংশ জানান হইয়াছিল। শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গিনীরা প্রাচ্য ম্যাজিক বা বাজি ও যাদু উপভোগ করিলেন, বুঝিলাম; কিন্তু নাচ-গান ইত্যাদি প্রাচ্য দেশীয় উদ্ভট মাত্ররূপে গ্রহণ করিলেন।

জাপানী চারণের 'কোদান' বা কথকতা

জাপানীরা আপন মনেই চলা-ফেরা করিতেছে। ইহাদের গল্প-গুজবে বাহিরের লোক যোগ দিতে পায় না। ইয়োরামেরিকানেরা কি এই জন্য জাপানকে দুর্বোধ্য বা "চেনা মুস্কিল" বলে? সেদিন একজন জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "মহাশয়, আপনি কখনও কোন জাপানীকে মন খুলিয়া হাসিতে দেখিয়াছেন কি? ইহারা প্রত্যেক কথায় মুচ্‌কে হাসে; কিন্তু এই মুচ্‌কে হাসির অর্থ বুঝা অসম্ভব। জাপানীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা নিতান্ত কঠিন। ইহাদিগকে চিনিয়া উঠা ভার।"

নৈশ-ভোজনের পর 'ডেকে' দাঁড়াইয়া চাঁদ দেখিতেছি। একজন খালাসী আসিয়া জাপানী ভাষায় কি যেন বলিল—অমনি জাপানীরা যে যেখানে ছিলেন সেখান হইতে নিচের তলায় যাইতে লাগিলেন। একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয়, ব্যাপার কি? একসঙ্গে হঠাৎ সকলে মিলিয়া কোথায় চলিয়াছেন?" ইনি ইংরাজী কিছু কম জানেন—সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "কোদান, কোদান।" আমি বলিলাম, "আমি আসিতে পারি কি?" উত্তরের অপেক্ষায় না থাকিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইলাম।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ভোজনালয়ে একটা সভার ব্যবস্থা হইয়াছে—জাপানী পতাকা ঝুলিতেছে—প্রায় একশত জাপানী পুরুষ ও রমণী উপস্থিত। একজন প্রবীণ ব্যক্তি আগন্তুককে দেখিয়া ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি জাপানী ভাষা বুঝেন কি?" আমি বলিলাম, "না"। সকলে হাসিয়া উঠিল।

জাহাজের কাপ্তেন আসিয়া এক ব্যক্তিকে সভাস্থলে পরিচিত করিয়া দিলেন। আমার সঙ্গী বলিলেন, "এই ব্যক্তির বয়স ৭৫ বৎসর—ইনি বক্তৃতা করিবেন।" বৃদ্ধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর একজন আসিল। তাহার হাতে একটা বাদ্য-যন্ত্র, তিনটা তারের সেতার—জাপানী নাম "সেম্‌সেন।" বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া, বসিয়া নানা ভঙ্গীসহকারে কথকতা সুরু করিয়া দিলেন। এক অক্ষরও বুঝিলাম না; কিন্তু ধরণ-ধারণ দেখিয়া দেশীয় কথক ঠাকুরের দৃশ্য মনে পড়িল। কথা বলিতে বলিতে গান আরম্ভ করিয়া দেওয়াও জাপানী কথকের রীতি। দুনিয়ার সর্ব্বত্রই "কোদান" প্রচলিত। প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই সমুদয় বেশী দেখা যাইত। বর্ত্তমান যুগে সংবাদ-পত্র সকলপ্রকার লোক-শিক্ষার ভার লইয়াছে। বিলাতী মিন্‌ষ্ট্রেল, ফরাসী টুবেডোর ও ট্রভে, জার্ম্মাণ মিনেসিঙার, ভোক্‌সডিক্টার, ওয়াণ্ডার-লেরার এবং ভারতীয় চারণ, কথক, পাঠক সবই এক গোত্রের অন্তর্গত।

জাপানী বাজনায় ও গানের সুরে অনেকটা ভারতীয় বাজনা ও সুরের ইঙ্গিত পাইলাম। ইয়োরামেরিকান সঙ্গীতে আমাদের পরিচিত কোন লক্ষণ পাই না; কিন্তু জাপানের গান-বাজনায় বেশ বুঝিতে পারি যে, ভারত ও জাপান একই পরিবারের অন্তর্গত।

কোন্ বিষয়ে কথকতা হইল, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না—শ্রোতৃ-মণ্ডলীর সকলেই নির্ব্বাক হইয়া শুনিল। সঙ্গীর কথায় আভাস পাইলাম—রুশ-জাপানের যুদ্ধ। ইহার নিকট সুবিধা না পাইয়া আর একজন ইংরাজীভিজ্ঞ জাপানীর নিকট গেলাম। ইনি বলিলেন—"রুশ-জাপানের যুদ্ধে পোর্ট আর্থার দখল করিবার সময়ে জাপানী সৈনিক-পুরুষদিগের যৎপরোনাস্তি কষ্টস্বীকার করিতে হইয়াছিল। সেই পোর্ট আর্থারের বীরত্বকাহিনী এই 'কোদানে'র আলোচিত বিষয়। অগ্রগামী

১৩ পৃষ্ঠা

৫। জাহাজে জাপানী নাট্যাভিনয়

India Press, Calcutta.

৬। জাহাজে জাপানী কস্‌রৎ

৭। জাহাজে জাপানী কসরৎ

কর্ম্মবীরগণের স্বার্থত্যাগ,সমাজে প্রচারিত করা কথক-মহাশয়ের উদ্দেশ্য। ইনি জাপানে বিশেষ প্রসিদ্ধ।"

বাঙ্গলায় "স্বদেশী আন্দোলনে"র সময়ে দেখিতাম, বরিশাল হইতে একাধিক কথক আসিয়া কলিকাতায় স্বদেশীর ইতিহাস শুনাইতেন। জাপানের এই প্রবীণ কথককে দেখিয়া সেই কথা মনে পড়িল। ইনি হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে জাপানী সমাজে কয়েক মাসকাল এইরূপ "কোদান" প্রচার করিয়া স্বদেশে ফিরিতেছেন। একজন জাপানী বলিলেন, "আমরা মিলিটারিজম্ বা ক্ষত্রধর্ম্ম ফেনাইয়া বাড়াইয়া, ঘনাইয়া তুলিবার জন্য এইরূপ "কোদান" পছন্দ করি, ভাবিবেন না। আমরা বড় শান্তিপ্রিয়। যুদ্ধ-বিগ্রহ আদৌ পছন্দ করি না; কিন্তু পূর্ব্বপুরুষগণের আত্ম-বলিদান সর্ব্বদা মনে রাখিতে চাহি। আমরা স্বদেশ-সম্বন্ধে সর্ব্বদা ভাবিয়া থাকি —"দেশের জন্য ঢালিল রক্ত অযুত যাহার ভক্তবীর।"

সাগরে তারিখ-বিভ্রাট্

৩১শে মে তারিখের রাত্রিকালে কাপ্তেন একটা বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন—কল্য মঙ্গলবার সকাল প্রায় ৯৷৷০ টার সময়ে আমাদের জাহাজ ১৮০ 'ডিগ্রি' পশ্চিম-'লঙ্গিচিউডে' উপস্থিত হইবে অর্থাৎ আমরা বিলাতের গ্রিন্‌উইচ্ মানমন্দির হইতে পশ্চিম দিকে পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ অতিক্রম করিব।"

আমরা দেখিতে পাই, সূর্য্য প্রতি ২৪ ঘণ্টায় সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া আসে। অবশ্য সূর্য্য ঘুরে না—ঘুরে পৃথিবী; কিন্তু আমরা সূর্য্যের গতিই দেখিতে পাই। সমস্ত পৃথিবীর পরিধি গণিতের ভাষায় ৩৬০ 'ডিগ্রি'তে বিভক্ত; সুতরাং যদি লণ্ডনের সমীপবর্ত্তী গ্রেনীজ-নগরে বসিয়া থাকি, তাহা হইলে দেখিব যে, সূর্য্য পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া অবশেষে ২৪ ঘণ্টা পরে ৩৬০ 'ডিগ্রি' ঘুরিয়া আসিবে—আমার একদিবস পূর্ণ হইবে। গ্রেনীজে যখন ১লা জুন সকাল ৯৷৷০টা, তখন প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থিত ১৮০ 'ডিগ্রি' পশ্চিম-'লঙ্গিচিউডে' ৩১শে মে রাত্রি ৯৷৷০টা। এই দুই কেন্দ্রে সময়ের ব্যবধান ১২ ঘণ্টা; সুতরাং স্বভাবতঃই দুই স্থানের তারিখ ও দিন একরূপ হইতে পারে না।

তাহার উপর আর এক কথা। সূর্য্য (পৃথিবী) চলিতেছে—এদিকে আমাদের জাহাজও চলিতেছে। আমরা যখন স্থল ছাড়িয়া আসি, তখন দিন ও তারিখের নাম জানা ছিল। ইতিমধ্যে গ্রেনীজ হইতে ১২৫০০ মাইল পশ্চিমে চলিয়া আসিয়াছি। জাহাজে বসিয়া সূর্য্যের অস্ত-উদয় অনুসারে যদি দিন ও তারিখ গণনা করি, তাহা হইলে

গ্রেনীজবাসিগণের দিন ও তারিখের সঙ্গে আমাদের সামঞ্জস্য থাকিবে না। অঙ্ক কষিয়া ঠিক করা হইয়াছে যে, জাহাজে পশ্চিম দিকে যাইতে ১৮০ 'ডিগ্রি' পশ্চিমে আসিবামাত্র পুরা একদিন বেশী গণনা করা কর্ত্তব্য এবং পূর্ব্বদিকে যাইতে হইলে, ১৮০ 'ডিগ্রি' পূর্ব্ব-'লঙ্গিচিউডে' পৌছিবামাত্র পুরা একদিন কম গণনা করা কর্ত্তব্য।

এই হিসাবে জাহাজের গণনায় যেদিন ১লা জুন মঙ্গলবার হইত, তাহা ২রা জুন বুধবার হইল।

একজন ফরাসী 'ব্যারণ' জাপানে যাইতেছেন। আর একজন ইংরাজ-ব্যবসাদার চীনে চলিয়াছেন। ইঁহারা দুইজনে প্রায় সকল সময়ে একসঙ্গে কাটাইয়া থাকেন। ইংরাজ একদিন বলিলেন—"মহাশয়, আমেরিকার অত্যুক্তিপ্রিয়তা দেখিয়া আমি বিরক্ত হইয়া গিয়াছি।" জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি দেখিয়াছেন?" ইনি উত্তর করিলেন—"আরে মহাশয়! ইয়াঙ্কিদের যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! সেদিন নিউ-ইয়র্কের কয়েকজন উচ্চপদস্থ লোক বলিতেছিলেন—'এবার ফ্রান্সের বিশেষ ক্ষতি হইল।' আমি প্রশ্ন করিলাম—'কেন?' ইয়াঙ্কিরা বলিলেন—'আমেরিকার পর্য্যটকেরা প্রতিবৎসর ফ্রান্সে বেড়াইতে যান। তাহার ফলে ফরাসীদের যথেষ্ট টাকা রোজগার হয়। রেলকোম্পানী, হোটেল-কোম্পানী ইত্যাদি সকলেই ইয়াঙ্কি-'টুরিষ্ট'দের অর্থে বিশেষ লাভবান্ হইয়া থাকে। এই বৎসর যুদ্ধের জন্য আমেরিকা হইতে পর্য্যটকগণ ফ্রান্সে যাইতে পারেন নাই—ফরাসীদের লোকসান হয় নাই কি'?"

কয়েকজন ইয়াঙ্কি-পণ্ডিত ম্যানিলায় চলিয়াছেন। একজন কীট-তত্ত্ববিৎ 'এন্‌টমলজিষ্ট', একজন 'ব্যাক্টিরিয়লজিষ্ট' এবং একজন রসায়নাধ্যাপক। আমেরিকা হইতে এসিয়ার দিকে যত জাহাজ আসে, প্রত্যেক জাহাজেই দুই-চারি-দশজন পণ্ডিত ফিলিপিনের যাত্রী থাকেন।

কীট-তত্ত্ববিৎ বলিলেন—"হনলুলুতে ইক্ষুক্ষেত্রে নানাপ্রকার অনিষ্ট-জনক কীট দেখা দিয়াছে। সেইগুলি নিবারণ করার জন্য আমাদিগকে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হয়। আমি এখানকার এক্‌সপেরিমেণ্টাল ষ্টেসনে বা পরীক্ষাক্ষেত্রে ১০।১২ বৎসর অনুসন্ধান-কার্য্যে নিযুক্ত আছি। সম্প্রতি শুনিলাম—ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে এক প্রকার কীট দেখা দিয়াছে। সেগুলি ইক্ষু-কীটের শত্রু; সুতরাং সেই কীট যদি হনলুলুতে আমদানী করা যায়, তাহাহইলে অল্পপরিশ্রমে হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জের ইক্ষুক্ষেত্রসমূহ বাঁচান যাইতে পারে। এই অনুসন্ধানে আমি এ-যাত্রায় বাহির হইয়াছি।"

জাপানী কুস্তী-কসরৎ

জাপানী আরোহীরা শ্বেতাঙ্গের নাচ-বাজনায় যোগ দিলেন না। জাপানী জাহাজে শ্বেতাঙ্গ পুরুষ, রমণীগণও কিছু নির্জীব ও স্ফূর্ত্তিহীন-ভাবেই চলিতেছেন। শ্বেতাঙ্গ-জাহাজে শ্বেতাঙ্গদিগের যেরূপ জীবন দেখিয়াছি, তাহার সঙ্গে এই জাহাজে ইহাদের চলা-ফেরার তুলনা করা চলে না। বিদেশী জাহাজে সকল জাতিই সঙ্কোচ বোধ করে। আপন ও পর, স্বদেশী ও বিদেশী ইত্যাদি ভেদজ্ঞান মানুষমাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ। ভারতবাসী প্রায় কোন কার্য্যেই স্বদেশীর কর্তৃত্ব দেখিতে পায় না। বিদেশীর প্রভাবেই চিরজীবন কাটিতেছে। এই কারণে স্বাভাবিক মানুষের চিত্তে সাধারণতঃ যে সকল সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান, গৌরব-নিন্দা ইত্যাদি দেখা যায়, ভারতবাসীর হৃদয়ে সেই সমুদয়ের কোন স্থান নাই। ভারতবাসী একপ্রকার সৃষ্টিছাড়া জীব; কাজেই ইয়াঙ্কি, ইংরাজ, ফরাসী ও রুষ-যাত্রীরা জাপানী জাহাজে কেন নিস্তেজভাবে জীবন-যাপন করিতেছে, তাহা ভারতবাসীরা সহজে না বুঝিতেও পারে।

আজ নৈশ-ভোজনের সময়ে টেবিলের উপর একখানা মুদ্রিত বিজ্ঞাপন দেখিলাম। লেখা আছে যে, জাপানী নাবিক ও ভৃত্যেরা প্রধান 'ডেকে' স্বদেশী পালোয়ানী, লাঠি-খেলা, ছোরা-খেলা ইত্যাদি দেখাইবে। জাপানীর প্রসিদ্ধ 'জিউজিৎসু'-কসরৎও প্রদর্শিত হইবে। জাহাজে চীনা-সেবকগণের সংখ্যাও কম নয়; কিন্তু তাহাদের নাম কোন কাজেই দেখিতে পাই না। চীনাদের অবস্থা দেখিয়া কষ্ট হয়।

ভোজনান্তে 'ডেকের' উপর আসিলাম। একটা সুবৃহৎ আখড়া

প্রস্তুত করা হইয়াছে। আমাদের দেশে মাটি কাটিয়া কোদলাইয়া কুস্তীর ক্ষেত্র তৈয়ার করা হয়। জাপানী কস্‌রতেরও সেই ব্যবস্থা দেখিতেছি। তবে জাহাজে কাঠের 'ডেকে' মাটি বা বালু কোথায় পাওয়া যাইবে? তাই মোটা দড়ির গালিচা বা চটের উপর মাদুর জড়াইয়া 'ডেকে'র উপর ফেলা হইয়াছে। মুখা-মুখি দুই দিকে এক এক বাল্‌তী জল এবং এক এক ভাঁড় নূণ রাখা হইয়াছে।

কুস্তীগিরেরা একে একে মল্লক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদের দেশী অনাবৃতদেহ জাঙ্গিয়া-পরা পালোয়ানের মূর্ত্তিসমূহ যেন সম্মুখে দাঁড়াইল। জাপানীদের শারীরিক গঠনে কোন সৌন্দর্য্য নাই দেখিতেছি। ইহাদের মুখ দেখিয়াও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় না। এই জাহাজে যে কয়জন জাপানী আরোহী আছেন, তাঁহাদের মুখে-চোখে বুদ্ধিমান্ জাতির লক্ষণ দেখি নাই; অথচ ইয়োরামেরিকান জাতীয় প্রায় অধিকাংশ লোকের মুখ-চোখে তীক্ষ্ণ ধী-শক্তির ইঙ্গিত পাই। চেহারামাত্র দেখিলে, জাপানীকে কদাকার হাস্য-রসহীন নির্ব্বোধ জাতির অন্তর্গত, বিবেচনা করিতে প্রবৃত্তি হইবে। ভারতবাসীর চেহারা ও মুখশ্রী কিরূপ, বিদেশীয়েরাই ভাল বলিতে পারিবে।

দুইদল পালোয়ান দুইদিকে মুখামুখি হইয়া বসিল। একব্যক্তি চিৎকার করিয়া প্রত্যেক দলের একজনকে আহ্বান করিল। প্রত্যেক লড়াই একমিনিট, দুইমিনিটের ভিতরই সমাপ্ত হইয়া গেল দেখিলাম। কুস্তী করিতে করিতে নূণ খাওয়া ও জলপান করা ইহাদের অভ্যাস। জাপানীরা ওস্তাদী চালে 'পাঁয়তারা' বেশী করে না। তবে ইহাদের চীৎ করিয়া ফেলিবার মধ্যে একটু কায়দা আছে। তাহাই প্রধানভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভারতীয় কুস্তীগিরদিগের মার-প্যাঁচ এখানে দেখিলাম না।

যাহা হউক, শ্বেতাঙ্গেরা সেদিনকার অভিনয় অপেক্ষা আজকার কুস্তীতে বেশী আনন্দ উপভোগ করিল। তবে সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় ইহাদের ধারণাও জন্মিল—"জাপানীরা আদিম অসভ্য বা অর্দ্ধ-সভ্য লোহিতাঙ্গ বা মাওরি-জাতীয় লোকদিগেরই মাসতুত ভাই।" ইহাদের ভাব-ভঙ্গী ধরণ-ধারণ সবই আদিম, অসভ্য, বর্ব্বর অথবা মধ্যযুগের অনুরূপ। তবে আজকাল ইহারা রুষিয়াকে হারাইয়াছে, আমেরিকাকে ভয় দেখাইতেছে, প্রশান্ত মহাসাগরকে জাপানী-সাগরে পরিণত করিয়াছে, সেনা-বিভাগে জার্ম্মাণীর সমকক্ষ হইয়াছে, প্রবল পরাক্রান্ত ইংরাজ-জাতিকেও বন্ধুত্ব-প্রার্থী করিয়া রাখিয়াছে; সুতরাং জাপানকে অসভ্য বলা ধৃষ্টতামাত্র।"

একটা ব্যবসায়ের কথা মনে হইতেছে। ভারতবাসীরা এইদিকে ঝুঁকিলে, লাভবান্ হইতে পারেন। ইয়োরামেরিকার লোকজন নাচ-বাজনা, কুস্তী, যাদু ইত্যাদি বড় ভালবাসে। নূতন ধরণের যে কোন দৃশ্য অথবা অভিনয় দেখা, ইহাদের নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি। পাশ্চাত্য দেশের প্রত্যেক সহরে নানা প্রকার সদসৎছবি, খেলা, কৌতুক ইত্যাদি দেখাইবার জন্য বহু আয়োজন আছে। কুলী, মজুর, কেরাণী, দোকানদার, ব্যাঙ্কার ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোকই প্রায় প্রতিদিন এই সকল চিত্র-শালায় অথবা প্রদর্শনী-স্থানে যাইয়া সময় কাটায়। কোন নাটকের অভিনয় দেখিতে যত লোক অগ্রসর হয়, তাহা অপেক্ষা বেশী লোক এই ধরণের চিত্রগৃহে বা নাচঘরে আসিয়া থাকে। হাসি-ঠাট্টা, গল্প-কৌতুক, বিস্ময়জনক দৃশ্য, লোমহর্ষণকারী ঘটনা, লাফালাফি, শারীরিক কৌশল ইত্যাদি শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও রমণীগণের অত্যন্ত প্রিয়বস্তু। ভারতবর্ষের কুস্তীগির, হরবোলা (ভেন্ট্রিলোকিষ্ট), বাজী, যাদুকর ইত্যাদি মিলিত হইয়া যদি একটা কোম্পানী গঠন করেন, তাহা হইলে ইয়োরামেরিকার

নানাস্থানে ইহাঁদের পসার জমিতে পারে। শ্বেতাঙ্গেরা কোন এক বস্তু বেশী চাহে না—দুই-তিন ঘণ্টার মধ্যে "পাঁচফুলের সাজি" দেখিতে পছন্দ করে। প্রত্যেক দৃশ্যে একটা নূতন কিছু চিত্তাকর্ষক সামগ্রী থাকিলেই হইল; কাজেই ভারতীয় কোম্পানীকে খানিকটা নাচ, খানিকটা বাজনা, খানিকটা গান, খানিকটা ক্রীড়া-কৌতুক-ব্যায়াম, খানিকটা বাজি, খানিকটা ছবি, খানিকটা রসিকতা, খানিকটা "ভেন্ট্রিলোকিজম্" ইত্যাদি মিলাইয়া 'প্রোগ্রাম' প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার মধ্যে অর্দ্ধঘণ্টাব্যাপী ক্ষুদ্র নাটকের অভিনয়ও চলিতে পারে। এইরূপ একটা কোম্পানী তৈয়ারী করা বোধ হয় বেশী কঠিন নয়।

এসিয়ায় শ্বেতাঙ্গ

ভারতবাসীরা বোম্বাই হইতে ইয়োরোপ যাইবার সময়ে পেনিনসুলার য়্যাণ্ড ওরিয়েণ্টাল ন্যাভিগেশন কোম্পানীর জাহাজের যাত্রী হইতে ইচ্ছা করে না। এই কোম্পানীর স্বত্বাধিকারিগণ ইংরাজ। ইহাদের জাহাজে ইংরাজ শাসন-কর্ত্তারা এবং বণিকগণ বেশী যাওয়া-আসা করেন। ভারতীয় যাত্রীদিগের বিশেষ লাঞ্ছনা হইয়া থাকে। প্রশান্ত মহাসাগরের এসিয়াবাসী যাত্রীরাও এইরূপ লাঞ্ছনাই ইয়াঙ্কি জাহাজে সহ্য করে।

ইয়াঙ্কিই হউন আর ইংরাজই হউন, ফরাসীই হউন আর জার্ম্মাণীই হউন—ইহারা সকলেই নিজকে এসিয়াবাসী অপেক্ষা উন্নত বিবেচনা করিয়া থাকেন। নূন্যাধিক পরিমাণে ইহাঁদের সকলেরই রাজ্য এসিয়ায় রহিয়াছে। সমবেতভাবে ইহাঁরা এসিয়ার হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা। সমগ্র এসিয়াই প্রকৃত প্রস্তাবে ইয়োরামেরিকার অধীন। একমাত্র জাপানের পূরাপূরি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও ক্ষমতা আছে; কিন্তু এসিয়ার অন্যান্য স্থান ভারতবর্ষের মত পূরাপুরি পরাধীন না হইলেও, যথার্থ স্বাধীনতাশীল নয়। চীনের 'রিপাব্লিকে' বিদেশীয় রাষ্ট্রসমূহের ক্ষমতা অত্যধিক। চীনা 'স্বরাজে' ইংরাজ, ইয়াঙ্কি, ফরাসী, রুষ, জাপানী ও জার্ম্মাণ এই ছয় রাষ্ট্রের ষড়যন্ত্র সর্ব্বদা চলিতেছে। ইহার নাম 'স্বরাজ'; কিন্তু পররাজ বা অরাজ বলিলেই প্রকৃত বিবরণ দেওয়া হয়। শ্যাম-রাজ্য ইংরাজ ও ফরাসী সাম্রাজ্যদ্বয়ের ভিতর চাপা পড়িয়া রহিয়াছে। আফগানিস্থান ও পারশ্য, ইংরাজ ও রুষ-সাম্রাজ্যদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী বাফার-ষ্টেট মাত্র।

অর্থাৎ রুশিয়ার সাম্রাজ্য এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য—এই উভয়ের "ধাক্কা সামলাইবার" জন্য আফ্‌গানিস্থান রহিয়াছেন। আফ্‌গানিস্থান না থাকিলে ইংরাজ ও রুশ সাম্রাজ্যের সীমা লাগালাগি হইয়া পড়িবে। তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে অনেক অশান্তির কারণ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। এই জন্য আফ্‌গানিস্থান, পারশ্য ইত্যাদি দেশকে স্বাধীন বা অর্দ্ধস্বাধীন বা সিকি-স্বাধীন রাখিয়া দেওয়া রুশ ও ইংরাজের স্বার্থ। এই সকল দেশকে বিদেশীয় রাষ্ট্রসমূহের স্ফিয়ার অব্ ইন্‌ফ্লুয়েন্স এবং স্ফিয়ার অব্ ইণ্টারেষ্ট রূপে বিবৃত করা হয়। প্রত্যেক জনপদই একাধিক জাতির "প্রভাবমণ্ডলের" অথবা "স্বার্থমণ্ডলের" অন্তর্গত। আর তুরস্ক ও মিশরের ত কথাই নাই। আজকাল বৌদ্ধ-চীন যেরূপ অসংখ্য জাতির প্রভাবমণ্ডলে পরিণত হইয়াছে, মুসলমান-সাম্রাজ্যে সেইরূপ পরজাতিপুঞ্জের প্রভাবমণ্ডল দুই-তিনশত বৎসর ধরিয়া রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরদ্বয়ের দ্বীপপুঞ্জ ভারতবর্ষের ন্যায় পুরাপুরি পরাধীন; কাজেই পীকিং, ব্যাঙ্কক, ব্যাটেভিয়া হইতে কন্‌ষ্টান্টি-নোপল, ক্যাইরো, মক্কা পর্য্যন্ত ৯০ কোটি নর-নারীর বাসস্থান সম্বন্ধে বলা যায়—"স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কা'কে তোরা, স্বদেশ তোদের নয়।" এই বিরাট্ মহাদেশ বর্ত্তমান যুগে ইয়োরামেরিকার জমিদারীস্বরূপ—বৃহত্তর ইয়োরামেরিকার ভোগভূমিমাত্র।

জাপান, রাষ্ট্রীয় হিসাবে পূরা-পরাধীন, কিম্বা অর্দ্ধ-পরাধীন বাফার-ষ্টেট (অর্থাৎ ধাক্কা সামলাইবার রাষ্ট্র) অথবা অন্যকোন রাষ্ট্রের প্রভাবমণ্ডল মাত্র নয়। জাপান, দুনিয়ার রাষ্ট্রমণ্ডলে ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মাণী ইত্যাদি ৬।৭ বনিয়াদী ঘরের মর্য্যাদা পাইয়া থাকে। ১৯০৫ সাল হইতে জাপান কুলীন-সমাজে আসন পাইতেছে। জাপান ফার্ষ্টক্লাশ পাওয়ার অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তি।

রাষ্ট্রমণ্ডলে জাপানের স্বাধীনতা ও কৌলিন্য দেখিতেছি; কিন্তু বিদ্যার ক্ষেত্রে, সারস্বতমণ্ডলে, বিজ্ঞান-রাজ্যে জাপানের এই পদমর্য্যাদা আছে কি? রাষ্ট্রবীরগণ জাপানকে পুরা-স্বাধীন রাষ্ট্র, প্রথম শ্রেণীর কুলীন, দুনিয়া-পূজ্য শক্তি ইত্যাদির সম্মান প্রদান করিতেছেন; কিন্তু অন্যান্য সকল বিভাগে জাপান ইয়োরামেরিকার অধীন—কৃষি, শিল্প-বিজ্ঞান, ব্যবসায়, শাসন-প্রণালী, শিক্ষা-পদ্ধতি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই জাপানকে শ্বেতাঙ্গগণের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইয়াঙ্কি অর্ণবযানাধ্যক্ষ কমডোর পেরি আসিয়া জাপানে বিদেশীয় প্রভাব প্রবর্ত্তন করেন। তাহার ১৫ বৎসর পর হইতে জাপানে নবীন জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হইতে থাকে। শিক্ষা, রাষ্ট্র, শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসা, সকল বিষয়ে পুরাতনের স্থানে নূতন প্রবর্ত্তিত হয়। যুদ্ধবিদ্যা শিখিবার জন্য জাপানীরা জার্ম্মাণীকে গুরু মানিয়া লইয়াছিল; আইন প্রস্তুত করিবার জন্য ফরাসীর শরণাপন্ন হইয়াছিল; জাহাজ তৈয়ারী করিবার জন্য ইংল্যাণ্ডের 'শাগ্‌রেতি' স্বীকার করিয়াছিল, এবং বিদ্যালয় গঠন করিবার জন্য ইয়াঙ্কিস্থানকে পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে জাপান ইয়োরামেরিকার শিষ্য, ছাত্র ও সন্তানমাত্র। জাপানীরা ইহা বেশ জানে; এজন্য ইহারা শ্বেতাঙ্গের নিকট সর্ব্বদা কৃতজ্ঞ। আজ ইহারা ইয়াঙ্কিস্থানকে চোখ রাঙ্গাইয়া ভয় দেখাইতেছে, ইয়োরোপকেও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে; কিন্তু ইয়োরামেরিকার অধীনতা জাপান এখনও মর্ম্মে মর্ম্মে স্বীকার করে। ইয়োরামেরিকার শিক্ষক, চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক 'এঞ্জিনীয়ার' ইত্যাদির সাহায্য জাপানীদের এখনও আবশ্যক।

এই হিসাবে পরাধীন ও অর্দ্ধ-পরাধীন এসিয়া-মহাদেশের সঙ্গে ইয়োরামেরিকার যে সম্বন্ধ, পাঁচকোটি জাপানীর বাসস্থান স্বাধীন এসিয়ার

সঙ্গেও ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ। বর্ত্তমান যুগে শ্বেতাঙ্গেরা সমগ্র এসিয়ার শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু—ইহারা উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ, তাহার নৈসর্গিক অধিকার ছাড়িবে কেন? এই জন্যই শ্বেতাঙ্গ নর-নারীগণ যে-কোন এসিয়াবাসী অপেক্ষা নিজকে মহত্তর ও উন্নততর বিবেচনা করে। ইহাদের বিবেচনায় জাপানী, ভারতবাসী, চীনা, পারসিক সকলেই শূদ্র—নগণ্য ছাত্র বা শিষ্য—অর্দ্ধসভ্য নাবালক। এই কারণেই জাপানেরও বেশী সম্মান ইয়োরামেরিকায় নাই।

সুয়েজ-খাল অতিক্রম করিয়া এসিয়ায় পড়িবামাত্র য়ুরোপীয়েরা তাহাদের ব্রাহ্মণোচিত গুরুগিরি ফলাইয়া থাকে। হনলুলু ছাড়িবার পর হইতে ইয়াঙ্কিরা ঠিক সেই মূর্ত্তি ধারণ করে। ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক —আমাদের দুঃখ করিলে কি হইবে?

জাপানী ও ইয়াঙ্কি দুই জাতীয় জাহাজেই দেখিলাম,—প্রথম শ্রেণীর শ্বেতাঙ্গ যাত্রিগণ সকলেই উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। শ্বেতাঙ্গ সমাজের ইঁহারা গণ্যমান্য লোক। কেহ ধর্ম্ম-প্রচারক, কেহ শিক্ষা-প্রচারক, কেহ সমাজ-সেবক, কেহ বৈজ্ঞানিক;—প্রত্যেকেই এসিয়ায় কিছু-না-কিছু দান করিবার জন্য চলিয়াছেন। কয়েকজন শাসন-কর্ত্তার সঙ্গেও দেখা হইল। এই শ্রেণীর লোক এসিয়াবাসীকে কি চোখে দেখিবেন? প্রাচীন যুগে এসিয়া দুনিয়ার গুরু ছিল—একথা বলিয়া ইঁহাদের সম্মান বা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা চলে কি? কাজেই লজ্জায় মুখ অবনত করিয়া থাকিতে হয়—জাপানীদের মাথাও ইঁহাদের নিকট হেঁট থাকিতে বাধ্য।

ইয়াঙ্কি জাহাজের ভোজনালয়ে ভাল ভাল টেবিলগুলি শ্বেতাঙ্গদের জন্য বাছিয়া রাখা হয়—কোন এশিয়াবাসীকে সেই সকল স্থানে বসিতে দেওয়া হয় না। ইয়াঙ্কিরা চীনা বা জাপানীদের সঙ্গে একাসনে খানা খাইতে চাহে না; কাজেই জাপানীরা ইয়াঙ্কি জাহাজে চলা-ফেরা করে

২৬ পৃষ্ঠা

৮। জাহাজে ভোজনালয়

India Press, Calcutta.

২৭ পৃষ্ঠা

৯। জাহাজে শয়ন-কক্ষ

India Press, Calcutta.

না। এদিকে জাপানী জাহাজেও শ্বেতাঙ্গেরা বেশী আসে যায় না—নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই তাহারা জাপানী কোম্পানীর আশ্রয় লইয়া থাকে। জাপানী জাহাজেও শ্বেতাঙ্গেরা জাপানীদের সঙ্গে আহারে বসে না; এইজন্য কোম্পানী প্রথম হইতেই গোলযোগ বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইয়াঙ্কি জাহাজে সুদীর্ঘ ও প্রশস্ত টেবিল ভোজনালয়ের মধ্যস্থলে সন্নিবেশিত—ইহাই "কুলীন"দিগের জন্য সম্মানসূচক আসন। পাশে পাশে কতকগুলি ছোট ছোট টেবিল থাকে—সেইগুলিতে কুলীন, অকুলীন বিচার করা হয় না। জাপানী জাহাজের ভোজনালয়ে একটাও সুবৃহৎ টেবিল নাই—মধ্যস্থলেও কোন সম্মানসূচক আসন পাতা হয় না—সকল টেবিলই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র; সুতরাং কুলীন-অকুলীন, উচ্চ-নীচ, শ্বেতাঙ্গ-পীতাঙ্গ ইত্যাদি জাতিভেদ বুঝা যায় না। এই উপায়ে শ্বেতাঙ্গের অহঙ্কারও রক্ষিত হয়, জাপানীদের ইজ্জৎও মারা যায় না। জাপান লড়াই করিয়া জিতিয়াছে বলিয়া কি জাতিতে উঠিয়াছে? জাপানী যে এসিয়াবাসী সেই এসিয়াবাসী—জাপানীর সঙ্গে শ্বেতাঙ্গের পংক্তি-ভোজন এখনও সুদূরপরাহত। চীনা-বেচারাদের ও ভারতবাসীর কথা ত এক্ষেত্রে উঠিতেই পারে না।

কোন কোন শ্বেতাঙ্গ পণ্ডিত প্রাচ্য সভ্যতার প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রশংসা আন্তরিক হইতে পারে এবং হয় ত প্রশংসা নিতান্ত অমূলক না হইতেও পারে; কিন্তু যাঁহারা বর্ত্তমান যুগে জাপান, চীন, ভারতবর্ষ, পারস্য ইত্যাদি দেশে নব্য বিদ্যাসমূহ প্রচার করিতে আসিতেছেন, তাঁহাদের মুখে এসিয়ার গৌরব শুনিলে, "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" সহ্য করিবার অবস্থা উপস্থিত হয়। একজন পাদ্রী-চিকিৎসক বলিলেন—"মহাশয়, এসিয়াবাসীদের মস্তিষ্ক অতিশয় তীক্ষ্ণ। সাধারণ জার্ম্মাণ, ইংরাজ, ইয়াঙ্কি অপেক্ষা চীনা ও ভারতীয় ব্যক্তির মাথা

উন্নততর। আপনারা যত শীঘ্র ইয়োরোপ ও আমেরিকার দর্শন, বিজ্ঞান বুঝিতে সমর্থ, আমরা তত শীঘ্র এসিয়ার মর্ম্মকথা বুঝিতে সমর্থ নহি। আপনাদের লোকেরা ইংরাজী, জার্ম্মাণ, ফরাসী, গ্রীক, ল্যাটিন ইত্যাদি ভাষা অতি সহজেই দখল করিয়া ফেলে—আর আমরা আপনাদের চীনা বা ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য কয়জনে সত্যভাবে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছি? বিলাতী 'ব্রাউনিং' ভারতবাসীর পক্ষে দুর্ব্বোধ্য নয়—অথচ আপনাদের ঠাকুরকে আমরা কেহই বুঝি না। এসিয়ার সেরা ছাত্রেরা ইয়োরোপ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল শ্বেতাঙ্গ ছাত্রকেই হারাইয়া দিতে পারে। আমি আমেরিকার একজন শিক্ষিত চীনার কথা জানি। সে চিকিৎসা-বিদ্যার শেষ পরীক্ষায় সকলপ্রকার উচ্চতম মেডেল ও পারিতোষিক পাইয়াছিল। অথচ একজন ইয়াঙ্কি, ত্রিশবৎসর চীনে বাস করিয়াও চীনা-ভাষা শিখিতে পারিলেন না।"

রাষ্ট্রমণ্ডলে প্রশান্ত মহাসাগর

বড়ই বিস্ময়ের কথা—এ কয়দিনের ভিতর কোন জাপানীর সঙ্গে কোন শ্বেতাঙ্গের বাক্যালাপ হইল না। জাপানী জাহাজ-কোম্পানীর ব্যবস্থায় আজ জাপানী থিয়েটার, কাল জাপানী ব্যায়াম, পরশু জাপানী সিনেমা-প্রদর্শন ইত্যাদি কত কি হইল। ফরাসী, ইয়াঙ্কি ও ইংরাজ জাহাজ-কোম্পানীর ব্যবস্থায় এই সকল অনুষ্ঠান দেখি নাই। মিলা-মিশার এত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও শ্বেতাঙ্গে-পীতাঙ্গে করমর্দ্দন পর্য্যন্তও হইল না। হায় জাপান, তুমি শ্বেতাঙ্গের হিংসা-দ্বেষ ও ঘৃণা এড়াইয়া কতদিন আত্মরক্ষা করিতে পারিবে? আর হায় এসিয়া!

জাপানের কয়েকজন ব্যবসায়ী এই জাহাজে আছেন—কেহ কেহ ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সঙ্গে কারবারও আছে। সকলেই আমেরিকার বিশ্বমেলা দেখিয়া ফিরিতেছেন। ইঁহাদের দ্রব্যাদি মেলায় প্রদর্শিত হইয়াছে। রেশমী বস্ত্রের মহাজনই এই জাহাজে বেশী।

একজন দেখিলাম, পাঠাগারে বসিয়া জাপানী-অক্ষরে লিখিতেছেন। ইনি কলযন্ত্রের ব্যবসায় করিয়া থাকেন। ইয়াঙ্কিস্থানের বড় বড় শিল্প-কেন্দ্রে 'ফ্যাক্টরী' পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। পরিদর্শনের ফল জাপানের কল-কারখানা-বিষয়ক সংবাদ-পত্রের জন্য লিখিত হইতেছে।

জাপানীরা, তাহাদের মাতৃভাষায় লিখিত 'নভেল' পাঠ করিয়া দিন কাটাইতেছে, জাহাজে উপন্যাস-পাঠ শ্বেতাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গীদিগেরও দস্তুর। 'ব্যারণ' ইতো বলিলেন—"আমি ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা

করিতে ভালবাসি। আমার সঙ্গে কয়েকখানা ইংরাজী ও জাপানী ভাষায় প্রণীত ইতিহাস-গ্রন্থ রহিয়াছে।"

ইয়াঙ্কি জাহাজের মত জাপানী জাহাজেও দৈনিক সংবাদপত্র বাহির হয়। তারহীন টেলিগ্রাফের সাহায্যে যুদ্ধের খবর জাহাজে বসিয়া প্রতিদিন পাওয়া যাইতেছে।

প্রশান্ত মহাসাগরকে সত্য সত্যই প্রশান্ত দেখিলাম। মাত্র একদিন কয়েক ঘণ্টার জন্য সমুদ্র উন্মত্ত ছিল। শীতকালে শুনিতে পাই, প্রশান্ত মহাসাগর সর্ব্বদাই ভীষণ আকার ধারণ করিয়া থাকে। এত বড় ঢেউ অন্য কোন সাগরে দেখা যায় না—তখন জাহাজের তালহীন নৃত্য আরোহীদিগের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়। কিন্তু এ যাত্রায় সৌভাগ্য-ক্রমে বিলাতী কবির "All was tranquil as the summer sea." অর্থাৎ গ্রীষ্ম-সাগরের তরঙ্গহীনতা কাহাকে বলে, বেশ বুঝিতে পারিলাম।

আটলাণ্টিক পার হইতে মাত্র সাতদিন লাগিয়াছিল—প্রশান্ত মহাসাগর পার হইতে সতের দিন লাগিল। ঠিক যেন নৌকাবক্ষে নদী পার হইতেছি। হনলুলুতে যত গরম ছিল, জাহাজে উঠিবার পর আর তত গরম নাই। জাহাজ বহু উত্তরে আসিয়া পড়িয়াছে। জাপানের দিকে অগ্রসর হইবার সময়ে আবার গরম সুরু হইল।

বিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রমণ্ডলে প্রশান্ত মহাসাগরের স্থান অতি উচ্চ হইবে। এই সাগরে একটা বড় বন্দর লাভ করা চিরকালই রুষিয়ার আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। জাপানের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া রুষিয়া আজকাল কিছু নতশির; কিন্তু রুষিয়ার গোঁ শীঘ্র যাইবে না। ইংরাজ ত এসিয়ার সর্ব্বপ্রধান বিদেশীয় প্রভু—সম্প্রতি চীনে ইংরাজের সাম্রাজ্য-বিস্তার ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের উপর কতকগুলি বর্দ্ধিষ্ঠ চীনা-বন্দরও ইংরাজের

আয়ত্তে রহিয়াছে। এদিকে ইংরাজের অষ্ট্রেলিয়া ও ক্যানাডা, প্রশান্ত মহাসাগরের দুই সীমায় জাপানের আক্রমণকে সর্ব্বদা ভয় করিতেছে। ওশিয়ানিয়ার দ্বীপপুঞ্জে নানা ইয়োরোপীয় ও ইয়াঙ্কি জাতির আধিপত্য জাপান-সাম্রাজ্যের কণ্টকস্বরূপ। হাওয়াই ও ফিলিপিন লইয়া জাপান ও ইয়াঙ্কিস্থানের মনোমালিন্য শীঘ্র ঘুচিবার নয়। অধিকন্তু প্যানামা-খাল কাটার ফলে আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরদ্বয় যুক্ত হইয়া গেল। তাহার প্রভাবে প্রশান্ত মহাসাগরে ইয়োরামেরিকার কার্য্যক্ষেত্র এবং আটলাণ্টিক মহাসাগরে জাপানের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃতরূপেই প্রস্তুত হইবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণ দ্রুতবেগে সাধিত হইতে থাকিবে।

আমেরিকা আবিষ্কারের পর হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগরে রাষ্ট্র-মণ্ডলের ভার-কেন্দ্র অবস্থিত ছিল। ষোড়শ হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত আটলাণ্টিকের দুই পার্শ্ববর্ত্তী জনপদসমূহই দুনিয়ার হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা রহিয়াছে। তাহার পূর্ব্বে ভূমধ্যসাগরের ভিতর রাষ্ট্রমণ্ডলের ভার-কেন্দ্র অবস্থিত ছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভূমধ্যসাগরের যে স্থান ছিল, কলাম্বসের পর আটলাণ্টিকের সেই স্থান রহিয়াছে। ১৯০৫ সালে জাপানের বিজয়-লাভ এবং ১৯১৫ সালে প্যানামা-খাল খোলার পর হইতে প্রশান্ত মহাসাগরেরও সেই স্থান হইবে। বর্ত্তমানে জাপান নৌ-বলে "কমাণ্ড অব্ দি প্যাসিফিক" বা প্রশান্ত মহাসাগরের আধিপত্য ভোগ করিতেছেন। দেখা যাউক, এই আধিপত্য কোথায় গিয়া ঠেকে। সম্প্রতি ইংরাজ ও ইয়াঙ্কি এই আধিপত্যভোগে জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বী। ফ্রান্স এবং রুষিয়া কিছুকাল হতপ্রভ থাকিতে বাধ্য; কিন্তু প্রতিভাবান্ জার্ম্মাণীর উদীয়মান নৌ-বল কখন কি মূর্ত্তি ধারণ করে, বলা যায় না।

এইরূপে সমুদ্র হইতে সমুদ্রান্তরে যুগে যুগে মানব জাতির লীলা-ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। সকল যুগেই সাগর মানবকে আহ্বান করিয়া

তাহার সভ্যতা বিকাশের পথ প্রস্তুত ও বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে। বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার বুঝিতে হইলে সাগরের ডাক অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না। যখন ইয়াংসিকিয়াং, গঙ্গা, টাইগ্রিস ও নীল নদী চতুষ্টয়ের কূলে মানব-সভ্যতার বিকাশ সাধিত হইতেছিল, তখন ভারত মহাসাগর দুনিয়ার কেন্দ্র ছিল। সেই প্রাচীন জগতের মধ্যবর্ত্তী জনপদ ছিল ভারতবর্ষ। যখন একদিকে মিশর, অপরদিকে চীন এবং এই দুই জনপদের মধ্যে ভারতবর্ষ আদান-প্রদানও বিনিময়ের উপায়স্বরূপ বিরাজ করিত, তখন ভূমধ্যসাগরের গৌরব আরব্ধ হয় নাই। সেখানে মানবজাতির নূতন কর্ম্মকেন্দ্র-স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছিল মাত্র।

সাগরাধিপত্য বা "কমাণ্ড অব দি সী" কাহাকে বলে, ভারতবাসীর পক্ষে আজকাল তাহা বুঝা অসাধ্য। ভারতবাসী আজকাল সাগরের ডাকে সাড়া দেয় না। বিশেষতঃ, সমুদ্রযাত্রা-নিষেধের শাস্ত্রবাণী পণ্ডিত-মহাশয়গণ জোরের সহিত প্রচার করিতেছেন। ইংরাজেরা বর্ত্তমান যুগের সাগরাধিপতি। এই তথ্যের ফর্ম্মূলা "বৃটেনিয়া রুলস্ দি ওয়েভস্"। আধুনিক জগৎ এই সূত্র একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধস্বরূপ গ্রহণ করিয়া লইয়াছে। কিন্তু বৃটেনিয়াদেবীর সাগর-শাসনে অনেকে বিরক্ত। জার্ম্মাণেরা ইংরাজকে বেশীদিন এই গৌরবের অধিকারী থাকিতে দিবে না, ইহাই তাহাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। জার্ম্মাণেরা বলে—"আমরা দুনিয়ার জাতি-পুঞ্জকে সাগরে চলাফেরার পুরা স্বাধীনতা প্রদান করিবার জন্য ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়িতেছি। জগতের সকল সমুদ্রের চাবিই ইংরাজের হস্তগত। ইহাতে দুনিয়ার লোককে ইংরাজের নিকট অবনত থাকিতে হয়। আমরা ইংরাজের এই আধিপত্য ভাঙ্গিয়া জগদ্বাসীর সাগরাধিকার প্রবর্ত্তন করিতে চাহি। এই হিসাবে আমরা মানব জাতির উদ্ধারকর্ত্তা।

ইংরাজ-জাতির একচ্ছত্র সাগর-ভোগ না থাকিলে, জগতের সকল জাতিই স্বাধীনভাবে স্বচ্ছন্দে সমুদ্রে চলা-ফেরা করিতে পারিবে।"

ইংরাজ যে হিসাবে সপ্তসমুদ্রে সাগরাধিপত্য করিয়া আসিতেছেন, জাপানীরা সেই হিসাবে প্রশান্ত মহাসাগরে আধিপত্য ভোগ করিতে-ছেন। বর্ত্তমানযুগের ভারতবাসী এই সাগরাধিপত্য কবিতায় ভোগ করিতে শিখিতেছে :—

"একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত-সাগরময়,
সন্তান যার তিব্বত, চীন, জাপানে গঠিল উপনিবেশ।"

সেদিন ছিল "ভারতবাসীর সাগরাধিপত্যের যুগ; হিন্দু বরুণদেব তখন ভারত-মহাসাগরের অধিপতি ছিলেন। সুতরাং ভারতবাসী বর্ত্তমান যুগের "প্রশান্তমহাসাগর-সমস্যা" বুঝিতে পারিবে না কেন?

"সায়োনারা" বা বিদায়

ইয়োকোহামায় পৌঁছিবার আগের দিন রাত্রে জাহাজের কর্ম্মচারীরা নানাপ্রকার কাগজের ফুল ও পতাকায় ভোজনালয় সাজাইয়া দিলেন। নৈশ-ভোজনের সময় বেশ হাসি-ঠাট্টা চলিতে লাগিল প্রত্যেক আরোহীর মাথায় একটা করিয়া 'গাধার টুপি' দেওয়া হইল। এক টেবিল হইতে অপর টেবিলের দিকে লোকেরা কাগজ ছোড়া-ছুড়ি করিতে থাকিলেন। জাপানী কোম্পানীর জাহাজে প্রতিদিনই একটা-না-একটা উৎসব লাগিয়াই আছে।

আজকার "মেনু" বা খাদ্য-তালিকা ভাল কাগজে ছাপান হইয়াছে। জাপানী ভাষায় কিন্তু ইংরাজি অক্ষরে মাথায় লেখা "সায়োনারা" বা বিদায়। মাঝে মাঝে উচ্চ সাহিত্য হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে যথা—

My appetite comes to me while eating—Montaigne.

Can we desire too much of a good thing?—Don Quixote.

My good digestion waits on appetite, and health on both.

—Macbeth.

হনলুলুর কীট-তত্ত্ববিদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইল। ইনি বলিলেন—"জাপানের নৃ-তত্ত্ব বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। জাপানীরা তাহাদের প্রাচীন সভ্যতার সকল অঙ্গই চীন, কোরিয়া ও ভারতবর্ষ হইতে লাভ করিয়াছে। অথচ ইহাদের উৎপত্তি বোধ হয় এসিয়া-মহাদেশে হয় নাই। শারীরিক গঠন, মুখ-চোখের আকৃতি ইত্যাদির প্রমাণে ইহাদিগকে মলয়-

দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণের জাতি বলা কর্ত্তব্য। জাপানী জাতিকে মঙ্গোলিয় জাতির অন্তর্গত বিবেচনা করা যাইতে পারে না। জাপানীরা দক্ষিণ দ্বীপপুঞ্জ হইতে উত্তরে অগ্রসর হইয়াছে।"

"তোয়া কাইসেন কায়সা" বা "প্রাচ্য জাহাজ-কোম্পানী"র 'প্রেসিডেণ্ট' আজ তারহীন বার্ত্তাবহের সাহায্যে প্রথম শ্রেণীর যাত্রিগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার তোকিও-নগরস্থ গৃহে একদিন সকলকে চা-পান করা হইবে। সভাপতি-মহাশয় প্রত্যেকবার জাহাজ পৌঁছিলে আরোহীদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। জাপানীরা খরিদ্দারের মন রাখিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকে দেখিতেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাধীন এশিয়ার রাজধানী

তোকিওর পথে

জাহাজ প্রত্যূষে আসিয়া ইয়োকোহামায় ঠেকিল। জাপানে এখন বর্ষাকাল। আকাশ মেঘে ও কুয়াশায় আচ্ছন্ন। বিলাতেও এই সময়ের অবস্থা প্রায় এইরূপ—কিন্তু শীত কিছু বেশী।

ইয়োকোহামা-বন্দর দেখিয়া নিউইয়র্কের বিরাট দৃশ্য ত মনে আসিলই না—এমন কি ফ্রান্সের মার্সেলও জাপানের সেরা বন্দর অপেক্ষা সমৃদ্ধিসম্পন্ন বোধ হইতে লাগিল।

এতদিন পরে আবার ভাষাসমস্যায় পড়িলাম। ইংরাজীশিক্ষিত ভারতবাসীর নিকট ইংলিশস্থান ও ইয়াঙ্কিস্থান হিন্দুস্থানেরই বিস্তার মাত্র। এই দুই দেশের প্রত্যেক স্থানে নিজের দেশেই আছি ভাবিতাম। লোকজনের কথা বুঝিতে পারার এই ফল। আজ হিন্দু-প্রভাব-সমন্বিত এশিয়ার এক অংশে পদার্পণ করিবামাত্র নিতান্তই সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। ইয়োরামেরিকার নরনারীগণই এসিয়াবাসী অপেক্ষা ভারতবাসীর বেশী আত্মীয় মনে হইতেছে! ভাবিতেছি—"ইংরাজকে, ইয়াঙ্কিকে চিনিতে জানিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি—এই চেষ্টা নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই। কিন্তু জাপানীকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াও সফল হইব কি?"

'এশিয়ার ঐক্য' কথাটা বর্ত্তমানযুগে শব্দ মাত্র। প্রাচীন যুগের

১০। ইয়োকোহামা নগর

India Press, Calcutta.
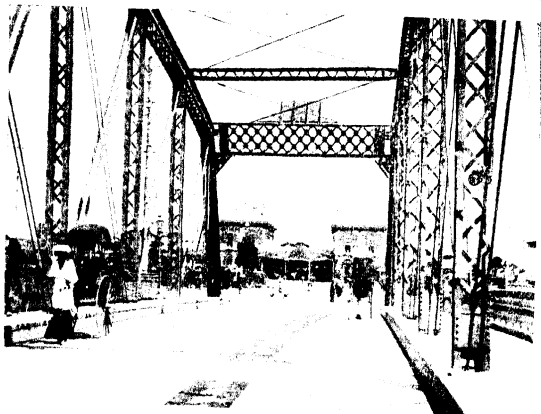
১১। ইয়োকোহামার একদৃশ্য

১২। দাইমিয়োর কলহ

এশিয়ায় ভাষার ঐক্য না থাকিলেও সাহিত্যের ঐক্য, ভাবের ঐক্য, আদর্শের ঐক্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐক্য, সুকুমার শিল্পের ঐক্য, পূজাপাঠের ঐক্য ইত্যাদি ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমানযুগে হিন্দুর সঙ্গে মিশরীর লেনদেন নাই, জাপানীর সঙ্গে হিন্দুর লেনদেন নাই, চীনার সঙ্গে পারশীর লেনদেন নাই। এশিয়ার কোন জাতি অপরাপর জাতিকে চিনে না। আধুনিক কালে এশিয়াবাসীর মূলমন্ত্র আসে এশিয়ার বাহির হইতে। বর্ত্তমান এশিয়ায় যদি কিছু ঐক্য থাকে তাহা এই বাহিরের প্রভাবে সাধিত হইয়াছে। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, আদর্শ, প্রেরণা ইত্যাদি সবই এশিয়া ইয়োরামেরিকা হইতে আমদানি করিয়া থাকে। ইয়োরামেরিকার সাগ্‌রেতী করিয়াছি বলিয়া ইয়োরামেরিকার প্রভাবে ও সাহায্যে ইয়োরামেরিকার কৃতী শিষ্য জাপানকে কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিব মাত্র। সুতরাং এশিয়ার ঐক্য মিথ্যা কথা—এশিয়া অনেক। পরন্তু ইয়োরামেরিকা অনেক ক্ষেত্রে সত্যসত্যই এক। পাশ্চাত্য দেশের সকল জাতির মধ্যেই মোটের উপর একটা আদর্শ ও প্রেরণা দেখিতে পাওয়া যায়। ইয়োরামেরিকার ঐক্যেই সমগ্র দুনিয়ায় একটা চলনসই ঐক্যবন্ধন সৃষ্ট হইয়াছে। ইংরাজী ভাষা বর্ত্তমানযুগে এইরূপ এক বন্ধন-রজ্জু।

ইংরাজী ভাষাকে সম্বল করিয়া কোন ইতালীয় পর্য্যটক ভারতবর্ষে আসিলে হিন্দুস্থানের কতখানি বুঝিতে পারিবেন? ভারতবাসীও ইংরাজীর মাহাত্ম্যে জাপানী জীবনের ঠিক ততটুকুই বুঝিতে পারিবেন। বরং ইংরাজ-শাসিত ভারতবর্ষে ইংরাজীর সাহায্যে যথেষ্ট উপকার হয়। কিন্তু জাপানীত এক মাত্র ইংল্যণ্ডকেই বর্ত্তমান জগৎ বিবেচনা করে না। জাপানীরা কেহ জার্ম্মাণ শিখে, কেহ ফরাসীতে গ্রন্থ লিখে, কেহ বা ইংরাজী চর্চ্চা করে। কাজেই ইংরাজী জানা লোক জাপানে বেশী

না থাকারই কথা। মিশরের অবস্থাও এইরূপ দেখিয়াছি। মিশরীয়েরা এতকাল ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের আদরই করিয়াছে।

বন্দরে নামিয়া টুরিষ্ট-কোম্পানীর আশ্রয় লইলাম। একজন লোক সঙ্গে পাওয়া গেল—জাতিতে রুশ—ইংরাজী কথা মন্দ বলে না। যথারীতি মাল-পরীক্ষা সুরু হইল। কাষ্টম আফিসের কর্ম্মচারীরা বাক্স খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন, তামাক চুরুট ইত্যাদি সঙ্গে আছে কি না। প্রত্যেক বন্দরেই এই ব্যবস্থা।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে যখন মার্কিণ কমডোর পেরি জাহাজ লইয়া জাপানে উপস্থিত হন তখন ইয়োকোহামা একটা ধীবর-পল্লী মাত্র ছিল। তখনকার দিনে সমুদ্রযাত্রা জাপানে নিষিদ্ধ ছিল। সাগর পার হইলে জাপানীদের প্রাণদণ্ড হইত। রাষ্ট্রবীর ইতো যৌবনকালে প্রাণদণ্ড হইতে বিশেষ কষ্টে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। অথচ আজ এই বন্দরে রণতরী বাঁধা থাকে—ইয়াঙ্কিরাষ্ট্র এই বন্দরের ভয়ে জড়সড়। এই জাহাজঘাটার শক্তি খর্ব্ব করিতে পারিলে ইংরাজ, জার্ম্মাণ, ফরাসী, রুশ সকলেই যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হয়। ষাট বৎসরে এই রূপান্তর।

অথচ ইয়োকোহামা সহরটা এখনও নিতান্ত জাঁকজমকহীন ও দরিদ্র দেখিতেছি। না আছে অট্টালিকা বৈভব—না আছে অগণিত লোকসমাগম। ইয়োরামেরিকার নগরগুলির তুলনায় ইয়োকোহামা এখনও একটা পল্লীই বটে।

এই সহরে মোটর-কার নাই বলিলেই চলে—ঘোড়ার গাড়ীও নাই। রাস্তায় হৈহৈ রৈরৈ সামান্যমাত্র দেখিতে পাই না। হোটেল, দোকান, বাজার ইত্যাদির ঐশ্বর্য্যই বা কৈ? জাপানকে এশিয়ার ইংল্যাণ্ড, এবং আজকাল জার্ম্মাণি বলিয়া বিবৃত করা হয়। অথচ তাহার সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র এত দরিদ্র কেন? দেখিতেছি, ইয়োরামেরিকার সমান

ধনশালী ও চালচলনশীল না হইয়াও ইয়োরামেরিকার বিজ্ঞান ও শিল্পের মূলমন্ত্র আয়ত্ত করা যায়। আর নিতান্ত দরিদ্র পল্লীবাসী জাতিও দুনিয়ায় প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তি হইতে পারে। ইয়োকোহামায় নামিবার পূর্ব্বে এই কথাটা যথার্থরূপে বুঝিতে পারিতাম না। আজ বিস্ময়ের সীমা নাই। এই বিস্ময় দুনিয়ার সপ্তম আশ্চর্য্যজনক বস্তু বা অষ্টম আশ্চর্য্যজনক বস্তু দেখিবার বিস্ময়েরই অনুরূপ।

ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে ঠেলা-গাড়ীর চলন আছে। সেইরূপ ঠেলা-গাড়ীতে মাল চাপাইয়া জাপানী ঠেলাওয়ালারা সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। আমি বসিলাম মানুষ-ঠেলা রিক্শতে। এইরূপ ঠেলা-গাড়ী এবং রিক্শই ইয়োকোহামার স্থল-যান। কতকগুলি গরুর গাড়ীর মত গাড়ীও দেখা গেল। এই সমুদয়ে মানুষ যাওয়া-আসা করে না—মাল চালান দেওয়া হয়। এইগুলির বাহক গর্দ্দভপ্রায় অশ্ব। লিভারপুল, নিউইয়র্কের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাচ্য বন্দরের দৃশ্য এইরূপ।

রাস্তায় লোকজনের পায়ে কাহারও চামড়ার জুতা আছে কাহারও বা নাই। জাপানের স্বদেশী জুতা বিচিত্র। কাঠের খড়ম অথবা খড়ের চটি জুতা অধিকাংশ চরণের আবরণ দেখিলাম। চামড়ার সম্পূর্ণ জুতা অথবা বুট প্রায় কোন পথিকের পায়ে দেখা গেল না। বস্ত্রের মধ্যে জাপানী আল্‌খাল্লা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমাদের চোগা-চাপকান, মিশরের গালাবিয়া আর জাপানীদের "কিওমনো" প্রায় একশ্রেণীর অন্তর্গত। মাথার টুপি একধরণের নয়—তবে সকলের মস্তকেই একটা না একটা আবরণ রহিয়াছে, একথাও বলা যায় না। স্ত্রীলোকের মাথায় বিচিত্র খোপাই একমাত্র শিরস্ত্রাণ। জাপানী রমণীদের কটিবন্ধে আসন-সদৃশ বস্তু দেখা যায়। এই আসন পৃষ্ঠে বোঁচকার মত বাঁধা থাকে। ইহারা শিশুসন্তানগণকে কোলে করিয়া

বেড়ায় না—পীঠে বাঁধিয়া রাখে। ভারতবর্ষে পাহাড়ী মেয়েরা এইরূপ করে।

সহরের এদিক ওদিক সামান্য মাত্রা ঘুরিয়া রেলওয়ে ষ্টেসনে আসিলাম। নগরের অন্যান্য দৃশ্যে যেরূপ এখানেও সেইরূপ দারিদ্র্যের লক্ষণই দেখিতে পাইতেছি। গাড়ীগুলি ছোট ছোট—কোন মতে কাজ সারা যায় এই উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইয়াছে। ইয়াঙ্কিস্থান কুবেরের রাজ্য—সেখানকার বিষয়সম্পদ দেখিতে দেখিতে "চাল" বড় হইয়া গিয়াছে। কাজেই জাপানের বাহ্য অবস্থা দেখিয়া হতাশ হইতেছি। যে পরিমাণে হতাশ হইতেছি সেই পরিমাণে আবার বিস্ময় বাড়িতেছে। যতই বিস্ময় বাড়িতেছে ততই ভাবিতেছি—"রূপেতে কি করে বাপু, গুণ যদি থাকে?" দুনিয়ার সম্পদহীন জাতিমাত্রেই জাপানের বাহ্য দুরবস্থা দেখিলে স্বকীয় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হইবে সন্দেহ নাই।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। জাপানের কয়েকখানা ইংরাজী সংবাদপত্র পাঠ করিতে লাগিলাম। এই সকল কাগজে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের পক্ষ প্রধানভাবে অবলম্বিত হইয়া থাকে। জাপানে একখানা মাসিক-পত্র ইংরাজীতে সম্পাদিত হয়। নাম "জাপান ম্যাগাজিন"। ইহারও এক সংখ্যা কাগজের দোকানে পাওয়া গেল। পূর্ব্ব হইতেই কাগজের কথা জানা ছিল। ভারতবাসীরা এইখানা নিয়মিত পড়িলে নব্য জাপানের লেখকগণকে বুঝিতে পারিবেন। জাপানীরা বিগত দুই বৎসর হইতে ভারতবর্ষের সঙ্গে কারবার বাড়াবার জন্য ঝুঁকিয়াছে। এইজন্য এই মাসিকপত্রের পরিচালকগণ আজকাল ভারতীয় মাসিক-পত্রে নিজেদের বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া থাকেন। লেখকেরা অধিকাংশই জাপানী।

এশিয়া ছাড়িবার সময়ে মিশর দেখিয়াছি—এশিয়া প্রবেশ করিবার

সময়ে জাপান দেখিতেছি। মিশরে ঐশ্বর্য্য সম্পদ ও সৌন্দর্য্যের আকার দেখিতেছি মনে হইত। জাপানের দৃশ্য প্রথম-দৃষ্টিতে একেবারেই চিত্তাকর্ষক নয়।

রেলপথের দুই ধারে নিতান্ত অবজ্ঞেয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগৃহ। ঘর-গুলি যেন খেলানার সামগ্রী মাত্র। খড়ো চালা অথবা খোলা বা খাপরার ছাদ প্রায় অধিকাংশ গৃহে দেখিতেছি। কোন কোন স্থানে সাধারণ টিনের ছাউনি। দোকানগুলি ভারতীয় পাড়াগেঁয়ে দোকানের মত। ম্যাঞ্চেষ্টার, লণ্ডন ইত্যাদির পার্শ্বে এই ধরণের পল্লী কল্পনা করা অসম্ভব।

রেলপথের দুই ধারে কৃষিক্ষেত্র—চাষীরা কাজ করিতেছে। বর্ষা-কাল—ক্ষেতে কাদা—কৃষকেরা ছত্রসম বৃহদাকার তালপাতার টুপি মাথায় পরিয়া আছে। ভূমিতে উদ্ভিদের কোন বিশেষ উৎকর্ষ লক্ষ্য করিলাম না। পোর্ট-সৈয়দ হইতে কাইরোর পথে কৃষি-ক্ষেত্রের কত বিচিত্র দৃশ্য চোখে পড়ে—এখানে তাহার সম্পূর্ণ অভাব। বরং মোটের উপর বিশ্রী ও কদাকার দৃশ্যই দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। স্থানে স্থানে বাঙ্গালা দেশের পচা ডোবার জল ও দুর্গন্ধময় খালের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। স্থানে স্থানে উচ্চ পাহাড় থাকায় চট্টগ্রাম অঞ্চল মনে পড়ে—কখনও কখনও ফরিদপুর বা রাজসাহী জেলার ম্যালেরিয়াপ্রধান মাঠ যেন সম্মুখে বিস্তৃত। গোয়ালন্দ, দামুকদিয়া, পোড়াদহ ইত্যাদির হাট-বাজার, দোকান, হোটেল ও আবহাওয়া যেন জাপানের এই স্যাঁত্সাঁতে অঞ্চলে দেখিতে পাইতেছি। প্রায় ঘণ্টা খানেকের মধ্যে তোকিও পৌছিলাম।

খোলার ঘরের মহানগরী

তোকিও ষ্টেসন খুব বড়—কিন্তু রাজধানীর কোলাহল কিছুই শুনিতে পাই না। শুনিলাম, এই সহরে বিশ লক্ষ নরনারীর বাস—কিন্তু রেলে, ষ্টেসনে, রাস্তায় তাহার কোন চিহ্ন নাই।

ইয়াঙ্কিরা জাপানীদের গুরু—ইয়াঙ্কিস্থানের প্রয়াসেই জাপান দুনিয়ার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে। কাজেই ইয়োকোহামায় তোকিওতে ইয়াঙ্কি প্রভাব দেখিতে পাইলাম। রেলওয়ে ষ্টেসন, গাড়ী যাতায়াত, সহরের বিভিন্ন বিভাগ ইত্যাদি সম্বন্ধে জাপানীরা ইয়াঙ্কিদের পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। শাসন এবং কার্য্য-নির্ব্বাহও ইয়াঙ্কি মতে হইতেছে।

তোকিওতে ও রিক্‌শ। ভারতবর্ষের একটা সাধারণ মফঃস্বলের সহরের ভিতর দিয়া যেন যাইতেছি। নিউইয়র্ক, লণ্ডন ইত্যাদির কোন কোন রাস্তায় শুইয়া থাকিতে প্রবৃত্তি হয়—সেগুলি এমনই সুগঠিত, সুশ্রী ও পরিষ্কার। তোকিওর পথ-ঘাট কর্দ্দমময় ও অপরিষ্কার। ইয়োরামেরিকার মাপকাঠিতে এখানকার রাস্তাগুলিকে পাকা রাস্তা বলা উচিত নয়। ট্রাম চলিতেছে—কিন্তু লোকের ভিড় নাই। কয়েকটা বড় বড় অট্টালিকা পথে পড়িল—এগুলি ছাড়া অন্যান্য গৃহসমূহ কাষ্ঠনির্ম্মিত, ক্ষুদ্র ও অনুচ্চ। ছাদ প্রায় সর্ব্বত্রই টালি-নির্ম্মিত।

হোটেলে জিনিষপত্র রাখিয়া নগরদর্শনে বাহির হইলাম। কাইরোকে প্রাসাদপুরী মনে হইয়াছিল—তোকিওকে কুটির-নগর বলা যাইতে পারে। সত্যসত্যই তোকিও চালা-ঘরের রাজধানী। ইট-পাথরের ঘর এখানে
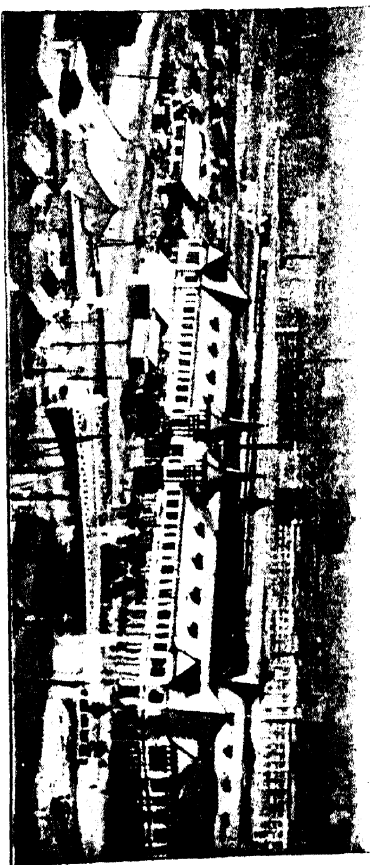
১৩। তোকিওর একদৃশ্য

India Press, Calcutta.

৪৩ পৃষ্ঠা

১৪। খোলার ঘরের রাজধানী

India Press, Calcutta.

অতি বিরল। সহরের মধ্যে এইরূপ উল্লেখযোগ্য ভবন মাত্র দুই চারিটা আছে। বলা বাহুল্য, জাপানী নরনারীগণ এই সমুদয় গৃহ অতিশয় কৌতূহলের সহিত দেখিয়া থাকে। আমাদের তাজমহল দেখা আর জাপানীদের "পাকা বাড়ী" দেখা অনেকটা এক ধরণের।

অনুচ্চ খোলার ঘরের রাজধানীর ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে ইহার একপ্রকার সৌন্দর্য্যও লক্ষ্য করিলাম। সে সৌন্দর্য্যের নমুনা ইয়োরামেরিকার কুত্রাপি পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। ভারতবর্ষের কুটিরসভ্যতায় তাহার নিদর্শন অনেক দেখা যায়। চৌয়ারি আটচালা, বাঙ্গালা ঘর, ইত্যাদির গঠনরীতি দেখা থাকিলে তোকিওর গৃহনির্ম্মাণশিল্প অনুমান করা সহজ। আমাদের দেশে মধ্যযুগে জমিদার ও রাজরাজড়ারা এই ধরণের গৃহ প্রস্তুত করিয়াই নগর বা পল্লী বসাইতেন। তোকিওতে ঘুরিতে ঘুরিতে মহারাষ্ট্রের পুণানগরে আছি মনে হইল। সেখানকার "গায়কবাড়-ওয়াড়া" যেন জাপানী রাজধানীর পাড়ায় পাড়ায় দেখিতে পাইলাম।

এতদিন শুনিয়া আসিতেছিলাম যে, জাপানীরা আগাগোড়া পাশ্চাত্য সভ্যতার চাপে পড়িয়া জাতীয় বিশেষত্ব বিসর্জ্জন দিতেছে। ইয়োকোহামা এবং তোকিওর বহির্দৃশ্য দেখিয়া ত তাহার কোন পরিচয় পাইলাম না। জাপানের হাট-বাজার, মাঠ-বাগান, রাস্তা-ঘাট, বাড়ী-ঘর, লোকজন ইত্যাদি দেখিয়া ইয়োরামেরিকার প্রভাব শীঘ্র শীঘ্র অনুমাণ করা কঠিন। বরং জাপানীদিগকে ভারতবাসীর জ্ঞাতি বিবেচনা করাই সহজ ও স্বাভাবিক। ইয়োরামেরিকায় ও জাপানে আদৌ কোন আদানপ্রদান বা সংমিশ্রণ আছে কি না, গ্রন্থে বর্ণিত প্রমাণ ব্যতীত হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ। জাপানকে ইয়োরামেরিকার অনুকরণ মাত্র অথবা দাসস্থান বা উপনিবেশ মাত্র ভাবিবার কোন কারণ নাই।

জাপানে ইয়োরামেরিকা আসিয়াছে সত্য—কিন্তু সর্ব্বত্র এশিয়াই দেখিতে পাইতেছি।

ইয়োরামেরিকার বিচারে যেরূপ জীবনযাপনকে মধ্যবিত্ত অথবা দরিদ্র বলা হয় জাপানের লোকজন বাড়ীঘর দেখিলে মোটের উপর সেইরূপ সংসারযাত্রার কথা মনে হইবে। সমগ্র বৈষয়িক জীবনই পাশ্চাত্য সমাজে যথেষ্ট উচ্চতর ভূমির উপর অবস্থিত। অশনবসনের যে সমুদয় দ্রব্য ইয়োরামেরিকায় একান্ত আবশ্যক জাপানীর বিচারে সেগুলি হয়ত বিলাস-সামগ্রী স্বরূপ।

কয়েকটা গলি ও সঙ্কীর্ণ বক্র পথ অতিক্রম করিয়া একজন অধ্যাপ-কের গৃহে আসিলাম। অধ্যাপক গৃহে নাই। একজন আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। আগন্তুককে দেখিবামাত্র সে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল! ভারতবর্ষ ছাড়িবার পর এতখানি মস্তক অবনত করা এই প্রথম দেখিলাম। ইয়োরামেরিকায় সম্মান প্রদর্শনের জন্য মাথা হেঁট করিবার রীতি নাই। এশিয়ায় চরণ-বন্দনা করাই দস্তুর। দাসীর কথা আমি বুঝিলাম না, আমার কথাও দাসী বুঝিল না। দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, গৃহের ভিতর হইতে একজন রমণী উঁকি মারিয়া দেখিতে-ছেন; বোধ হয় তিনি অধ্যাপকপত্নী। আবার এশিয়ার কথাই মনে হইতেছে—ইয়োরামেরিকার নয়। স্ত্রী-স্বাধীনতার পাশ্চাত্য সংস্করণ জাপানে অতি সামান্যমাত্র আমদানি হইয়াছে। জাপানে ও ভারত-বর্ষে এ বিষয়ে প্রভেদ অল্প। রিকশ-বাহক সংবাদ লইল, অধ্যাপক গৃহে নাই। দুর্গন্ধময় পঙ্কিল নর্দ্দমা ও পাড়াগেঁয়ে "কাঁচা" গলির দৃশ্য দেখিতে দেখিতে হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

হোটেলের স্বত্বাধিকারিগণ সকলেই জাপানী—কর্ম্মচারী এবং দাস দাসীরাও স্বদেশী। কিন্তু থাকাখাওয়ার বন্দোবস্ত ইয়োরামেরিকার আদর্শে

করা হয়। হোটেলে নানাদেশীয় পর্য্যটক অথবা জাপান-প্রবাসী বাস করিতেছেন। জাপানীও কয়েকজন আছেন। রুশ, ফরাসী এবং ইংরাজ পর-রাষ্ট্রদৌত্য বিভাগের কোন কোন কর্ম্মচারী এই হোটেলের মক্কেল। খানাঘরে জাপানীরা তাঁহাদের স্বদেশী পোষাকই ব্যবহার করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, শ্বেতাঙ্গ অতিথিগণ ইহাঁদের খড়ো চটিজুতা এবং অসভ্যতাসূচক আল্‌খাল্লার বিরুদ্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেন না। ইয়োরামেরিকায় খানাঘরের পোষাক ব্যবহার সম্বন্ধে নিয়ম অত্যন্ত কড়া। কিন্তু জাপান যে ফার্ষ্ট ক্লাশ পাওয়ার—কাজেই তাহার রাজধানীতে শেতাঙ্গদের আস্ফালন টিকিবে কেন?

জাপানী দাসদাসীরা মনিবদিগকে অত্যন্ত খাতির করে দেখিতেছি। ইয়োরামেরিকায় খাতির সম্মান ইত্যাদির রেওয়াজ নাই বলিলেই চলে। বিলাতে প্লীজ অর্থাৎ "যে আজ্ঞে" বা "থ্যাঙ্ক ইউ" অর্থাৎ ধন্যবাদ বলিলেই চূড়ান্ত খাতির করা হয়—ইয়াঙ্কিস্থানে এই সকল শব্দের ব্যবহারও অত্যন্ত কম। ইয়াঙ্কিরা কেহ কাহারও তোয়াক্কা রাখে না। কিন্তু জাপানী ভৃত্যেরা মনিবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উঠে এবং অনেকখানি মাথা নীচু করিয়া অভিবাদন করে। এই অভ্যাস কি নিতান্তই গোলামীর লক্ষণ? ইহাতে জাতীয় চরিত্রের নূতন একপ্রকার উৎকর্ষ বুঝা যায় না কি?

আজ দেখিলাম, হোটেলে, নৈশভোজনের জন্য বহুলোক আসিতেছেন—সকলেই জাপানী। ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্যাপার কি? ইহাঁরা কি হোটেলেই থাকেন?" ইনি বলিলেন—"না। আমাদের হোটেল তোকিও-সহরের সমাজ-কেন্দ্র। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে এখানে ৮।১০ টা সমিতির বৈঠক, আলোচনা, উৎসব ইত্যাদির সঙ্গে ভোজ হয়। জাপানের প্রধান মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের গণ্যমান্য

সকল লোকেই কোন না কোন উপায়ে এই সকল বৈঠকের সঙ্গে লিপ্ত আছেন। কোন কোন দিন রাত্রে দুই হাজারের অধিক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। আজ প্রায় ৬০০ অতিথি উপস্থিত।" ভাবিলাম, এই হোটেল ওয়াশিংটনের কস্‌মস্‌ ক্লাবের সমকক্ষ।

নব্য জাপানের কতিপয় প্রতিষ্ঠান

জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বাঙ্গালা দেশে বর্ষা আরম্ভ হইয়া থাকে। জাপানেও তাহাই দেখিতেছি। আজ পূরাদমে অবিরাম বৃষ্টি পড়িতেছে। বহুদিন পরে ঝমঝম বৃষ্টিপাত দেখিলাম—কিন্তু মেঘের গুড়ুম গুড়ুম শব্দ ভারতবর্ষ ছাড়িবার পর শুনি নাই। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘের দৃশ্যও অনেকদিন দেখা হয় নাই।

বৃষ্টির মধ্যেই রিক্‌শতে বাহির হইলাম। কলিকাতার বর্ষাকাল দেখিতে পাইতেছি। ট্রাম-গাড়ীগুলির ভিতর খড়মের কাদা জমিয়া যাইতেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছাতা মাথায় দিয়া লোক-জন চলাফেরা করিতেছে। পাশ্চাত্য ধরণের ছাতা অনেকেই ব্যবহার করে না। আমাদের দেশে কৃষকেরা যেরূপ তালপাতার ধামাস্বরূপ প্রকাণ্ড টুপি ব্যবহার করিয়া থাকে সেইরূপ টুপি তোকিওতেও ব্যবহৃত হইতেছে। মাঠের কৃষক এবং রাস্তার পথিক উভয়েই এই ধরণের শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করে। ইহার দ্বারা রৌদ্র ও বৃষ্টি দুই হইতেই রক্ষা পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, ঘরের চালা-স্বরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছাতা ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নদীর ঘাটে, সাধু সন্ন্যাসীদিগের আশ্রমে, তীর্থক্ষেত্রে, কুম্ভমেলায় এই ধরণের ছাতা অনেক দেখা যায়। সেই শ্রেণীর ছাতাই আজ বাদলার দিনে তোকিওর পথে পথে দেখিতেছি। জাপান ইয়োরামেরিকা হইতে এখনও বহুদূরে নহে কি?

বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী দেখিলাম। অধ্যাপক কাজুতোষী উয়েদার সঙ্গে নিউইয়র্কে আসিবার সময়ে জাহাজে আলাপ হইয়াছিল।

ইঁহার সঙ্গে জাপানী ভাষা সম্বন্ধে খানিকক্ষণ গল্প হইল। ইনি বলিলেন—"জাপানীদের পক্ষেই জাপানী ভাষা কঠিন—জাপানী অক্ষর পরিচয়ই অনেকের পুরা-পুরি হয় না। বিদেশীয় লোকের পক্ষে আমাদের ভাষা আয়ত্ত করা বিশেষ কষ্টসাধ্য।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"জাপানী বর্ণমালা ও লিপি-প্রণালী ত চীনা রীতি অনুসরণ করে। কোন বাঁধাবাঁধি নাই কি?" উয়েদা বলিলেন—"জাপানীরা চীনা লিপি গ্রহণ করিয়াছে সত্য কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা নূতন লিপিও প্রবর্ত্তন করিয়াছে। যে কোন জাপানী গ্রন্থে দুই ধরণের লিপিই দেখিতে পাইবেন। চীনা লিপির উচ্চারণ আবার সমস্যাপূর্ণ। খৃষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে যে উচ্চারণ ছিল আজকাল চীনালিপির উচ্চারণ সেরূপ নয়। কাজেই কোন অক্ষর বা চিত্র দেখিলে তাহা দুই প্রকারে উচ্চারণ করা যায়। সুতরাং লেখা পড়িতে শিক্ষা করাই একটা প্রধান কাজ হইয়া পড়ে।"

জাপানীরা ফরাসী, জার্ম্মণ ও ইংরাজী তিন ভাষারই গ্রন্থ সমানভাবে ব্যবহার করেন। ইঁহাদের অধ্যাপকগণ কেহ ফরাসী ভাষায়, কেহ জার্ম্মাণ ভাষায়, কেহ বা ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করিয়া থাকেন। তোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থালয় এই কারণে দেখিবার জিনিষ। চীনা গ্রন্থ ও হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ এখানে যথেষ্ট।

একটা ক্ষুদ্র মিউজিয়ামও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত। ভারতবর্ষের নিদর্শন এক গৃহে সংগৃহীত হইয়াছে। অধ্যাপক জুঞ্জিরো তাকাকুসু দুই তিনবার ভারতবর্ষ হইতে এই সমুদয় লইয়া আসিয়াছেন। শেষবার তাঁহার সঙ্গে দেশে দেখা হয়। তাকাকুসু বৌদ্ধ সাহিত্যাভিজ্ঞ ভারতবাসীর নিকট সুপরিচিত। তোকিওর বৌদ্ধ সাহিত্যাধ্যাপক

মহাসেয়ো আনেসাকি এক্ষণে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেছেন। তাকাকুসু ভারতবর্ষে বিদেশী পোষাকে ছিলেন—আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখিলাম, কিওমনো-পরা এবং খড়ো চটি পায়ে। অধ্যাপকগণ দ্বিপ্রহরে বিশ্ববিদ্যালয়ের হোটেলে আহার করেন—বিদেশী ধরণে রান্নাবাড়ি হয়। প্রায় সকল অধ্যাপকই বিদেশের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন।

আমেরিকায়, দেখিয়াছি ইয়াঙ্কিতে জাপানীতে সদ্ভাববর্দ্ধনের প্রয়াস দ্রুতবেগে চলিতেছে। "জাপান-পরিষৎ" স্থাপিত হইয়াছে—পরিষদের মুখপত্রের নাম "নিউইয়র্ক জাপান রিভিউ"। পরিচালকগণ প্রধানতঃ জাপানী। বিশেষভাবে রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধের আলোচনাই উদ্দেশ্য—অন্যান্য বিষয়েও প্রবন্ধসমালোচনাদি বাহির হইয়া থাকে। জাপানী সমাজ, সাহিত্য, কলা ও সভ্যতার আদর্শ ইয়াঙ্কিস্থানে প্রচার করা প্রথম উদ্দেশ্য। ইয়াঙ্কিসভ্যতার কথা জাপানী মহলে প্রচার করা দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। এই উপায়ে দুই সমাজে রাষ্ট্রীয় বন্ধুত্ব বর্দ্ধিত করা তৃতীয় উদ্দেশ্য। পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মাসুজি মিয়াকাওয়া ডি সি, এল্ এল্, এল্, ডি। ইনি "Life of Japan" অর্থাৎ জাপানী জীবন এবং "The American People" অর্থ "ইয়াঙ্কি সভ্যতা" নামক গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা।

হার্ভার্ডে দেখিয়াছি, অধ্যাপক আনেসাকি জাপানীদের শান্তিপ্রিয়তা প্রচার করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। দুনিয়ায় যাহাতে শান্তি স্থাপিত হয়, আজকাল সকল দেশেই তাহার পরামর্শ ও বৈঠক হইয়া থাকে। জাপানীরা এইরূপ শান্তির আন্দোলনে পশ্চাৎপদ নন। তোকিওতে এই জন্য জাপান য়্যাসোসিয়েশন কায়েম করিয়া স্থাপিত হইয়াছে। আনেসাকি ইয়াঙ্কি মহলে এই শান্তি-পরিষদের প্রতিনিধি।

ভারতবর্ষের সঙ্গেও জাপানীদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ করিবার জন্য জাপানীরা ব্যগ্র। ভারতীয় বাজারে জাপানী মালের কাটতি বাড়ানই উদ্দেশ্য। এই জন্য কয়েক বৎসর হইল "ইণ্ডো-জাপানীজ য়্যাসোসিয়েশন" নামক "জাপানী-ভারতীয় পরিষৎ" স্থাপিত হইয়াছে। বহু গণ্যমান্য জাপানী পরিষদের সভ্য—প্রধানতঃ মহাজন ও ব্যবসায়িগণ ইহার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী। নব্য জাপানের পিতৃস্থানীয় রাষ্ট্রবীর কাউণ্ট ওকুমা পরিষদের সভাপতি। দুনিয়ার রাষ্ট্রমণ্ডলে ভারতবর্ষের কোন স্থান নাই—ভারতবর্ষ বৃটিশসাম্রাজ্যের অংশ মাত্র—সুতরাং ভারতবর্ষ-বিষয়ক রাষ্ট্রীয় সমস্যা মীমাংসা করিবার জন্য জাপানীরা বৃটিশ জাতির সঙ্গে আলোচনা করিয়া থাকেন। বিগত ৮।৯ বৎসর হইতে ইংরাজের সঙ্গে জাপানীর চূড়ান্ত মাখামাখির সম্বন্ধ স্থাপিত রহিয়াছে। এই সন্ধির ফলে ভারতবর্ষের ভিতর বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে জাপানীরা ইংরাজকে সকল প্রকারে সাহায্য করিবেন। আবার কোন বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষ রক্ষা করিবার জন্যও ইংরাজ জাপানের সাহায্য পাইবেন। অধিকন্তু ইংরাজ যদি এশিয়ার কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন জাপানও তাহাই করিবেন। সেই বন্ধুত্বের সর্ত্তেই জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে ইংরাজের যুদ্ধ সুরু হইবামাত্র জাপান চীনের জার্ম্মাণ রাজ্য আক্রমণ করেন। এই ধরণের সন্ধিকে অফেন্সিব্ ও ডিফেন্সিভ মিত্রতা বলে। অর্থাৎ আত্মরক্ষায় মিত্রতা আর পরকে আক্রমণেও মিত্রতা।

কাজেই "জাপানী-ভারতীয়-পরিষদে"র কার্য্যতালিকায় রাষ্ট্রনীতির গন্ধ নাই। এই পরিষৎ বৎসরে দুইখানা ইংরাজী পত্র এবং দুই খানা জাপানী পত্র প্রচার করিয়া থাকেন। পরিষদের উদ্দেশ্য নিম্নে বিবৃত হইতেছে :—"ভারতীয় দেশসমূহের সঙ্গে জাপানীদের ঘনিষ্ঠতা

ও বন্ধুত্ব পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করা আমাদের উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষ বলিলে আমরা বৃটিশভারত, ওলন্দাজভারত (যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বালি), সিঙ্গাপুর ও ষ্ট্রেট্‌স্ সেট্‌লমেণ্টস্, শ্যাম, এবং ফরাসী ইণ্ডোচীন অর্থাৎ আনাম টংকিঙ ইত্যাদি সকল জনপদ বুঝিব।

আমাদের কার্য্য প্রধানতঃ দ্বিবিধ থাকিবেঃ—

(১) এই সকল দেশের ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা আমাদের কার্য্য হইবে।

(২) এই সকল দেশের সঙ্গে জাপানীদের লেন-দেন এবং জাপানের সঙ্গে এই সকল দেশবাসীর লেন-দেন বাড়াইবার সুযোগ সৃষ্টি করিতে আমরা যত্নবান হইব, ভারত-তত্ত্ব ও জাপান-তত্ত্ব সুপ্রচারিত করা আমাদের লক্ষ্য থাকিবে।"

ভারতবর্ষ শব্দে জাপানীরা সমগ্র ভারতমণ্ডল বুঝিতেছেন। শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, ফরাসী, চীন, যবদ্বীপ, সুমাত্রা ইত্যাদি জনপদ ইহার অন্তর্গত। ভারতবাসীরও এই বিস্তৃত অর্থ গ্রহণ ও প্রচার করা কর্ত্তব্য।

বলা বাহুল্য, বৌদ্ধ সাহিত্যে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ডাক্তার বুনিউ নান্জিও, অধ্যাপক তাকাকুসু এবং অধ্যাপক আনেসাকি এই পরিষদের অন্যতম ধুরন্ধর। আজকাল জাপানের প্রায় ৫০০ মহাজন এই পরিষদের সভ্য। তোকিওর কর্ম্মবহুল অঞ্চলে ইঁহাদের কার্য্যালয় অবস্থিত। একজন প্রধান কর্ম্মচারীর সঙ্গে আলাপ করিলাম। কথাবার্ত্তায় বুঝা গেল—জাপানীরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে অগ্রসর হইতেছেন। ইঁহারা রুশিয়াকে পরাজিত করিবার পর ৭।৮ বৎসর কাল ভারতবিরোধী ছিলেন। এখানে আসিয়া ভারতবাসীরা

সহানুভূতি ও হৃদ্যতা পাইত না। সেই যুগের জাপান সম্বন্ধে পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছিলেন—"জাপান ভারতের মিত্র নহে।"

রাষ্ট্রমণ্ডলে মতপরিবর্ত্তন এবং কর্ম্মপরিবর্ত্তন অহরহঃ ঘটিতেছে। রাষ্ট্রীয় শত্রুতামিত্রতা ঋতুপরিবর্ত্তনের মত গতিশীল। ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের যে আদর্শ জাতিগত বন্ধুত্বের আদর্শ তাহা নয়। দুনিয়ায় প্রতিমুহূর্ত্ত স্বার্থের ক্ষেত্র বদলাইয়া যাইতেছে—এই কারণে প্রতিমুহূর্ত্ত প্রত্যেক জাতির শত্রু মিত্র ও উদাসীন জাতিগণের সংখ্যাও বদলাইতেছে। সুতরাং আট-দশ বৎসরের মধ্যে জাপানে ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে কার্য্য-প্রণালী পরিবর্ত্তনের সূচনা হওয়া অতি স্বাভাবিক। এই কথা বুঝিয়া জীবন-গঠন সুরু না করিলে ভারতবাসী দুনিয়ার সকল খেলায়ই নাবালক থাকিয়া যাইবেন।

বিশেষতঃ গত বৎসর হইতে ইয়োরোপের মহাকুরুক্ষেত্র সমর দুনিয়ার ভারকেন্দ্র স্থানান্তরিত করিতেছে। তাহার ফলে এশিয়ায় জার্ম্মাণ ও অষ্ট্রিয়ান শিল্প এবং বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ রহিয়াছে। ইহাতে একদিকে ভারতবর্ষে স্বদেশী আন্দোলন পুষ্টিলাভ করিতেছে—এমন কি বৃটিশ গবর্মেণ্টও বাধ্য হইয়া ভারতীয় স্বদেশীর সংরক্ষণ করিতেছেন। অপরদিকে এশিয়ায় জাপানের স্বর্ণসুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও জাপান স্বাধীন ভাবে যাহা করিতে পারিতেন না তাহা এই সংগ্রামের ফলে আপনা-আপনিই সাধিত হইতেছে। এই রূপেই "একস্য সর্ব্বনাশঃ অন্যস্য তু পৌষমাসঃ" হইয়া থাকে। ইয়োরোপীয়েরা যুদ্ধ করিয়া মরিতেছে—ফাঁক তালে জাপান এশিয়ায় শিল্প ও ব্যবসায়ের সাম্রাজ্য গঠন করিয়া লইতেছেন। সুতরাং ১৯১৫ সালের জাপানে দেখিতেছি—বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ ভারতবর্ষের কথা জানিতে ও শুনিতে উদ্‌গ্রীব।

জাপানের সকল মহলেই ভারতবর্ষ লইয়া একটা সাড়া পড়িয়াছে। যুদ্ধের প্রায় বৎসর দুএক পূর্ব্ব হইতেই বোধ হয় জাপানের ভারত-প্রীতি দেখা দিয়াছে। অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করা চতুর জাতির লক্ষণ। ভারতবাসীও ইচ্ছা করিলে এই ফাঁকে অনেক কাজ হাসিল করিয়া লইতে পারেন। সদ্ভাব বেশী দিন থাকে না—অসদ্ভাবও বেশীদিন থাকে না। দুনিয়ার নিয়মই এই। স্বামীতে পত্নীতে যে অকাট্য সম্বন্ধ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে তাহা হইতে পারে না। ভারতবাসী পারিবারিক জীবনে চিরকালের সম্বন্ধ, আমরণ সম্বন্ধ, জন্মমরণাতীত সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া চলেন। এই জন্য রাষ্ট্র-মণ্ডলের চাল বুঝিতে আমরা অসমর্থ।

একটা ছাপাখানা দেখিলাম। ভারতবর্ষের ছাপাখানাগুলি হইতে এখানে কোন উৎকর্ষ লক্ষ্য করি নাই। ইয়োরামেরিকার কার্য্যালয়ে সাধারণতঃ যেরূপ পারিপাট্য, বাহ্যসৌন্দর্য্য ও সুশৃঙ্খলা থাকে, জাপানের কার্য্যালয়ে সেরূপ নয়। ইংরাজী ভাষার জন্য উৎকৃষ্ট মুদ্রাযন্ত্র জাপানে নাই। ভারতবর্ষে ইংরাজী ছাপা, জাপানের তুলনায়, ভালই হয়। তবে টাইপ হইতে আরম্ভ করিয়া, যন্ত্র, কালী, কাগজ সবই জাপানের স্বদেশী।

ট্রামে কয়েকবার ঘুরিয়া-ফিরিয়া আসা গেল। কণ্ডাক্টর কিম্বা পথিক বা ট্রামযাত্রীরা প্রায়ই ইংরাজী জানে না। কাজেই হোটেলের ম্যানেজারের সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজে আমার গন্তব্য স্থানের নাম জাপান ও ইংরাজী ভাষায় লিখাইয়া লইতেছি। কাগজের টুকরাগুলি দেখাইয়া রাস্তায় চলাফেরা করিতেছি। রিক্শবাহকগণও লেখা পড়িতে পারে। সার্ব্বজনীন শিক্ষার সুফল টুরিষ্ট-হিসাবে বেশ বুঝিতে পারা গেল। কোন ফরাসী পর্য্যটক ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসিয়া যদি বাঙ্গালা, হিন্দী কিম্বা তেলেগু ভাষায় গন্তব্য স্থানের নাম লিখাইয়া লন তাহা হইলে তাঁহার

গমনাগমন সুসাধ্য হয় কি? ভারতবর্ষের গাড়োয়ান, মাঝি, কুলী, মজুরেরা নিরক্ষর যে!

ইংল্যাণ্ডে ও আমেরিকায় লোকসমাগমের কেন্দ্রে সুবিশাল মানচিত্র ঝুলাইয়া যুদ্ধের ফলাফল প্রতিদিন বুঝান হয়। বড় বড় অক্ষরে সংবাদ ছাপান হইয়া থাকে। আপামর জনসাধারণ পথে হাঁটিতে হাঁটিতে একবার সে দিকে দৃষ্টিপাত করে। তোকিওতেও স্থানে স্থানে অট্টালিকার প্রাচীর-গাত্রে জাপানের মানচিত্র, আমেরিকার মানচিত্র, ইয়োরোপীয় মহাসমরের মানচিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে—জাপানী আবালবৃদ্ধবনিতা সেইগুলি আগ্রহের সহিত দেখিতেছে। ভারতবর্ষে এই দৃশ্য কবে দেখিতে পাইব?

জাপানের কোথাও ইষ্টক বা প্রস্তরের একটা নূতন সৌধ নির্ম্মিত হইলে তাহা সকলের পক্ষে একটা দর্শনযোগ্য বস্তু বিবেচিত হয়। খোলার ঘরের সহরে পাকা বাড়ী দেখিবার সাধ স্বাভাবিক। এইরূপ দেখিবার উপযুক্ত অট্টালিকা দুইটা একটা করিয়া তোকিওর নানা পাড়ায় মাথা তুলিতেছে। দুইটা বড় বড় দোকানগৃহের ভিতর দেখিলাম। এই দুই স্থানে ইয়াঙ্কিস্থানের রীতি অনুসারে কার্য্য চালান হয়। নামও "ডিপার্ট-মেণ্ট ষ্টোর।" প্রত্যেক দোকানে নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয় হয়।

প্রথম কোম্পানীর নাম মারুজেন-কোম্পানী। ইহাঁদের পুস্তকবিভাগ দেখা গেল। তোকিওতে ইয়োরোপীয় গ্রন্থসমূহের ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দোকান। বলা বাহুল্য, জাপানের সাধারণ পুস্তকালয়ে চীনা এবং জাপানী গ্রন্থই রক্ষিত হইয়া থাকে। ইংরাজী, ফরাসী, জার্ম্মাণ বা রুশ ভাষায় প্রণীত গ্রন্থের জন্য ইয়োরোপে অথবা আমেরিকায় অর্ডার পাঠাইতে হয়। কিছুকাল হইল মারুজেন-কোম্পানী এই অসুবিধা নিবারণের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাঁরা প্রধান প্রধান ভাষায় রচিত বহুবিধ মূল্যবান্ গ্রন্থ সর্ব্বদা মজুত রাখিতেছেন। ইহাঁদের দোকানে বর্ত্তমান বিশ্বসাহিত্যের

৫৪ পৃষ্ঠা।

১৫। আটাগো-পাহাড় হইতে তোকিওর দৃশ্য

India Press, Calcutta.

১৬। মিৎসুকোষীদ্রব্য ভাণ্ডার

India Press, Calcutta.

যে সমুদয় গ্রন্থ রক্ষিত হইতেছে সেই সমুদয় গ্রন্থ ভারতবর্ষের কোন দোকানে দেখিতে পাই না। ভারতবর্ষের সর্ব্ব বিখ্যাত পুস্তকালয়ে ইংরাজী গ্রন্থমালা মাত্রই পাওয়া যায়। কিন্তু মারুজেন-কোম্পানী দুনিয়ার পুস্তক আমদানি করেন। কাইরোর কোন কোন দোকানে এইরূপ দেখিয়াছি—কিন্তু সেখানে স্বত্বাধিকারীরা হয় জার্ম্মাণ, না হয় ফরাসী। মারুজেন-কোম্পানী আগাগোড়া স্বদেশী—কর্ম্মচারিগণের মধ্যে একজনও বিদেশী নাই—অথচ জার্ম্মাণ, ফরাসী, রুশ, ইংরাজী সকল প্রকার গ্রন্থেরই ব্যবসায় চলিতেছে। অধিকন্তু জাপান এবং চীন সম্বন্ধে দুনিয়ার লোকেরা যাহা যাহা লিখিতেছেন বিশেষভাবে সেই সমুদয় পুস্তকের সংগ্রহও হইতেছে। ভারতবাসী চীন ও জাপান সম্বন্ধে গ্রন্থতালিকা এই ডিপার্টমেণ্ট ষ্টোরের নিকট হইতে লইতে পারেন।

দ্বিতীয় দোকানের নাম "মিৎসুকোষী"। লণ্ডন, নিউইয়র্ক, শিকাগোর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিপার্টমেণ্ট ষ্টোরের ইহা সমকক্ষ। দোকান হিসাবে এসিয়ায় ইহার তুলনা নাই। সাজসজ্জা, আস্‌বাব, শৃঙ্খলা, কার্য্যপরিচালনা, খরিদদারে প্রতি মনোযোগ, কর্ম্মচারিগণের মধ্যে শ্রমবিভাগ ইত্যাদি সকল বিষয়েই মিৎসুকোষী ইয়াঙ্কি বা ইংরাজ দোকান বলা চলিতে পারে। দোকানগৃহও তোকিও নগরের উল্‌ওয়ার্থ-বিল্ডিং বা তাজমহল। কোম্পানী আগাগোড়া স্বদেশী—দু-একজন বোধ হয় বিদেশীয় কর্ম্মচারী আছেন। মাল স্বদেশী-বিদেশী উভয় প্রকারই পাওয়া যায়। নূতন গৃহ মাত্র ১৪ বৎসর হইল নির্ম্মিত হইয়াছে। দোকান অতি পুরাতন—প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। কাজেই পর্য্যটক মাত্রেই অন্ততঃ দেখিবার জন্য মিৎসুকোষীতে আসিয়া থাকেন। আধুনিক এঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার সকল প্রকার আবিষ্কারই এই ভবনে দেখিতে পাইলাম। তড়িতের শক্তিতে সিঁড়ি-উঠা লণ্ডনে প্রথম দেখি—এই দোকানের ভিতর-

ও দেখিলাম। জাপানী এঞ্জিনীয়ারই এই গৃহ-নির্ম্মাণের দায়িত্ব পাইয়াছিলেন। অথচ ফারসী, ইতালীয় ও প্রাচীন ইয়োরোপীয় বাস্তুরীতি অট্টালিকার ভিতর অবলম্বিত হইয়াছে। অগ্নিকাণ্ড হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কল এই ভবনের নানাস্থানে রক্ষিত আছে। আগুন লাগিলে এই সকল কল হইতে জল আপনা-আপনি বাহির হইবে। এইগুলির নাম "অটোমেটিক স্প্রিঙ্কলার" (Automatic sprinkler)। যদি কোন খরিদদার দোকানে বসিয়া ডাকে পত্র দিতে চাহেন এই জন্য যথোচিত ব্যবস্থা আছে। এত বড় দোকানের নানা স্থানে এক সঙ্গে দ্রব্য বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু টাকা জমা হয় সবই এক খাজাঞ্চি-বিভাগে। টাকা এক যায়গায় জমা করিবার জন্য কল আছে। বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে খাজাঞ্চি—বিভাগের যোগ দেখিতে পাইলাম। ঐ সকল স্থান হইতে টাকা-পয়সা নলের ভিতর দিয়া আপনা-আপনি যথা স্থানে পৌঁছিতেছে।

ইয়োরামেরিকার আধুনিকতম দোকানেও এই সকল ব্যবস্থার অতিরিক্ত কিছু নাই। জাপানীদিগকে দেখিতে নিতান্তই বুদ্ধিহীন ও অকেজো বোধ হয়। ইহারা যখন চারি ইঞ্চি উচ্চ কাঠের খড়ম পায়ে দিয়া রাস্তায় ঠকাশ-ঠকাশ করিতে করিতে হাঁটে তখন ইহাদিগকে রুষ-বিজয়ী জাতি বিবেচনা করা অসম্ভব। অথচ এই চেহারা ও চালচলন লইয়াই জাপানীরা বড় বড় জাহাজও চালাইতেছে—দোকানও চালাইতেছে। ভারতবাসী বহুকাল নিষ্কর্ম্মা থাকিতে থাকিতে সামান্য কার্য্য সাধন করিবার ক্ষমতাও হারাইয়া বসিয়াছে। কাজেই কোন কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমরা অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিতে ভাবিতে হয়রাণ হইয়া পড়ি। "আমরা কি এই কাজের যোগ্য?" "আমাদের ধাতে কি ইহা পোষাইবে?" ইত্যাদি নৈরাশ্যসূচক প্রশ্ন আমাদের মাথায় স্থায়ী ঘর করিয়া রহিয়াছে। ছোট-খাট কাজকেও মহা-গুরুতর রূপে প্রচার

করা আজকাল আমাদের স্বভাব। ফলতঃ কোন দিকেই আমরা অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। জাপানে আসিয়া দেখিতেছি—সত্যই "মরা হাড়েও ভেল্কি" খেলান যায়! যোগ্যতা, "Fitness", কার্য্যক্ষমতা, ইত্যাদি সম্বন্ধে বেশী উচ্চ মাপকাঠি রাখা বেকুব ও নিষ্কর্ম্মাজাতির প্রকৃতি।

গাইডের সঙ্গে নগরভ্রমণ

জাপানে প্রতিবৎসর প্রায় ২০,০০০ পর্য্যটকের সমাগম হইয়া থাকে। জাপানী ভাষা তাঁহাদের প্রায় কাহারও জানা থাকে না। এই সকল লোকের সুবিধার জন্য গবর্মেণ্ট একটা "টুরিষ্ট বিউরো" স্থাপন করিয়াছেন। এই বিউরো সকলকে বিনামূল্যে পরামর্শ দিয়া থাকেন। বিউরোর কর্ত্তাদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া একজন জাপানী গাইড বা প্রদর্শক নিযুক্ত করিলাম। ইহাঁর পারিশ্রমিক দিতে হইবে দৈনিক ৬৲। সহরের ভিতর সারাদিন ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্য ল্যাণ্ডো ভাড়া করিতে হইবে। দৈনিক ভাড়া লাগিবে ১৪৲।

গাইড ইংরাজী মন্দ জানেন না। জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কি বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিখিয়াছেন?" ইনি বলিলেন—"না মহাশয়, লোকের সঙ্গে কারবার করিতে করিতে আমি এই ভাষা আয়ত্ত করিয়াছি। আমাকে দুই বৎসর আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে কাটাইতে হইয়াছে।" ইনি পূর্ব্বে ভারতীয় পর্য্যটকগণের সংস্পর্শে আসিয়াছেন। শুনিলাম, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বড়োদার গায়কবাড় যখন জাপানে আসেন তখন তাঁহার সঙ্গে এই প্রদর্শক ঘুরা-ফিরা করিয়াছেন। কিছুকাল হইল সিংহলের বৌদ্ধ-প্রচারক শ্রীযুক্ত ধর্ম্মপাল জাপান ভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন। এই গাইড তাঁহাকেও সাহায্য করিতেন।

আমাদের দেশে বর্ষাকালে যেরূপ, এখানেও সেইরূপ, কখনও গুঁড়ি গুঁড়ি কখনও মুসলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। কর্দ্দমময় রাস্তার অবস্থা দেখিয়া ভারতবাসীর নাক শিঁটকান উচিত নয়। পুরুষ ও স্ত্রী সকলেই

উচ্চ খড়ম পায়ে চলিতেছে। বৃহদাকার ছাতাও বহুলোকের মাথায় দেখিতেছি। গাইড্ বলিলেন, "জাপানের প্রাচীন স্বদেশী ছাতা দুই প্রকার। রৌদ্র হইতে আত্মরক্ষার জন্য একপ্রকার ছাতা ব্যবহৃত হয়। বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার জন্য আর এক প্রকার ব্যবহৃত হয়। দুইই কাগজের তৈয়ারী। বর্ষাকালে যে ছাতা ব্যবহৃত হয় তাহার কাগজ তৈলে সিক্ত করা থাকে।" জাপানীরা কাগজ-প্রস্তুত-করণে সিদ্ধ-হস্ত। জাপানী কাগজ খুব শক্তও হয়। কাগজের প্রাচীর, কাগজের সূতা ও দড়ি, কাগজের ছাতা ইত্যাদি জাপানের বিশেষত্ব।

(ক) চশ্‌মার দোকান

একটা দোকনে প্রবেশ করিলাম। এখানে চশ্‌মাসংক্রান্ত নানা প্রকার কাজ করা হয়। ইয়োরামেরিকার নূতনতম যন্ত্রাদি এই গৃহে অনেকবিধ দেখা গেল। অথচ বাহির হইতে দেখিলে ইহা একটা নগণ্য ও খেলো কারবারের স্থান মনে হইবে। দোকানে টেবিল চেয়ার ইত্যাদি নাই। চৌকির উপর মাদুর পাতা রহিয়াছে। তাহাতে দুই জন পুরুষ ও একজন রমণী বসিয়া আছে। বসিবার রীতি ভারতীয় ধরণেরই। জাপানীদের বাহির দেখিয়া ভিতর বুঝিবার জো নাই। দারিদ্র্য সত্বেও একটা জাতি কত বড় কাজ করিতে পারে, জাপান তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। কিন্তু মনোহারী দোকানদার ফরাসে বসিয়া কারবার চালাইতেছে—এই দৃশ্যই তোকিওর অধিকাংশ স্থলে দেখিতে পাই। মিৎসুকোষী ও মারু-জেন-কোম্পানীর আড়ম্বর জাপানী ব্যবসায় মহলে অতি বিরল। তোকিও দেখিয়া নিউইয়র্ক শিকাগোর সামান্য মাত্র ইঙ্গিতও পাইতেছি না—ভারতীয় মফঃস্বলের পরিচয়ই বেশী পাইতেছি। বর্ত্তমানযুগে কুটির-শিল্প, ক্ষুদ্র কারবার এবং পরিবারবদ্ধ শিল্পনীতি যন্ত্রচালিত বৃহদাকার কারখানার

সঙ্গে কিরূপভাবে চলিতে পারে তাহা বুঝিবার জন্য জাপানে আসা আবশ্যক। জাপানে কুটির-সভ্যতা বিলুপ্ত হয় নাই—ফ্যাক্টরীর দৌরাত্ম্য এখানে মারাত্মকভাবে দেখা দেয় নাই, বিশ্বাস করিতেছি।

(খ) মিকাডো প্রাসাদ

রাস্তায় দুই পার্শ্বে দোকান-শ্রেণী দেখিতে দেখিতে রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইলাম। পথে কতকগুলি বৃহৎ অট্টালিকা চোখে পড়িল। প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্ক, অপিস, থিয়েটার ইত্যাদির জন্য এই সকল সৌধ নির্ম্মিত। স্থানে স্থানে দুই একবার নাতিবিস্তীর্ণ খাল পার হইতে হইল। এই খাল-গুলি মধ্যযুগে নগর-দুর্গের পরিখা ছিল। এক্ষণে গমনাগমনের, বিশেষতঃ মাল আমদানি রপ্তানীর জন্য ব্যবহৃত হয়। এই কয়দিনে খালগুলির ভিন্ন ভিন্ন অংশ দেখিলাম। প্রত্যেক অংশেই সর্ব্বদা মহাজনগণের নৌকা যাতায়াত করিতেছে, দেখিয়াছি।

রাজপ্রাসাদে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। তবে যে বাগানের ভিতর ইহা অবস্থিত তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়। প্রাসাদ মধ্য-যুগে নির্ম্মিত—তখন তোকিও নগরের নাম ছিল ইয়েডো। সেই সময়ে সম্রাট্গণের ক্ষমতা এক প্রকার ছিল না বলিলেই চলে। সম্রাটেরা কিয়োতো নগরের প্রাসাদে বন্দিস্বরূপ বাস করিতেন। সাম্রাজ্যের যথার্থ ক্ষমতা সেনাপতি বা শোগুনদিগের হস্তগত ছিল। সেই শোগুণেরা তোকিওতে তাঁহাদের কাছারী খুলেন। সেই কাছারীই বর্ত্তমানে রাজ-প্রাসাদ। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে শোগুণদিগের ক্ষমতা ধ্বংস করিয়া সম্রাট যথার্থ সম্রাট হন। এই যুগের নাম "রেষ্টোরেশন" অর্থাৎ সম্রাটের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। আর এক নাম "মৈজি" (Meiji) অর্থাৎ উন্নতি বা গৌরবের যুগ। সঙ্গে সঙ্গে কিয়োতো হইতে তোকিওতে রাজধানী

স্থানান্তরিত হইয়াছে। আজকাল স্বাধীন এসিয়ার যে রাষ্ট্রকেন্দ্র দেখিতেছি তাহা মাত্র ৪৫ বৎসরের নগর। গাইড্‌কে জিজ্ঞাসা করিলাম—"প্রাসাদের নির্ম্মাণ সম্বন্ধে কোন কাহিনী প্রচলিত আছে কি? এই কার্য্যের জন্য ইয়োরোপীয়েরা নিযুক্ত হইয়াছিল কি?" ইনি উত্তর করিলেন—"সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যযুগে ইহা নির্ম্মিত হয়। ওলন্দাজ শিল্পিগণের হাত বোধ হয় ইহাতে কিছু আছে। জাপানীরা ওলন্দাজ প্রভাব কোনদিনই সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করিতে পারে নাই।"

(গ) আটাগো পাহাড়

সপ্তদশ শতাব্দীর নির্ম্মিত একটা তোরণদ্বারের নিম্ন দিয়া অগ্রসর হইলাম। প্রাসাদের বাহিরে চারিদিকে বড় বড় সরকারী ভবনসমূহ অবস্থিত। বিচারালয়, পার্লামেণ্ট-গৃহ, ইত্যাদিতে না নামিয়া একটা অনুচ্চ পাহাড়ের পাদদেশে আসিলাম। এই পাহাড়ে একটা শিণ্টো মন্দিরে অল্প হাটিয়া শিরোদেশে উঠা গেল। জাপানের গৌরব চেরিরসম তরুর শ্রেণী এখানে দেখিতে পাইলাম। বর্ষার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ফুল ফুটিয়াছে—এক্ষণে তরুসমূহ পুষ্পহীন। পাহাড়ে দাঁড়াইয়া নগরের দক্ষিণাংশ আগাগোড়া দেখিয়া লইলাম। মাঝে মাঝে কলের চিম্‌নি হইতে ধূম বহির্গত হইতেছে—অদূরে তোকিও-সাগরের জলরাশি—কিন্তু মোটের উপর কৃষ্ণ টালিনির্ম্মিত ছাদের শোভাই দৃষ্টি বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিল। নাতিক্ষুদ্র নাতিবৃহৎ কাষ্ঠকুটিরের সুন্দর সমাবেশ তোকিও ছাড়া আর কোথাও দেখিব কিনা সন্দেহ হইতে লাগিল।

পূর্ব্বে কখনও শিণ্টো-মন্দির দেখি নাই। আটাগো পাহাড়ে এই প্রথম দেখিলাম। মন্দিরের সম্মুখে একটা ক্ষুদ্র আবৃত স্থানে এক চৌবাচ্চায় জল রহিয়াছে। এই জলে হাত মুখ ধুইয়া মন্দিরে পূজা

করিতে আসা হয়। মন্দির দেখিতে জাপানের অন্যান্য মন্দিরেরই অনুরূপ। গৃহ-রচনায় জাপানীরা বৌদ্ধশিন্টো প্রভেদ করিত না। বৌদ্ধ ও শিন্টো দুই মতাবলম্বী লোকই আটাগোর শিন্টো-মন্দিরে আসিয়া থাকে। এসিয়ায় ধর্ম্মকলহ এখনও গুরুতর হয় নাই। এই মন্দিরের ভিতর কোন মূর্ত্তি দেখিলাম না—কিন্তু বৌদ্ধ-মন্দিরে মূর্ত্তিপূজার চরম ব্যবস্থা দেখা যায়। পূর্ব্বপুরুষগণের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি মন্দিরের ভিতর রক্ষিত হইতেছে। পিত্তলের মুকুর শিন্টোমন্দির গাত্রের প্রধান অঙ্গ। এইগুলির প্রভাবে দুষ্ট প্রেতগুলি দূরে বিতাড়িত হয়। এই জন্য ঢক্কানিনাদও করা হইয়া থাকে। পূর্ব্বপুরুষদিগের ঢাল তলওয়ার, পোষাক ইত্যাদি মন্দিরের ভিতর সাজান রহিয়াছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে জাপানীরা মুখোস পরিয়া নৃত্য করিত। সেই সকল মুখোসও কতিপয় দেখিতে পাইলাম। শিন্টোমন্দিরের উপাসকগণ মন্দিরে প্রবেশ করে না—বাহির হইতে দুইবার হাতে তালি দিয়া অবনত মস্তকে পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে।

আটাগো পাহাড়ের পাদদেশে একটা কবর-স্থান। ইহা অনেক-দিনের পুরাতন—প্রায় ২৫০ বৎসরের হইবে। শিন্টো-মতাবলম্বীরা মৃতদেহ কবর দেয়। বৌদ্ধেরা প্রথমে ইহার অগ্নিসৎকার করে, পরে ভস্ম কবরের ভিতর পুঁতিয়া রাখে। কবরের উপর প্রস্তরশিলা স্থাপন করা বৌদ্ধ, শিন্টো, খৃষ্টান সকলেরই দস্তর।

(ঘ) জাপানী ক্ষত্রিয়ের কাহিনী

পাহাড় হইতে নগরের ভিতর অনেকদূর পর্য্যন্ত গাড়ী চলিতে থাকিল। কুটির-সভ্যতার সমাজ টোকিওর সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইতেছি। যোজন-ব্যাপী মালগুদাম-সদৃশ বাসভবন বা আফিস-গৃহ যদি নব্যজীবনের সাক্ষ্য
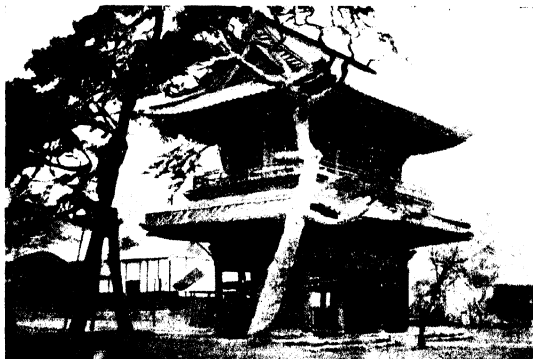
১৭। বৌদ্ধমন্দিরের তোরণ-দ্বার

১৮। বৌদ্ধ মন্দিরের ঘণ্টাগৃহ

India Press, Calcutta

৬৩ পৃষ্ঠা।

১৯। বৌদ্ধ মন্দির

India Press, Calcutta.

হয় তাহা হইলে টোকিওকে "সেকেলে" নগর বলিতে হইবে,—"আধুনিকতা" জাপানীসমাজে প্রবলমাত্রায় প্রবিষ্ট হয় নাই।

একটা সুবৃহৎ উদ্যানে আসিয়া পড়িলাম। নানাবিধ তরুবরের প্রভাবে ইহা সর্ব্বদা বনের মত দেখায়। সুদীর্ঘ সরল বৃক্ষের সারি অনেক রহিয়াছে। উদ্যানে সম্প্রতি থামিলাম না। বরাবর এক বৌদ্ধ মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। একটা ফটক পার হইলাম। দুই পার্শ্বে তীর্থক্ষেত্রের সুপরিচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান সাজান রহিয়াছে। জাপানী ছবি, ছড়ি, বাটি, পাখা, ইত্যাদি অনেক প্রকার দ্রব্য এইখানে বিক্রয় হয়।

দু এক পা হাঁটিতে হাঁটিতে দুইটি বৌদ্ধ সাধু বা দেবতার প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিলাম। অদূরে একটি তোরণদ্বার—ইহা জাপানের খাসরীতি অনুসারে নির্ম্মিত। ইহা দুইতল বিশিষ্ট—আগাগোড়া কাঠের প্রস্তুত। পার্শ্বস্থিত একটা কাষ্ঠগৃহে ঘণ্টা ঝুলিতেছে। কাশীর বিশ্বেশ্বর মন্দিরের দৃশ্য মনে পড়িল। সুবৃহৎ মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া গাইড্ বলিলেন —"এই মন্দির ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু অগ্নিকাণ্ডে সেই ভবন ভস্মসাৎ হয়—তাহার পর নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। তোরণদ্বার রক্ষা পাইয়াছিল।"

জাপানে বৈশাখ মাসে বুদ্ধদেবের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে জনসাধারণের বিরাট উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময়ে এই মন্দিরে যথেষ্ট লোকসমাগম হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রতিদিনই তীর্থযাত্রীরা মন্দির দর্শন করিতে আসে। বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানী-সমাজে জীবন্ত রহিয়াছে। ইয়োরামেরিকার প্রভাবে নবযুগের লক্ষণ জাপানে যথেষ্ট আমদানি হইয়াছে সত্য—কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের জীবন-প্রবাহ বিলুপ্ত হয় নাই। তথাকথিত কুসংস্কারসমূহের বিরুদ্ধে নব্য জাপানীরা যতই আন্দোলন করুক

না কেন, জনসাধারণের চিত্ত হইতে বুদ্ধ-আত্মার প্রতি অকপট ভক্তি বিদূরিত হয় নাই; এই জন্য জাপানের নরনারীগণকে দেখিলে ভারত-সন্তানদিগের আত্মীয় বলিয়া সহজেই ধরিতে পারি। জাপানীদের চলা-ফেরায়, উঠাবসায়, ভাবভঙ্গীতে ইয়োরামেরিকার চিহ্ন দেখিতে পাই না। এই সমুদয়ে ভারতবর্ষের ছাপ যেন মারা রহিয়াছে।

মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে অনেক পুরুষ ও রমণীকে বাগানের ভিতর অন্য একদিকে অগ্রসর হইতে দেখিলাম। গাইডকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই উদ্যানে বৌদ্ধ মন্দির ছাড়া আর কোন দেখিবার জিনিষ আছে কি?" গাইড বলিলেন—"জাপানী 'বুশিদো' বা ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের জলন্ত পরিচয় এই বাগানে আছে। জাপানীরা কিরূপ প্রভুভক্ত, সমাজভক্ত ও দেশভক্ত তাহার প্রমাণ এখানে পাইবেন। মধ্যযুগে জাপানী ক্ষত্রিয়েরা প্রভুর জন্য প্রাণদান করিয়াছিল—তাহাদের কবর এই বাগানের ভিতর অবস্থিত। সেই গোরস্থান অদ্যাপি জাপানীজাতির তীর্থক্ষেত্র।"

প্রাচীন জাপান সম্বন্ধে আধুনিক জাপানীরা ভাবিয়া থাকে—

"দেশের জন্য ঢালিল রক্ত
অযুত যাহার ভক্ত বীর"

সেই আত্মবলিদানের নাম বুশিদো-ধর্ম্ম। আবার সেই আত্মত্যাগের প্রবৃত্তিকে পূজা করিবার আগ্রহের নামও' বুশিদো-ধর্ম্ম। যাঁহারা ভারতীয় রাজস্থানের কাহিনী জানেন তাঁহারা বুশিদো-প্রকৃতি বুঝিতে পারিবেন। কেবল মাত্র শারীরিক বলের প্রয়োগ ও পাশবিক ক্ষমতার বড়াইকে বুশিদো বা ক্ষাত্র-ধর্ম্ম বলা হয় না। অত্যাচারীর আক্রমণ হইতে দীনগণকে রক্ষা করা; স্বজাতি, স্বধর্ম্ম, স্বদেশ ও স্বসমাজের ইজ্জদরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করা; ব্যক্তিগত, পরিবারগত, গোত্রগত,

কুলগত মানসম্ভ্রম অটুট রাখিবার জন্য শস্ত্রনিপাত করা; রমণীজাতির গৌরব রক্ষা করা ইত্যাদি কার্য্যই বুশিদো-ধর্ম্মের অন্তর্গত। "রঘুবংশে" ক্ষত্রিয় শব্দের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে—"ক্ষতাৎ কিল ত্রায়তে ইত্যুদগ্রঃ ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষু রূঢ়ঃ।" বুশিদো শব্দেরও ব্যুৎপত্তি ঠিক এইরূপ।

গোরস্থানে ৪৭ টি কবর দেখিতে পাইলাম। কবরের সম্মুখে ধূপ পোড়ান হয়। গাইডের কথানুসারে ধূপের কাঠি ক্রয় করা গেল। জাপানীরাও এইরূপই করিল। কবরের নিকট মস্তক অবনত করা এবং প্রজ্বলিত ধূপশলাকা স্থাপন করা পূজার অঙ্গ।

এই কবরসমূহে ৪৭ জন "রোণিন" বা ক্ষত্রিয়বীরের শবদেহ প্রোথিত আছে। ইহারা তাহাদের প্রভুর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহার শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। মধ্যযুগে প্রতিহিংসা গ্রহণ করা দুনিয়ার রীতি ছিল। দলাদলি, গৃহকলহ, পারিবারিক বিরোধ, feuds, clan-spirit ইত্যাদি ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, জার্ম্মানীতে, ইতালীতে, ভারতবর্ষে, জাপানে সর্ব্বত্রই বিরাজ করিত। ব্যক্তিগত সম্মানের উনিশবিশ হইলে, অথবা বংশগত কৌলীন্য বা পদমর্য্যাদার সামান্য মাত্র অসম্মান হইলে মধ্যযুগের লোকেরা অস্ত্রধারণ করিত। স্যার ওয়াল্টার স্কটের Lay of the Last Minstrel বা "বিলাতের শেষ চারণ" "কাব্যে-Till pride be quelled and love be free" অর্থাৎ "ভালবাসার জয় ও বংশ-মর্য্যাদার পরাজয়"-কাহিনী বিবৃত আছে। রাজস্থানের প্রত্যেক কাহি-নীই এই বংশমর্য্যাদা বা ব্যক্তিগত মর্য্যাদার আখ্যায়িকা। জাপানের মধ্যযুগেও সেই রেষারেষি, প্রতিযোগিতা ও প্রতিহিংসার বৃত্তান্ত প্রচুর।

মিকাডোকে কিয়োতোর প্রাসাদে একপ্রকার বন্দী রাখিয়া তাঁহার শোগুণ কর্ম্মচারীরা কামাকুরা নগরে শাসন-কার্য্য চালাইতেন। কোন

এক জমিদারবংশই চিরকাল শোগুণী করিতে পারেন নাই। বংশে বংশে কাড়াকাড়ি ও ঠোকাঠুকি সর্ব্বদাই চলিত—এক এক সময়ে এক এক পরিবার শোগুণী বা নবাবী করিত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তোকু-গাওয়া বংশীয় জমিদারেরা প্রবল হইয়া উঠে। ইহারা কামাকুরা হইতে ইয়েডো (বর্ত্তমান টোকিও) নগরে শাসন-কেন্দ্র স্থানান্তরিত করে। তোকু-গাওয়া নবাবগণের আমলে দুইজন জমিদার-কর্ম্মচারীর মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। একজনের নাম আসানো—আর একজনের নাম কিরা। কিরা উচ্চতর পদের কর্ম্মচারী। ইনি আদেশ দ্বারা আসানোকে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিতেন। অথচ আসানো কিরা অপেক্ষা চরিত্রে ও দেশ-হিতৈষনায় উন্নত ছিলেন। অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া আসানো আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যার নাম জাপানী ভাষায় "হারাকিরি"। গত বৎসর মিকোডোর মৃত্যুর পর সেনাপতি নোগি এবং তাঁহার পত্নী এইরূপ হারাকিরি করিয়াছেন। পেটের ভিতর ছোরা বসাইয়া প্রাণনাশ করাকে হারাকিরি বলে। বিষপান করা অথবা রিভলভারের সাহায্যে বুকে কিম্বা গলায় গুলিকরা হারাকিরি নয়।

আসানোর হারিকিরিতে তাঁহার বিশ্বাসী "রোণিন"গণ উত্তেজিত হইল। আমাদের দেশে যাহাকে প্রভুভক্ত লাঠিয়াল বলা হয় তাহাকে জাপানে "সামুরাই" বলা হইয়া থাকে। রোণিনেরা সামুরাই-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত দল-বিশেষ। প্রভুভক্তি ও যুদ্ধপিপাসা এই দুই লক্ষণে সামুরাই চরিত্র গঠিত। ভারতবর্ষের প্রত্যেক রাজপুতকে জাপানী ভাষায় সামুরাই বলা যাইতে পারে এবং প্রত্যেক দলপতি বা প্রধানকে জাপানী পারিভাষিক অনুসারে ডাইমো বলা উচিত।

আসানো ডাইমোর "লাঠিয়ালেরা" প্রত্যেকেই মর্ম্মাহত হইয়া ভাবিতে

লাগিল—"প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা সার। প্রতিহিংসা বিনা মম কিছু নাহি আর।" ঘটনা অষ্টাদশশতাব্দীর প্রথমভাগে ঘটিয়াছিল। ডাইমোতে ডাইমোতে বিবাদ প্রায়ই হইত—কাজেই শোগুণের কাণে এই হারাকিরি এবং রোণিনগণের উত্তেজনার কথা শীঘ্র উঠে নাই। রোণিনেরা কিলা ডাইমোর দুর্গ আক্রমণ করিল—ইহারা সংখ্যায় ৪৭। কিলার পেটোয়ারা আসানোর বীরগণের সঙ্গে লড়াইয়ে হার মানিল। রোণিনেরা কিলার মস্তকচ্ছেদন করিয়া সদর্পে আসানোর কবরের নিকট উপস্থিত হইল।

গাইড্ বলিলেন—পথে আসিতে একটা কূপ দেখিয়াছেন। তাহার জলে কিলার মস্তক ধৌত করা হইয়াছিল। পরে উহা আসানোর কবরের সম্মুখে উপহার স্বরূপ রক্ষিত হয়। আসানোর কবরই এই গোরস্থানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রকৃত প্রস্তাবে এই গোরস্থান আসানোবংশের জন্যই রক্ষিত—তাঁহার ভক্ত রোণিনগণকে পরিবারের অন্তর্গত করিয়া লওয়া হইয়াছে। এইজন্য তাহাদের কবরও এখানে দেখিতে পাইতেছেন।"

কিলা হত হইলে সংবাদ নবাবসরকারে রটিয়া গেল। শোগুণের বিচারে রোণিনগণের হারাকিরি-দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইল। তাহাদের দোষ —তাহারা দেশের শান্তি ভঙ্গ করিয়াছে। রোণিনেরা আনন্দের সহিত এই আজ্ঞা গ্রহণ করিল। প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিজ হাতে পেটে ছুরি চালাইয়া আত্মহত্যা করিল। পরে শোগুণের ঘাতক ইহাদের মস্তক ছিন্ন করিল। বর্ত্তমানকালেও জাপানের আবালবৃদ্ধ-বনিতা ৪৭ রোণিনের প্রভুভক্তি, দেশসেবা ও আত্মত্যাগ কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

শোগুণদিগের সমাধি-ক্ষেত্র

এইবার শিবা-পার্কের দিকে ফিরিলাম। বাগানের ভিতর বৌদ্ধ মন্দির এবং শোগুণদিগের সমাধি অবস্থিত। মন্দির পুড়িয়া গিয়াছে—পুনরায় নির্ম্মিত হইতেছে। প্রাচীন বাস্তুরীতি অনুসারেই কাষ্ঠময় ভবন নির্ম্মিত হইবে। তোকুগাওয়াবংশীয় দ্বিতীয় নবাব ও নবাবপত্নীর সমাধি-স্থান দেখিলাম। গৃহগুলি মন্দিরের রীতিতে নির্ম্মিত—সমস্তই কাষ্ঠময়।

সমাধিক্ষেত্রের চতুঃসীমার ভিতর প্রবেশ করিতে কতকগুলি আলোক-স্তম্ভ দুই পার্শ্বে সারিবদ্ধ দেখিলাম। মিশরের লুক্সর-কার্ণাকে স্ফিঙ্কসের সারি স্মরণে আসিল। গৃহে প্রবেশ করিবার সময় দ্বাররক্ষক জুতার উপর কাপড়ের জুতা পরাইয়া দিল। গৃহের মেজে পরিষ্কার রাখিবার জন্য এই নিয়ম। কাইরোতেও মস্‌জিদে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এইরূপ করিতে হইয়াছিল। গৃহদ্বয়ের অভ্যন্তর অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত। মধ্যযুগের জাপানী সুকুমার শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন এই খানে বিদ্যমান। কেবলমাত্র চিত্রকলা নয়—রঞ্জনশিল্প, ধাতুর কার্য্য, কাষ্ঠশিল্প, "ল্যাকার"-কাজ ইত্যাদি নানা বিষয়ের উৎকর্ষ দেখিতে পাইলাম। কোন মূর্ত্তি বা প্রতিমা দেখা গেল না। শুনিলাম, শোগুণের পরিবারস্থ লোকেরা আসিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের জন্য এখানে প্রার্থনা করিয়া থাকে। তাঁহাদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র, মুকুট, যুদ্ধঢাক ইত্যাদি গৃহের ভিতর পবিত্র ভাবে রক্ষিত হইতেছে।

প্রাচীরগাত্রে এবং ছাদে নানাপ্রকার চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। চিত্রের ভিতর কোন কাহিনী বর্ণিত নাই। প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনাই প্রধান

উদ্দেশ্য। উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর নানা সমাবেশ চিত্রকরগণের কার্য্যে দেখিতে পাইতেছি। ময়ূর, সিংহ, পদ্ম, অশ্বত্থ ইত্যাদির চিত্রই বেশী। সিংহ আঁকিতে শিল্পীরা দক্ষ নন বুঝিলাম। এতদিন ইয়োরামেরিকায় নব্য-যন্ত্রশাসিত কারুকার্য্য দেখিয়াছি। আজ জাপানী মধ্যযুগের হস্তশিল্প দেখিয়া এক অভিনব জগতে বিচরণ করিতেছি। এ যে মিশর-ভারতের শিল্প-সাধনা। মধ্যযুগের শিল্পকলা বোধ হয় জগতে আর ফিরিবে না। কিন্তু তাহার এক কণামাত্র দেখিলেই হৃদয় আবেগে পূর্ণ হয় কেন? নিউইয়র্কের উল্‌ওয়ার্থ বিল্ডিং দেখিয়া সে রোমাঞ্চ ত অনুভব করি না!

সমাধিক্ষেত্রের চতুঃসীমার মধ্যে স্থানে স্থানে কৃষ্ণ গ্রানাইট প্রস্তরের উপর বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি খোদিত দেখিলাম। কোন কোনটায় বৌদ্ধ জাতকের কাহিনীও বিবৃত রহিয়াছে। নমুনাগুলি ভাস্কর্য্য হিসাবে উচ্চ-শ্রেণীর অন্তর্গত। একস্থানে একটা ব্রহ্মদেশীয় পঞ্চতলবিশিষ্ট প্যাগোডা নির্ম্মিত হইয়াছে। বাগানের ভিতর কতকগুলি কর্পূর-বৃক্ষ দেখিলাম।

শিবা-পার্ক ছাড়িয়া রাজকুমারগণের প্রাসাদের দিকে আসিলাম। এই ভবন লণ্ডনের বাকিংহাম প্যালাসের অনুকরণে নির্ম্মিত। পথে সেনাপতি নোগির গৃহ দেখা গেল। নোগির দুই পুত্র রুশ যুদ্ধে মারা গিয়াছিল—তাঁহার পত্নীও স্বামীর সঙ্গে হারাকিরি করেন। এই জন্য নোগী তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি টোকিও নগরকে সমর্পণ করিয়াছেন।

জাপানের স্বদেশী হোটেল

ইতিমধ্যে দু-একবার জাপানী খানা দেখিয়াছি। আজ ষোড়শোপচারে জাপানী ভোজনের ব্যবস্থা করিলাম। একটা হোটেলে আসা গেল। যেন গোয়ালন্দের কোন হোটেলে প্রবেশ করিতেছি। একজন দাসী আসিয়া একটা ক্ষুদ্র গৃহে লইয়া গেল। গৃহের ছাদ টালি-নির্ম্মিত ও অমুচ্চ। প্রাচীর এবং মেজে কাঠের প্রস্তুত। কাগজের ব্যবহারও কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে হয়। কাগজের দেওয়ালবিশিষ্ট ঘরে বসিয়া যেন স্বপ্নরাজ্যে আছি অথবা খেলনার সামগ্রী দেখিতেছি, মনে হইতে লাগিল। জুতা খুলিতে হইল। বালিশের মত আশনে আমাদের অভ্যস্ত নিয়মে উপবেশন করিলাম। জাপানীরা আসনের উপর সাধারণতঃ হাঁটু পাতিয়া বসে—আমরা যে ভাবে বসি তাহা কিছু অসভ্যতার লক্ষণ। বর্ষাকাল—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—ঘরে বাতি জ্বলিতেছে না—গৃহের চালা হইতে টুপুর টাপুর জল মাটিতে পড়িতেছে। মাদুরের ফরাসের উপর আসনে উপবিষ্ট হইয়া উর্দ্ধে ও পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিতেছি আর ভাবিতেছি,—জাপানের রাজধানীর ভিতর এরূপ নীরব নিঝুম শান্তিময় স্থান আছে! টোকিও কি আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্র—ইয়োরামেরিকান লণ্ডন নিউয়র্কের প্রতিদ্বন্দ্বী? এ যে পূর্ব্ববঙ্গের এক-পল্লী-কুটির! অথচ টেলিফোনও দেখিলাম—আর তড়িতের বাতিও রহিয়াছে। ইহার নাম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়। পল্লীবাসী, কুটিরবাসী, রিক্তপদ, কিওমনোধারী, ভেতো জাপানীরা তারহীন বার্ত্তাবহ, আকাশজান এবং তড়িৎ ও বাষ্পের শক্তি নিজস্ব করিয়া লইয়াছে।

যে কুটিরে বসিলাম সেই কুটিরে অন্য কোন অতিথি আসিবে না। গাইড্ বলিলেন—"এইরূপ অনেকগুলি কুটির এই হোটেলে আছে। প্রত্যেকটাই স্বতন্ত্র। রন্ধনাদি একত্র হয়— কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপবেশন ও পরিবেষণের গৃহ।"

দাসী হাঁটু পাতিয়া এবং মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। প্রথমেই চা আসিল। দুধ ও চিনি চার সঙ্গে পাইলাম না। প্রত্যেকের সম্মুখে কাঠের একটা ক্ষুদ্র বাক্সের ভিতর কয়লার আগুনের ভাঁড় রক্ষিত হইল। গাইড্ ধূমপান করেন—আগুনে চুরুট জ্বালাইয়া লইলেন। বাক্সের ভিতর একটা ছোট চোঙ্গা দেখিলাম—তাহার ভিতর চুরুটের ছাই ফেলিতে হয়।

এইবার একটা কাঠের রেকাবিতে খাদ্যদ্রব্য আসিল। চারি পাঁচটা বাটিতে আহার্য্য ও পানীয় রক্ষিত হইয়াছে। বাটিগুলি চীনামাটির প্রস্তুত—অথবা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। কাষ্ঠ-পাত্রের উপর সোনালি কাজ করিতে জাপানীরা ওস্তাদ। দুইটা কাঠিও রেকাবিতে ছিল। কাঁটা চামচের পরিবর্ত্তে চীনা ও জাপানীরা কাঠি ব্যবহার করে। গাইড্ বলিলেন—"প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য স্বতন্ত্র কাঠি—একজনের ব্যবহৃত কাঠি অন্যে ব্যবহার করে না। পয়সাওয়ালা লোকেরা রূপার কাঠি ব্যবহার করে।" খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে মৎস্যই প্রধান। কাঁচা মাছও জাপানীরা খায়। শুঁটকি মাছও পাওয়া গেল। একটা ঝোল পান করিলাম— তাহার ভিতর চিংড়ি মাছ, পায়রার মাংস, শসা ইত্যাদি সিদ্ধ করা হইয়াছে। বেগুনভাজা খাইলাম। জাপানীরা সকল মাংসই ভক্ষণ করে। গোঁড়া বৌদ্ধগণ গোমাংস খায় না। মৎস্যে কাহারও আপত্তি নাই। খানিক-ক্ষণ পরে ভাত আসিল। গাইড্ মহাশয় কাঠির সাহায্যে সকল খাদ্যই উদরসাৎ করিলেন। আমি কেবল প্রাণেন অর্দ্ধভোজনং করিলাম। তবে

ঝোলটা চলনসই ছিল। বকশিষসহ মূল্য দিতে হইল সাড়ে তিন টাকা। আহারের পর দাসী গরম জলে গামছা ভিজাইয়া সম্মুখে রাখিল। মুখ মুছিয়া "সয়োনারা" বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। এই কথাটা মাত্র এ-কয়দিনে রপ্ত হইয়াছে।

সমর-মিউজিয়াম ও গৃহস্থালী-প্রদর্শনী

টোকিওর পার্ক বা উদ্যানগুলির ভিতরেই বড় বড় সরকারী প্রতিষ্ঠান-সমূহ অবস্থিত। পার্কের ভিতরেই প্রাচীন মন্দির এবং কবরসমূহও দেখিয়াছি। একটা বাগানের মধ্যে টোকিওর সর্ব্বপ্রসিদ্ধ শিন্তোমন্দির দেখিলাম। স্বয়ং মিকাডো এই মন্দিরে পূজা প্রদান করিয়া থাকেন। মন্দিরের সম্মুখে তোরণদ্বার যথারীতি অবস্থিত। শিন্তো তোরণদ্বারে এবং বৌদ্ধ তোরণদ্বারে সামান্য প্রভেদ আছে। বৌদ্ধদ্বারের সর্ব্বোচ্চ দণ্ড বক্র—শিন্তোদ্বারের দণ্ডগুলি সবই সরল রেখার ন্যায় সন্নিবেশিত।

গাইড্ বলিলেন—"এই মন্দিরে সেনাবিভাগের লোকজনই বিশেষ-ভাবে যোগদান করে। জাপানী বীরগণের মধ্যে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছে তাহাদের পবিত্র স্মৃতি রক্ষার জন্য এই মন্দির উৎসর্গীকৃত। মন্দিরের বার্ষিক উৎসবের সময়ে সেনাবিভাগ হইতে ইহার সকল প্রকার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।"

শিন্তোধর্ম্মে পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি বাড়াইয়া দেয়। তাহার ফলে "পিতামহদের অস্থিমজ্জা যত ধূলিরূপে তাহে রয়েছে মিশ্রিত" এই "ধ্রুবজ্ঞান" সর্ব্বদা লোকের মনে থাকিয়া যায়। যুদ্ধব্যবসায়ী ক্ষত্রিয় ও বুসিদো-পন্থী সামুরাইগণের পক্ষে পিতৃ-পূজা বিশেষ কার্য্যকরী। যে ধর্ম্মমতের দ্বারা অতীত গৌরবকাহিনী বাণী সাধারণ্যে সুপ্রচারিত হয় তাহাকে রণপণ্ডিতগণ সর্ব্বদা সম্মান করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এই জন্য শিন্তোতত্ত্ব জাপানের রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম।

শিন্তোমন্দিরের সন্নিকটেই মিলিটারি বা সমর-মিউজিয়াম অবস্থিত।

এই ভবনের সম্মুখে কতকগুলি ভগ্ন কামান রক্ষিত হইয়াছে। রুশযুদ্ধে জাপানীরা যে কামান ব্যবহার করিয়াছিল তাহার দু-একটা এখানে দেখিলাম। রুশেরা পোর্ট আর্থার দুর্গে যে সকল কামান ফেলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল তাহারও কয়েকটা এখানে দেখা গেল। এই বাগানে বহুসংখ্যক চেরিসম বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম।

পয়সা দিয়া মিউজিয়ামের ভিতর প্রবেশ করিলাম। প্রাচীন ও মধ্য-যুগের কামান, গোলা ও বন্দুক অনেকগুলি সাজান রহিয়াছে। এই সকল পুরাতন অস্ত্র-শস্ত্র, রণপোষাক, দুর্গের নমুনা ইত্যাদির সংগ্রহে বহু প্রকোষ্ঠ পরিপূর্ণ। এইগুলি দেখিলে রাজপুত-মারাঠা-শিখ-মোগলযুগের যুদ্ধসজ্জাও বুঝিতে পারা যায়।

সামরিক চিত্রের সংখ্যাও মন্দ নয়। প্রসিদ্ধ সেনাপতিগণের ফটোগ্রাফ অথবা তৈলচিত্র, যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য, পুরাতন জাহাজের চিত্র ইত্যাদি প্রায় সকল গৃহেই দেখা গেল।

মধ্যযুগে জাপানী দুর্গ ও প্রাসাদগুলি ধর্ম্মমন্দিরের রীতিতেই নির্ম্মিত হইত। এই সমুদয় অট্টালিকার মধ্যে একটা পরিবারগত সাম্য লক্ষ্য করিতে পারি।

এই সেদিন চীনের জার্মাণ বন্দর দখল করিবার সময়ে জাপানীরা যে এরোপ্লেন ব্যবহার করিয়াছিল তাহাও দেখিতে পাইলাম। জাপানের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবজনক সমর ১৯০৫ সালের রুশ-সংগ্রাম। তাহার পর হইতেই জাপানকে জগতের রাষ্ট্রমণ্ডল প্রথমশ্রেণীর শক্তিরূপে স্বীকার করিতেছে। বলা বাহুল্য, সেই রুশ-সমরের কাহিনীই এই সংগ্রহালয়ে যৎপরোনাস্তি বিবৃত রহিয়াছে। কোথাও রুশদিগের রন্ধন-শালা, কোথাও বা তাহাদের যুদ্ধ-সরঞ্জাম জাপানীদের "ট্রফি" বা লুণ্ঠিত দ্রব্য-রূপে বিরাজ করিতেছে।

রুশযুদ্ধের পূর্ব্বে জাপানীরা আর একটা সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিল। ১৮৯৪ সালে কোরিয়ায় গণ্ডগোল উপলক্ষ্যে চীনের বিরুদ্ধে জাপানীরা যুদ্ধঘোষনা করে। তখন ইয়োরামেরিকানেরা জাপানকে বিশেষ সম্মান ও ভয় করিত না। চীন সাম্রাজ্যের বিশাল বিস্তৃতি দেখিয়া তাহারা চীনাজাতিকে ভয় করিয়া চলিত। কিন্তু ইতিমধ্যে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে জাপানীরা নব্য বিজ্ঞান, নব্য শাসন, নব্য শিল্প ইত্যাদি প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক অভাবিতরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে। তাহাদের নৌবল এবং সামরিক শক্তিও যথেষ্ট দৃঢ় হইয়াছে। জাপানী সেনা ও রণতরীর সম্মুখে চীনারা উড়িয়া গেল। চীনাদিগকে পরাজিত করিবামাত্র জাপান দুনিয়ায় বিশেষ বিখ্যাত হইয়া পড়িল। ১৮৯৪ সালেই ইয়োরামেরিকানেরা জাপানীদিগের কৃতিত্ব প্রথম লক্ষ্য করিল। তখন হইতে ১৯০৫ পর্য্যন্ত জাপানের গতিবিধি সকলেই মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিল। ১৯০৫-এর পর হইতে জাপানকে ইয়াঙ্কি এবং ইংরাজেরাও খোসামোদ করিতে লালায়িত। যাহাহউক ১৮৯৪ সালের চীনাসমর নব্য জাপানের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। এই মিউজিয়ামে সেই সংগ্রামের বহুবস্তু প্রদর্শিত দেখিলাম।

নব্য জাপানের জন্ম হয় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে। সেই বৎসর মিকাডো সম্রাট শোগুণদিগের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া স্বকীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। তখন হইতে জাপানে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, পাশ্চাত্য শাসন, পাশ্চাত্য কায়দার প্রবলভাবে আমদানি সুরু হয়। কিন্তু মিকাডোর সিংহাসন-প্রাপ্তি সহজে সাধিত হয় নাই। মিকাডোর পক্ষে এবং জমিদারবংশীয়-গণের পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হয়। সেই "সিভিল ওয়ার" বা গৃহ-বিবাদের কোন কোন চিত্রও সমরসংগ্রহালয়ে রহিয়াছে। টৌকিও সহরের এক উদ্যানে শেষ যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধের এক চিত্রও দেখিলাম।

জাপানের সামরিক ইতিহাসে ১৮৬৮, ১৮৯৪ এবং ১৯০৫ স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। মধ্যযুগের কাহিনীসমূহ বংশগত বিবাদ, ব্যক্তিগত অভিমান ইত্যাদির বৃত্তান্ত। তাহাতে সামরিক তথ্য বা তত্ত্ব বিশেষ কিছু নাই। কাজেই "মিলিটারী মিউজিয়ামে" জাপানী মধ্যযুগের কোন যুদ্ধ-বিবরণ নাই। তবে সেই যুগে যোদ্ধারা কিরূপ পোষাক পরিত, শিকারীরা কিরূপ অশ্বচালনা করিত, তীর, ধনুক, বন্দুক, গোলা ইত্যাদি কিরূপ ব্যবহৃত হইত তাহার যথেষ্ট নিদর্শন সংগৃহীত রহিয়াছে। ষোড়শ-শতাব্দীতে জাপানীরা কোরিয়া দখল করিতে যাইয়া পরাজিত হয়। সেই কোরিয়া-যুদ্ধের কোন বস্তু এখানে দেখিলাম না। তখনকার একটা জাহাজ দেখা গেল মাত্র। এশিয়া ও ইয়োরোপে বাষ্পযুগের পূর্ব্বে এক ধরণের জাহাজই নির্ম্মিত হইত।

জাপানীরা সর্ব্বদা গৌরব করিয়া থাকে যে, তাহাদের দেশ কখনও বিদেশীয় জনগণের হস্তগত হয় নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোগলেরা চীন দখল করিয়া জাপান আক্রমণ করে। মোগলের সাম্রাজ্য তখন ইয়োরোপের পশ্চিম সীমা হইতে এশিয়ার পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সর্ব্বগ্রাসী মোগল পরাক্রম দৈবক্রমে বিধ্বস্ত হয়। নাগাসাকি বন্দরের নিকট প্রবল ঝটিকায় মোগল নৌবল ধ্বংস হইয়া যায়। তাহার পর হইতে কোন বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণ জাপানী জাতিকে আশঙ্কিত করে নাই। ইংরাজের মত জাপানীরাও স্বাধীনতার বড়াই করিতে অধিকারী। এই মোগল আক্রমণের কয়েকটা পুরাতন চিত্র দুই তিন প্রাচীরে দেখিতে পাইলাম।

টোকিওর এই মিউজিয়াম দেখিলে সমগ্র জাপানের ধারাবাহিক ইতিহাস হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ এবং প্রস্তর-যুগের অস্ত্রাদিও কিছু কিছু সংগৃহীত রহিয়াছে। জাপানের আদিম নিবাসী আইনোদিগের সামরিক জীবনও বুঝিতে পারা গেল।

বর্ত্তমান যুগে ইয়োরামেরিকার রাষ্ট্র-সমূহ যে সকল অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে এক গৃহে সেইগুলির নমুনা সংগৃহীত হইয়াছে। একটা আল্‌মারির দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া গাইড্‌ বলিলেন—"এই দেখুন চুলের কাছি। চীনা-সমরের সময়ে একজন জাপানী রমণী স্ত্রীলোকের চুল সংগ্রহ করিয়া এই দড়ি প্রস্তুত করিয়াছিল। হাজার হাজার রমণী এই কাছির জন্য তাহাদের কেশ সমূলে নষ্ট করিয়াছিল। এই কাছি এক জাহাজের কাপ্তেনকে উপহার পাঠান হয়।" কোন কোন গৃহে অলঙ্কারস্বরূপ "পোষাকি" অস্ত্র-শস্ত্র রক্ষিত হইয়াছে। এগুলি যুদ্ধে ব্যবহৃত হইত না। রাজদরবারে উৎসবোপলক্ষ্যে, অথবা সামাজিক কার্য্যকলাপের সময়ে মধ্যযুগের "ডাইমো" বা দলপতিগণ এই সমুদয় মণিমুক্তাসমন্বিত তরবারি ধারণ করিতেন।

এক গৃহ সেনাপতি নোগির স্মৃতিরক্ষার জন্য উৎসর্গীকৃত। এখানে সেনাপতি এবং তাঁহার পত্নীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। তাঁহাদের দুই পুত্র রুশযুদ্ধে মারা যায়। তাহাদের চিত্রও দেখিলাম। যে পোষাক পরিয়া সপত্নীক নোগি হারাকিরি করেন সেই পোষাকও প্রদর্শিত হইতেছে। নোগি ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মানী, জাপান ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র হইতে যে সমুদয় গৌরবসূচক "ব্যাজ" বা পদক পাইয়াছিলেন সেগুলির সঙ্গে তাঁহার হস্তলিপি এক আলমারির মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। নোগির পূর্ব্ব পুরুষগণ যে সমুদয় সামরিক দ্রব্য রাখিয়া গিয়াছিলেন সেই সমুদয় বস্তুও এই গৃহে দেখিতে পাইলাম।

টোকিওর নৌচালন-বিদ্যালয়ে একবার আকস্মিক বিপদ ঘটে। একটা জাহাজে করিয়া বহুসংখ্যক ছাত্র ও শিক্ষক সমুদ্রে পরীক্ষা-কার্য্য করিতে বাহির হন। পরে তাঁহারা নিরুদ্দেশ হইয়া পড়েন। সেই জাহাজের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। মিউজিয়ামের ভিতর এই জাহাজ ও আরোহিগণের চিত্র দেখিলাম।

সমর-মিউজিয়াম হইতে উয়েনোপার্কে আসিলাম। ইহার ভিতর একটা পুষ্করিণী আছে। তাহার মধ্যে পদ্ম ফুটিয়া থাকে। এই পুষ্করিণীর সম্মুখে একটা সুবৃহৎ গৃহ দেখিলাম। গত বৎসর প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে এই অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। এই বৎসর এখানে একটা গৃহস্থালী-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহা স্থায়ী প্রদর্শনী-গৃহ বা মিউজিয়াম-স্বরূপ রক্ষিত হইবে।

জাপানীরা ইয়াঙ্কিদের নিকট প্রদর্শনী-পরিচালনা শিখিয়াছে। ব্যবস্থা আগাগোড়া সেইরূপ বোধ হইল। তবে জাপানের সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই দারিদ্র্যের লক্ষণ দেখিতে পাই—প্রদর্শনীর সাজসরঞ্জাম ইত্যাদিও দারিদ্র্যের পরিচয় প্রদান করিল। মেলায় যে সমুদয় বস্তু দেখিলাম এগুলিই কোন ইয়োরামেরিকান নগরে প্রদর্শিত হইলে ইহাদের সৌন্দর্য্য দশগুণ বেশী দেখিতাম। পাশ্চাত্যেরা বাহ্য আয়োজনগুলি অতিশয় উচ্চ অঙ্গের করিয়া থাকে। তাহাতে যথেষ্ট অর্থব্যয় হয়। এশিয়ার লোকেরা সেগুলিকে অনাবশ্যক বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত।

যাহাহউক এখানে জাপানের স্ত্রীশিক্ষা ও রমণীসমাজ সম্বন্ধে সকলপ্রকার তথ্য দেখিতে পাইলাম। চিত্রাঙ্কন, শিশুবিনয়ন, ধাত্রীকার্য্য, বস্ত্রধৌতকরণ, রন্ধন ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহনির্ম্মাণ, পোষাকপ্রস্তুতকরণ ইত্যাদি সামাজিক জীবনের সকল প্রকার নিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছে। গত বৎসরের ভিতর জাপানীরা যে যে বিষয়ে নূতন আয়োজন করিয়াছে এখানে সেইগুলিই প্রদর্শিত। গৃহস্থালীর প্রদর্শনীতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প ইত্যাদি সকল বিভাগেরই পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। এখানে তাহাই দেখিলাম। ডাব্‌লিনের প্যাট্রিক্ গেডিজ-প্রবর্ত্তিত নগর-প্রদর্শনী আর টোকিওর এই গৃহস্থালী-প্রদর্শনী অনেকটা একশ্রেণীর অন্তর্গত।

স্বদেশী জাপান

মিৎসুকোষী কোম্পানী, মারুজেন-কোম্পানী, বড় বড় ব্যাঙ্ক ও নব্যধরণের "ষ্টোরস্"সমূহ গিঞ্জাষ্ট্রীটে অবস্থিত। গিঞ্জাষ্ট্রীটকে টোকিওর চৌরঙ্গি রোড বলা যাইতে পারে। নিউ-ইয়র্কের পঞ্চম য়্যাভিনিউ ও লণ্ডনের পিকাডিলি যাহা, টোকিওর গিঞ্জামহল্লা তাহা। নব্য জাপানীর ব্যবসায়কেন্দ্র এইখানকার আধুনিক অট্টালিকাসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। এই অঞ্চল দেখিয়া জাপানে ইয়োরামেরিকার প্রভাব কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিতেছি। অবশ্য গিঞ্জা দেখিয়া নিউইয়র্ক লণ্ডনের ধনসম্পদ ও লোক-সমারোহ অনুমান করা অসম্ভব।

গিঞ্জামহাল্লার বাহিরে নগরের স্থানে স্থানে কতকগুলি ইয়োরামেরিকান রীতির সৌধ দেখিতে পাই। এগুলি হয় রাজপ্রাসাদ কিম্বা সরকারী কার্য্যালয়। ইহাদের সংখ্যা বেশী নয়—কিন্তু দুই চারিটা প্রত্যেক অঞ্চলেই আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে টোকিওর সর্ব্বত্র জাপানীর জাপানই লক্ষ্য করিতেছি। ক্ষুদ্র কুটির, সঙ্কীর্ণ গলি, কাঠের বাড়ী, কাগজের দেওয়াল, কাঠের খড়ম, কাগজের ছাতা, ঠেলাগাড়ী, ছেলে-পীঠেকরা রমণী, ফরাসবিছান দোকান, মাছভাতের হোটেল,—ইত্যাদিই সর্ব্বদা চোখে পড়ে। আর ইয়োরামেরিকার ত্রিসীমানায় নাই—ভারতবর্ষের ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছি মনে হইতেছে। টোকিওতে হ্যাট্-কোট্-পরা, হোটেলবাসী ইয়োরামেরিকাপ্রিয়, জড়বাদী, ধর্ম্মত্যাগী জাপানী কয়জন? বুদ্ধসেবী, কুটিরবাসী, কিওমনো-পরা, পুরাতনতন্ত্রী নরনারীই এখনও জাপানের মেরুদণ্ড। বিগত ৫০ বৎসরের পাশ্চাত্য

প্রভাবে স্বদেশী জাপান মারা যায় নাই—ইহার উপর কোন গভীর ও বিস্তৃত বিদেশীয় প্রলেপ পড়িয়াছে কি না সন্দেহ—বরং নূতন প্রবর্ত্তিত ইয়োরামেরিকান অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলিই জাপানীদের সাধারণ জীবন-প্রবাহের অঙ্গীভূত হইয়া যাইতেছে।

শব্জী-বাজার

আজ সকালে বাজার দেখিতে বাহির হইলাম। সহরের সর্ব্বাপেক্ষা বড়বাজারে আসা গেল। বাঙ্গালাদেশের মফঃস্বলে পাড়াগেঁয়ে হাট বসিলে যেরূপ হয়, লণ্ডন-নিউইয়র্কের সমকক্ষ টোকিওর বাজার সেইরূপ মাত্র। ইংরাজ ও ইয়াঙ্কিরা এই বাজার দেখিয়া দূর হইতে "ত্রাহি মধুসূদন" বলিবে সন্দেহ নাই। উহারা যে সকল জাতিকে অসভ্য ও অর্দ্ধসভ্য বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত তাহাদের ধরণধারণ সবই জাপানী সমাজে বর্ত্তমান। অথচ জাপান রুষিয়াকে কাবু করিয়াছে—কাজেই সে আজ প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তি। সুতরাং তাহাকে অসভ্য বলে সাধ্য কার? কিন্তু ইয়োরামেরিকানেরা জাপানকে নিজেদের সঙ্গে একই রাষ্ট্রীয় আসনে স্থান দিতে বাধ্য হইয়া প্রতিপদে মর্ম্মাহত হইতেছে।

একটা মুদীখানায় প্রবেশ করিলাম। চৌকির উপর ফরাস পাতা রহিয়াছে। মুদী মহাশয় হাঁটু পাতিয়া বসিয়া আছেন। ঘরের মেঝে অপরিষ্কার—বিশেষরূপে পাকা-বাঁধান নয়। বাদলার দিনে খড়মের কাদায় ঘর ময়লা হইতেছে। মাছি ভন্ ভন্ করিতেছে। কতকগুলি কাঠের ভাঁড়ে নানাপ্রকার শস্য সাজান রহিয়াছে। আমাদের দেশে চটের বোরায় মাল রাখা হয়—জাপানীরা কাঠের ব্যারেল ব্যবহার করে। কতকগুলি ব্যারেল ঘরের বাহিরে রাস্তার উপরেই রক্ষিত হইয়াছে। মটর, তিল, গোধূম, শিমের বীজ ইত্যাদি দেখিতে পাইলাম। ধান চাউলের দোকান অন্যত্র। টিনের কৌটায় সুরক্ষিত ফলও এই

দোকানে আছে। এইগুলি জাপানেই প্রস্তুত। গাইড্ বলিলেন—"এই যে বাক্সের ভিতর কতকগুলি শুষ্ক শব্জী ও ফল দেখিতেছেন, এগুলি নিরামিষাশী বৌদ্ধ পুরোহিতগণের খাদ্য।" সামুদ্রিক উদ্ভিদ্ এবং ব্যাঙের ছাতা রৌদ্রে শুকাইয়া এইরূপে রাখা হয়।

মুদীখানা হইতে বাজারের ভিতর প্রবেশ করিলাম। ঠিক যেন এলাহাবাদের চকের ভিতর দিয়া চলিতেছি। এখানে কপির পাতা পচিতেছে, ওখানে মূলার শাক পড়িয়া আছে। কোথাও বা ঠেলা-গাড়ীতে করিয়া কুমড়া, আদা, বেগুন, সাকরকন্দ আলু, শালগম ইত্যাদি স্থানান্তরিত হইতেছে—কোথাও বা অর্দ্ধাবৃতদেহ ভারবাহী বাঁকে করিয়া মাল চালান করিতেছে। তাহার উপর বৃষ্টির উৎপাতে জল কাদা দুর্গন্ধ ত যথারীতি আছেই।

ছোট ছোট চুপড়ীতে শাকশব্জীগুলি সাজান। দোকানঘরগুলি নিতান্তই ক্ষুদ্র—ঘরের বাহিরেই কেনা-বেচা চলিতেছে। কোথাও বা একটা টিনের ছত্রস্বরূপ আবরণের নীচে দোকানদার বসিয়া আছেন। খোলার ছাদওয়ালা গৃহই বেশী। দেখিয়া শুনিয়া কলিকাতার কোন বাজারের কথা মনে হইল না। স্যাঁত স্যাঁতে বিক্রমপুরের হাট-বাজার-মেলার দৃশ্যই চোখে আসিল। টোকিও কি "আধুনিক" নগর?

আমাদের দেশে বাজারের স্থানে স্থানে চাল-কড়াই ভাজার দোকান দেখা যায়। এখানে সেইরূপ চার দোকান। কয়েকটা অন্ধকারময় ঘরে রুটি তৈয়ারী হইতেছে। মাছে আলুতে মিশাইয়া এই রুটি তৈয়ারি করা হয়। একজন অর্দ্ধউলঙ্গভাবে একটা গামলার ভিতর লাফাইতেছে—তাহার পায়ের নীচে রুটির উপকরণ। টোকিওর বাজারে ফল বেশী দেখিলাম না। জাপানীরা ফরমোসা হইতে কলা

আমদানী করে এবং আমেরিকা হইতে লেবু আনয়ন করে। পূর্ব্বে জাপানে নাসপাতি জন্মিত না। কিছুকাল হইল যুক্তরাষ্ট্র হইতে এই গাছের চারা আনা হইয়াছে। এক্ষণে নাসপাতি জাপানেই উৎপন্ন হয়।

হস্ত-শিল্পের কারবার

শঙ্গীবাজার হইতে বাহির হইয়া নগরের নানাস্থানে কতকগুলি দোকান দেখা গেল। এই সকল দোকান ইয়োরামেরিকায় দেখিতে পাই না। ভারতবাসীর পক্ষে অবশ্য এগুলি নূতন নয়। এই সমুদয়ে মধ্যযুগের জাপান, এশিয়াবাসী জাপানী এবং জাপানীর জাপান বুঝিতে পারা যায়। জাপানীরা যে ভারতবাসীর শিষ্য ও আত্মীয় তাহার পরিচয় এইখানে পাইলাম।

বিলাতে ও ইয়াঙ্কিস্থানে আজকাল প্রায় সকল পদার্থই কলে প্রস্তুত হয়। বিগত ৩০।৪০ বৎসরের ভিতর জাপানেও যন্ত্রচালিত কারখানার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। ছুরী কাঁচি হইতে গরদ পশম পর্য্যন্ত সকল বস্তুর জন্যই জাপানীরা ছোট বড় ফ্যাক্টরী স্থাপন করিয়াছে। টোকিও, ওসাকা, নাগাসাকি ইত্যাদির কোন কোন কারখানায় দশ হাজার নরনারী কর্ম্ম করিতেছে।

এই সকল কারখানায় যে সমুদয় জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে তাহা ছাড়া ইয়োরামেরিকায় বর্ত্তমানযুগে আর কোন বস্তু পাওয়া যায় না। কিন্তু জাপানে এখনও বহু জিনিষ হাতেই তৈয়ারী হয়। সেগুলির ফ্যাক্টরী বৃহৎ যন্ত্রচালিত কারখানা' নয়—ক্ষুদ্র-বৃহৎ পরিবারের কুটির। জাপানীদের এই হস্তশিল্প, কুটির-শিল্প এবং পরিবারগত কারবার না দেখিলে জাপানের যথার্থ রূপ দেখা হয় না। স্বদেশী জাপান বুঝিবার জন্য হস্তশিল্পের, এবং সুকুমার কারুকার্য্যের কয়েকটা দোকান খুঁজিয়া লইলাম। গাইডের সাহায্য আবশ্যক হইল।

ধাতুশিল্পের নমুনা দেখিয়া পাশ্চাত্যেরা বিস্মিত হইবেন। কিন্তু ভারতবাসীর চোখে এগুলির বিশেষত্ব বেশী নাই। তবে সোনা, রূপা, কাঁসা, হাতীর দাঁত ইত্যাদির উপর জাপানী অলঙ্কার-সমাবেশ নূতন। এনামেল এবং চীনামাটির শিল্প সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। কাশী, মোরাদাবাদ, মুর্শিদাবাদ, তাঞ্জোর ইত্যাদির হস্তশিল্প দেখা থাকিলে এই ধরণের কারুকার্য্য দুনিয়ার অন্যত্র দেখিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু দুইটা শিল্প বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ল্যাকার-শিল্পে অর্থাৎ সোনালি গালা (লাহা) নির্ম্মিত কলাইয়ের কার্য্যে জাপানীরা সুদক্ষ। এগুলি অতিশয় মনোরম। দ্বিতীয়তঃ, রেশমের উপর বুনন কার্য্য। ইহাই জাপানীদের খাস শিল্প। এ বিষয়ে ইহারা জগতে অদ্বিতীয়।

সোনালি গালার কাজ ইতিমধ্যে জাপানের নানাস্থানে দেখিয়াছি। সাধারণ থালা বাটি বাক্স ছুরি ইত্যাদির উপর ইহার প্রলেপ যেখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। সেদিন তোকুগাওয়া বংশীয় দ্বিতীয় শোগুণের সমাধি-মন্দিরে সচিত্র ল্যাকার কার্য্যের প্রাচীর ও ছাদ দেখিয়া এক অভিনব শিল্পজগতের পরিচয় পাইয়াছিলাম। একজন ফরাসী শিল্প-সমালোচক বলেন—"জাপানী ল্যাকার-শিল্প মানুষের হস্তশিল্পের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন।" জাপানের এই কারুকার্য্য সম্বন্ধে ডিক্ (Dick) তাঁহার The Arts and Crafts of old Japan অর্থাৎ "জাপানী শিল্প-কল্প" নামক গ্রন্থে বলিতেছেন :—"The most wonderful of all Japanese arts is their lacquer work, and perhaps in this more completely than in any other medium does the peculiar genius of Japan find expression. * * * Even were the same brilliant faculty of design the gift of the European, the amazing and unfaltering precision of hand,

and the limitless patience and unceasing care required by the technical processes, place lacquer work far beyond his scope." অর্থাৎ "ল্যাকার-শিল্প জাপানী শিল্পের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। বোধ হয় জাপানী প্রতিভার চরম বিকাশ এই শিল্পেই সাধিত হইয়াছে। ডিজাইন বা নক্সা করিবার ক্ষমতায় এবং ছাঁচ প্রস্তুত করণে হয়ত ইয়োরোপীয় শিল্পীরা জাপানীদিগকে হারাইতে পারিবে। কিন্তু হাতের সাফাই, আর সময়সাপেক্ষ ধীরযন্ত্রচালনাগুণে জাপানীরা ল্যাকার-শিল্পকে অদ্বিতীয় করিয়া রাখিয়াছে।"

রেশমী কাপড়ের দোকানে আসিয়া বিস্ময়ে আপ্লুত হইলাম। রেশমের উপর নানা রংয়ের রেশমী সূতার বুনন দেখিতেছি কি কাগজ কিম্বা ক্যাম্বিশের উপর তুলির ছবি দেখিতেছি, কি সম্মুখে জীবন্ত পশুপক্ষী তৃণলতা দেখিতেছি বুঝা কঠিন। এই সকল কার্য্য পর্দ্দার জন্য, গালিচায় ব্যবহারের জন্য, আসনের জন্য, টেবিল ক্লথের জন্য, অথবা দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। শিল্পীরা জাপানের প্রসিদ্ধ তীর্থ-স্থান, মন্দির, প্রাকৃতিক দৃশ্য, ঋতু, হ্রদ, নদী, সমুদ্র, আগ্নেয়গিরি ইত্যাদি এই রেশমী শিল্পে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিয়াছে। এই দোকানের সংগ্রহালয়ে দাঁড়াইয়া সমগ্র জাপানের প্রতিকৃতি দেখিয়া লইলাম।

জাপানীদের এই শিল্প ভারতবর্ষে নিতান্ত অপরিচিত নয়। কাকেমনো নামক লম্বমান রেশমী চিত্রপট আমরা দেশে দেখিতে পাই। তাহাতে জাপানের ফুজি পর্ব্বত অথবা মিয়াজিমা, শিন্তোমন্দিরের তোরণদ্বার কিম্বা নারা নগরের বৌদ্ধ মন্দির, কিম্বা জাপানের বারমাসের বার ফুল দেখিয়া থাকি। এই সকল কাকেমনো মানচিত্রের মত গুটাইয়া রাখা যায়। জাপানী চিত্রকরেরা ছবি কাঠের ফ্রেমে বাঁধাইয়া রাখে না। চিত্র ঝুলাইয়া রাখা এবং আবশ্যক হইলে গুটাইয়া রাখা এদেশের দস্তুর।

কাকেমনোর আবিষ্কার চীনে হয়—পরে কোরিয়া হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে বৌদ্ধ শিল্পের সকল অঙ্গ জাপানে আমদানি হইয়াছে।

এই রেশমী বুনন-কার্য্যের দোকান জাপানে সুপ্রসিদ্ধ। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তোকুগাওয়া শোগুণদিগের আমলে এই দোকান খোলা হয়। সেই শোগুণেরা সকল প্রকার শিল্পকর্ম্মের উৎসাহদাতা ও সংরক্ষক ছিলেন। তাঁহাদের অর্ডার পাইয়াই কারিকরেরা সহিষ্ণুতার সহিত হস্তিদন্ত, গালা, ধাতু, রেশম ইত্যাদির উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ফলাইতে সমর্থ হইত।

দোকানদার বলিলেন—"চৌদ্দ পনর বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ তাতা মহাশয় জাপানে আসিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট আমরা অনেক জিনিষ বেচিয়াছি। পাঁচসাত বৎসর হইল বড়োদার গায়কবাড় এখানে আসেন। তিনিও বহুসংখ্যক কাকেমনো, পর্দ্দা, টেবিলক্লথ, বিছানার চাদর ইত্যাদি ক্রয় করিয়াছেন।"

দুইখানা সুবৃহৎ পর্দ্দা দেখিলাম। একটার উপর সমুদ্রের তরঙ্গ বুনা হইয়াছে—অপরটায় পার্ব্বত্য প্রদেশে ধান্যক্ষেত্র দেখিতে পাইতেছি। প্রথমটার মূল্য ৩০০০৲ দ্বিতীয়টার মূল্য ৬০০০৲। দুই কারিগরই কিয়োতো নগরে বাস করেন। ইঁহাদের মত আরও অনেক ওস্তাদ কিয়োটোতে আছেন। ইঁহাদের কোন ফ্যাক্টরী নাই—স্বগৃহে সাগ্রেদের সাহায্যে কার্য্য করিয়া থাকেন। ভারতীয় গৃহ-শিল্প এইরূপ।

দোকানদার বলিলেন—"আমরা ইঁহাদের নিকট "ডিজাইন" চাহিয়া পাঠাই। বুনন-কার্য্যের জন্য আর একশ্রেণীর লোক নিযুক্ত করি। সর্ব্বসমেত আমাদের অধীনে রেশমী কার্য্যে ১০০ কারিগর কার্য্য করে। আমাদের দোকানের অন্যান্য বিভাগও আছে। কারিগরের সংখ্যা প্রায় ১০০০। কোন একস্থানে এই সকল লোক সমবেত হয় না। বর্ণ

বারটা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যালয় আছে। কোথাও আধুনিক যন্ত্রাদির ব্যবহার নাই।”

এই দোকানের বড় আফিস এবং কার্য্যালয়গুলি কিয়োতোতেই অবস্থিত। কিয়োতো নগর বহুকাল পর্য্যন্ত জাপানের রাজধানী ছিল—ইহা জাপানী-দের দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, গৌড় বা মুর্শিদাবাদ। কাজেই এই নগর সকল প্রকার সুকুমার ও সূক্ষ্ম শিল্প-কার্য্যের কেন্দ্রস্থল। দোকানের নাম নিশিমুরা কোম্পানী। রেশমী বুনন কার্য্য ষোড়শশতাব্দীতে শিল্পী শিজো কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছিল। কেইনিন, কোকিও প্রভৃতি আধুনিক কারিগরেরা তাঁহারই চেলা।

মুক্তার চাষ

মুক্তার কারবার সমগ্র এশিয়ার স্বদেশী। জাপানেও মুক্তার ব্যবসায় প্রসিদ্ধ। টোকিওর "মিকিমোতো পার্ল্‌ষ্টোর" এই প্রাচ্য শিল্পের বিখ্যাত দোকান।

এই দোকানে মুক্তার জিনিষ অনেকবিধ রহিয়াছে। কিন্তু সেগুলি দেখিবার জন্য এখানে আসি নাই। এখানে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগে ইচ্ছানুরূপ খাঁটি মুক্তা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আছে শুনিয়াই আসিয়াছি।

শুক্রনীতিতে বর্ণিত আছে যে, সিংহলের লোকেরা কৃত্রিম উপায়ে মুক্তা প্রস্তুত করিত। এইজন্য সংস্কৃত নাটকীয় সাহিত্যে দেখিতে পাই যে, খাঁটি মুক্তা বাছিয়া লইবার জন্য সুদক্ষ জহরি নিযুক্ত হইত। কৃত্রিম মুক্তার বিবরণ আমরা পাশ্চাত্য সাহিত্যেও পাই। রোমান পার্ল, ভেনেশিয়ান পার্ল ইত্যাদি বস্তু যথার্থ পক্ষে কাচ পাথর। কিন্তু মুক্তার নামে চালান হইত। জাপানের এই দোকানে সেইরূপ নামে-মাত্র মুক্তার ব্যবসায় চলিতেছে না। দোকানের স্বত্বাধিকারী মিকিমোতো মহাশয় সমুদ্রের ভিতর আসল মুক্তা-জীবের পালন বা চাষ করিতেছেন। উদ্ভিদের চাষ, ফলফুল শস্যের চাষ, মাছের চাষ ইত্যাদির ন্যায় পার্ল-কাল্‌চার অর্থাৎ মুক্তার চাষ খাঁটি বিজ্ঞানের সাহায্যে চলিতেছে। সমুদ্র হইতে প্রকৃতির দানস্বরূপ মুক্তা অল্পমাত্র পাওয়া যায়। বিশেষ আয়োজনের ফলে মিকিমোতো প্রতিবৎসর বহু সংখ্যা মুক্তা পাইতেছেন। কাজেই বলা যাইতে পারে যে, তিনি "attempts to make the pearl oyster work for man and produce natural and true

pearls in a more reliable and methodical manner than nature—in short a kind of "harnessing" the mollusc for the service of man" অর্থাৎ "প্রকৃতির খেয়ালে কোথায় কখন মুক্তা জন্মিবে কে জানে? মিকিমোতো মহাশয় এই খেয়ালের উপর নির্ভর করেন না। তিনি প্রকৃতির নিয়মগুলি দখল করিয়াছেন এবং সেই নিয়মগুলি কাজে লাগাইতেছেন। ফলতঃ প্রকৃতি দাসীর ন্যায় মিকিমোতোর আজ্ঞা পালন করিতেছে। বিজ্ঞানের বলে প্রকৃতির খেয়াল উড়িয়া গেল।" ইয়াঙ্কি লুথার বার্ব্বাঙ্ক উদ্ভিজ্জগতে যাহা করিতেছেন, জাপানী মিকিমোতো ঝিনুক শামুকের জগতে তাহাই করিতেছেন। ইঁহার তৈয়ারী মুক্তার কাটতি আজকাল বিলাতে ও আমেরিকায় বেশ বাড়িয়া চলিয়াছে।

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবতত্ত্বাধ্যাপক ডাক্তার মিৎসুকুরীর পরামর্শে মিকিমোতো মুক্তার চাষে প্রবৃত্ত হন। মাছের চাষ যে কারণে সম্ভব, ঝিনুক শামুকের চাষও সেই কারণেই সম্ভব। যথারীতি ঝিনুকের চাষ করিতে পারিলে মুক্তালাভের আশা করা যায়। কৃত্রিম উপায়ে সকণ্টক উদ্ভিদ্‌কে নিষ্কণ্টক উদ্ভিদে রূপান্তরিত করা দেখিয়াছি। মিকিমোতোর দোকানে কৃত্রিম উপায়ে স্বাভাবিক মুক্তাফলের উৎপত্তি দেখিলাম। মুক্তার আবাদ-প্রণালী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে :—

"Every year during the month of July and August, small pieces of rock and stone are placed where the oyster larvœ are most abundantly found. Soon small oyster spats are found attached to them. As this takes place in the shallow waters, if the oysters were left there during the winter they would die from chill. So together

with the stones to which they are anchored, they are removed to deeper waters. When they reach their third year, they are taken out of the sea, and undergo an operation which leads to the pearl formation. This consists chiefly in introducing into them small pearls or round pieces of nacre which are to serve as nucleii of pearls. The shells are then put back into the sea and carefully laid down on the bed. They are left there undisturbed for at least four years more. At the end of that period it will be found that the animal has invested the nucleus with many layers of nacre and in fact produced a pearl."

অর্থাৎ "প্রতিবৎসর শ্রাবণ ভাদ্র মাসে শামুকের আড্ডায় কতকগুলি পাথরের টুকরা রাখিয়া দেওয়া হয়। সমুদ্রের কিনারায় অগভীর স্থানে শামুকেরা আসিয়া থাকে। পরে দেখা যায় যে শামুকগুলি পাথরের গায় লাগিয়া রহিয়াছে। শীত কালে সমুদ্রের গভীরতর অংশে এই শামুক-লগ্ন পাথরগুলি স্থানান্তরিত করা হয়। এই খানে তিন বৎসর রাখিয়া পরে এইগুলিকে ডাঙ্গায় আনা হইয়া থাকে। এই অবস্থায় একপ্রকার প্রক্রিয়া আবশ্যক হয়। তাহার ফলে মুক্তা গঠিত হইতে পারে। অতি সূক্ষ্মমুক্তার দানা শামুকের ভিতর স্থাপন করাই এই প্রক্রিয়ার প্রধান অঙ্গ। এই দানাই শেষে মুক্তার 'কেন্দ্র' হইয়া পড়ে। এই প্রক্রিয়ার পর শামুক-গুলিকে আবার সমুদ্রে লইয়া যাওয়া হয়। দ্বিতীয়বারকার সমুদ্রবাস অন্ততঃ চারিবৎসরব্যাপী। চারি বৎসর পরে দেখা যায় যে, দানা-গুলির চারিপাশে ভিন্ন ভিন্ন স্তর রহিয়াছে। ইহাই মুক্ত।"

নেভ্যাল মিউজিয়াম

হোটেলের অতি নিকটেই "নেভ্যাল মিউজিয়াম" বা নৌসংগ্রহালয়। একটা খাল পার হইয়া মিউজিয়ামে প্রবেশ করিলাম। গৃহের চারিদিকে বাগান—অট্টালিকা আধুনিক ধরণের। বাগানের চারিদিকে পোর্ট আর্থারে লুণ্ঠিত রুশ কামান, টর্পেডো এবং জাহাজের অংশ-বিশেষ সাজান রহিয়াছে।

সংগ্রহালয়ের ভিতরও এইরূপ বহু "ট্রফি" দেখিতে পাইলাম। ওসাকার কারখানায় প্রস্তুত কামান, গোলা ইত্যাদির সংগ্রহ মন্দ নয়। চীনা সংগ্রামে লুণ্ঠিত দ্রব্যের সংখ্যা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ষোড়শশতাব্দীতে জাপানীরা কোরিয়া আক্রমণ করিতে যাইয়া বিফল হয়। সেই সময়ে ব্যবহৃত জাহাজের নমুনা মিউজিয়ামে রহিয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রাণী জিঙ্গো কোরিয়া দেশ জাপানের অধীন করেন। সেই বিজয় কাহিনীর কোন নিদর্শন "মিলিটারী মিউজিয়ামে"ও নাই, এখানেও দেখিলাম না।

কতকগুলি বন্দর, পোতাশ্রয়, ডক্‌ইয়ার্ড ইত্যাদির নক্সা ও মডেল কোন কোন প্রকোষ্ঠে প্রদর্শিত হইতেছে। পোর্ট আর্থারের জলযুদ্ধ ও স্থলযুদ্ধ বুঝাইবার জন্যই কয়েকটা ঘর বিশেষভাবে রক্ষিত। মানচিত্র, মডেল ইত্যাদি দেখিলে সকলেই যুদ্ধের ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য সহজে বুঝিতে পারে। জাপানীরা কোথায় কতগুলি নিজেদের মালের জাহাজ ডুবাইয়া রুশ-রণতরীর পথ অবরুদ্ধ করিয়াছিল তাহা বেশ সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। একজন চিত্রকর রুশ-যুদ্ধের কতকগুলি চিত্র অঙ্কন

করিয়াছেন। নেপোলিয়ানী সমরের যুগে ফরাসী চিত্রকরেরা এইরূপ সুকুমার শিল্পে সুদক্ষ ছিলেন। তিনটি চিত্রের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে (শিল্পীর নাম টোজে):—

১। পোর্ট আর্থারের যুদ্ধ (১০ মার্চ্চ, পূর্ব্বাহ্ণ খৃঃ অঃ ১৯০৪)।

২। পোর্ট আর্থারে কামানদাগা (১৯ আগষ্ট, ১৯০৪)।

৩। পোর্ট আর্থারের পথ বা মুখ বন্ধ করার (Bottling up) দৃশ্য।

কয়েকটা গৃহে তড়িতের যন্ত্র বহুবিধ দেখা গেল—বর্ত্তমান সমুদ্র-যুদ্ধ এবং অর্ণবযানের জটিল কলসমূহের প্রদর্শনী-গৃহস্বরূপ এই ঘরগুলি ব্যবহৃত হয়। মিউজিয়ামের পার্শ্বেই নেভ্যাল কলেজ—এই মিউজিয়াম ছাত্রগণের ল্যাবরেটরী।

মিলিটারি মিউজিয়ামে দেখিয়াছি, সেদিনকার জার্ম্মাণ-যুদ্ধে ব্যবহৃত আকাশযান জাপানীরা ইতিমধ্যেই সংগ্রহালয়ে তুলিয়াছেন। নেভ্যাল মিউজিয়ামেও জার্ম্মাণ উপনিবেশ এবং দ্বীপপুঞ্জের "ট্রফি"-সমূহ রক্ষিত হইতেছে।

রুশ-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জাপানীরা ইংরাজের নেপোলিয়ান-ধ্বংসের গৌরব অনুভব করিতেছে। সেনাপতি নোগি জাপানের ওয়েলিংটন, এবং য়্যাডমির্যাল টোগো ইহাদের নেল্‌সন। ১৯০৫ সালের ২৭ মে তারিখে বেলা ১-৫৫ মিনিটের সময় টোগো চিরস্মরণীয় জয়লাভ করেন। তিনি যে জাহাজে বসিয়া সমগ্র নৌবিভাগের পরিচালনা করিতেছিলেন তাহার নাম "মিকাসা।" নেভ্যাল কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ ২৭ মে তারিখে উৎসব করিয়া থাকে। মিউজিয়ামের একগৃহে জাপানী নেল্‌সনের "ফ্ল্যাগ্‌শিপ" ঝুলান রহিয়াছে।

মধ্যযুগের কয়েকখানা রণতরীর নমুনা ও চিত্র একগৃহে দেখিতে পাইলাম। একটা জাহাজ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে :—

'The Ataka Maru was the biggest war-galley possessed by Shogun before the new Navy was established. Her dimensions were 180 ft. long, 63 ft. broad and 22 ft. deep and proplled by 130 oars. She mounted five guns besides numerous small arms and the vital parts of the ship were protected by copper sheets." অর্থাৎ "শোগুণী আমলের বৃহত্তম জাহাজের নাম আতাকা মারু। ১৮০ ফিট লম্বা, ৬৩ ফিট চওড়া, ২২ ফিট উচ্চ। ১৩০ দাঁড়। পাঁচটা কামান এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ অন্যান্য অস্ত্র "আতাকায়" ছিল। তামার পাতে জাহাজের সুরক্ষণীয় স্থানগুলি মোড়া।"

বর্ত্তমান রণতরীর তুলনায় এই জাহাজ একখানা পান্সী বা বজরা মাত্র! চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে জাপানীদের এই অবস্থা ছিল। অথচ আজ জাপানের হস্তে প্রশান্ত মহাসাগরের আধিপত্য—ইয়াঙ্কিরা জাপানী রণতরীর ভয়ে অস্থির—ইংরাজও আশঙ্কিত!

জলযুদ্ধে আজকাল শত্রুপক্ষীয় টর্পেডোসমূহের আক্রমণই বিশেষ ভীতিজনক। এই যন্ত্রগুলি জলের ভিতর লুক্কায়িত থাকে—এবং অলক্ষ্যে আসিয়া বহু ব্যয়সাধ্য বিরাট জাহাজগুলিকে এক নিমেষের মধ্যে রসাতলে পাঠাইয়া দেয়। কাজেই টর্পেডো ধ্বংস করিতে পারা বর্ত্তমানকালে অত্যন্ত আবশ্যক। গাইড কয়েকটা আল্‌মারির নিকট লইয়া গিয়া বলিলেন—"এই যে পদক, পেয়ালা, ফুলের বাটি ইত্যাদি দেখিতেছেন, এগুলি প্রাইজ বা পুরস্কার। যে সকল নাবিক টর্পেডো ধ্বংস করিতে কৃতিত্ব দেখায় তাহারা নৌবিভাগ হইতে এই সকল পুরস্কার পাইয়া থাকে।"

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইয়াঙ্কি নাবধ্যক্ষ পেরি জাপানে আগমন করেন।

তখন জাপানে শোগুণী আমল। ইয়াঙ্কিদিগকে এবং অন্যান্য "ম্লেচ্ছ"-গণকে জাপানে বসতিস্থাপন এবং বাণিজ্য বিস্তার করিতে দেওয়া হইবে কি না এই বিষয়ে দুই দল জাপানে দেখা দিল। শেষ পর্য্যন্ত মিকাডোর অনুমতি না লইয়াই শোগুণ পেরিকে দরবারে আহ্বান করিলেন। পেরির জাপানী দরবারে আগমন একটা সমসাময়িক চিত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে। মিউজিয়ামে তাহা দেখিলাম। ক্লাইব মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট "দেওয়ানী"র সনন্দ লাভ করিবার সময়ে যে ভাবে দরবারে উপস্থিত ছিলেন তাহার এক চিত্র ভারতবর্ষে দেখিয়াছি। সদলবল পেরি-চিত্র দেখিয়া সেই কাহিনী মনে পড়িল। দুই ঘটনায় প্রায় ১০০ বৎসরের ব্যবধান।

জাপানীরা বহুকাল পর্য্যন্ত সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া "গৃহে চ মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ" ভাবিতেছিলেন। বিদেশীয়গণকে ম্লেচ্ছ জ্ঞান করা তাহাদের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। অবশেষে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সাত আটজন জাপানীকে ইয়াঙ্কিস্থানে পাঠান হয়। এই কয়জন নব্য জাপানীর চিত্র দেখা গেল। ইহারা তখনও ম্লেচ্ছ পোষাক ধরে নাই—ইহারা হিন্দু মতেই খাঁটি স্বদেশীভাবে সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিল। ৩৩ বৎসর মাত্র বিদেশগমনের পর জাপানীরা তারহীন বার্ত্তাবহ, আকাশযান, জাহাজ-ধ্বংসকারী মাইন ও টর্পেডো ইত্যাদির ব্যবহার করিয়া ইয়োরোপের আশঙ্কাস্থল রুশজাতিকে পদদলিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই বিস্ময়-জনক ঘটনার তুলনা জগতে নাই।

রুশযুদ্ধের পর ইংরাজেরা জাপানকে বন্ধুত্ব পাশে আবদ্ধ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। এই বন্ধুত্বলাভ করা জাপানের পক্ষেও গৌরবজনক সন্দেহ নাই। বন্ধুত্ব সুদৃঢ় করিবার জন্য ১৯১০ সালে ইংল্যাণ্ডে এক বিরাট প্রদর্শনী খোলা হয়—যে কোন কার্য্যের জন্য প্রদর্শনী খোলা বর্ত্তমান

যুগের রীতি। প্রদর্শনীর নাম বিলাতী-জাপানী প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীর জন্য জাপান হইতে সকল প্রকার দ্রব্য লণ্ডনে পাঠান হইয়াছিল। জাপানকে ইংলিশস্থানে সুপ্রচারিত করিবার জন্য একজন জাপানী রাষ্ট্র-নায়ক "Japan Today," অর্থাৎ "আধুনিক জাপান" নামক সুবৃহৎ সচিত্র গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার নাম মোচিজুকি। সেই মেলায় প্রদর্শিত কোন কোন দ্রব্য এই নৌসংগ্রহালয়ে দেখিলাম।

চিত্রশালা ও ইম্পিরিয়্যাল মিউজিয়াম

বর্ত্তমান সম্রাটের বিবাহোপলক্ষ্যে টোকিওবাসিগণ তাঁহাকে একটা অট্টালিকা উপহার দিয়াছিলেন। সেই অট্টালিকা আজকাল জাপানীদের সুকুমারশিল্পভবন। ইম্পিরিয়্যাল মিউজিয়ামের সংলগ্ন এই সৌধে গবর্মেণ্ট Fine and Industrial Arts-এর নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছেন।

কতকগুলি প্রকোষ্ঠে চীনা অক্ষরে প্রাচীন চীনা সাহিত্যের লম্বমান "কাকেমোনো" দেখিলাম। ইয়োরোপে এবং এশিয়ায় মধ্যযুগের লোকেরা লিপিচাতুর্য্যের জন্য জীবন কাটাইয়া ফেলিত। পার্শী, আরবী, ল্যাটিন, চীনা সকল ভাষায়ই সযত্নে লিখিত পুঁথি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মিউজিয়ামে যাহা দেখিলাম তাহার অধিকাংশই সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যের চীনা অনুবাদ।

অন্যান্য গৃহে চিত্রাবলী প্রদর্শিত হইতেছে—আগাগোড়া "কাকেমোনো"। এইগুলি সমস্তই মধ্যযুগের চীনাশিল্প। শুনিলাম—"মিউজিয়ামের কর্ত্তাদের নিকট এত বেশী চীনা চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে যে, সেগুলি একসঙ্গে প্রদর্শন করা অসম্ভব। এই জন্য দুইতিন সপ্তাহ পর নূতন নূতন কাকেমোনোর তাড়া খুলিয়া দেওয়া হয়।" আজ প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রই দেখিলাম। একজন বলিলেন—"ইহার পূর্ব্বে চীনাদের বৌদ্ধধর্ম্মবিষয়ক চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।"

চীনারা উদ্ভিদ্, পর্ব্বত ইত্যাদি আঁকিতে যাইয়া প্রকৃতির অনুকরণ করে না। এগুলি দেখিলে স্বাভাবিক বস্তুর পরিচয় পাই না। কেবল বুঝিতে পারি যে—গাছপাতা, পাহাড়-পর্ব্বত চিত্রিত রহিয়াছে। কিন্তু

কোন্ জাতীয় গাছ বা কোন্ পাহাড় আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

কিন্তু ইহাদের অঙ্কিত জীবজন্তুগুলি সবই স্বাভাবিক। দেখিবামাত্র চিনিতে পারা যায়। অঙ্কনেও যথেষ্ট ক্ষমতা আছে।

চিত্রশালায় জাপানী শিল্পের নিদর্শন একটাও নাই। কোন কোন গৃহে কোরিয়ার হস্তশিল্প এবং চীনামাটির কাজ প্রদর্শিত হইতেছে। এখান হইতে ইম্পিরিয়্যাল মিউজিয়ামে প্রবেশ করিলাম। প্রথমেই স্থাপত্যগৃহ। এই গৃহে হিন্দু-বৌদ্ধ-তান্ত্রিক দেব-দেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। বুদ্ধ, অবলোকিতেশ্বর ইত্যাদি দেখিয়া ভারতীয় মিউজিয়ামসমূহের অভ্যন্তর মনে আসিল। বিদ্যার দেবতা, দীর্ঘ আয়ুর দেবতা ইত্যাদিও অনেক রহিয়াছে। কিম্ভূত কিমাকার আকৃতি-বিশিষ্ট দেব-দেবীর মূর্ত্তিও কম নাই। এই সকলগুলি প্রধানতঃ কাষ্ঠনির্ম্মিত। ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তির সংখ্যা অল্প। প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিলাম না—ধাতুর মধ্যে পিত্তলের ব্যবহার বুঝা গেল। কামাকুরা নগর হইতে এইগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। ইয়েডো বা টোকিওতে তোকুগাওয়া শোগুণেরা রাষ্ট্রকেন্দ্র স্থাপন করিবার পূর্ব্বে কামাকুরায় শোগুণী দরবার অবস্থিত ছিল। সুতরাং মিউজিয়ামের এই মূর্ত্তিগুলি ষোড়শশতাব্দীর পূর্ব্বেকার যুগ উন্মুক্ত করিতেছে।

জাপানী স্থাপত্য সম্বন্ধে Chamberlain বলিতেছেন :—"Sculpture long remained exclusively in Buddhist hands—at first in those of Korean Priests or of descendants of Korean and Chinese Craftsmen—whence it not unnaturally exhibit Indian influence. Critics still hesitate as to the share to be attributed to native Japanese in a series of large wood and bronze images adorning the

temples of Kyoto and Nara. Whatever their origin and date (some are attributed to the sixth and seventh centuries), these figures, by virtue of their passionate vitality of expression and of their truth to Anatomical detail, may claim a place among the world's master-pieces. The ideal they embodied has not again been reached on Japanese soil. Japan also possesses some early stone images and a few remarkable stone carvings in relief, but this brand of the art has remained comparatively unimportant." অর্থাৎ "বহুকাল পর্য্যন্ত জাপানে স্থাপত্য-শিল্প বৌদ্ধ প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। হয় কোরিয়াবাসী শিল্পী, না হয় চীনা ভাস্কর, জাপানী স্থাপত্যের গুরু ও কর্ত্তা ছিলেন। এই সূত্রে ভারতীয় স্থাপত্যের অনেক লক্ষণ জাপানী শিল্পে আসিয়া পড়িয়াছে। জাপানের খাঁটি স্বদেশী শিল্পী অনেক দিন পর্য্যন্ত স্থাপত্য-ক্ষেত্রে হাত দেখাইতে পারেন নাই। কিয়োতো এবং নারা নগরদ্বয়ের মন্দিরে মন্দিরে বহুসংখ্যক কাষ্ঠ-মূর্ত্তি এবং কাংস্য-মূর্ত্তি দেখিতে পাই। এইগুলি ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর কার্য্য। কিন্তু এইগুলি খাঁটি জাপানী স্থপতির কার্য্য নয় বলিয়া সমালোচকগণের মধ্যে একটা মত প্রচলিত আছে। এই সমুদয়ের শিল্পী যাহারাই হউন, তাঁহাদের ক্ষমতা অদ্ভুত সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ, জীবন ফুটাইবার ক্ষমতা এই সকল মূর্ত্তি-খোদাইয়ে দেখিতে পাই। দ্বিতীয়তঃ, মানব দেহের অস্থিপঞ্জরাদিও নিখুঁতভাবে শিল্পীরা এই সকল মূর্ত্তির মধ্যে দেখাইতে পারিয়াছেন। কাজেই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্য-শিল্পের আসনে এই গুলির স্থান। জাপানে এই শিল্প পরবর্ত্তী-কালে আর বেশী উন্নতিলাভ করে নাই।"

৫৫২ খৃষ্টাব্দে কোরিয়া হইতে জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আমদানি হয়। ইহাই জাপানী সভ্যতার প্রথম বর্ষ। জাপানের শিল্প, শিক্ষা, শাসন, ইত্যাদি সকল বস্তুই এই ঘটনার পর আরব্ধ হইয়াছে। এই ঘটনার পূর্ব্ববর্ত্তী বৃত্তান্তসমূহকে প্রাগৈতিহাসিক বলা চলে। আমরা এখন পর্য্যন্ত খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর (অর্থাৎ বুদ্ধদেবের) পূর্ব্বেকার ভারত সম্বন্ধে প্রমাণসিদ্ধ ঘটনা উল্লেখ করিতে পারি না। কাজেই বলিতে হইবে, বুদ্ধদেবের আবির্ভাব-কালের ১১০০।১২০০ বৎসর পরে জাপানে সভ্যতার বীজ উপ্ত হয়। এই হিসাবে জাপানের দীক্ষাগুরু ভারতবর্ষ জাপান অপেক্ষা ১১০০।১২০০ বৎসর প্রাচীন। জাপান যখন কোরিয়ার নিকট ধর্ম্মগ্রহণ করিতেছিল তখন ভারতবর্ষে কালিদাস, বিক্রমাদিত্য, বরাহ, মিহিরের স্বর্ণযুগ প্রায় অতীত হইতেছে। তখনও হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্যগৌরব সুরু হয় নাই। জাপানে কোন্ ধরণের ভারতীয় প্রভাব প্রবেশ করিয়াছে, তাহা বুঝিবার জন্য এই সন তারিখটা মনে রাখা আবশ্যক। এই কথা মনে না রাখিলে, জাপানী বৌদ্ধধর্ম্ম, জাপানী মূর্ত্তিতত্ত্ব, জাপানী চিত্রকলা ও অন্যান্য সূক্ষ্মশিল্প যথার্থরূপে বুঝা যাইবে না।

ইম্পিরিয়্যাল মিউজিয়ামের অন্যান্য গৃহে জাপানী চিত্রকলার নিদর্শন প্রদর্শিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, বৌদ্ধশিল্পের পরিচয়ই বেশী পাইলাম। কিন্তু জাপানী শিল্প একমাত্র ধর্ম্মশিল্পই নয়। বাস্তবজগৎ লইয়া ভারতবাসীর মত জাপানীরাও নাড়াচাড়া করিত। প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং ঐতিহাসিক ঘটনার চিত্রনে জাপানীরা ক্ষমতা দেখাইয়াছে। অবশ্য জাপানী চিত্রকলার প্রত্যেক যুগেই চীন ও কোরিয়ার শিল্পীদিগের প্রভাব ন্যূনাধিক বর্ত্তমান।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ হইতে নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত জাপানের বৌদ্ধ চিত্রকলা বোধ হয় আগাগোড়া বিদেশীয় শিল্পিগণের কৃতিত্বের সাক্ষী। এই যুগে

প্রধানতঃ ধর্ম্মচিত্রই অঙ্কিত হইত। আর তখন কোন জাপানী সন্তান চিত্রবিদ্যায় হাত দেখাইতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। এই যুগে চীনে টাঙ ও সুঙ রাজবংশের আমল এবং ভারতবর্ষে হর্ষবর্দ্ধন, ধর্ম্মপাল ও চোল সম্রাটগণের অভ্যুদয়। এই যুগের চীনে এবং ভারতে সাহিত্য, শিল্প, রাষ্ট্র ও বাণিজ্যের যৎপরোনাস্তি উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই যুগের ভারতবর্ষ সম্বন্ধেই সদর্পে বলা যায়—"সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ"। সমগ্র এসিয়ায় ভারতমণ্ডল এই যুগেই স্থাপিত হইয়াছিল। জাপানের তখন প্রত্যেক বিষয়ে হাতে-খড়ী হইতেছে মাত্র।

এই যুগের ভারত-শিষ্য জাপান সম্বন্ধে ডিক্ বলিতেছেন :—The chief centres of the new culture which spread over the land were the great Buddhist Monasteries. Just as our own mediœval cathedrals and monasteries were the nurseries of the arts, so in Japan arose a race of artist priests. Their work at first applied solely to religious purposes, but afterwards widened out till, along with the sacred, there existed also a secular school. For three or four hundred years under these benign and mellowing influences the country grew and prospered. The quiet and peaceful times from the eighth to the 10th century marked a period of great literary activity several of the most famous poets of Japan, whose writings still live in old tradition, flourishing during this period. অর্থাৎ "বৌদ্ধ মঠগুলি এই ভারতীয় (চীনা ও কোরিয়ান) বিদ্যার কেন্দ্র ছিল। ইয়োরোপে মধ্যযুগে ধর্ম্মযাজকগণই শিল্প ও সাহিত্যের সেবক ছিলেন।

জাপানেও এইরূপ দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারের জন্য জাপানী শিল্পীরা শিল্পের চর্চ্চা করিতেন। ক্রমশঃ সাংসারিক এবং ধর্ম্মসংস্রবহীন অন্যান্য দিকেও শিল্পের বিকাশ সাধিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত জাপানী সভ্যতা উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। এই যুগে জাপানী সাহিত্যেরও সবিশেষ পুষ্টি হইয়াছিল। জাপানীদের কতিপয় সর্ব্বপ্রসিদ্ধ কবি এই যুগের লোক।"

হিন্দুস্থানের সভ্যতা-তপন যখন মধ্যাহ্নগগন হইতে ক্রমশঃ অস্তাচলের পথে অগ্রসর, জাপানে তখনমাত্র সূর্য্যোদয় দেখা দিতেছে।

বড় বড় মিউজিয়ামে যাহা থাকা আবশ্যক টোকিওর ইম্পিরিয়্যাল মিউজিয়ামে তাহার সবই আছে। তবে ইহাকে প্রথম শ্রেণীর সংগ্রহালয় বলিতে পারি না। খনিজতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান-কার্য্যের ফল মুদ্রিত হইয়াছে দেখিলাম। জাপানী অধ্যাপকগণ আধুনিক বিজ্ঞানচর্চ্চায় যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিতেছেন। জীবতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, এঞ্জিনিয়ারিং, তড়িৎ-বিজ্ঞান, রসায়ন ইত্যাদি বিষয়ে জাপানী বৈজ্ঞানিকেরা মৌলিক গবেষণা প্রায়ই ছাপাইয়া থাকেন। মারুজেন কোম্পানী ইহাঁদের আলোচনা ও অনুসন্ধান এবং পরীক্ষার তালিকা স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। জাপানী বিজ্ঞানসেবিগণের পক্ষে বসিয়া থাকা অসম্ভব।

"কোক্বা" বা সুকুমার-শিল্পের পত্রিকা

একজন পত্রিকা-সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ হইল। নাম সেইচিতাকি। ইনি কয়েক বৎসর হইল ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন। ইংরাজী ও জার্মাণ ভাষায় প্রণীত গ্রন্থ পাঠ করিবার ক্ষমতা আছে—কিন্তু কোন বিদেশীয় ভাষায় লিখিবার ক্ষমতা নাই। ইনি ইংরাজীতে কথা বেশ বলেন।

ইঁহার আফিসে দেখা করিলাম। অতিশয় ক্ষুদ্র কার্য্যালয়। খাঁটি স্বদেশীভাবে কাজ-কর্ম্ম চলিতেছে—সাধারণ ভারতীয় ছাপাখানার অবস্থা এইরূপ। প্রথমেই দুধহীন চিনিহীন চা পান করিলাম। মিশরীয়েরা কাফি দিয়া আগন্তুককে আলাপ-আপ্যায়িত করে—জাপানীরা চা দিয়া করে—আর ভারতবর্ষের রেওয়াজ পান তামাক। ইয়োরামেরিকানেরা যখন-তখন কোন লোককে পান-ভোজনের জন্য খোসামোদ করে না। যাহাকে আহারাদির জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়, সে যথা সময়ে আসিয়া টেবিলে বসে। তবে যে কোন সময়ে সিগারেট-প্রদানের ব্যবস্থা আছে।

টেবিলের উপর কয়েকখানা মোটা বই পড়িয়া আছে। ভিতরে স্থানে স্থানে জাপানী লেখা—কিন্তু এগুলি চিত্রসংগ্রহের পুস্তক। শ্রীযুক্ত কুমার-স্বামীর Selected Examples of Indian Art-এর অর্থাৎ "ভারতীয় সুকুমার-শিল্পের নিদর্শন" নামক গ্রন্থের মত এই পুস্তকসমূহে চীনা শিল্পের নিদর্শন মুদ্রিত হইয়াছে। তাকি বলিলেন—"এই ধরণের গ্রন্থ-প্রকাশ "কোক্কা"-কার্যালয়ের অন্যতম কার্য্য।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপ-নারা কি আর্কিয়লজি বা পুরাতত্ত্বের দিকেই বেশী নজর দিয়াছেন? সুকুমারশিল্পের এস্থেটিক্স্ বা সৌন্দর্য্যতত্ত্ব-সম্বন্ধে 'কোক্কা'য় আলো-

চনা প্রকাশিত হয় না কি?" তাকি বলিলেন, "আমি স্বয়ং চিত্রবিদ্যা শিখিয়াছিলাম। প্রথম বয়সে চিত্রাঙ্কনও করিয়াছি। পরে চিত্রসমালোচনায় লাগিয়াছি। এক্ষণে চিত্র বা স্থাপত্যের ঐতিহাসিক তথ্য ও তত্ত্বের আলোচনায়ই বেশী মনোযোগ দিয়াছি। তবে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব একেবারে বাদ দিই না।"

তাকি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্ট-হিষ্টরি বা সুকুমার-শিল্পের ইতিহাস সম্বন্ধে অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাস-বিদ্যার প্রত্যেক ছাত্রকেই এই বিষয় শিখিতে হয়। এই হিসাবে টোকিওর বিশ্ববিদ্যালয় জগতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্বতন্ত্র। তাকি বলিলেন—"বোধ হয় এক মাত্র জার্ম্মানীতে এই নিয়ম আছে।" বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষে আর্ট-হিষ্টরি নামক একটা বিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পাঠ্যতালিকায়ই এখনও স্থান পায় নাই।

তাকি এই ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যেই ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন। কলিকাতা, সারনাথ, লক্ষ্ণৌ, মথুরা ও লাহোরের মিউজিয়ামগুলি দেখিয়াছেন। অজন্তায় যাওয়াই ইঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাকি বলিলেন—"আমি পূর্ব্বে গ্রিফিথ্‌সের (Griffiths-এর) অজন্তাবিষয়ক গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়াছিলাম। তাঁহার শিষ্যবর্গের অঙ্কিত নকল চিত্রগুলি দেখিয়া অজন্তার একটা মোটা জ্ঞান লাভ করি। কিন্তু স্বচক্ষে সেই বিরাট গহ্বর-শিল্প দেখিয়া সম্পূর্ণ নূতন জ্ঞান লাভ করিয়াছি। আমি এতদিন চীনা চিত্রকলার চর্চ্চা করিতাম। খৃষ্টীয় সপ্তম হইতে দশম একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যুগের চীনা শিল্প বিশেষ প্রসিদ্ধ। অজন্তার চিত্রাবলী দেখিবামাত্র আমি ভাবিলাম, যেন চীনা কারিগরদিগের কারুকার্য্য দেখিতেছি। অথচ চীনা শিল্পের গৌরবযুগ অজন্তার যুগের বহু পরবর্ত্তী। কাজেই আজেন্তার শিল্পিগণকে চীনা শিল্পীদিগের গুরু অথবা গুরু ভাই

বলিতে আমার প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গ্রিফিথ্‌সের গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট চিত্রাবলী দেখিয়া আসল অজন্তার যথার্থ স্বরূপ বুঝা যায় না। তাঁহার চিত্রকরগণ সকলেই পাশ্চত্ত্য চিত্রবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন—তাঁহারা প্রাচ্য কায়দার অধিকারী ছিলেন না। এই জন্য অজন্তার নকল করিতে যাইয়া তাঁহারা অজ্ঞাতসারে পাশ্চাত্য-লক্ষণ-সমন্বিত রচনা সৃষ্টি করিয়াছেন। আসল অজন্তায় চীনা লক্ষণ পাই—অথচ গ্রিফিথ্‌সের পুস্তকে পাই না। এই সকল কথা আমি ভারতভ্রমণের পর কোন কোন জাপানী পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি।"

তাকি সারনাথ ও মথুরার স্থাপত্য-শিল্প সম্বন্ধে বলিলেন—"এইগুলিই আমার ভাল লাগে। আর এইগুলিই খাঁটি ভারতীয়। দেখিবামাত্র ভারতবর্ষীয় মূর্ত্তি বলিয়া চেনা যায়। অধিকন্তু মূর্ত্তিসমূহের ভিতর দিয়া একটা গাম্ভীর্য্য ও শান্তিপ্রিয়তা ফুটিয়া বাহির হইতেছে বুঝিতে পারি। কিন্তু গান্ধার স্থাপত্যে বিদেশীয় প্রভাব যথেষ্ট। চীনা স্থাপত্যে খাঁটি ভারতীয় এবং গান্ধার উভয় শিল্পেরই লক্ষণ বিদ্যমান।"

কোক্কা কোম্পানীর ছাপাখানা হইতে কয়েকদিন হইল একখানা সুবৃহৎ গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। ইহা দুই খণ্ডে বিভক্ত। ইংরাজ প্রত্ন-তত্ত্ববিৎ ষ্টাইন (Stein) যেমন খোটান তুর্কীস্থান ইত্যাদি অঞ্চলে খনন-কার্য্য করিতেছেন জাপানী বৌদ্ধ পণ্ডিত ওতানিও সেইরূপ করিতেছেন। তাঁহার আবিষ্কৃত তথ্যরাশি এই দুই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ওতানিকে কি জাপান গবর্মেণ্ট এই কার্য্যের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন ?" তাকি বলিলেন—"না। ওতানি আমাদের সর্ব্বপ্রধান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কর্ত্তা। ইঁহার অধীনে প্রচুর অর্থের আয়-ব্যায় হইয়া থাকে। কাউণ্ট ওতানি কিয়োতো নগরের "পশ্চিম হোঙ্গাঞ্জি" বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সর্ব্ব প্রধান মোহন্ত। ইনি স্বয়ং

আধুনিক বিদ্যায় পারদর্শী—ইংলণ্ডে লেখাপড়া শিখিয়াছেন। ভৌগলিক অনুসন্ধান, ভূগর্ভ-খনন, পুরাতত্ত্ব-সংগ্রহ ইত্যাদিতে ওতানির আগ্রহ যথেষ্ট। ইনি দুই তিনবার তুর্কীস্থান অঞ্চলে শিষ্যসহ অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন। এক্ষণে ইহাঁদের সংগৃহীত পদার্থের কিয়দংশ মাত্র প্রকাশিত হইল। সকল বস্তুই কিয়োটোর প্রধান মন্দিরে রক্ষিত হইতেছে।" গ্রন্থদ্বয়ের ভিতর প্রধান শিল্পী, মুদ্রা, মূর্ত্তি, বৌদ্ধসূত্র, অলঙ্কার ইত্যাদির ফটোগ্রাফ ছাপা হইয়াছে। খরচ হইল প্রায় দশ হাজার টাকা।

তাকিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কোক্কা কোম্পানির কার্য্য কি লাভজনক? গবর্মেণ্ট বোধ হয় আপনাদিগকে অর্থ-সাহায্য করেন।" অধ্যাপক বলিলেন—"গবর্মেণ্টের সাহায্য আমরা পাই না। অথচ আমাদের কার্য্য আদৌ লাভজনক নয়। প্রত্যেক বৎসরই লোকসান দিতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে এই কার্য্যের জন্য দুইজন বন্ধু পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা টোকিওর সর্ব্ববিখ্যাত "আসাহি" দৈনিক পত্রের স্বত্বাধিকারী। দৈনিক পত্রের পরিচালনায় লাভ যথেষ্ট থাকে। তাঁহারা এই লাভের কিয়দংশে কোক্কা কোম্পানীর কার্য্য চালাইয়া থাকেন। ইহাঁদের নাম মুরায়ামা এবং উয়েনো—উভয়েই ওসাকার অধিবাসী।" কোক্কা কোম্পানীর মাসিক খরচ প্রায় ৩০০০৲।

কোক্কা-পত্রিকা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইল। "কোক্কা" শব্দের অর্থ দেশের ফুল বা গৌরব। সুকুমার শিল্পকে জাপানীরা ফুলের আখ্যা দিয়াছে। মাত্র ৩০০ কাপি প্রতিমাসে ছাপা হয়। ইংরাজী সংস্করণ ও জাপানী সংস্করণ—দুই সংস্করণ বাহির হয়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম —"আপনি ইংরাজী লিখিতে পারেন না বলিলেন—তবে ইংরাজী সংস্করণের সম্পাদক হইলেন কি করিয়া?" ইনি বলিলেন—"আমার বক্তব্য জাপানীতে লিখি। একজন বন্ধু তাহার অনুবাদ করেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কাগজের কাট্‌তি কোন্ দেশে বেশী ?" ইনি বলিলেন—"ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত বলিয়া ইহার বিক্রয় বিলাতেই বেশী হয়—আমেরিকায় অতি অল্প। ভারতবর্ষে থ্যাকার স্পিঙ্কের দোকানে ৫।৬ খানা পাঠান হয়। ফরাসী ও জার্ম্মাণেরা আমাদের কার্য্য এবং প্রাচ্য চিত্র ও স্থাপত্য যথেষ্ট আদর করেন। প্রাচ্য শিল্পের যথার্থ সমাদর বিলাতে বেশী নয়। ইংরাজী সংস্করণের প্রথম কয়েক পৃষ্ঠায় সমগ্র সংখ্যার সারাংশ ফরাসী ভাষায় দেওয়া হয়।"

ইহাঁর গৃহে দেখিলাম—নন্দলাল বসুর "কৈকেয়ী"-চিত্র ঝুলিতেছে। তাকি বলিলেন—"কয়েক বৎসর হইল, কোক্কাতে অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবং নন্দলাল বসুর কয়েকটা কার্য্য প্রকাশিত হইয়াছিল। এক সংখ্যায় জজ উড্রফের লিখিত "নব্য ভারতীয় চিত্রকলা" নামক প্রবন্ধও বাহির হয়। এই দেখুন সেই সংখ্যা।"

তাকি বলিতে লাগিলেন—"ওকাকুরার প্রভাবে আজকাল যুবক জাপান নব্য ভারতীয় চিত্রকলার ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি তরুণ শিল্পিগণ অবণীন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত কলাপদ্ধতির অন্ধ অনুকরণও আরম্ভ করিয়াছেন। আমি নিজে আপনাদের নব্য শিল্প ভালবাসি—কিন্তু, মাপ করিবেন, আপনাদের চিত্রকরগণ এখনও তেজস্বিতা ও শক্তিমত্তার নিদর্শন সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। সকল চিত্রেই যেন একটা অত্যধিক কোমলতা ও মেয়েলি ভাব মাখান রহিয়াছে। কিন্তু রেখাপাত ও বর্ণ-সমাবেশ সর্ব্বথা প্রশংসাযোগ্য।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"পাশ্চাত্য শিল্প আপনাদের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতেছে ?" তাকি উত্তর করিলেন—"আমাদের দেশে শিল্পকলা সম্বন্ধে বর্ত্তমানে দুই দল চলিতেছে। স্বদেশী আন্দোলনের দল—এবং বিদেশী অনুকরণের দল। বিদেশী অনুকরণপন্থীরা খ্যাতি

অর্জ্জন করিতে পারেন নাই—স্বদেশী ওয়ালারাই শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া যাইবে।”

মধ্যযুগের জাপানী শিল্পে ওলন্দাজ বা ফরাসী শিল্পের প্রভাব সম্বন্ধে তাকি বলিলেন—“চিত্রকলায় সামান্য মাত্র প্রভাব পাই না। কোন কোন মূর্ত্তি-চিত্রনে রেখাবাহুল্য দেখিয়া পাশ্চাত্য প্রভাব আন্দাজ করিতে পারি। কিন্তু ধাতুশিল্প, অলঙ্কার-শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে ইয়োরোপীয়দিগের প্রভাব সহজেই ধরিতে পারি।”

আফিসে বসিয়া তাকি কার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন। কয়েকজন লোক ফটো তুলিতেছে—কয়েকজন ছবি আঁকিতেছে। কাঠ খোদাইয়ের কার্য্যে এবং রংলাগাইবার কার্য্যেও ২০।২৫ জন লোক নিযুক্ত। কোন কোন ছবি রঙাইতে প্রায় ১০০ বার স্বতন্ত্র প্রয়াস করিতে হয়। সমস্ত কাজই হাতে হইতেছে। কারিগরেরা এক প্রকার উলঙ্গ ভাবে ফরাসে বসিয়া কাজ করে। ল্যাঙট-পরা আছে মাত্র—গায়ে কোন জামা নাই। কোন কোন কারিগরের মাসিক আয় ১০০।১৫০৲।

———

রঙ্গালয়ে পাঁচ ঘণ্টা

মিকাডো-প্রাসাদের সম্মুখেই নব্য জাপানের সর্ব্বপ্রসিদ্ধ রঙ্গালয় অবস্থিত। ইহার নাম ইম্পিরিয়্যাল থিয়েটার। এই থিয়েটারে ইংলণ্ড ও আমেরিকার নূতনতম সাজ সরঞ্জাম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মঞ্চ, গ্যালারি, চেয়ার, দ্বারবান, দাসদাসী, টিকেট-গৃহ ইত্যাদি সবই ইয়োরামেরিকার ধরণের দেখিলাম। তবে টিকেট কিছু সস্তা—প্রথম শ্রেণীর মূল্য ৪৲ মাত্র। একটা বিশেষ প্রভেদ এই যে, এইখানে পাঁচ ঘণ্টা করিয়া অভিনয় হয়। বিকাল পাঁচটা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত নাটক চলিতে থাকে। মাঝে মাঝে ১০।১৫।২০ মিনিট অবকাশ পাওয়া যায়। সেই অবকাশে পান-ভোজনাদি সারিতে হয়। এই জন্য থিয়েটারের ভিতরেই জাপানী ও বিদেশীয় দুই ধরণের হোটেল রহিয়াছে।

থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী, নটনটী, পরিচালক ইত্যাদি সকলেই জাপানী। জাপানী ভাষায় জাপানী নাটকেরই অভিনয় হয়। গাইড্ বলিলেন—"মাঝে মাঝে ফরাসী, ইংরাজ বা আমেরিকান কোম্পানী আসিয়া গৃহ ভাড়া করিয়া লয়। তখন জাপানীরা বিদেশী থিয়েটার দেখিবার সুযোগ পায়।"

গাইড্ একখানা ইংরাজী ভাষায় লিখিত "প্রোগ্রাম" লইয়া আসিলেন। ইহাতে নাটকের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া আছে। সুতরাং গল্প বুঝিয়া অভিনয় বুঝিবার সুযোগ ঘটিল। প্রথমে একটা তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ নাটক, পরে একটা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ নাটক অভিনীত হইল। বেশীক্ষণ আর বসিয়া থাকা গেল না। পরে আরও একটা ক্ষুদ্র নাটকের অভিনয় ছিল।

আজকার অভিনয়ে অল্পবিস্তর নাচ গানও ছিল। জাপানী গান আমরা সহজেই বুঝিতে পারি—কিন্তু নিতান্ত এক ঘেয়ে বোধ হইল। যেন প্রত্যেক লাইনই ঝিঁঝিঁটের সুরে বাঁধা। জাপানীরা অভিনয়ের সময়ে আমাদের পরিচিত "গুলিখোরী" ভাঙ্গা গলা ব্যবহার করে ভাবিতেছি। ইহা কতটা কৃত্রিম, কতটা স্বাভাবিক এবং কতটা জাপানীদের উপভোগ্য তাহা এত শীঘ্র বুঝিয়া উঠিবার যোগ্যতা হয় নাই। এইরূপ গলার আওয়াজ জাহাজে অনুষ্ঠিত অভিনয়েও লক্ষ্য করিয়াছি। ইহা আমাদের যাত্রাদলের টানা নাকী সুরের মত কি না কে বলিতে পারে?

প্রথম নাটকের নাম "বারাঙ্গনা ও সামুরাই"। মধ্যযুগের জাপানী সমাজ এই কাব্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। লেখকও আধুনিক নন; প্রায় ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে এই রচনা প্রথম প্রকাশিত হয়। তখনও নব্য জাপানের জন্ম হয় নাই। নাটকের তিন অঙ্কে যেন তিনটা স্বতন্ত্র গল্প পাইলাম—পরস্পর-সম্বন্ধ অতি সামান্য মাত্র। কোন চরিত্রের বিকাশ অথবা জটিল সমস্যার সমাধান কাব্যের ভিতর নাই। তবে জাপানের "ফিউড্যাল" যুগ বা নবাবী আমল সম্বন্ধে কয়েকটা স্পষ্ট চিত্র পাওয়া গেল। নটনটীদিগের সংখ্যাধিক্যে বেশ বৈচিত্র্য সৃষ্ট হইয়াছিল। ইংরাজেরা "কিস্‌মেত" দেখিয়া মুসলমান সমাজ যেরূপ বুঝে, আমি এই নাটকের গল্প পড়িয়া এবং অভিনয় দেখিয়া জাপানের শোগুণী আমল সেইরূপ বুঝিলাম। প্রথম অঙ্কে দেখা গেল জমিদার (ডাইমো) লাঠিয়ালে (সামুরাই) বেশ্যা লইয়া বিরোধ। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রধান বিষয় শোগুণীশাসনে রাস্তাঘাট, বিষয়সম্পত্তি রক্ষা, পান্থশালা ইত্যাদির ব্যবস্থা। তৃতীয় অঙ্কে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব, ভূতপ্রেতে বিশ্বাস ইত্যাদি বুঝিতে পারা যায়।

দ্বিতীয় নাটকের নাম "কোহারু এবং জিহেই।" ইহাও জাপানের শোগুণী আমলেরই চিত্র। নায়ক-নায়িকার প্রেম এবং তাহার পরিণাম ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। মোটের উপর ইহাকে জাপানী সাহিত্যের "রোমিও য়্যাণ্ড জুলিয়েত" বলা চলিতে পারে। গল্পাংশ লইয়া জাপানী ও ইংরাজী কাব্যে কোন তুলনাই হয় না। দুই প্রেমিকের অবৈধ প্রণয়, এবং অবশেষে উভয়ের আত্মহত্যা—এই দুই লক্ষণ সেক্‌স্‌পীয়ার ও জাপানী নাট্যকারের রচনায় দর্শকমাত্রই দেখিতে পাইবেন। ইংরাজী প্রোগ্রামে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে :—

কোহারু এবং জিহেই।

এক অঙ্কে সম্পূর্ণ "প্রেমে বিষাদ" বিষয়ক নাটক।

লেখক মঞ্জোমন।

কাল খ্রীঃ ১৭২০। স্থান-ওসাকা।

দৃশ্যঃ ওসাকার বেশ্যাপাড়ায় চা-গৃহ।

গল্প অতি সহজ ও সরল—ইহাতে নাটকোচিত উপকরণ কিছুই নাই। জিহেই একজন বিবাহিত যুবক। কোহারু একজন বেশ্যা—ওসাকা নগরের বেশ্যাপাড়ায় তাহার বাস। দুইজনে প্রণয় জন্মে কিন্তু বিবাহ অসম্ভব, কাজেই দুইজনে আত্মহত্যার পরামর্শ করে। এই আত্মহত্যার সংকল্প লইয়াই নাটক সুরু হইয়াছে। এদিকে জিহেইয়ের ভাই ও পত্নী তাহাকে এই প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গাইবার জন্য চেষ্টিত। কোন উপায় না পাইয়া জিহেইয়ের ভাই "সামুরাই"-বেশে কোহারুর গৃহে প্রবেশ করিল। কোহারুকে নিতান্ত বিষণ্ণ দেখিয়া বেশ্যা-পাড়ার মালিককে জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি?" বেশ্যাব্যবসায়ী বলিল—"কোহারুপাগল হইয়াছে—একটা যুবকের পাল্লায় পড়িয়া প্রাণ দিবার আয়োজন করিয়াছে।"

সামুরাই বিশেষ করিয়া কোহারুকে বুঝাইল। কোহারু শেষ পর্য্যন্ত জিহেইকে ভুলিয়া যাইতে রাজী হইল। ইতিমধ্যে কোহারু জিহেইয়ের পত্নীর নিকট হইতে একখানা চিঠি পাইয়াছে। পত্নীর কাকুতি মিনতিতে বেশ্যার হৃদয় গলিয়া রহিয়াছিল। কাজেই আত্মহত্যা না করাই তাহার ইচ্ছা হইল।

জিহেই বেশ্যালয়ের বাহির হইতে কাণ পাতিয়া সামুরাই ও কোহারুর কথোপকথন শুনিতেছিল। রাগে অন্ধ হইয়া সে কাগজের দেওয়ালের ভিতর দিয়া ছোরা চালাইল—কিন্তু কোহারু বাঁচিয়া গেল। সামুরাই আসিয়া জিহেইকে বাঁধিয়া ফেলিল। এতক্ষণে জিহেইয়ের এক প্রতিদ্বন্দ্বী কোহারুর গৃহ-সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। তাহার সঙ্গে জিহেইয়ের কিছু বচসা ও মারপিট হইবার উপক্রম। সামুরাই জিহেইকে প্রতিদ্বন্দ্বীর আঘাত হইতে রক্ষা করিল। অবশেষে সে নিজের মুখোস খুলিয়া দাঁড়াইল। ভাইকে দেখিয়া জিহেই কিছু অপ্রতিভ এবং শান্ত হইল। কিন্তু কোহারু যে তাহাকে এত শীঘ্র ভুলিয়া যাইতে স্বীকৃত হইয়াছিল সেই দুঃখে জিহেইয়ের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। অকস্মাৎ তাহার পত্নীর চিঠি জিহেই কোহারুর গৃহে দেখিতে পাইল। তাহার দুঃখ আর থাকিল না। কিছুকাল বেশ দিনগুলি কাটিল। কিন্তু ভালবাসার স্মৃতি জিহেই ও কোহারুর হৃদয় হইতে কোন মতেই উন্মূলিত হইল না। অবশেষে আত্মহত্যা ভিন্ন তাহাদের দুঃখ ঘুচিবার উপায় রহিল না। জাপানে আত্মহত্যা সুপ্রচলিত।

জাপানের শোগুণী আমল

১৬৭০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। সেণ্ডাই প্রদেশের ডাইমো এক বারাঙ্গনাকে মুক্তি প্রদান করিয়াছিল। বারাঙ্গনার নাম তাকাও। তাকাওকে বেশ্যা-ব্যবসায়ীর কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্ম ডাইমোকে তাকাওর সমান ওজনে স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিতে হইয়াছিল। তোকিওর বেশ্যা-পাড়ার নাম জাপানী ভাষায় যোশীবাড়া। ইহা অদ্যাপি বর্ত্তমান।

যোশীবাড়া সম্বন্ধে বীকার (Beeker) একখানা সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। নাম "The Nightless City". ভূমিকায় লেখক বলিতেছেন,—"I have compiled this book with the object of providing foreign students of Sociology, medical men and philanthropists, with some reliable *data* regarding the practical working of the system in the leading prostitute quarter of the Japanese Metropolis, and I leave my readers to form their own opinions as to the pros and cons of the success or otherwise achieved by the plan of strict segregation adopted in this country." অর্থাৎ "তোকিও সহরের একটা গোটা পাড়া বেশ্যাগণের জন্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। বেশ্যা-সমাজ সম্বন্ধে রাষ্ট্রের এই ব্যবস্থায় সুফল ফলিয়াছে কি কুফল ফলিয়াছে, সমাজ-তত্ত্ববিদগণ তাহার আলোচনা করিবেন। আমি কতকগুলি তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেছি মাত্র। চিকিৎসা-ব্যবসায়িগণ, মানবসেবকগণ এবং অন্যান্য বিদ্যার আলোচনা-

কারিগণ এই সমুদয় তথ্য হইতে নিজ নিজ মত গঠন করিতে সুযোগ পাইবেন।"

ইয়োরামেরিকার অনেক দেশে স্বতন্ত্র বেশ্যাপাড়া নাই—বেশ্যা বলিয়া সমাজের কোন শ্রেণীও দেখা যায় না। তাহা বলিয়া সেই সকল দেশকে বেশ্যাহীন বা পুণ্যাত্মাগণের দেশ বলা উচিত নয়। গ্রন্থকার বলিতেছেন :—

"To Japanese who may think that the Yoshiwara is a disgrace to Japan I would remark that this Empire has by no means a monopoly of vice ; and to foreigners who declaim against the 'immorality of Japanese' I would say frankly—Read the History of Prostitution by Dr. W. W. Sanger of New York, also the *Maiden Tribute of Modern Babylon* which appeared in the Pall Mall Gazette fourteen years ago. You cannot criticise this country too closely, for you certainly dare not lay the flattering unction to your souls that you, as a race, have any monopoly of vice." অর্থাৎ "যোশীবাড়ার নাম শুনিয়া পাশ্চাত্ত্যেরা আঁতকাইয়া যাইবেন না। ইহাকে জাপানী সমাজের কলঙ্ক বিবেচনা করিবার কারণ নাই। ইহা ইয়োরোপ এবং আমেরিকার নগরে নগরে নানা ভাবে রহিয়াছে। কেহ যেন জাপানী চরিত্রকে দুর্নীতি-পরায়ণ বিবেচনা না করেন। ইংরাজী "বেশ্যাবৃত্তির ইতিহাস" পাঠ করিলে পাশ্চত্ত্যেরা বুঝিবেন যে, পাপ বা দুর্নীতি জাপানী সমাজের একচেটিয়া নয়।"

"বারাঙ্গনা ও সামুরাই" নাটকের প্রোগ্রাম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

ঐতিহাসিক নাটক

তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ।

কাল ১৬৭৩। স্থান—য়েদো (তোকিওর পুরাতন নাম)
এবং শিমোৎসাকে প্রদেশ।

প্রথম অঙ্ক—প্রমোদতরণী—স্থমিদা বক্ষে।

দ্বিতীয় অঙ্ক—দাইমো দাতে মহাশয়ের মিছিল।

তৃতীয় অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য

তাকাওর পিতা চোস্থকের বাস-গৃহ (শিওবারা, শিমোৎসাকে)।

দ্বিতীয় দৃশ্য—হোকিনদী—চোস্থকের গৃহের সন্নিকটে।

তোকিও নগর স্থমিদা নদীর উপর অবস্থিত। "গাওয়া" নদীর জাপানী নাম। তোকুগাওয়া শোগুণদিগের আমলে তোকিওর নাম ছিল ইয়েডো। স্থমিদা "গাওয়া"র উপর একখানা সুবৃহৎ বিলাস-বজ্‌রা ধীরে ভাসিয়া যাইতেছে—এই দৃশ্য প্রথমেই দেখিলাম। বেশ্যালয় হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত তাকাও বজরায় দাঁড়াইয়া দূর হইতে আগত বংশীধ্বনি শুনিতেছে। দেখিতে দেখিতে একটা ছোট নৌকা বাহিয়া তাহার পূর্ব্ব-বন্ধু সামুরাই বজরার নিকট উপস্থিত হইল। পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠিল—তাকাও সামুরাইয়ের নৌকায় একখানা পত্র নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"যদি এই পত্রে লিখিত প্রস্তাবে তোমার সম্মতি থাকে, তাহা হইলে তোমার বাঁশী বাজাইয়া উত্তর দিবে।"

সামুরাই চলিয়া যাইতেছে এমন সময়ে সদলবল দাইমো বজরা হইতে তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল—"খবরদার, তুমি তাকাওয়ের নিকট আর আসিও না। এখন সে আর বাজারের বেশ্যা নয়।" সামুরাই বলিল—"তাকাওকে জিজ্ঞাসা করুন, মহাশয়। দেখিবেন, সে আপনার নয়—তাহার হৃদয়ে একমাত্র আমার আসন।" দাইমো

তেলে-বেগুণে জলিয়া উঠিল—সামুরাইয়ের উপর ছোরা চালাইল। সামুরাই ছোরা সাম্‌লাইয়া বিদ্রূপ-হাস্য হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। খানিক পরে তাহার বাঁশী হইতে করুণ ধ্বনি উড়িয়া আসিল। তাকাও বুঝিল, সামুরাই তাহার প্রস্তাবে সম্মত আছে।

তাকাও এক্ষণে দাইমোকে বলিল—"মহাশয়, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। আমাকে বিদায় দিন।" দাইমো বলিলেন—"তুমি কি ক্ষেপিয়াছ? এত অর্থব্যয়ে তোমাকে মুক্ত করিয়াছি কি বনে ছাড়িয়া দিবার জন্য?" তাকাও আত্মহত্যার সঙ্কল্প করিল। তাহার চেষ্টা ফলবতী হইল না। দাইমো নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তাকাওকে হত্যা করিল। মধ্যযুগের জমিদারগণের পক্ষে নরহত্যা করা অতি সাধারণ কথা।

দ্বিতীয় অঙ্কে দাইমো ইয়েডো হইতে স্বকীয় জমিদারীতে গমন করিতেছেন। পথের দৃশ্য দেখান হইয়াছে। সেই যুগে গমনাগমন বিশেষ নিরাপদ ছিল না। চোর ডাকাইতের উপদ্রব প্রায়ই দেখা যাইত। যে পথে দাইমো দলবলসহ যাত্রা করিয়াছেন সেই পথে সামুরাই ছদ্মবেশে বসিয়া আছে। তাহার প্রণয়িণীকে হত্যা করার প্রতিশোধ না লইয়া সে মরিবে না—ইহাই তাহার প্রতিজ্ঞা। সামুরাইয়ের হাতে একটা বন্দুক। তাহাকে পাকড়াও করিবার জন্য দাইমোর লোকজন চারিদিকে ছুটিল।

রাস্তায় এক দাগী ডাকাইত একজন বৃদ্ধের সঙ্গে বচসা করিতে করিতে উপস্থিত। বৃদ্ধের সঙ্গে দুই কন্যা। বৃদ্ধ বলিতেছে—"কাল রাত্রে আমি সরাইয়ে বাস করিবার সময়ে কিছু টাকা হারাইয়াছি। সে টাকা নিশ্চয়ই তুমি চুরি করিয়াছ।" ডাকাইত ধরা পড়িবার উপক্রম দেখিয়া টাকার থলেটা বৃদ্ধের অগোচরে একটা ঝোপের ভিতর ফেলিয়া দিল। বৃদ্ধের উপর ডাকাইত জুলুম করিতেছে, এমন সময়ে দাইমোর

একজন অনুচর থলেটা বৃদ্ধকে ফিরাইয়া দিল। সে ঝোপ হইতে এটা তুলিয়া আনিয়াছিল। বৃদ্ধ প্রস্থান করিল।

দাইমোর অনুচর দাগী ডাকাইতকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইল। ডাকাইতের ভ্রূক্ষেপ নাই—সে ইচ্ছা করিয়া অনুচরের ছোরার নিকট মাথা লইয়া গেল। তাহার সাহস দেখিয়া অনুচর প্রীত হইল এবং তাহাকে খুন না করিয়া কাজে নিযুক্ত করিল। অনুচরকে বলা হইল—"পুরোহিতবেশে একব্যক্তি ঐ সরাইয়ে বাস করিতেছে। তোমাকে ঐখানে থাকিয়া তাহার গাঁটরি অনুসন্ধান করিতে হইবে। তাহার ভিতর বোধ হয় একটা বন্দুক আছে। সেটা যদি আমাকে আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমার ইচ্ছা-স্বরূপ বকশিষ পাইবে।" এইরূপ কথাবার্ত্তার পর দুই জনে প্রস্থান করিল।

সামুরাই দেখিল, রাস্তায় এখন কেহ নাই। অদূরে দাইমোর লাঠিয়াল, বরকন্দাজ, কুলী, সহিস ও সেবকগণ আসিতেছে। কাহারও বাঁকে প্যাট্রা, কাহারও ঘাড়ে বর্শা—কেহ বা খাদ্যদ্রব্য বহন করিতেছে—কেহ বা অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে লইয়া যাইতেছে। স্বয়ং দাইমো পাল্কীর ভিতর বসিয়া আছেন। সামুরাই বন্দুকের গুলি দাইমোর দিকে চালাইল। হঠাৎ এই আক্রমণে জমিদারের লোকজন ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। পরে তাহারা সামুরাইকে আক্রমণ করিল। এই আক্রমণে জাপানী লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, জিউজিৎসু ইত্যাদি দেখিতে পাইলাম। সামুরাই তাহার ভক্ত সেবককে সঙ্গে আনিয়াছিল। দুই জনেই লাঠি ছোরায় ওস্তাদ—কাজেই দাইমোর বহুসংখ্যক অনুচরকে অতি সহজেই ধরাশায়ী করিল। রঙ্গমঞ্চের উপর বাহুযুদ্ধের এই দৃশ্য বেশ দেখাইল।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে তাকাওর পিতা তাহার পত্নীর সাম্বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতেছে। শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে কয়েকজন বন্ধু নিমন্ত্রিত। জাপানী পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থা দেখা গেল। বৃদ্ধের গৃহে অতিথিগণের

আহারাদি সমাপ্ত হইল। কথায় কথায় তাকাওয়ের কথা উঠিল। বৃদ্ধ বলিল—"আমার দারিদ্র্যবশতঃ তাকাওকে প্রতিপালন করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম। এই সময়ে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়। ভাবিয়াছিলাম, সে একজন ধনবান্ ব্যবসায়ী। এই ভাবিয়া তাহার নিকট তাকাওকে দত্তক প্রদান করি। পরে জানিতে পারি, এই ব্যক্তি এক নরাধম দাগী বদ্‌মায়েস। সে তাকাওকে স্বগৃহে প্রতিপালন না করিয়া যোশীবাড়ায় বেশ্যালয়ে রাখিয়াছে। কি করিব আমার দুরদৃষ্ট। আমার পাপেই আমি আমার সোনার কন্যাকে জাহান্নামে পাঠাইয়াছি। তাহার কষ্টের জন্য আমিই দায়ী। আমি জীবনে এত পশুহত্যা করিয়াছি যে, নরকেও আমার স্থান হইবে না। এই পাপেই আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এখন হইতে আমি বৌদ্ধধর্ম্মের সকল নিয়ম যথারীতি পালন করিব স্থির করিয়াছি। এই লও আমার বন্দুক—আর জীবহত্যা আমার দ্বারা হইবে না।" অতিথিগণ বিদায় হইল।

খানিক পরে সেই দাগীকে পাকড়াও করিয়া বৃদ্ধের বন্ধুগণ ফিরিয়া আসিল। বৃদ্ধ বলিল—"নরাধম, তুই আমার কন্যার সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্। মৃত্যুই তোর একমাত্র শাস্তি।" পরক্ষণেই বৃদ্ধ ভাবিল—"অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ। আমি খাঁটি বৌদ্ধ হইতে চলিয়াছি। সুতরাং নরহত্যার কারণ হইব কি করিয়া?" কাজেই বদমায়েসকে খুন করা হইল না।

সকলে চলিয়া গেলে বৃদ্ধ বৌদ্ধ মন্দিরে পত্নীর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিতে লাগিল। এই সময়ে তাহার কন্যা যেন তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। রক্তমাংসের তাকাও যেন তাহাকে বলিতেছে—"আমি যোশীবাড়া হইতে মুক্তি পাইয়াই তোমার নিকট ফিরিয়া আসিয়াছি।" মাতার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া তাকাও যেন শোকে অভিভূত হইল এবং মন্দিরে প্রার্থনা করিবার জন্য প্রবেশ করিল।

এই সময়ে পুরোহিতবেশধারী সামুরাই আসিয়া বৃদ্ধকে বলিল—"তোমার কন্যা আমার প্রণয়িনী ছিল। কিন্তু আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই। আমার প্রভু দাইমো তাহাকে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিয়াছে। সেই হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য, আমি এই ছদ্মবেশে ঘুরিতেছি।" বৃদ্ধ বলিল—"সে কিহে বাপু? তাকাও যে জীবিত—সে এই মাত্র আমার সঙ্গে দেখা করিয়া গেল। ঐ ঘরেই এখনও সে আছে।" বৃদ্ধ মন্দিরের দরজা খুলিয়া দেখে—তাকাও অন্তর্হিত হইয়াছে।

এইবার সামুরাই তাহার বাঁশী বাজাইতে লাগিল। ধ্বনি শুনিবামাত্র তাকাও আবার মূর্ত্তি গ্রহণ করিল। সামুরাইকে ধন্যবাদ দিল এবং জানাইল—"আমি এক্ষণে নরক-যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি।" এই বলিয়া তাকাও অগ্নিরূপে অদৃশ্য হইল। সামুরাই কিছুক্ষণ অচেতনভাবে পড়িয়া রহিল। বৃদ্ধ আসিয়া সামুরাইকে জাগাইল। এই সময়ে দাইমোর অনুচরেরা সামুরাইকে পাকড়াও করিতে বৃদ্ধের গৃহে আসিয়া উপস্থিত। উভয়ে সন্নিকটস্থ পর্ব্বতে পলায়ন করিল।

হোকি"গাওয়া"র ধারে দাইমোর লোকজন সমবেত। দাগী ডাকাইতটা বৃদ্ধকে ধরিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে—"সামুরাইয়ের সন্ধান বলিয়া দিতেই হইবে।" বৃদ্ধ কোন জবাব দিল না। দাগী তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত, এমন সময়ে সামুরাই আসিয়া নরাধমকে ভূমিসাৎ করিল। কিন্তু দাইমোর অনুচরবর্গ সামুরাইকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিল। দাইমো বলিলেন—"উহাকে মারিয়া ফেলিও না। যদি পুরোহিতভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে উহাকে মুক্তি দিব।" সামুরাই বলিল—"আমার পক্ষে সেরূপ জীবন দুর্ব্বহ।" এই বলিয়া সে হারাকিরি করিল।

য়ামাতোস্থানের স্বর্গ—হিন্দুস্থান

হোটেলের নিকটেই একটা আফিসে কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হইল। কার্য্যালয়ের নিম্নতলায় সাইনবোর্ডে লেখা আছে "দক্ষিণ-আমেরিকায় উপনিবেশ-স্থাপন-সমিতি"। ভাবিলাম, প্যানামা খাল কাটার সুফল ভোগ করিবার জন্য জাপানীদের এই প্রতিষ্ঠান। ইতিপূর্ব্বেই জাপানীরা দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ-স্থাপনে ব্রতী হইয়াছেন। এক্ষণে ইঁহাদের উদ্যম বাড়িয়া যাইবারই কথা। অনুসন্ধানে বুঝিলাম—"ব্রেজিলের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠভাবে পাতাইবার জন্য এই আয়োজন হইয়াছে।" পূর্ব্বে জাপান হইতে ব্রেজিল যাইতে হইলে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইত। প্যানামা খালের প্রভাবে প্রশান্ত মহাসাগরের দিক হইতে অতি সহজেই জাপানীরা আটলান্টিক কূলের দেশসমূহে পৌঁছিতে পারিবে। কাজেই জাপানের ব্যবসায়ীরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্রে জার্ম্মাণীর বহির্ব্বাণিজ্য এক প্রকার স্থগিত—ইংরাজও নূতন দিকে নজর দিতে অসমর্থ। এই সুযোগে জাপান চারিদিকে হাত পা বাড়াইয়া চলিয়াছেন। ইহারই নাম "একস্য সর্ব্বনাশঃ অন্যস্য তু পৌষ মাসঃ।" আসিয়া অবধি ভারতবর্ষের প্রতি জাপানের সস্নেহ ভাব বেশ লক্ষ্য করিতেছি, দুই বৎসর পূর্ব্বে এতটা ছিল না। ব্যবসায়ের স্বার্থে জাপানের কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সুলক্ষণ বটে।

এই কার্য্যালয়ে একজন পত্রিকাসম্পাদকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইল। ইনি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। দুই তিন খানা মাসিক পত্রের

পরিচালনা ইহাঁর হাতে রহিয়াছে। গত বৎসর একখানা কাগজ বাহির করিয়াছেন। তাহার নাম "বিংশ শতাব্দী"। জাপানী ভাষায় ইহার প্রবন্ধাবলী লিখিত হয়। বার্ষিক মূল্য ৪৷৷৹; গ্রাহক সংখ্যা ৭৫০০। সম্পাদক বলিলেন—"মাত্র এক বৎসর চলিতেছে—এইজন্য গ্রাহকসংখ্যা এত অল্প।" ইহাঁর নাম সাকুরাই—ইনি ইয়োরোপও দেখিয়াছেন।

সম্পাদক মহাশয় একজন ধর্ম্মপ্রচারকের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিলেন। দুইজনেই ইংরাজীতে কথা বলিতে পারেন। ধর্ম্মপ্রচারক মহাশয় বহুকাল তোকিওর কেও-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়াছেন। অধ্যাপকের নাম কিঞ্জা কিঞ্জে হিরাই। হিরাই দোতলার ঘরে ছিলেন। উপরে উঠিবার পূর্ব্বে বাহিরের ঘরে বুট খুলিয়া প্রবেশ করিতে হইল। জুতা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করা জাপানীদের দস্তুর। ভারতবর্ষ ছাড়িবার পর আর কখনও জুতা খুলিতে হয় নাই। জাপানীরা সাধারণতঃ কাঠের খড়ম অথবা খড়ো চটি ব্যবহার করে—চামড়ার জুতা জাপানের স্বদেশী জিনিষ নয়। ইয়োরামেরিকান প্রভাবে বিদেশীয় ছাতা, বিদেশীয় টুপি এবং বিদেশীয় জুতা ব্যবহৃত হইতেছে—এখনও জনসাধারণ এবং রাস্তায় ঘাটে যত লোক দেখি তাহার অধিকাংশই প্রাচীন রেওয়াজই চালাইতেছে।

আমরা ভারতবর্ষকে "আর্য্যভূমি" বলিয়া থাকি—ভারতবাসীকে আর্য্য-সন্তান বলিয়া জানি। ভারতীয় চরিত্র বর্ণনা করিতে হইলে অনেক সময়ে আর্য্য-বীর্য্য, আর্য্য-শক্তি, আর্য্য-ধর্ম্ম ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত শব্দ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করি। ইংরাজেরা সেইরূপ নিজেদের দেশকে "য়্যাল্‌বিয়ন" বলিয়া বর্ণনা করে। আইরিশ জাতি তাহাদের জন্মভূমিকে "এরিন্" নামে ডাকিয়া থাকে। জার্ম্মাণেরা তাহাদের "পিতৃভূমি"কে "ভয়শল্যাণ্ড" নামে প্রচারিত করে। সেইরূপ

জাপান সম্বন্ধে খাঁটি জাপানী নাম য়ামাতো (Yamato)। জাপানীরা তাহাদের সভ্যতার বিশেষত্ব সংক্ষেপে জানাইতে হইলে য়ামাতো দামাশী (Damashii) অর্থাৎ য়ামাতো শক্তি, য়ামাতো বীর্য্য, য়ামাতো ধর্ম্ম বা য়ামাতোর 'ধাত' ইত্যাদি শব্দের পারিভাষিক প্রতিশব্দ ব্যবহার করে। আমরা যেমন বলি—"যতক্ষণ আমার শরীরে আর্য্যশোণিত প্রবাহিত ততক্ষণ আমার দ্বারা……।" সেইরূপ জাপানীরা বলে—"আমাদের য়ামাতো-ধাতের সঙ্গে চীনা সভ্যতা, ভারতীয় সভ্যতা এবং আজকাল ইয়োরামেরিকার সভ্যতা মিলাইয়া লইয়াছি। য়ামাতো-রক্ত সর্ব্বদা নূতন নূতন শক্তির সংস্পর্শে আসিয়া পুষ্ট হইতেছে। এই জন্য জাপান চিরকাল উন্নতিশীল।" জাপানী ভাষায় ভারতীয় কথাটার পারিভাষিকও তৈয়ারি করিতে পারি। মন্দ শুনাইবে না। "আর্য্য শোণিত," "হিন্দুর ধাত," "হিন্দুত্ব," "ভারতের স্বধর্ম্ম" ইত্যাদির স্থানে "ইন্দোনো দামাশী" শব্দ ব্যবহার করা চলে।

অধ্যাপক হিরাই বলিলেন—"মহাশয়, কিছুকাল হইল আমি একখান সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান দেখিতেছিলাম। হঠাৎ যমকোটি শব্দ চোখে পড়িল। অভিধানে যেরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায়, লঙ্কা দ্বীপের যতটা পশ্চিমে ও উত্তরে জাপান অবস্থিত যমকোটি শব্দে হিন্দুরা সেই দেশ বুঝিত। জাপানী য়ামাতো যমকোটি শব্দের অপভ্রংশ কিনা কে বলিতে পারে ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভারতীয় ভাষা হইতে জাপানী শব্দের আমদানি হইয়াছে, এরূপ বুঝিবার কোন কারণ আছে কি ?" হিরাই উত্তর করিলেন—"কেবল ভাষা কেন, আমাদের জাতিও ভারতীয় জনগণেরই আত্মীয় এবং বংশসম্ভূত, আমি এইরূপই বিশ্বাস করি। এতদিন পণ্ডিতগণের ধারণা ছিল যে, জাপানীরা মঙ্গোলিয় বা

পীত জাতি। চীন ও কোরিয়ার জনগণকে এবং জাপানী নরনারীকে এক গোত্রভুক্ত করা ভাষাতত্ত্ববিৎ নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের প্রয়াস ছিল। জাপানের অধ্যাপক মহাশয়গণও জাপানী জাতিকে মঙ্গোলিয় বা পীত বলিয়া জানেন। আমি এই মতের সম্পূর্ণ বিরোধী।" আমি বলিলাম—"আজকাল কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলিতেছেন—জাপানীরা মঙ্গোলিয় জাতিসম্ভূত নয়। তাহারা এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী জনগণেরই আত্মীয়। চীনাদের সঙ্গে জাপানীদের রক্তগত অথবা ভাষাগত সম্বন্ধ কিছুই নাই। দুই সমাজকে এক পীতাঙ্গ জাতির দুই শাখা বিবেচনা করা চলে না।"

হিরাই বলিলেন—"আমিও চীনাদিগকে জাপানীর গোত্রভুক্ত করিতে পারি না; প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতীয় জনগণের সঙ্গেই আমাদের আত্মীয়তা ছিল, এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে আমরা কোরিয়া হইতে আমদানি করি। তাহার পর হইতে কোরিয়া ও চীনের পীতাঙ্গ জাতির সঙ্গে আমাদের লেনদেন বাড়িয়া যায়। কিন্তু খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে এই য়ামাতো দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল? এ কথা সকলেরই জানা আছে যে, জাপানের আদিম নিবাসিগণের নাম আইনো। তাহাদের বংশধরেরা এক্ষণে জাপানী দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্বোত্তর দ্বীপে বাস করিতেছে। এই আইনোদিগের জন্মস্থানে জাপানী ঔপনিবেশিকেরা বিদেশ হইতে আগমন করে। তাহার পর এই দেশের নাম হয় য়ামাতো। আর্য্যগণের আগমনের পর যেমন ভারতবর্ষের নাম আর্য্যস্থান, আর্য্যাবর্ত্ত বা আর্য্যভূমি, সেইরূপ বিদেশীয় আগমনের পর এই উদীয়মান সূর্য্যের দেশ য়ামাতোস্থান নামে পরিচিত হইল। কিন্তু এই বিদেশীয়েরা আসিল কোথা হইতে?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কি বলিতে চাহেন যে, ভারত-বর্ষ য়ামাতোস্থানবাসিদিগের পিতৃভূমি? আপনাদের দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে জাপানীরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন সংবাদ রাখিত কি? কোরিয়া এবং চীনের সাহায্য পাইবার পূর্ব্বে জাপানীরা হিন্দুস্থানের পরিচয় পাইয়াছিল তাহার প্রমাণ কৈ?" হিরাই বলিলেন—"প্রথমেই আমি ধর্ম্মের প্রমাণ দিব। জাপানীরা ষষ্ঠ শতাব্দীতে কোরিয়ার সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম্ম আমদানি করে। তাহার পূর্ব্বে জাপানী সমাজে কি ধর্ম্মভাব আদৌ ছিল না? নিতান্ত অসভ্য ও বর্ব্বর সমাজে অল্পকালের ভিতর বৌদ্ধধর্ম্ম, সাহিত্য ও শিল্প স্থায়ী হইয়া গেল কি করিয়া? আমি বলিব—বৌদ্ধ ধর্ম্মের সমান অথবা অনুকূল ধর্ম্ম য়ামাতোদেশে ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বেই বিরাজ করিতেছিল। য়ামাতো-ধাতে কোরিয়ার বৌদ্ধধর্ম্ম নূতন বোধ হয় নাই—বরং য়ামাতোবাসিগণ এই উদার ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য অর্দ্ধ প্রস্তুত হইয়াছিল। সেই অর্দ্ধ প্রস্তুত থাকিবার যুগ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আলোচনা এখনও বেশী হয় নাই। যখন হইবে তখন দেখা যাইবে যে, সেই যুগের য়ামাতোস্থানে এবং হিন্দুস্থানে অতিশয় গভীর ও নিকট সম্বন্ধ ছিল। সেই যুগের হিন্দু-জাপানী সংমিশ্রণে চীনের সাহায্য আবশ্যক হয় নাই।"

এই কথা বলিতে বলিতে হিরাই "আমানোপারা" শব্দের উল্লেখ করিলেন। এই শব্দ সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের জাপানী লোক-সাহিত্যে পাওয়া যায়। ইহার অর্থ স্বর্গভূমি।' য়ামাতোবাসিগণ তাহাদের পিতৃস্থান সম্বন্ধে এই আখ্যা প্রয়োগ করিত। য়ামাতোর প্রাচীনতম লোক-সাহিত্যে বহু ভারতীয় কাহিনীর উল্লেখ পাই। প্রাচীন জাপান এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের সাহিত্য তুলনা করা এই জন্য বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু এইদিকে কোন পণ্ডিতেরই দৃষ্টি পড়ে নাই। সকলেই চীন-জাপানের

আদান-প্রদান বুঝিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন। কিন্তু চীনাযুগের পূর্ব্বে য়ামাতোস্থানের একটা ভারতীয় যুগ আছে, এ কথা কাহারও মনে আসে নাই। হিরাইয়ের নিকট এই তথ্য প্রথম জানা গেল। ভারতীয় পণ্ডিতগণের কেহ কেহ এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোরিয়া হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম ও শিল্প আমদানির পূর্ব্বে আমাতোবাসিগণ অনেকটা বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিল—আপনার এই মত সমর্থন করা সম্ভব কি?" হিরাই বলিলেন—"উপনিষদের গূঢ় অধ্যাত্মবাদ এবং সূক্ষ্ম সাধনতত্ত্ব য়ামাতোস্থানে পূর্ব্ব হইতেই ছিল। এইরূপ ছিল বলিয়াই জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম সহজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছে। এনিনোকিনি নামক একব্যক্তি ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে আমাদের সমাজে অর্দ্ধবৌদ্ধ অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রচার করিয়া যান। এইরূপ অধ্যাত্মবাদিগণের সংখ্যা একাধিক।"

ভাষার প্রমাণ সম্বন্ধে হিরাই বলিলেন—"এ বিষয়ে আমি যথেষ্ট কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি। জাপানী ভাষা গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত এবং পার্শী ভাষাসমূহের ন্যায় আর্য্যভাষা। ইহা কোন মতেই মঙ্গোলিয় শ্রেণীর অন্তর্গত নয়। বাক্যে পদ সন্নিবেশের রীতি, বিভক্তি, ব্যাকরণ, শব্দসম্পদ ইত্যাদি সকল বিষয়েই জাপানীরা আর্য্যভাষাভাষী। আমরা চীনালিপি আমদানি করিয়াছি বলিয়া আমাদিগকে চীনাভাষাভাষিগণের পর্য্যায়ভুক্ত করা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক ও ভ্রান্তিমূলক। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ যে সকল প্রমাণের সাহায্যে ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় ভাষাসমূহের মধ্যে পারিবারিক ঐক্য স্থাপন করিয়াছেন, আমি সেই সকল প্রমাণের সাহায্যেই জাপানী ভাষাকে আর্য্য বা ইণ্ডু-ইয়োরোপীয়ান পর্য্যায়ভুক্ত করিতে পারি। আমি বহুসংখ্যক জাপানী শব্দ সংগ্রহ করিয়াছি। এই

গুলির সঙ্গে "ইণ্ডু আরিয়ান" বা "ইণ্ডু ইয়োরোপীয়ান" বা "আর্য্য" ভাষার শব্দের তুলনা-সাধনও করিয়াছি। এই সকলগুলির উৎপত্তি যে এক এই বিষয়েও আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে। কিন্তু ভাষাতত্ত্ববিদগণ এত শীঘ্র তাঁহাদের সংস্কার বর্জ্জন করিয়া আমার নূতন মত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবেন না। বলা বাহুল্য, জাপানী ভাষাবিজ্ঞানবিদ্‌গণ সকল বিষয়েই এখনও ইয়োরামেরিকানদিগের অনুচর মাত্র। তাঁহারা আমার এই স্বাধীন মত নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিতেও প্রস্তুত নন!"

হিরাই এই সকল বিষয় লইয়া একখানা জাপানী গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এক্ষণে বিশদভাবে ইংরাজিতে এই কথাগুলি লেখা হইতেছে। ইণ্ডুজাপানী-পরিষৎ-পত্রিকায় গ্রন্থের কিয়দংশ বাহির হইয়াছে। নাম A Vocabulary of the Japanese and Aryan languages hypothetically compared.

বাঙ্গালা, আসামী, পারশী ও নেপালী এবং সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ জাপানী ব্যাকরণের সঙ্গে তুলনা করা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত শব্দের তুলনাও সাধিত হইতেছে। কয়েকটা শব্দ-তুলনার নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

অকির Akir—clear luminous, distinct, obvious.

Greek, aigle (glitter, splendour, lustre brightness), hence glad, aglaos, hence English glow, Latin acclaro (to make clear, to reveal); hence Eng. clear. Sanskrit and Hindusthani agurh বা অ ঢ় (evident, easy of comprehension).

অমে Ame—heaven, sky. Sanskrit অমর Amar (immortal), amit (undying). Persian and Hindusthani Asman (আস্মান) (sky, heaven). Pali Amata (immortal).

অক Aka—water, Sanskrit, ap অপ, Persian ab (water), Gothic ahwa (river), Old High German aha, Anglo-Saxon Ea, Lat. aqua (water).

হারুক Haruka—far, distant, remote. Sanskrit Para (পার) (far, distant), Zend para, Greek pera, Lat. peren-die, Gothic fairra, German feru, English far.

হিকো Hiko—an echo. GK. eko, Lat. and English echo.

মুষি Musi—Insects, worms, bugs, Eng. moth, Dutch mot, German motte.

মুগি Mugi—Barley, wheat, Swedesh muga (heap, esp. of hay).

কামি Kami—hair of the head, Sanskrit ka (ক) (head), GK. Kome (hair) coma (foliage), Kometes (comet) English comet (lit. long haired)

কতিপয় শব্দের উচ্চারণ-গত সাদৃশ্য দেখাইতে পারিলেই বিভিন্ন ভাষার ঐক্য স্থাপিত হয় না। ব্যাকরণের ঐক্য প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক। হিরাইয়ের গবেষণা এখনও বহুকাল পর্য্যন্ত ফিললজিষ্টগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে কিনা সন্দেহ। হিরাই লিখিয়া যাইতেছেন। অনেকদিক হইতেই জাপানীরা অল্পকাল ভারত ঘেঁশা, ভারতবাসীরাও কিছু জাপান ঘেঁশা হউক।

প্রেসিডেণ্ট নারুসে ও মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়

সকালেই সূর্য্যের কিরণ এত প্রখর যে বাহিরে আসা এক প্রকার অসম্ভব। ঘরের ভিতর বসিয়া থাকিলেও অবিরাম ঘর্ম্মাক্ত হইতে হয়। বাঙ্গালাদেশে বর্ষাকালে হঠাৎ বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেলে যেমন গরম পড়ে, তোকিওতে সেইরূপ গুমোট গরম পাইতেছি। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, গরম দেশের লোকেরাও প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তিতে পরিণত হইতে পারে। একমাত্র শীতপ্রধান দেশের লোকেরাই স্বরাজ ডিমক্রেসী বিজ্ঞান ইত্যাদির অধিকারী—আষাঢ় মাসে জাপানে আসিলে সে ধারণা থাকে না।

রিক্‌শতে বাহির হইলাম। রেলওয়ে ষ্টেসনে ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম লওয়া গেল। প্রায় ঘণ্টাখানেক তড়িতের গাড়িতে চলিলাম। তোকিও নগর যেন প্রদক্ষিণ করিতেছি। ষ্টেসন ছাড়িবামাত্র সহরের ফ্যাক্টরী পাড়া সুরু হইল। ধূমনির্গমের চিম্‌নী কার্য্যালয় ইত্যাদির সমাবেশে এই স্থানটা নব্য-জাপানের পরিচয় দিতেছে। লম্বা লম্বা মালগুদাম এবং কারখানাগৃহ চোখে পড়িল। কিন্তু ইংলণ্ড অথবা ইয়াঙ্কিস্থানের বিরাট আয়োজন এখানে নাই বোধ হইতেছে। কৃষ্ণবর্ণ টিন এবং খোলার চালাই প্রত্যেক গৃহে দেখিতে পাইতেছি ফ্যাক্টরীপাড়ার গৃহসমূহও অন্যান্য পাড়ার মত ক্ষুদ্র এবং অনুন্নত। দড়ির উপর গৃহস্থগণ লেপ পোষাক বিছানা রৌদ্রে শুকাইতেছে। বঙ্গীয় পল্লীর ভিতর দিয়া যেন চলিতেছি। বহুদিন পর কাকের ডাক শুনিলাম। এই রেলপথ সমস্তটাই তোকিও মহানগরীর বহিঃসীমা।

মেজিরো-পল্লীতে উপস্থিত হইলাম। ইহা মহানগরীর একটা পাড়া। এই পল্লীর পর তোকিও নগরের অন্তর্গত জনপদ নাই। মেজিরো হইতে মফঃস্বলের আরম্ভ। গাছপালা-বাগান-পরিপূর্ণ পাড়াগাঁয়ের বাজার দোকান অতিক্রম করিয়া "জোশী দাই গাকু" বা "রমণী-মহা-বিদ্যালয়ের" ভিতর প্রবেশ করিলাম। জাপানী ভাষায় "দাই" শব্দের অর্থ "মহা" এবং "গাকু" শব্দের অর্থ বিদ্যালয়; সুতরাং দাইগাকু শব্দের অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়। চেরিরসম-তরুর কুঞ্জবনে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অবস্থিত।

অতিথি-গৃহে উপবেশন করিলাম। প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা এবং সভাপতি শ্রীযুক্ত জিঞ্জ্য নারুসের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। দুইজন বালিকা আসিয়া চা, ফল ইত্যাদি দিয়া গেল। ইহাদিগকে দেখিয়া দাসী বোধ হইল না। জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয়, এই বালিকাদ্বয় কে?" নারুসে বলিলেন—"ইহারা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে "এটিকেট" বা সৌজন্য শিষ্টাচার শিখাইবার আয়োজন আছে। আমাদের এখানে কোন অতিথি আসিলে এটিকেট ক্লাসের ছাত্রেরা তাঁহাদিগকে সেবা করে। অতিথি-গৃহ এই উপায়ে আমাদের একটা ল্যাবরেটরীস্বরূপ।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই যে গৃহে বসিয়া আছি ইহা কি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রিসেপ্‌সন-রুম?" নারুসে বলিলেন—"দুঃখের কথা, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোন নিজ গৃহে অতিথি-অভ্যর্থনা করিবার ব্যবস্থা নাই। আমাদের যথেষ্ট স্থানাভাব। কিন্তু এই বিদ্যালয় হইতে যে সকল ছাত্রী বাহির হইয়া গিয়াছে তাহারা একটা পরিষৎ স্থাপন করিয়াছে। তাহার নাম য্যালুম্নাই পরিষৎ। সেই পরিষৎ এক্ষণে বিদ্যালয়ের হিতকর নানা অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করিয়াছে। এই গৃহ তাহাদেরই অতিথিশালা।"

এই পরিষদের নাম চেরি-মেপল্-সমিতি। চেরিব্লসমের ফুল এবং মেপল্ গাছের পাতার সৌন্দর্য্যকে জীবনের সৌন্দর্য্যের আদর্শ করা এই সমিতির উদ্দেশ্য। ইতিমধ্যে ইহারা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৭৫০০৲ টাকার পুস্তক উপহার দিয়াছে। ইহাদের অধীনে ব্যাঙ্ক, মুদীখানা, মনোহারির দোকান, ফলফুলের এবং শাকশব্জীর বাগান, গোশালা, নৈশবিদ্যালয় এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা পরিচালিত হইতেছে।

এই নারী-বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে ইম্পিরিয়্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক শিক্ষা সমাপ্ত হয় মাত্র। জাপানে নারীজাতির জন্য উচ্চতম শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। নারুসে এই প্রতিষ্ঠান স্বচেষ্টায় স্থাপন করিয়াছেন। এখানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ত আছেই—সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থাও আছে। অঙ্কন, গণিত, রসায়ন, শরীর-বিজ্ঞান, রন্ধন, শেলাই, নাচগান, বাজনা, চিত্রকলা ইত্যাদি কোন বিষয়ই বাদ দেওয়া হয় নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা গৃহ দেখিলাম। নিম্নতম বিভাগে বালক ও বালিকারা এক সঙ্গে বসে। উচ্চতর বিভাগে বালক ভর্ত্তি করা হয় না। কোন গৃহে ৩০এর বেশী ছাত্র নাই। প্রত্যেক গৃহেই প্রাচীরগুলি নানাবর্ণের চিত্রে সুশোভিত। দেওয়ালের গায়ে কাল বোর্ড লাগান আছে। তাহার উপর পেন্সিল দিয়া চিত্র অঙ্কন করা হইয়াছে। ব্যায়াম, কুস্তী, জিউজিৎসু, লাঠিখেলা ইত্যাদির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। জাকজমকশালী পাকা বাঁড়ী অথবা সাজসরঞ্জামের বাহুল্য দেখিলাম না। কাঠের ঘর, কাগজের প্রাচীর ইত্যাদিই বেশী। অথচ ল্যাবরেটরী, সংগ্রহালয় ইত্যাদি সবই আছে। অল্প ব্যয়ে বেশী কাজ করিতে জাপানীদের মত পটু জাতি বোধ হয় আর কোথাও নাই। ভারতবাসীর এই গুণ লাভ করা নিতান্ত আবশ্যক। শিক্ষার ব্যবস্থায়

বাহিরের পারিপাট্য কত গৌণ তাহা জাপানে আসিলে ভারতবাসী মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

নারুসের একজন সহকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগ দেখাইলেন। বিদ্যালয়ের ডর্ম্মিটরীতে বা ছাত্রাবাসে আজকাল প্রায় ৮০০ ছাত্রী বাস করে। ডর্ম্মিটরী সম্বন্ধে সহকারী মহাশয় বলিলেন, "ছাত্রীরা নিজ পরিবারে যেভাবে বাস করে, যথাসম্ভব সেই ভাব রক্ষা করা আমাদের উদ্দেশ্য। চাল যাহাতে না বাড়িয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা আমরা করিতে বিশেষ চেষ্টিত। রান্না করা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বিছানা পরিষ্কার করা ইত্যাদি সকল কাজই ইহারা স্বহস্তে করে। প্রত্যেক ডর্ম্মিটরীতে ৩০ জনের স্থান আছে। ভিন্ন ভিন্ন বয়সের বালিকা প্রত্যেক আবাসে রাখা হয়। একজন করিয়া প্রবীণা রমণী প্রত্যেকের অভিভাবক। পারিবারিক আদর্শের জীবনযাপন আমরা রক্ষা করিয়া চলিতেছি। সুতরাং ছাত্রীরা লেখাপড়া শিখিয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া পড়ে না।" কোন গৃহে ৩ জন, কোন গৃহে ৪ জন, কোন গৃহে ৭ জন পর্য্যন্ত ছাত্রীর শয়নস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাহির হইতে দেখিলাম ঘরের ভিতর টেবিল চেয়ার ইত্যাদির আয়োজন নাই। মাদুর পাতা রহিয়াছে। তাহার উপর ক্ষুদ্র শতরঞ্চি-সদৃশ আসন।

মাত্র ১৫ বৎসর হইল এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তখন প্রেসিডেন্ট নারুসের হাতে চাঁদা আদায়ের ফলে মাত্র ৫০০,০০০৲ টাকা ছিল। মিকাডোপত্নী সম্রাজ্ঞী দান করেন ৩০০০৲। পরে কয়েক জন ধনী ব্যবসায়ী ৩০,০০০ করিয়া প্রদান করেন। এক ব্যক্তি এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। শুনিলাম, জাপানে লক্ষাধিক টাকা দান ইতিপূর্ব্বে কোন এক ব্যক্তির দ্বারা হয় নাই। জাপানের মাপকাঠিতে ভারতবর্ষের লোকেরা দানবীর বিবেচিত হইবেন দেখিতেছি।

স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে নারুসের মত তাঁহার বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত করিলাম :—

"The principles we wish to put into practice in the education of women are three :—(1) To educate women as human beings, (2) To educate women as women, (3) To educate women as members of the community. On matured reflection we have been led to the conclusion that most of the women's education now prevailng in this country is being conducted on the assumption that a woman is some sort of machine or implement, so that what is imparted to her is the so-called useful knowledge, useful in everyday life, some craft which can be put to immediate practical use, and those who engage in this kind of education fail, as it seems to us, to regard on woman as a personality, a human being. We, on the other hand, believe that the aim of a common general education, as well as of a University education for women, is to educate them as personalities, as human beings. What do we mean by saying that women must be educated in the first place as personalities, as human beings ? We mean simply that education must aim at the all-round development of women, both in mind and body ; it must try to make them fully developed personalities,

so that in whatever station they may be placed, they will be able to do their duty well.

But this is not the sole aim of women's education. We cannot ignore the fact that woman is woman ; her physiology and the structure of the society of which she is a member, require of her duties which are peculiar to her, in the performance of which her mission in life consists. In other words, her great function is to become a good wife and a wise mother. * * *

But this does not yet exhaust the aim of women's education. A woman is a member of the Civic Community, of the body politic. She must be so educated that she shall always remember that her ife is related in an important manner to the nation, that the prosperity or decay of the nation of which she is a part, rests in a material degree on her."

নারুসের এই বাণী যে কোন দেশেই নারী-শিক্ষানুশাসনের প্রথম সূত্ররূপে গ্রহণ করা চলিতে পারে। নারুসে তাঁহার "জোশী দাই গাকু"তে এই তিনটি উদ্দেশ্য সর্ব্বদাই কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টিত :—

(১) রমণীরা মানুষ—তাহারা জানোয়ার বা যন্ত্রমাত্র নয়। সুতরাং সকল উপায়ে তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।

(২) রমণীরা রমণী—তাহারা পুরুষ নয়। তাহাদিগকে পত্নী ও জননী হইতে হইবে। তাহার জন্য বিশেষ কতকগুলি গুণ অর্জ্জন করা আবশ্যক।

(৩) রমণীরা দেশের লোক-সমাজের অর্দ্ধ অঙ্গ। সুতরাং তাহাদিগকে পাকা স্বদেশ-সেবক এবং সমাজের বলিষ্ঠ অঙ্গে পরিণত করিতে হইবে। রাষ্ট্রসেবা-বিষয়ে পুরুষের এবং রমণীর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য একপ্রকার।

এশিয়ায় বিদেশীয় কুঠিয়ালের উপদ্রব

হোটেল যে পাড়ায় অবস্থিত তাহার নাম ছুকিজি। এই স্থানে পূর্ব্বে সমুদ্র ছিল—সমুদ্র এখন সরিয়া গিয়াছে। এইরূপে সমুদ্র হইতে প্রাপ্ত ভূমিখণ্ডকে জাপানী-ভাষায় ছুকিজি বলে। কাজেই এই পাড়া সমুদ্রের সন্নিকটে। কয়েক মিনিট হাঁটিলেই সমুদ্রকূলে উপস্থিত হওয়া যায়। স্থমিদা নদীর মোহানাও এইখানেই।

তোকিও উপসাগর, স্থমিদা নদী, বন্দর এবং ক্ষুদ্র দ্বীপ এই সকলের সমবায়ে নৌকা জাহাজের চলাচল বেশ ক্ষিপ্র। দেখিবামাত্র ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্র বলিয়া অনুমান করা যায়। বড় বড় জাহাজ এই ঘাটে আসিতে পারে না। কলিকাতার গঙ্গায় জাহাজের অরণ্য দেখিতে পাই—এখানে সে দৃশ্য নাই। বরং গোয়ালন্দ দামুকদিয়ার কথা মনে আসে।

গাইড্ সমুদ্রের ধারে কয়েকটা গৃহ দেখাইয়া বলিলেন—"এই অট্টালিকাগুলি যে ভূমির উপর দণ্ডায়মান, ৪০ বৎসর পূর্ব্বে সেই ভূমি জাপানরাষ্ট্রের পুরাপুরি অধীন ছিল না। এই ভূমিকে "কন্‌সেশন" বলা হইত। ইয়োরামেরিকার রাষ্ট্রপুঞ্জ জাপান-দরবার হইতে এই সকল জমি দানস্বরূপ অধিকার করিত। এই সকল অঞ্চলে জাপানী-দরবারের কোন প্রভুত্ব খাটিত না।

ইংরাজ, ফরাসী ইত্যাদি রাষ্ট্রসমূহ এখনও চীনে এইরূপ কন্‌সেশন বা অধিকার ভোগ করিতেছে। আজকাল মিশরে ইংরাজের একাধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু ১৫।২০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেখানে ইয়োরোপীয়

রাষ্ট্রসমূহের এইরূপ কন্‌সেশন ছিল। ভারতবর্ষেও মোগল-মারাঠা-নবাবী-আমলে ইয়োরোপীয় বণিকগণ সরকার হইতে কুঠী স্থাপনের জন্য জমি পাইত। সেই সকল ভূমিখণ্ডে দেশীয় দরবারের কোন ক্ষমতাই থাকিত না, বিদেশীয় বণিকগণই সর্ব্বেসর্ব্বা হইত। ষোড়শ শতাব্দীর পর হইতে এশিয়ার সকল দেশেই এইরূপ ইয়োরোপীয় বণিক-রাষ্ট্র স্থাপিত হইয়াছে। জাপান এই বিদেশীয় আওতার বহির্ভূত ছিল না। তবে জাপান সৌভাগ্যক্রমে ইহা কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছে—অন্য কোন দেশ পারে নাই, চীন পারিবে কিনা সন্দেহ।

আর একটা পারিভাষিক শব্দ এই সকল কন্‌সেশন বা বণিকরাষ্ট্রের আমলে অত্যধিক ব্যবহৃত হয়। জাপানেও উহা যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার নাম "একস্‌ট্রা টেরিটরিয়্যালিটি"। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী, ইংরাজ, আমেরিকান বা ওলন্দাজ যে কোন বিদেশীয় লোক জাপানে বাস করিত, তাহারা জাপান-সরকারের আইন মানিতে বাধ্য হইত না। তাহারা জাপানে থাকিয়াও জাপানের বাহিরেই যেন ছিল—তাহারা সকল বিষয়ে নিজ নিজ দেশীয় রাষ্ট্রের আইন মানিতে পারিত। জাপানের বিচারকগণ ইংরাজকে, ফরাসীকে, আমেরিকানকে নিজ কাছারীতে হাজির করাইতে পারিতেন না। জাপান একটা স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল বটে কিন্তু তাহার স্বাধীনতাকে কোন বিদেশীয় রাষ্ট্রই সম্মান করিত না। আজকাল চীনে এই অবস্থা চলিতেছে। ইংরাজ কিম্বা ফরাসী যে কোন লোক চীন সাম্রাজ্যের যে কোন অংশে একস্‌ট্রা টেরিটরিয়্যালিটির সকল অধিকার ভোগ করে। ইংরাজেরা চীনে থাকিয়াও যেন ইংলণ্ডেই বাস করিতেছে। চীনের আইন-কানুনে তাহাদের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। কার্য্যতঃ চীনের স্বাধীনতা নাই বলিলেই চলে। জাপানে এই কন্‌সেশন এবং একস্‌ট্রা-টেরিটারিয়ালিটির

উপদ্রব ৮।১০ বৎসর মাত্র হইল দূরীভূত হইয়াছে। ইহা দূর করিতে জাপানের যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

মারুজেন কোম্পানীর দোকানে পাশ্চাত্য সাহিত্য, কলা ও দর্শনসম্বন্ধে প্রায় সকল গ্রন্থই দেখিলাম। সমালোচনা, সাহিত্যের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থের সংগ্রহও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। খানিকটা বিস্মিত হইয়া ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয়, এই সকল পুস্তকের কাটৃতি জাপানী-সমাজে আছে কি? এইগুলি কতদিন পরে বিক্রয় হইবে, আশা করিতেছেন?" ম্যানেজার বলিলেন—"যে বইএর কাটৃতি কম, আমরা দোকানে সে বই রাখি না। যে সকল পুস্তক এখানে দেখিতেছেন এগুলির কোনটাই বেশী দিন পড়িয়া থাকিবে না। অনেকগুলির অর্ডার পূর্ব্ব হই-তেই পাইয়াছি। জাপানে ইংরাজী জানা লোকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। আমাদের কবি, নাট্যকার, চিত্রকর, ঔপন্যাসিক ইত্যাদি-গণ ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, রুশিয়া, স্পেন, ইতালী, আমেরিকা, ব্রেজিল, আর্জেন্টিণ ইত্যাদি দেশের সাহিত্য ও সুকুমার শিল্প বুঝিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত। আপনাদের ঠাকুরের গ্রন্থাবলীও জাপানে খুব বেশী বিক্রী হয়। যখনই ইয়োরোপ হইতে ঠাকুরের গ্রন্থাবলীর চালান আসিয়া পৌঁছে তাহার এক সপ্তাহের ভিতরেই সকলগুলি নিঃশেষ হইয়া যায়। তিনি জাপানে কয়েক মাসের ভিতরেই উপস্থিত হইবেন শুনিয়া জাপানীরা তাঁহার পুস্তক-সমূহ আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেছে।" মাত্র দু-এক মাস হইল ডাক্তার কুমার স্বামী এবং অরুণ সেন প্রণীত বিদ্যাপতির অনুবাদ বিলাতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই তোকিওতে সেই পুস্তক বিক্রী হইতেছে। জাপান সত্যসত্যই "আপ্-টু-ডেট্"—জাপানীরা বর্ত্তমান জগতে বাস করিতেছে। এই হিসাবে আমরা সাহিত্য ও কলার সংসারে অন্ততঃ ৫০ বৎসর পশ্চাদ্গামী—বিজ্ঞান ও শিল্পসম্বন্ধে আমরা এখনও মধ্যযুগেই আছি বলিতে পারি।

জাপানীরা সরকারী কাজে পাশ্চাত্য পোষাক ব্যবহার করে; কিন্তু এই পোষাক-ব্যবহারকারী লোকজনের সংখ্যা এত কম যে, রাস্তায় বা ট্রামে প্রায়ই চোখে পড়ে না। বিশেষতঃ, বিদেশীয় পোষাকে কোন রমণীকে এখন পর্য্যন্ত জাপানে দেখি নাই। অধিকন্তু যাঁহারা আফিসী কাজের খাতিরে হ্যাট-কোট-বুট পরেন, তাঁহারা ঘরে আসিলেই কিওমনো-ধারী হন। জাপানীদের স্বদেশী প্রাচীন পোষাকে কোন শিরস্ত্রাণ নাই। ইহারা নগ্ন মস্তকেই চলা-ফেরা করিত। আজকালও দেখিতেছি, সাধারণ জাপানীদের মাথায় কোন আবরণ নাই। জাপানীরা এসিয়ার বাঙ্গালী। তবে খড়ের চটি পায়ে দিয়া এবং কিওমনো পরিধান করিয়া অনেকেই পাশ্চাত্য টুপি ব্যবহার করিতেছে। শিরস্ত্রাণের চলন দেশে নিতান্ত নূতন। কিওমনো পোষাকে জাপানীগণকে অতি সুন্দর দেখায়।

হোটেলে একজন এঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি নাগাসাকি বন্দরের প্রসিদ্ধ জাহাজ-কারখানায় কর্ম্ম করেন। এই কারখানা প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বে জাপানে আর একটা মাত্র জাহাজ প্রস্তুত করিবার জন্য ডক্ইয়ার্ড ছিল। এঞ্জিনীয়ার মহাশয় ইয়োরোপের নানা দেশ দেখিয়া আসিয়াছেন। ইহাঁর শিক্ষালাভ টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে হইয়াছিল। এক্ষণে জাপানী-ভাষায় নেভ্যাল আর্কিটেক্চার, জাহাজনির্ম্মান এবং জাহাজ-চালনা ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থ পাওয়া যায়। কিন্তু ৮।১০ বৎসর পূর্ব্বে জাপানীরা ফরাসী কিম্বা ইংরাজী পুস্তকসমূহ ব্যবহার করিত।

রাত্রি এখন দেড়টা। হঠাৎ টেবিল চেয়ার মেজ ইত্যাদি কাঁপিয়া উঠিল। জাপানে ভূমিকম্প প্রায়ই হয়।

জাপানী খৃষ্টানদিগের মহিলা-সংস্কার-পরিষৎ

দুই জন জাপানী মহিলার সঙ্গে কথোপকথন হইল। দুই জনই খৃষ্টান। একজন ইংরাজী জানেন। ইনি বলিলেন—"আমরা খৃষ্টান বটে—কিন্তু কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন আমরা কোন্ মত মানিয়া চলি, তাহা হইলে উত্তর দেওয়া কঠিন হইবে। বর্ত্তমান যুগে কোন দেশেই শিক্ষিত নরনারীগণ কোন ধর্ম্ম-গ্রন্থের প্রভূত্ব স্বীকার করেন না। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ ধর্ম্মজ্ঞান অনুসারে কার্য্য করেন। এই হিসাবে দুনিয়ার উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই ধর্ম্ম এক। ইঁহারা নামে খৃষ্টান অথবা বৌদ্ধ অথবা মুসলমান অথবা হিন্দু। কার্য্যতঃ প্রত্যেকেই যুক্তিবাদী ও ব্যক্তিত্ববাদী।"

ইনি প্রায় বার বৎসর আমেরিকায় কাটাইয়াছেন। ইঁহার স্বামী সে দেশে ব্যবসায় উপলক্ষ্যে গমন করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর এই রমণী জাপানে ফিরিয়া আসিয়াছেন—এক্ষণে "মহিলা-সংস্কার-সমিতি"র নানা কার্য্যে সাহায্য করিতেছেন। মহিলা-সমাজে সকল প্রকার সংযম-প্রবর্ত্তন ইঁহাদের উদ্দেশ্য।

অপর রমণী বৃদ্ধা—নাম ইয়াজিমা। ইনি এই সমিতির প্রবর্ত্তক এবং বর্ত্তমান কর্ণধার—প্রায় ত্রিশ বৎসর হইতে জাপানী-মহিলা-সমাজে এই সমিতির কার্য্য করিতেছেন। এই সংস্কার-কার্য্যে ইয়াজিমা তাঁহার ধনসম্পত্তি উৎসর্গ করিয়াছেন।

অন্যান্য দেশে টেম্পারান্স ইউনিয়নের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে, মাদকতা নিবারণ। ভাবিয়াছিলাম, জাপানের এই সমিতিও বোধ হয় মদ্যপান-নিবারিণী-পরিষৎ এবং ধূমপান-নিবারিণী-পরিষৎ। আলোচনায় বুঝিলাম, ইহাকে বেশ্যা-নিবারিণী-পরিষৎ বিবেচনা করাই উচিত।

বেশ্যা শব্দ ইয়োরামেরিকায় বেশী ব্যবহৃত হয় না। বেশ্যা-সমাজ বলিয়া একটা স্বতন্ত্র নারী-সম্প্রদায় কোন কোন খৃষ্টান দেশে নাই। অবশ্য সে সকল দেশেও কার্য্যতঃ বেশ্যাবৃত্তি চালাইবার নানাপ্রকার কৌশল আছে। তাহা ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, আমেরিকান, ব্রেজিলিয়ান ইত্যাদি সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু ইয়োরামেরিকার খৃষ্টানেরা এশিয়ায় আসিবামাত্র বেশ্যানামধারী লোক দেখিয়া প্রাচ্য সমাজকে নিতান্ত নীতিহীন এবং দুশ্চরিত্র সপ্রমাণ করিতে ছাড়েন না। এমন কি, বেশ্যা-সংস্কার, বেশ্যা-নিবারণ ইত্যাদি কার্য্য তাঁহাদের সমাজ-সেবার আন্দোলনে একটা প্রধান স্থান পায়। বস্তুতঃ এশিয়াবাসীকে ইয়োরামেরিকান অপেক্ষা চরিত্র হিসাবে এবং নারীজাতির মর্য্যাদা হিসাবে অবনত বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। বরং গভীর ভাবে খতাইয়া দেখিলে ইয়োরামেরিকাকেই অবনত বিবেচনা করিবার কারণ পাওয়া যাইবে। অন্ততঃ দেখা যাইবে যে, দুনিয়ার মানুষ এক প্রকার।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিবার সময় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজ-দ্বয়ের জীবনযাত্রা-প্রণালী বিশ্লেষণ করিয়া দেখা আবশ্যক। নামতঃ এবং স্পষ্টতঃ বেশ্যা ইয়োরামেরিকার কোন কোন দেশে না থাকিতেও পারে—কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বেশ্যাবৃত্তিধারিণী নারীর সংখ্যা প্রত্যেক দেশেই অত্যধিক। এতদ্ব্যতীত আর একটা কথা বিশেষ ভাবে বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। ইয়োরামেরিকার সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের দৈনিক জীবনে

যতটা স্বাধীনতা আছে, সেই স্বাধীনতাকে সমগ্র এশিয়ার লোক অতিশয় নিন্দাজনক বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। এরূপ বিবেচনা করা উচিত কিনা আলাদা কথা। দুই জগতের পারিবারিক ও সামাজিক মাপকাঠি এ বিষয়ে বড়ই বিভিন্ন। এশিয়ার লোকেরা যে সকল ব্যবহারকে নিতান্ত ঘৃণিত, লজ্জাস্পদ এমন কি বেশ্যাজনোচিত বিবেচনা করিয়া থাকে, সেই সকল ব্যবহারে ইয়োরামেরিকার খৃষ্টানেরা কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। প্রাচ্যেরা যাহাকে বেশ্যা আখ্যা দেয়, পাশ্চাত্য সমাজে তাহাদের অনেকের স্থান ভদ্র-সমাজের অন্তর্গত। যদি দুই জগতে সামাজিক ও পারিবারিক মাপকাঠি একরূপ হইত, তাহা হইলে এশিয়ার যে সকল নারীকে বেশ্যা নামে অভিহিত করা হয়, তাহার অধিকাংশই ভদ্র-সমাজে স্থান পাইত। কাজেই খৃষ্টানেরা এশিয়ায় আসিয়া বেশ্যা-সমাজ, বেশ্যা-পাড়া ইত্যাদি দেখিয়া বিস্মিত হইবার সুযোগ পাইতেন না।

ইয়োরামেরিকায় স্ত্রী-পুরুষেরা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ পতি পত্নী বাছিয়া লয়। এই রীতি ভাল কি মন্দ বিচার করিতেছি না। কিন্তু এই রীতি এশিয়ার কুত্রাপি নাই—মোটের উপর বলা চলে যে, বিবাহের পাত্র-পাত্রী-নির্ব্বাচন প্রাচ্য জগতে এত কাল পর্য্যন্ত অভিভাবকগণের হস্তেই রহিয়াছে। এই প্রভেদে প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য সমাজ-জীবনের প্রভেদ খুব গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। বিবাহ পাকাপাকি হইয়া যাইবার পূর্ব্বে যুবক ও যুবতীরা স্বাধীনভাবে বহুকাল পর্য্যন্ত চলাফেরা করে। এই স্বচ্ছন্দ গতিবিধি ইয়োরামেরিকার ভদ্রতম বিচারে কেবলমাত্র মার্জ্জনীয় এরূপ নয়—ইহা তাহাদের সমাজের একটা প্রধান অঙ্গ। ইহা বাদ দিলে পাশ্চাত্য মানবজীবন বড়ই দরিদ্র হইয়া পড়ে। মধ্যযুগে এতটা ছিল না। বিগত পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর

অনেক বাড়াবাড়ি হইয়াছে। তবে পল্লীগ্রামে এবং ছোট ছোট সহরে এখনও সঙ্কোচ অনেকটা আছে। বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পুরুষ ও রমণীর সম্বন্ধকে সুইট্‌-হার্টের সম্বন্ধ বলা হয়। দুই জনের এই সম্বন্ধ কয়েকমাস পর্য্যন্ত হয়ত চলিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার পর আবার অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে প্রথম রমণীর, এবং অপর একজন রমণীর সঙ্গে প্রথম পুরুষের হৃদ্যতা এবং মধুর সম্বন্ধ আরব্ধ হয়। এইরূপ কত ভিন্ন ভিন্ন বন্ধুত্ব-সৃষ্টি ও প্রণয়-ভঙ্গের পর পাশ্চাত্য সমাজে একটা পাকাপাকি বিবাহ হয় তাহার স্থিরতা নাই। সকল দেশেই "লাখ কথায় বিয়ে"। অনেক ক্ষেত্রে বিবাহ হয়ত হইলই না—দুইজনে চিরজীবন "মিষ্ট হৃদয়ে"র সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াই কাটাইয়া দিল। এই জন্যই আমরা যাহাকে বেশ্যা, বারাঙ্গণা, কুলটা ইত্যাদি বলিয়া থাকি, তাহা ইয়োরামেরিকায় দেখিবার সুযোগ নাই। কিন্তু ইয়োরামেরিকার মাপকাঠি ও "সোশ্যাল কন্‌ভেনশন" অর্থাৎ "সংস্কার" যদি এশিয়ায় প্রচলিত হয়, তাহা হইলে পাশ্চাত্য নরনারীগণ প্রাচ্যে আসিয়া বেশ্যা, বারাঙ্গণা ইত্যাদি নামে কোন সমাজ দেখিতে পাইবেন না। অথবা এশিয়ার মাপকাঠি বা সংস্কার যদি ইয়োরামেরিকায় চালাইতে হয়, তাহা হইলে পাশ্চাত্য সমাজের বহু নারীকে বেশ্যাপাড়ায় স্থান দেওয়া আবশ্যক হইবে। মোটের উপর এই সকল বিষয়ে প্রাচ্যপাশ্চাত্যে উনিশবিশ করা কঠিন। দুই জগতে সংস্কারের প্রভেদ যত, রক্তমাংসের প্রবৃত্তির প্রভেদ তত নয়।

সামাজিক ও পারিবারিক জীবনসম্বন্ধে এবং স্ত্রীপুরুষের চরিত্র-বিচারে এশিয়ার লোকেরা কিছু চড়া সুরের নীতি অবলম্বন করিয়া থাকে। আমাদের মাপকাঠি অত্যধিক উচ্চ। পরপুরুষ এবং পরস্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করা পর্য্যন্ত আমরা পাপ ও গর্হিত কার্য্য বিবেচনা করিয়া থাকি। অতি সহজে আমরা স্ত্রীপুরুষকে "একঘরে" করিয়া বসি।

এই সকল কথা মনে না রাখিলে এশিয়ার ও ইয়োরামেরিকার তুলনা সাধন করা অসম্ভব। সতীত্বশব্দের অর্থ দুই জগতে দুই প্রকার। "ব্রহ্মচারী", "ব্রহ্মচারিণী," "ব্রহ্মচর্য্য" ইত্যাদি শব্দ পাশ্চাত্য সমাজে ব্যবহৃত হয়ই না। খৃষ্টান "সেবাসমিতি"-সমূহে বহুসংখ্যক অবিবাহিত স্ত্রী ও পুরুষ নিঃস্বার্থে কার্য্য করেন। অবশ্য তাঁহাদের একক জীবনের সকল প্রকার খরচ সমিতি হইতে দেওয়া হয়। শরীর নষ্ট করিয়া অথবা অনাহারে থাকিয়া তাঁহারা সেবাধর্ম্ম পালন করেন না। আর এই সকল লোকের মধ্যে ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মচারিণী কেহ থাকেন কিনা সন্দেহ। অবিবাহিত থাকা আর ব্রহ্মচর্য্য পালন করা এক বস্তু নয়।

তাহা ছাড়া আর এক কারণে ইয়োরামেরিকায় বেশ্যা দেখা যায় না। এই সকল দেশে পত্নী-বর্জ্জন এবং স্বামি-বর্জ্জন আইনের সাহায্যে সর্ব্বদাই ঘটিতেছে। ডাইভোর্স প্রথা যদি এশিয়ায় পুরাপুরি প্রচলিত হয় এবং বিধবা রমণীগণকে বিবাহ করিবার জন্য পুরুষেরা প্রস্তুত থাকে, তাহা হইলে প্রাচ্য দেশেও নামলেখান বেশ্যা কমিয়া যাইবে।

জাপানের এই মহিলা-সংস্কার-পরিষৎ ইয়োরামেরিকার খৃষ্টান ধুরন্ধর-গণের নায়কতায় জাপানী-সমাজে আন্দোলন সুরু করিয়াছেন। ইহাঁদের প্রধান লক্ষ্য—তোকিওর "জোশীবাড়া' নামক অতি পুরাতন বেশ্যাপাড়ার বিলোপ-সাধন। এই জন্য ইহাঁরা ২৫ বৎসরাবধি গভর্ণমেণ্টের নিকট আইনের জন্য দরখাস্ত করিতেছেন। আর একটা বিষয়েও ইহাঁরা গভর্ণমেণ্টের নিকট আইন জারি চাহিতেছেন। মধ্যযুগে জাপানী জমি-দারেরা নিজ পরিবারে ভূসম্পত্তি স্থায়ী করিবার জন্য বিশেষ যত্নবান ছিলেন। বিবাহিতা পত্নীর গর্ভে সন্তান না জন্মিলে তাঁহারা বেশ্যা রাখিতেন। এই উপায়ে এক স্বামীর একাধিক পত্নী ও উপপত্নী থাকা

জাপানী সমাজে অনেকটা দস্তুর হইয়া গিয়াছে। খৃষ্টানমহিলা-পরিষৎ এই রীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়া আসিতেছেন।

এই বৎসর কিয়োতো নগরে মিকাডোর রাজ্যাভিষেক-উৎসব সম্পন্ন হইবে। তাহাতে অসচ্চরিত্রা নারীর আগমন বন্ধ করিবার জন্য সমিতি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মফঃস্বলের অনাথা বালিকারা দুষ্ট আড়কাটিদের প্ররোচনায় বিপথগামিনী হইতে বাধ্য হয়। তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্যও সমিতির চেষ্টা আছে। সম্পাদক বলিলেন —"আমরা বহুসংখ্যক বেশ্যাকে মুক্তি দিতে পারিয়াছি। তাহারা জঘন্য জীবনযাপন হইতে রক্ষা পাইয়াছে। তাহাদের জন্য একটা আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে তাহারা সম্মানের সহিত শিল্পকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে পারিতেছে।"

পালোয়ান-পরিষৎ ও জিউজিৎসু-বিদ্যালয়

পালোয়ানী ও কুস্তীর ধুম জাপানে খুব বেশী। আজ টোকিওর এক বিরাট য়্যাম্ফি-থিয়েটারে কুস্তী-প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখিয়া আসিলাম। এই সুবৃহৎ গোলাকার প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে ১৫০০০ লোকের বসিবার আয়োজন আছে। আজ প্রায় ১২০০০ লোক উপস্থিত। গৃহের সাজসজ্জা, আসবাব-পত্র অতিশয় দরিদ্র ধরণের। গ্যালারিগুলিতে আসন পাতিয়া স্বদেশী কায়দায় বসিতে হয়। লোকজনের উৎসাহ দেখিয়া ভাবিলাম—কালু, কেকড়, করিমকে দেখিবার জন্যও ভারতবর্ষের আবাল বৃদ্ধ বনিতা এইরূপই উন্মত্ত হয়। মানুষের শারীরিক ও সামরিক শক্তিকে আদর করে না দুনিয়ায় এমন কোন লোক নাই। যুদ্ধের গল্প শুনিতে, যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য অথবা চিত্র দেখিতে এই জন্যই মানুষমাত্র উৎসাহিত হয়। সত্য-সত্যই মানুষ পশুবিশেষ। মানবের দেবভাবও অস্বীকার করিবার যো নাই—কিন্তু তাহার পশুত্বটাই সমগ্র জীবনের ভিত্তি।

পালোয়ানেরা ল্যাঙ্গট পরিয়া দুই দলে বিভক্ত হইয়াছে। বিচারক বা আম্পায়ার একটা কাঠের পাখা হাতে করিয়া দুইদিক হইতে দুই জনকে আহ্বান করিতেছে। য়্যাম্‌ফি থিয়েটারের কেন্দ্রস্থলে একটা ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার মেঝে ভিজা মৃত্তিকা ও বালুকায় প্রস্তুত। ভারতীয় আখড়াগুলিও এই প্রকার। বস্তুতঃ জাপানী কুস্তী-গিরদিগের চালচলন, ভাবভঙ্গী ইত্যাদি সবই আমাদের সুপরিচিত। কিন্তু কুস্তীর কায়দা, পালোয়ানী, পাঁয়তারা ইত্যাদি কিছু স্বতন্ত্র। কালু করিম ইত্যাদির লড়াই অনেক সময়ে বহু ঘণ্টাব্যাপী হয় কিন্তু জাপানী

পালোয়ানদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এক আধ মিনিটের ভিতরেই খতম হইয়া যায়। "টেনিও মারু" জাহাজে নাবিকেরা কুস্তী দেখাইয়াছিল। এই পালোয়ান-পরিষদের আখড়ায়ও ঠিক তাহাই দেখিলাম।

বিচারকের হস্তে যে পাখা থাকে তাহার নাম "দুম্বাই"। মধ্যযুগে জাপানী সেনাপতিরা সৈন্যদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্য এই পাখা ব্যবহার করিতেন। দুনিয়ার সর্ব্বত্র মধ্যযুগে লড়াই অনেকটা কুস্তী পালোয়ানীর মতই ছিল। লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, মল্লযুদ্ধ ইত্যাদিতে যাহারা পারদর্শী হইত তাহারা সমরক্ষেত্রেও জয়ী হইত। বর্ত্তমান রণপ্রণালী অন্যরূপ। সেই পাঞ্জাপাঞ্জা ও হাতাহাতি লড়াইয়ের যুগ আর নাই।

পালোয়ান-পরিষদের অধীনে প্রায় একহাজার কুস্তীগির নিয়মিতরূপে কার্য্য করে। ইহাদের ভরণ-পোষণ পরিষৎই করিয়া থাকেন। এই প্রদর্শনী-গৃহ পরিষদের সম্পত্তি। বৎসরের ভিতর দুই তিন মাস কছরত দেখাইবার আয়োজন হইয়া থাকে। আয় মন্দ হয় না। বার আনার নিম্নে টিকেট নাই। টোকিও হইতে অন্যান্য সহরে যাইয়া পরিষদের পালোয়ানেরা লড়াই দেখাইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, টোকিওর এই আম্ফিথিয়েটার ভাড়া দিয়া পরিষৎ অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন। একখানা মাসিকপত্র চালান হইতেছে। তাহার নাম "কুস্তীগিরের জগৎ"।

একব্যক্তি বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া অন্যান্য সকলকে পরাজিত করিতেছে। এই "চ্যাম্পিয়নের" নাম "উমেগাতানি" বা "স্থূলকায়"। ইঁহার বয়স মাত্র ৩৪ বৎসর। আখড়ায় যত পালোয়ান দেখিলাম প্রায় সকলেই দীর্ঘাকৃতি ও স্থূল কলেবর। অথচ জাপানের সাধারণ জনগণ হ্রস্বাকৃতি এবং শীর্ণকায়। পালোয়ানেরা ভারতীয় শিখদিগের মত মাথার চুল বাঁধিয়া রাখে। অনেককে দেখিয়া ঠিক শিখের মূর্ত্তিই মনেপড়িল।

কুস্তী-ব্যবসায়ের আড্ডা হইতে জিউজিৎস্থ-বিদ্যালয়ের আখড়া দেখিতে আসিলাম। অধ্যাপক কালো ইহার পরিচালক। বিদ্যা-লয়ের নাম কোদোকান। নিম্ন বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় এবং বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাই এইখানে নিয়মিতরূপে শিক্ষা করে। সকল প্রকার প্যাঁচ শিখিতে তিন বৎসর লাগে। ছাত্রসংখ্যা অনেক। মাসিক বেতন বেশী নয়।

শুনিলাম, কিয়োতোতে মহিলাগণের জন্য একটা স্বতন্ত্র জিউজিৎস্থ-বিদ্যালয় আছে।

মধ্যযুগের "নো"-নাটক বা জাপানী "গম্ভীরা"

সুমিদা নদীর ধারে কতকগুলি খোলার ঘরের পল্লীর মধ্যে একটা রঙ্গালয়। বাহির হইতে ইহাকে নাট্যশালা বিবেচনা করা কঠিন। এমন কি, এই গৃহকে সমীপবর্ত্তী অন্যান্য গৃহসমূহ হইতে কোন বিষয়ে পৃথক ভাবাই চলিতে পারে না। টোকিও নগরে এইরূপ আরও কয়েকটা রঙ্গালয় আছে। এইগুলির নাম নো-মণ্ডপ বলা যায়। "নো" নৃত্যগীত-বাদ্যসমন্বিত এক প্রকার অভিনয়বিশেষ। ষোড়শ শতাব্দীতে খাঁটি নাটক প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে "নো"ই জাপানে প্রচলিত ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত নো-নাটকের সমৃদ্ধি যুগ। পরবর্ত্তী-কালে নূতন "নো" রচিত হয় নাই—কিন্তু পুরাতন রচনাসমূহই অন্যান্য অভিনয়ের সঙ্গে সমাদৃত হইয়াছে। সেই মধ্যযুগের নাট্যকলা জাপানী সমাজে অদ্যাপি জীবিত আছে। ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য এবং নানা উপায়ে সুপ্রচারিত করিবার জন্য উচ্চশিক্ষিত এবং ধনবান্ জাপানীরা যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টও এই প্রাচীন অনুষ্ঠানটি রক্ষা করিতে বিশেষ যত্নবান্। এই বৎসর সম্রাটের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে প্রাসাদের ভিতর নো-নাটকের অভিনয় প্রদর্শিত হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছে। তাহার জন্য মঞ্চাদি নির্ম্মাণের সুবিস্তৃত আয়োজন হইতেছে। নব্য পাশ্চাত্য নাচগান বায়স্কোপ থিয়েটার ইত্যাদির যুগে নো-শিল্পিগণ এই উপায়ে "সংরক্ষিত" হইয়া যাইবে বিশ্বাস করিতেছি।

রঙ্গালয়ের প্রবেশপথেই দেখি, অসংখ্য কাঠের জুতা ঝুলান রহিয়াছে। দর্শকমণ্ডলী জুতা খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। জুতা খুলিয়া প্রবেশ করা গেল। মাদুরবিছান তক্তার উপর দিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম। বহুসংখ্যক লোক অভিনয় দেখিতেছে। সকাল নয়টার সময়ে অভিনয় স্থুরু হইয়াছে—বিকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত চলিবে। সর্ব্বসমেত আট নয়টা ক্ষুদ্র পালার অভিনয় হইবে। জনপ্রতি টিকেটের মূল্য দেড় টাকা।

শ্রোতাদিগের বসিবার মঞ্চ অভিনয়-মঞ্চ হইতে স্বতন্ত্র। যে মঞ্চে নৃত্যকার, গায়কদল এবং বাদকগণ বসিয়া আছে, তাহাতে দর্শকের স্থান নাই। সাজঘর হইতে মঞ্চ পর্য্যন্ত পথ বাঁধান আছে। এই পথও মঞ্চের অংশবিশেষ, অভিনয়-মঞ্চের ছাদও দর্শক-মঞ্চের ছাদ হইতে পৃথক্। দর্শকেরা স্বদেশী ভাবে হাঁটু পাতিয়া বসিয়া আছে। মাদুর-পাতা মঞ্চের উপর তাহাদের আসন স্থাপিত। মঞ্চ কতকগুলি চতুষ্কোণ প্রকোষ্ঠে বিভক্ত—প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে চারিজনের স্থান। দর্শকমণ্ডলী অভিনয়-মঞ্চের সম্মুখে এবং দুই পার্শ্বে অবস্থিত। দর্শকমণ্ডলী সকালেই আসিয়াছে—তাহারা যথাস্থানে বসিয়াই আহার করিয়াছে বুঝিতে পারিলাম। আসনের নিকটে থালা, বাটি, চায় কেট্‌লি ইত্যাদি পড়িয়া রহিয়াছে। কেহ কেহ খাদ্যদ্রব্য আনাইয়া লইতেছে। ইহা এক দিবস-ব্যাপী উৎসব-বিশেষ। কাল পালোয়ানী-প্রতিযোগীতার প্রদর্শনীতে দেখিয়াছি, দর্শকেরা গোটা দিনটাই মল্লক্ষেত্রে কাটাইতেছে। তাহারা দিবাভাগের খাওয়া যথাস্থানেই সারিয়া লয়।

আমি যখন রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইলাম, তখন কয়েকটা অভিনয় হইয়া গিয়াছে, আর একটার অর্দ্ধাংশও সম্পূর্ণ হইয়াছে। রমণীবেশে এক পুরুষ মুখোস্ পরিয়া গান করিতেছে এবং ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া মঞ্চের উপর ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। এই রমণীর বামদিকে দশজন গায়ক

স্থিরভাবে যথারীতি হাঁটুতে বসিয়া একসঙ্গে গান করিতেছে। এই দলবদ্ধ কোরাস্-গানের জাপানী নাম "উতাই"। বাজনা একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। রমণীর পশ্চাতে দুইজন টুলে বসিয়া দুইটা চামড়ার যন্ত্রে মাঝে মাঝে চাঁটি মারিতেছে। দুইজনে একতালে চাঁটি মারিতেছে না। অধিকন্তু গানের সুরের সঙ্গে চাঁটির তালের কোন সামঞ্জস্য আছে বোধ হইল না। গানের সুর শুনিয়া বিশেষ প্রীত হওয়া যায় না। তবে দশজনের গম্ভীর গলায় একটা মোটা আওয়াজ বাহির হয়—তাহা খানিকক্ষণ শুনিতে মিষ্ট লাগে। কিন্তু একঘেয়ে উঠা-নামাহীন স্বর শীঘ্রই বিরক্তিজনক হইয়া পড়ে।

দর্শকেরা অতিশয় মনোযোগের সহিত উতাই শুনিতেছে। গাইড বলিলেন—"এই নো অতি প্রসিদ্ধ—কিন্তু কঠিন। একমাত্র গান শুনিয়া কেহ ইহা পূরাপূরি বুঝিতে পারে না। এইজন্য সকলের হাতেই পুস্তক রহিয়াছে দেখুন।"

একজন ইংরাজ লেখক অভিনয় দেখিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য "Plays of old Japan" অর্থাৎ "প্রাচীন জাপানের নাট্য-সাহিত্য" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

"The magnetic effect of the quiet, intellectual audience on itself; the beautiful simplicity and harmony of the colour scheme within the theatre; the dignity and impersonalness of the actors fulfilling their anciently prescribed functions; the allusions and suggestions of the poems, the descriptions of natural beauties and the frequent references to religious and philosophical ideas; when combined with the solemn and strange

music of the singers create together, within the heart of the observer, a something which is well nigh sublime."

ভাষা ও ভাব বিন্দুমাত্র বুঝিলাম না—কেবলমাত্র গম্ভীর কণ্ঠোত্থিত উতাই শুনিয়া অর্গ্যান-সমন্বিত গির্জ্জাসঙ্গীতের একটা আভাস পাইলাম। আর রমণীবেশধারীর কৌশলে পা ফেলিবার কায়দা লক্ষ্য করিলাম। ইহাকে নৃত্য বলা উচিত নয়। শুনিলাম, যিনি রমণী সাজিয়াছেন তিনি এই রঙ্গালয়ের স্বত্বাধিকারী এবং প্রধান ওস্তাদ। পুত্রহারা রমণীর বিলাপ এবং অবশেষে পুত্রলাভ ও আনন্দ এই নো-নাটকের বিবৃত বিষয়।

এই গম্ভীর উতাইয়ের পর একটা হাল্‌কা পালা অভিনীত হইল। দুই-জন ভৃত্য মনিবের অজ্ঞাতসারে তাঁহার গৃহে "সাকি"মদ্য পান করিতেছে। দুইজনে মাতলামি করিতে করিতে নানারূপ বচসা কা:তেছে। হাস্য-রসের অবতারণা এই অভিনয়ে দেখিতে পাইলাম। ইহাতে কথোপ-কথনের অংশ বেশী। কণ্ঠস্বর কৃত্রিমভাবে গম্ভীর তৈয়ারী করা জাপানী সঙ্গীতকলার একটা বিশেষত্ব বোধ হইতেছে।

তৃতীয় নাটকে একজন যোদ্ধা রণে পরাজিত হইয়া শত্রুকর্ত্তৃক বন্দী হইয়াছে। কোয়ান্নন নাম্নী দেবীর নিকট প্রার্থনা করিয়া মুক্তিলাভের জন্য সে চেষ্টিত। কোরাসের উতাই গীত এই অভিনয়েও যথারীতি গম্ভীর। যোদ্ধাদিগের পোষাক মধ্যযুগের অনুরূপ। যেন মিউজিয়ামে সংগৃহীত রণবেশ পরিধান করিয়া অভিনেতারা মঞ্চে আসিয়াছে। চামড়ার "ডুজুমি" বাদ্যে চাঁটি মারিবার সঙ্গে সঙ্গে বাদকদ্বয় অতি বিকট আওয়াজ করে। ইহাতে যথেষ্ট রসভঙ্গ হয়। তাহা না হইলে উতাই শুনিতে একপ্রকার ভালই লাগে। খানিকক্ষণ কান তৈয়ারী করিলে নো-সঙ্গীত হইতে চিত্তের স্ফূর্ত্তি জন্মান যায়।

সর্ব্বশেষে যে অভিনয় হইল তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম-বিষয়ক চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। দুইজন পুরোহিত ফুদো নামক বিদ্যাদেবের নিকট প্রার্থনা করিতেছে। ইহাদের বেশ বৌদ্ধ-পুরোহিতগণের উপযুক্ত। এমন সময়ে সয়তান বা মার কাঠুরিয়া বেশে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বাধা দিল। সয়তান মুখোস পরিয়া বিকট সাজে দেখা দিয়াছে।

নো-নাটকগুলি অতিশয় ক্ষুদ্র। প্রায় কোন অভিনয়েই এক ঘণ্টার বেশী লাগে না। এইগুলিকে নাটক না বলিয়া ছোট গল্প বলাও বোধ হয় উচিত নয়। ষ্টোপস্ তাঁহার "প্লেজ অব্ ওল্ড জাপান" পুস্তকে বলিতেছেন :—"The dramatic qualities are almost entirely absent from the "No"; there is no inter-play of the characters, no working up of a story to some moving, dramatic and apparently inevitable conclusion."

ডিকিন্স্ তাঁহার বিখ্যাত Japanese Text অর্থাৎ "জাপানী সাহিত্য" পুস্তকের 'The No of Takasogo'-অধ্যায়ে লিখিতেছেন :—

"It is essentially an entertainment composed of music, posture and gesture, dancing, singing or chanting, reciting and dialogue."

মালদহ জেলায় বৈশাখ মাসে গম্ভীরা উপলক্ষ্যে তৃতীয় দিবস বোল্বাই সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয়। কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন পালায় বোল্বাই সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। প্রত্যেক পালাতে নাচগান, কথোপকথন, ভাবভঙ্গী ইত্যাদির সমাবেশ হয়। কাজেই যাঁহারা বোল্বাই দেখিয়াছেন, তাঁহাদের জাপানী "নো" দেখা হইয়াছে বলিতে পারি। নো-রঙ্গমঞ্চে বসিয়া এই কথাই বারে বারে মনে হইতে লাগিল। "নো" এবং গম্ভীরার বোল্বাই এক শ্রেণীর শিল্পকলা—ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে উভয়ের স্থান এক

প্রকার। মনব-চিত্তের একই প্রেরণা হইতে উভয়ের উৎপত্তি। তবে কড়ায় ক্রান্তিতে মিল খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

এই দুই শিল্পকলার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশও অনেকটা একপ্রকার। ধর্ম্ম-জীবনের আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানস্বরূপ নো-নাটক এবং গম্ভীরা-উৎসব জগতে দেখা দিয়াছে। ইয়োরোপে ঠিক এই জন্যই মিষ্টরি এবং মিরাকল্ প্লের উৎপত্তি হইয়াছিল। ধর্ম্ম ও নীতি প্রচার করাই নো, মিষ্টরি এবং গম্ভীরার প্রবর্ত্তকগণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ক্রমশঃ সাংসারিক ও বৈষয়িক বহু তন্ত্র ও তত্ত্ব এই সকল শিল্পীর আলোচনায় স্থান পাইয়াছে। রসিকতা, হাসিঠাট্টা ইত্যাদি নো-সাহিত্যে যথেষ্ট দেখা যায়। বোল্‌বাই-সাহিত্যেও এই ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত প্রসঙ্গের চূড়ান্ত দেখিতে পাই।

অধিকন্তু, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর বৌদ্ধ-জাপানে যে সকল ভাব ও ধারণা প্রচলিত ছিল, সেই সমুদয় অবলম্বন করিয়াই নো-প্রবর্ত্তকগণ উতাই রচনা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধমন্দিরে অভিনীত হইবার জন্য বৌদ্ধ পুরোহিতগণ কর্ত্তৃক এই সকল নো-নাটক প্রস্তুত করা হইয়াছিল। গম্ভীরার উৎপত্তিও বঙ্গদেশে যে যুগে হইয়াছিল তখন বৌদ্ধ, তান্ত্রিক ও শৈব ধর্ম্মভাবের প্রাচুর্য্য ছিল। দেবতার উদ্দেশ্যে ভক্তগণকর্ত্তৃক গম্ভীরার গান প্রস্তুত করা হইত। এখনও দেবতাকে নিবেদন করিয়াই বোল্‌বাই-শিল্পিগণ নৃত্যগীতাদি আরম্ভ করেন। জাপানেও এখন পর্য্যন্ত কিয়োতো, নিক্কো এবং অন্যান্য স্থানের বৌদ্ধ-মন্দিরে নো-নাটকের অভিনয় হইয়া থাকে। বর্ত্তমান শৈব অনুষ্ঠানের বোল্‌বাই-সাহিত্যের সঙ্গে জাপানী বৌদ্ধ নো-নাটকের কোন সংযোগ থাকা অসম্ভব কি? মধ্যযুগের এশিয়ার ইতিহাস খুঁজিলে হয়ত আত্মীয়তার সম্বন্ধ বাহির হইয়া পড়িবে।

জাপানী নো-সাহিত্যের একটা সাধারণ ধুয়া এই—

"The dew remains until the wind doth blow"

অর্থাৎ—"ভাঙল সৈকতে বারিবিন্দুসম স্তমিত রমণী সমাজে"—জগতের সকলই ক্ষণভঙ্গুর ও অস্থায়ী। এক নাটকে আছে—

"Nay in the three worlds, there is not a place."—

অর্থাৎ—"পৃথিবীতে কেহ ভালত বাসে না, এ পৃথিবী ভালবাসিতে জানে না।"

নো-নাটক জাপানী সমাজে যতদিন পর্য্যন্ত অভিনীত হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্ব "উদীয়মান সূর্য্যের দেশে" জাগরূক থাকিবে। এই তত্ত্ব ষ্টোপ্‌সের ভাষায় বিবৃত হইতেছে—

"In this the main theme is the transitoriness of human life and at the same time is presented a view of all the pain and misery people may endure when they are not rendered superior to it by a recognition of the higher philosophy that teaches that the whole universe is a dream, from whose toils the freed spirit can escape."

এই অধ্যাত্ম-তত্ত্ব জাপানীরা ভুলিয়া যাইতে অনিচ্ছুক। মিকাডো হইতে আরম্ভ করিয়া জাপানের গণ্যমান্য এবং অর্দ্ধশিক্ষিত লোকমাত্রেই এই উদার দর্শনের প্রচার চাহিতেছেন। পঞ্চাশ বৎসরকাল ইয়োরামেরিকান যুক্তিতত্ত্ব, নিরীশ্বরবাদ, বিজ্ঞানফ্যাক্টরী, এরোপ্লেন ইত্যাদি ভোগ করিয়াও জাপানীরা তাহাদের প্রাচীন শিল্পকলার প্রতি উদাসীন হইল না। জাপানীরা ভারতীয় চিন্তাধারা এখনও আদর করিতে প্রবৃত্ত। ভারতবাসীমাত্রেই জাপানীদের এই নো-সংরক্ষণ দেখিয়া পুলকিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

গাইড বলিলেন—"অন্যান্য রঙ্গালয় হইতে কর আদায় করা হয়। কিন্তু নো-নাট্যশালা হইতে গবর্ণমেণ্ট খাজনা আদায় করেন না।"

রঙ্গালয়ে একজন যুবকের সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি কাউণ্ট ওকুমাপ্রবর্ত্তিত ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধন-বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু নো-সাহিত্যে ইঁহার বিশেষ আগ্রহ। এই জন্য ইনি নো-সাহিত্য-বিষয়ক একখানা মাসিক পত্রের সহকারী সম্পাদক হইয়াছেন। আজ এই অভিনয়ের চিত্র সংগ্রহ করিতে আসিয়াছেন। কাগজের গ্রাহক ৩৫০০, বার্ষিক মূল্য ৫৷৷০। প্রাচীন নো-সাহিত্য সংগ্রহ করিয়া ছাপাইবার জন্য জাপানে সুবৃহৎ আন্দোলন সুরু হইয়াছে, বুঝিতে পারা গেল। যুবকের নিকট শুনিলাম—"শীঘ্রই একখানা বিরাট সচিত্র সংগ্রহপুস্তক বাহির হইবে। তাহার মূল্য ১৫০৲।"

জাপানী "বোল্‌বাই"-সাহিত্যের অনুবাদ, সমালোচনা অথবা বিবরণ নিম্নলিখিত ইংরাজী গ্রন্থে পাওয়া যায়:—

1. Jinrickishaw days—Scidmore.
2. Tales of old Japan—Mitford.
3. Japanese Text—Dickins.
4. Classical Poetry of the Japanese—Chamberlain.
5. History of Japanese Literature—Aston.
6. Japan, its history, art and literature—Brinkley.
7. Japanese Plays and Play fellows—Edwards.
8. Translation from Lyrical Drama—Sansom.
9. Plays of old Japan—Stopes.
10. A Japanese Medicæval Drama.

ট্রামে আসিয়াছিলাম—নৌকায় ফেরা গেল। সাধারণ বজরায় একটা ছোট এঞ্জিনের নৌকা লাগান হইয়াছে। সুমিদা নদীর উপর কলের নৌকায় চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিলাম জাপানীদের মিতব্যয়িতা এবং

নিজের অবস্থানুসারে বিদেশীয় আবিষ্কারসমূহ ব্যবহার করিবার ক্ষমতা এই দুইটি গুণ ভারতবাসীর শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। আমরা নব্য বৈজ্ঞানিক কলযন্ত্র-চালিত অনুষ্ঠানগুলিকে মহা ব্যয়সাধ্য বলিয়া জানি। অথচ চালার ঘরে, সাধারণ নৌকায়, নিতান্ত নগণ্য আবেষ্টনের ভিতর জাপানীরা বাষ্প, তড়িৎ ও গ্যাসের শক্তি কাজে লাগাইতেছে। ইয়োরামেরিকার নবাবী চাল গ্রহণ না করিয়াও ইয়োরামেরিকার উদ্ভাবিত কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করা সম্ভব—একমাত্র এই তত্ত্ব লাভ করিবার জন্যই ভারতবাসীর জাপানে আসা আবশ্যক।

কাগজের ফ্যাক্টরি

উয়েনো পার্ক ষ্টেসনে রেলে বসিলাম। পনর মিনিটের মধ্যে গাড়ী ওজি পল্লীতে পৌঁছিল। এইখানে দুইটা কাগজের কারখানা অবস্থিত— একটা গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি, অপরটার মালিক বেসরকারী কোম্পানী।

কারখানায় প্রবেশ করিতে পাশ আবশ্যক হয়। ইণ্ডু-জাপানী য়্যাসোসিয়েসন সরকারী ফ্যাক্টরীর পাশ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের একজন কর্ম্মচারীও সঙ্গে আসিয়াছেন। সুতরাং কোন প্রতিবন্ধক নাই। তবে ফটো-ক্যামেরা ফ্যাক্টরির ভিতর লইয়া যাওয়া চলিবে না।

কেরাণীগৃহে স্ত্রীলোকেরাও হিসাবপরীক্ষা কার্য্যে নিযুক্তা। জাপানের সর্ব্বজন-পরিচিত "সরোবান" হস্তে লইয়া কেরাণীরা গণনা করিতেছে। কতকগুলি তেঁতুলের বীজসদৃশ কাষ্ঠফলক দাবা-খেলার ঘরের মত সাজান। এইগুলি লোহার শিকের দ্বারা বিদ্ধ—কিন্তু ইচ্ছানুসারে সরান নড়ান যায়। ফলকগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যার সঙ্কেতস্বরূপ পরিচিত। কাজেই এইগুলি সরাইয়া নড়াইয়া যে কোন সংখ্যার মূল্য বাহির করা যায়। জাপানীরা ছোট বড় সকল দোকানেই এই যন্ত্রের ব্যবহার করিয়া থাকে। এমন কি, দুই চারি পয়সার হিসাবেও ইহারা এই যন্ত্রের সাহায্য লয়!

কারখানার একজন লোক আসিয়া সকল বিভাগ দেখাইয়া দিল। এই ব্যক্তির ইংরাজী জানা নাই। কিন্তু জাপানী সঙ্গী ইংরাজী জানেন— ইনি দোভাষীর কার্য্য করিলেন। শুনিলাম, সর্ব্বসমেত ৬০০ লোক এই কারখানায় কাজ করে, তাহার মধ্যে প্রায় ২০০ জন স্ত্রীলোক।

প্রথম গৃহে দেখিলাম, ধানের খড়ের অসম্ভব আঁটি মজুত রহিয়াছে। কতিপয় কুলী কতকগুলি আঁটি পরিষ্কার করিতেছে। এই সকল আঁটি স্বতন্ত্র গৃহে একটা কলের ভিতর বিক্ষিপ্ত হইতেছে। এই কল গোলাকার —ইহার ভিতর সোডার সঙ্গে খড়ের টুকরা সিদ্ধ হইতেছে। এই ডাইজেষ্টার দেখাইবার পর প্রদর্শক কতকগুলি সোডা-গৃহে লইয়া গেল। সোডার কিয়দংশও যাহাতে কারখানা হইতে নষ্ট না হয়, তাহার সবিশেষ চেষ্টা রহিয়াছে। খড়ের টুকরা সিদ্ধ হইয়া গেলে ডাইজেষ্টার হইতে প্রচুর পরিমাণ সোডা বাহির হইয়া থাকে। কয়েকটা ঘরে দেখিলাম, এই সোডা ধরিয়া রাখিবার জন্য নানাপ্রকার কার্য্য চলিতেছে।

তাহার পর কয়েক ঘর ভরিয়া গলান খড়ের "হালুয়া"-ভরা হাঁড়ি দেখা গেল। প্রথমে খড়ো রং দূরীভূত করা হইতেছে। পরে শ্বেতবর্ণ হালুয়াসদৃশ কাগজ-বস্তু সংগৃহীত হইতেছে। অবশেষে এই বস্তু অন্য এক গৃহে নীত হইতেছে। সেই গৃহে দেখিলাম—কাগজ-বস্তুকে জলের সঙ্গে মিলাইয়া মিলাইয়া একপ্রকার সরবত প্রস্তুত করা হইতেছে। এই সরবত কতকগুলি কলের উপর দিয়া চালান হইবার সময় কাগজ-বস্তুর "পলি" বা "পাত" ফেলিয়া যায়।

পাতসমূহ গোলাকার জালসদৃশ যন্ত্রে লাগিয়া থাকে। পরে ফ্লানেলের উপর এই পাতগুলি চাদরের মত দেখায়। অবশেষে আগুনে গরম করিয়া শুকান হয়। ইচ্ছানুরূপ আকারে কাগজ কাটা হইয়া গেলে ইহাকে পালিশ করিবার জন্য কয়েকজন লোক নিযুক্ত। দুইখানা ধাতু-নির্ম্মিত পাতের ভিতর রাখিয়া কাগজের উপর কলের ভার চাপান হয়। তাহার ফলে কাগজ চক্‌চকে ও মসৃণ দেখায়।

কারখানার গৃহগুলিতে আলোক ও বাতাসের স্বচ্ছন্দ গতিবিধি আছে। শ্রমজীবীদিগের বিশেষ কোন কষ্ট ভোগ করিতে হয়

না বুঝা গেল। পুরুষদিগের মাসিক বেতন ৩০৲, স্ত্রীলোকদিগের প্রায় ১৫৲।

ফ্যাক্‌টরীর ভিতর যতগুলি কল দেখিলাম, তাহার গাত্রস্থিত ছাপ হইতে বুঝা গেল—কোনটা আমেরিকায় তৈয়ারী, কোনটা জার্ম্মাণিতে তৈয়ারী ইত্যাদি।

কারখানা দেখিয়া উয়েনো পার্কে ফিরিয়া আসিলাম। এইখানকার এক হোটেলে দুইজন জাপানী অপেক্ষা করিতেছিলেন। একজন দালাল অপর জন এক বণিক। দালাল মহাশয় ইংরাজী বেশ জানেন। ইনি দুই তিনবার ইয়োরোপ ও আমেরিকা ঘুরিয়া আসিয়াছেন। ইঁহার এক ভাই হোক্কাইদো দ্বীপের স্যাপোরো-কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করেন।

হোটেলে খাওয়া দাওয়া করিয়া মটরকারে পুনরায় ওজি পল্লীতে আসা গেল। এইবার নূতন জাপানীদ্বয় সঙ্গী। তোকিওর সাধারণ পল্লী-দৃশ্য সর্ব্বত্র চোখে পড়িল। বাঁশের কঞ্চি ও বাকারী দ্বারা ঘরের বেড়া অথবা বাড়ীর সীমা নির্দ্দিষ্ট করা রহিয়াছে। মোজা পায়ে অথবা খড়ো চটি পায়ে জাপানীরা চলা-ফেরা করিতেছে। পথিকদিগের কাহারও মাথায় টুপি আছে, কাহারও মাথায় নাই। দালাল মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বর্ত্তমান যুগের পূর্ব্বে জাপানে টুপি ব্যবহার ছিল না।

ওজি পল্লীর দ্বিতীয় কাগজ-ফ্যাক্টরীতে প্রবেশ করিলাম। সাধারণতঃ প্রবেশ নিষেধ। ম্যানেজার বলিলেন—"এই কারখানা জাপানের সর্ব্ব পুরাতন। কাজেই গৃহগুলি বিশেষ সুবিধাজনক নয়—কিন্তু যন্ত্র ও কল-সমূহ সবই নূতনতম ধরণের।"

এই কারখানার কাগজ চীনে বেশী রপ্তানি হয়। জার্ম্মাণ ও ইয়োরোপীয় কাগজ অপেক্ষা এখানকার তৈয়ারী মাল সস্তা বোধ

হইল। ভারতবর্ষে এই কাগজের কাটতি বাড়ান সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিল।

জাপানের প্রধান দ্বীপের নাম নিপ্পন—ইহার উত্তরে হোক্কাইদো। এই দ্বীপে একপ্রকার গাছ জন্মে—তাহার শাঁস হইতে উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত করা যায়। সেই শাঁস ফ্যাক্টরীতে অনেক দেখিলাম। তাহা ছাড়া, ছেঁড়া ন্যাকড়ার বড় বড় বাণ্ডিল একটা প্রকাণ্ড মালগুদামে জমা করা রহিয়াছে। এই ন্যাকড়া গলাইয়া কাগজ প্রস্তুত করা এখানকার বিশেষত্ব। একটা গৃহে দেখিলাম, বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র-বৃহৎ খড়ো দড়ী সংগ্রহ করা হইতেছে। এইগুলি ন্যাকড়ার বস্তা খুলিবার সময়ে পাওয়া গিয়াছে।

ফ্যাক্টরীর কলসমূহ গবর্ণমেণ্ট কারখানারই অনুরূপ। গলান, রং ছাড়ান, "হালুয়া"র হাঁড়ি, "সরবত" ইত্যাদি দুই কারখানায়ই এক ধরণেরই। এখানে ন্যাকড়াগুলি কাটিয়া ছিঁড়িয়া পরিষ্কার করিয়া কাগজবস্তুতে পরিণত করা হইতেছে, এই যা প্রভেদ।

দুই কারখানাই বুঝিলাম, কাগজ প্রস্তুত করিতে জলের প্রয়োজন খুব বেশী। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত জলের ব্যবহারই চোখে পড়ে; কাজেই জল সরবাহর করা ফ্যাক্টরীর প্রধান কাজ। বহুদূর হইতে নর্দ্দমার সাহার্য্যে জল আনিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম—কারখানার কার্য্য ২৪ ঘণ্টা চলে—কখনও বন্ধ থাকে না। তবে শ্রমজীবীর পালা বদল হয়। ১২ ঘণ্টা করিয়া কাজ করা প্রত্যেক শ্রমজীবীর দস্তুর। বালক-বালিকাদিগকে যে কোন বয়সে নিযুক্ত করা যায়। নিতান্ত অল্পবয়স্কা বালিকা ফ্যাক্টরীতে কার্য্য করিতেছে দেখা গেল। জাপান গবর্ণমেণ্ট এখনও কোনপ্রকার ফ্যাক্টরীবিষয়ক আইন জারি করেন নাই।

এই স্থান হইতে সহরের ভিতর একটা কারখানায় আসিয়া গাড়ী

দাঁড়াইল। ইহাও কাগজের ফ্যাক্টরী। এখানে খড় হইতে কার্ডবোর্ড প্রস্তুত করা হয়। এখানকার যন্ত্রগুলি প্রথম দুইটি হইতে কথঞ্চিৎ স্বতন্ত্র ধরণের বোধ হইল।

কাগজের কারখানা দেখিতে দেখিতে আট ঘণ্টা কাটিল। এক স্থানে সেতুর উপর দিয়া সিমুদা পার হইলাম। তাহার পর কূলে কূলে গাড়ী চলিতে লাগিল। ছোট বড় বজরা, কলের নৌকা, দাঁড়ের নৌকা নদী-বক্ষে অসংখ্য। নদীর দুইধারে খোলার ঘর—ইট বা পাথরের বাড়ী বিরল। কোন কোন স্থানে দুএকটা কারখানার চিম্‌নীও দেখা যায়। মোটের উপর নারায়ণগঞ্জ গোয়ালন্দ ইত্যাদির দৃশ্য চোখে পড়ে।

এইবার এক মোজা-গেঞ্জির কারখানায় আসিলাম। সূতা, রেশম ও পশম তিন প্রকার বস্ত্রেই এখানে দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। ম্যানেজার কলিকাতা হইতে প্রাপ্ত অর্ডারের উল্লেখ করিলেন। ভারতে জাপানী-মালের কাটতি বাড়াইবার কথা আলোচিত হইল। এই কারখানায় সাধারণতঃ দামী জিনিষ প্রস্তুত করা হয়। ম্যানেজার বলিলেন—"ভারতবর্ষে আপনারা সস্তা জাপানী জিনিস দেখিয়াছেন। সেগুলি প্রধানতঃ ওসা-কায় তৈয়ারী হয়।"

গড়ান কাগজের দেওয়াল সরাইয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম। বাহির হইবার সময়ে সেই দেওয়াল সরাইতে হইল। জুতা পায়ে কারখানায় প্রবেশ নিষিদ্ধ।

রাষ্ট্রমণ্ডলে "একঘরে" জাপান

বর্ত্তমানে দেখিতেছি জার্ম্মাণি-বধ করিবার জন্য সকল জাতি ব্রতবদ্ধ হইয়াছেন। অদূর-ভবিষ্যতে জাপানবধ করিবার জন্য রাষ্ট্রমণ্ডলে একটা ষড়যন্ত্র দেখিতে পাইব। দশদিক হইতে এশিয়ার নব্য অভিমন্যুকে আক্রমণ সহ্য করিতে হইবে। জাপানের বর্ত্তমান অবস্থা এই কারণে বিশেষ ভীতিজনক। তাহাকে সর্ব্বদা আত্মরক্ষার জন্য সতর্কভাবে প্রস্তুত থাকিতে হইতেছে।

অবশ্য বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্রে জাপান কৌশলে ইংরাজ ও রুশপক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক খানিকটা কাজ হাঁসিল করিয়া লইতেছে। আর ইংরাজ হাতে পায়ে ধরিয়া জাপানকে নিজের দলে রাখিতেছেন। দুই পক্ষেরই স্বার্থসিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু জাপানের ব্যবহারে মিত্রদল বড় সন্তুষ্ট নন। রাষ্ট্রমণ্ডলে শত্রুতা মিত্রতার কোন অর্থ নাই। মিত্রতার ভিতরে ভিতরেই শত্রুতা চলিতে থাকে।

ইংরাজ বর্ত্তমানে জাপান হইতে যুদ্ধের জন্য খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতেছেন—অস্ত্র-শস্ত্রও ক্রয় করিতেছেন। রুশিয়ার অস্ত্র-শস্ত্রের নিতান্ত অভাব। শুনা যায়, জার্ম্মাণেরা যে সকল রুশ-সৈন্য বন্দী করিয়াছে তাহাদের হাতে মধ্যযুগের তরবারি ও ভোঁতা বন্দুক মাত্র ছিল! রুশিয়া এই কারণে জাপানের শরণাপন্ন হইয়াছেন। রুশকর্ম্মচারীরা আজকাল দলে দলে জাপানে আসিয়া গোলাবারুদের অর্ডার দিতেছে।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে জাপানের বিরুদ্ধে ইংরাজ ও রুশমত তৈয়ারী হইতেছে দেখিতে পাই। ইয়াঙ্কিদের জাপান-বিদ্বেষ ত আছেই। ১৯০৪।৫

সালের রুশ-যুদ্ধে ইয়োরামেরিকার জাতিপুঞ্জ জাপানের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ না করিয়া ভাল করে নাই—আজকাল সকলের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইতে চলিয়াছে। আগামী কোন গোলযোগের সময়ে সেই ভুল শোধরাইয়া লইবার জন্ম সকলেই প্রস্তুত—ইহা বেশ বুঝা যায়।

চীনের সঙ্গে জাপানের নূতন সন্ধি দেখিয়া ইয়োরামেরিকা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতির আশঙ্কা ইংরাজের। কিন্তু ইংরাজ এখন ইয়োরোপ লইয়া এত বিব্রত যে, এশিয়ায় হস্তক্ষেপ করিবার অবসর নাই। জার্ম্মাণিকে সাম্‌লাইয়া উঠিতেই ইংরাজ গলদঘর্ম্ম হইতেছেন। তাহার উপর এশিয়ার এই জার্ম্মাণ-জাতিকে শত্রু বিবেচনা করিতে হইলে, ইংরাজ পাগল হইয়া পড়িবেন। কাজেই চীনে জাপানের "দুর্ব্ববহার" এক্ষণে ধামা চাপা থাকিতেছে। রুশিয়ার দুরবস্থা এত বেশী যে, ৮।১০ বৎসর পর্য্যন্ত জাপানের বিরুদ্ধে চীন লইয়া গণ্ডগোল সুরু করিবার সাহস তাঁহার একেবারেই নাই। এদিকে ইয়াঙ্কিরা তাহাদের নৌবল এবং সেনাবল এখনও পুরাদমে বাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। এইজন্য বর্ত্তমানে তাহারা শান্তিপ্রিয় জাতির গৌরব ভোগ করিতেছে।

যাহা হউক, রুশিয়ার পেট্রোগ্র্যাড্ নগরের এক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে গভীরতর রুশমত প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার এক জাপানী অনুবাদ তোকিওর "হোচি" পত্রে বাহির হইয়াছে, তাহার ইংরাজী অনুবাদের কিয়দংশ জাপান টাইমস্ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল :—

"ইয়োরোপের গণ্ডগোলে জাপান চীনে অতিলোভের বশবর্ত্তী হইতেছেন। ইহা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। ইয়োরোপে লড়াই চিরকাল থাকিবে না। লড়াই থামিলে জাপান বেকুবির কুফল বুঝিতে পারিবেন।"

জাপান যে ইউরোপের গণ্ডগোলে "একস্য সর্ব্বনাশঃ অন্যস্তু পৌষমাসঃ"

নীতি অনুসারে কর্ম্ম করিতেছেন চীনারাও একথা বলিতেছে। বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্রের কথঞ্চিৎ শান্তি হইলেই জাপান চীনে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিবে না, এইরূপই চীনাদের বিশ্বাস। ইহাই তাহাদের আত্ম-রক্ষার সাহস ও ভরসা। তাহারা নিশ্চিন্তভাবে বুঝিতেছে যে, ইয়োরোপের মহাসমর থামিলেই জাপানকে চীনে জব্দ করিবার জন্য অভিমন্যুবধ পালা সুরু হইবে। চীনের একজন প্রধান বিচারপতি এই বিষয়ে "চাইনীজ ষ্টুডেণ্ট্‌স্ মন্‌থ্‌লি" পত্রে লিখিয়াছেন:—

"জাপান চীন দখল করিতে চাহেন, করুন। কিন্তু শীঘ্রই মজা টের পাইবেন। আমরা জাপানকে হারাইতে পারিব না সত্য। কিন্তু জাপানের শত্রু ত কেবল চীনারা নয়। গোটা ইয়োরোপ জাপানকে পিষিয়া ফেলিবে।"

মাস কয়েক হইল আমেরিকার কয়েকজন প্রতিনিধি জাপানের সঙ্গে সদ্ভাব বৃদ্ধির জন্য আসিয়াছিলেন। "জাপান এ্যাসোসিয়েশন কঙ্কর্ডিয়া" নামক জাপানীদের শান্তি-সমিতি তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। এই উপলক্ষ্যে জাপানসরকারের বড় বড় মন্ত্রিগণ উপস্থিত ছিলেন। জাপানের পররাষ্ট্র সচিব ব্যারণ কাতো স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, জাপান শান্তিপ্রিয় বটে কিন্তু বেকুব নয়। দুনিয়ার অন্যান্য জাতি নিজ নিজ স্বার্থ বুঝিয়া কার্য্য করে। জাপানীরাও ঠিক সেইরূপ নিজ স্বার্থ বুঝিয়াই কার্য্য করে। সুতরাং ইয়োরামেরিকার লোকজন নিজেদের চরিত্র সম্বন্ধে যে মাপকাঠি ব্যবহার করেন, জাপানী চরিত্র বিচার করিবার সময়ে যেন তাহা অপেক্ষা কঠিন বা উচ্চ কাঠি ব্যবহার না করেন। চীন ও জাপানের সম্বন্ধ আলোচনা করিবার পর কাতো বলিতেছেন:—

The Europeans and Americans prove at times

to be excessively severe in their criticisms of Japan's doings and policy. They very often make such a noise over our actions as they would never make in the case of peoples more closely related to them racially. In fact they seem to set up a standard of judgment for the Japanese much higher than the standard they themselves desire to be judged by. The Japanese have merits and short comings just as any other people, and their only wish is that they be judged by the western nations as the latter judge of one another".

জাপান বেশ বুঝিয়াছেন যে, খৃষ্টান ও শ্বেতাঙ্গ জাতিপুঞ্জ নিজেদের ভিতর মহাগর্হিত কার্য্য হইলেও তাহা লইয়া বেশী আন্দোলন করেন না। তখন তাঁহারা "সাত খুন মাপ" অথবা "মাকড় মারলে ধোকড় হয়" নীতি অনুসরণ করেন। কিন্তু জাপানীরা সামান্য মাত্র দোষাবহ কার্য্য করিলেই সমগ্র শ্বেতাঙ্গ জগৎ পীতাঙ্গ জাতির বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করেন। জাপান যে দুনিয়ায় সত্য সত্যই "একঘরে"—একথা জাপানী পররাষ্ট্রসচিব খোলাখুলি বুঝাইয়া দিয়াছেন। কথাগুলি বেশ চোখা।

সঙ্গে সঙ্গে এ্যাংগ্লো-জাপানী-মিত্রতা ও সন্ধি সম্বন্ধেও জাপানে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে ও জাপানে আজকাল প্রকাশ্যভাবে বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা চলিতেছে। কিন্তু ইহা কতটা গভীর এবং কতদিন স্থায়ী হইবে, তাহা বলা যায় না। তোকিওর এক অতি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের নাম "কোকুমিন।" ইহার সম্পাদক তোকুতোমি এই জাপানী-ইংরাজ মিত্রতা সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, ইয়াঙ্কিতে এবং জাপানীতে যুদ্ধ বাধিলে ইংরাজ জাপানকে সাহায্য

করিবেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। সুতরাং কাগজে-লেখা সন্ধির উপর জাপানীদের নির্ভর করা উচিত নয়। এই সম্পাদকীয় মন্তব্যের ইংরাজি অনুবাদ "জাপান ইকনমিক এ্যাণ্ড ফিনান্শিয়াল রিভিউ"-পত্রে বাহির হইয়াছে। এই পত্রের সম্পাদক একজন প্রসিদ্ধ পার্ল্যামেণ্ট-মেম্বর এবং রাষ্ট্রবীর। তোকুতোমির মতের এক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে:—

"এই মিত্রতাকে চিরস্থায়ী ভাবা মূর্খামি। রাষ্ট্রমণ্ডলের বন্ধুত্ব আজ আছে কাল নাই। বিশেষতঃ চীন সম্বন্ধে ইংরাজ খোলাখুলি জাপানীদের বিরোধী।"

আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্র-মণ্ডলে জাপানের সমস্যা অত্যন্ত দুরূহ। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে চীনকে পরাজিত করিয়া জাপান একটা নামজাদা রাষ্ট্ররূপে জগতে পরিচিত হইল। ১৯০৪।৫ সালে রুশযুদ্ধের প্রভাবে জাপান জগতে প্রথমশ্রেণীর রাষ্ট্ররূপে সম্মান লাভ করিল। ১৯১৪।১৫ সালের মহাকুরুক্ষেত্রে জাপান জার্ম্মানির শত্রু হইতে বাধ্য হইল। কিন্তু প্রকারান্তরে জাপানকে ইংলণ্ডেরও প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে হইয়াছে। আগামী দশবৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রমণ্ডলে ইহার পরিণাম বুঝিতে পারিব। সম্প্রতি দক্ষিণ আমেরিকায়, ভারতবর্ষে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে জাপানের বিশ্ববাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল।

ভারতবাসীর পেটে আজকাল জাপানবিদ্বেষ দেখা যাইতেছে। সকল কথা তলাইয়া বুঝিলে জাপানকে ভারতবাসীর প্রশংসা করাই উচিত। ভারতবর্ষের বাজার জাপানীরা দখল করিয়া বসিতেছে। তাহা বন্ধ করার ক্ষমতা ভারতবাসীর নাই। সে ক্ষমতা থাকিলে বিগত দশবৎসরের বিদেশী-বয়কট কৃতকার্য্য হইত। এতদিন অন্যান্য বিদেশীয়েরা ভারত জুড়িয়া বসিয়াছিল। আজ জাপান সুযোগ পাইতেছে। এই জন্যই কি জাপান ভারতবাসীর চক্ষুঃশূল? ভারতে জাপান-বিদ্বেষ বড়ই আপশোষের

কথা। রাষ্ট্রমণ্ডলের ধর্ম্ম বুঝিয়াই কোন জাতিবিশেষের নিন্দা বা প্রশংসা করিতে অগ্রসর হওয়া উচিত। পৃথিবীর কোন জাতিই অপর কোন জাতির খাঁটি বন্ধু নয়—আবার খাঁটি শত্রুও নয়। সংসার জটিল। এই বুঝিয়া জটিলভাবেই দুনিয়ায় চলিতে হইবে। জাপানকে ভারতবাসীর বন্ধু বিবেচনা করা কিছুকাল অবশ্যকর্ত্তব্য।

কবি ও সমালোচক য়োনে নোগুচি

নিউইয়র্কে থাকিতে একজন জাপানী যুবকের সঙ্গে দেখা হয়। সে ভাঙ্গা ইংরাজীতে বলিয়াছিলঃ—"আমি সঙ্গীতশিক্ষার জন্য কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়াছি।" যুবকের উত্তর শুনিয়া বিস্মিত হই।

পরে স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোর বিশ্বমেলায় দেখি, জাপানী "ব্যাণ্ডে" ঠিক ইংরাজের মত কনসার্টপার্টি চালাইতেছে। দূর হইতে সেই বাজনা শুনিয়া বাদকগণকে জাপানী বিবেচনা করিতে পারি নাই। তাহারা বিদেশীয় সঙ্গীত এত সুন্দর ভাবে অনুকরণ করিতে সমর্থ।

জাপানী জাহাজে ভোজনালয়ে দুইবেলা কন্‌সার্ট বাজান হইত। সুরগুলি সবই বিদেশীয়গণের সমাজে সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু জাপানীরা এত স্বচ্ছন্দে গৎগুলি বাজাইয়া যাইত যে, সেগুলিকে ইহাদের দেশীয় কায়দা বলিয়া ভ্রম হইত। শুনিতে পাই লণ্ডনে ১৯১০ সালে এ্যাংগ্লোজাপানী মেলা বসে তাহাতে জাপানী সেনাবিভাগের ব্যাণ্ড ইয়োরোপীয় সুর বাজাইয়া ইংরাজ শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। ইহাও কম বিস্ময়ের কথা নয়।

আজ টোকিওর উয়েনোপার্কে একটা সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে যাইয়া দেখি, এখানে আগাগোড়া বিদেশীয় সঙ্গীত শিখান হইতেছে। শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে কয়েকজন জার্ম্মাণ। বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে একটাও জাপানী যন্ত্র নাই। ছাত্র ও ছাত্রীরা জার্ম্মাণ গান শিখিতেছে—ইংরাজি গানও শিখান হয়। অথচ শিক্ষার্থীরা জার্ম্মাণ কিংবা ইংরাজি ভাষা অতি সামান্য মাত্র শিখিয়াছে। এক গৃহে দেখিলাম, জাপানী গান জার্ম্মাণ সুরে বাঁধা হইতেছে।

এই বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা ১০০, ছাত্রসংখ্যা ৮০। শিক্ষালাভের পর ইহারা সাধারণতঃ সরকারী বিদ্যালয়ে সঙ্গীত-শিক্ষক হইয়া থাকে। এই উপায়ে সমাজের সকল স্তরে বিদেশীয় তাল, মান, লয় প্রচারিত হইতেছে। জাপান গবর্ণমেণ্ট স্বদেশী সঙ্গীতশালাও স্থাপন করিয়াছেন।

জাপানীদের স্বদেশী বাদ্যযন্ত্র অতিশয় সহজ ও সরল—তাহারা বিদেশীয় যন্ত্রের ব্যবহারে সুদক্ষ হইতেছে কি করিয়া তাহা বিশেষ বিস্ময়েরই কথা। বিশেষতঃ, জাপানীদের দেশীয় গীত নিতান্তই একঘেয়ে—অনেকটা হয়ত বেসুরো। তাহাদের কান এরূপ আওয়াজে অভ্যস্ত। অথচ বিদেশীয় সুরের উঠানামা ও গাম্ভীর্য্য ইহাদের কানে ভাল লাগিতেছে! অধিকন্তু এমন কি, অনেক ক্ষেত্রে হয়ত গানগুলির ভাষা বুঝিবার ক্ষমতা ইহাদের নাই। ভারতেও এরূপ সম্ভব।

দুনিয়ার ভাল জিনিষগুলি হজম করিবার ক্ষমতা এই জাতির অসাধারণ। ১৩০০ বৎসর কাল জাপানীরা কোরিয়া, চীন ও ভারতবর্ষ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়াছে—বিগত ৫০ বৎসর হইতে ইয়োরামেরিকা জাপানের পুষ্টিসাধনোপযোগী রসদ যোগাইতেছে। জাপানের খাঁটি নিজস্ব কিছুই নাই।

সঙ্গীত-বিদ্যালয় হইতে হোটেলে ফিরিয়া কবি য়োনে নোগুচির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম্। ইনি সম্প্রতি কেও-বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। ইহাঁর জীবন অতি বিচিত্র। যৌবনে আমেরিকায় গৃহস্থঘরে থালা বাসন মাজিবার চাকরী করিয়া অন্ন সংস্থান করেন। প্রথম হইতে ইহাঁর কবিত্ব শক্তির বিকাশ দেখা যায়। বহুকাল স্বদেশের বাহিরে থাকায় মাতৃভাষায় অধিকার অল্প—ইনি ইংরাজীতে কবিতা রচনা করিয়া থাকেন। এক্ষণে ইহাঁর কবিতাবলী বিলাতে মুদ্রিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশী তরুদত্ত, সরোজিনী নাইডু, মনোমোহন ঘোষ এবং রবীন্দ্রনাথের ন্যায় নোগুচি ইংরাজী সাহিত্যে স্থান পাইতেছেন। গত

বৎসর যখন বিলাতে পদার্পন করি তখন নোগুচিকে লইয়া ইংরাজ-মহলে নানা আলোচনা হইতেছিল। নোগুচি সেই সময়ে ছয়মাস কাল বিলাতে কাটাইয়া জাপানে ফিরিয়া আসেন। তাহার এক বৎসর পূর্ব্বে রবিবাবুকে লইয়া ইংরাজেরা মাতামাতি করিতেছিল। আজকাল ইংলণ্ডে এবং সমগ্র জগতেই প্রাচ্য আদর্শের সমাদর আরব্ধ হইয়াছে। বিশেষতঃ নোগুচি রুশ-বিজয়ী জাতির বংশ-সম্ভূত। আর সেই জাতি সম্প্রতি ইংরাজের মিত্র। ইঁহার আদর ত সর্ব্বত্র হইবেই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয়, আপনি ত রুশযুদ্ধের দু-এক বৎসর পূর্ব্বে একবার বিলাত গিয়াছিলেন, তখন ইংরাজেরা আপনাকে বিশেষ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল কি?" নোগুচি উত্তর করিলেন—"এ যাত্রায় ইংরাজ-সমাজে আমি যত আদর পাইয়াছি, তাহার সঙ্গে ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বেকার অভিজ্ঞতা তুলনা করাই উচিত নয়। তখন আমার কেন?—কোন জাপানীরই আদর হওয়া একপ্রকার অসম্ভব ছিল। অধিকন্তু এইবার ইংরাজের বড় বড় সাহিত্য-পরিষৎ নিমন্ত্রণ দ্বারা আমাকে লইয়া যান। অকস্‌ফোর্ড, লণ্ডন ইত্যাদি নগরে আমাকে বক্তৃতা দিতে হইয়াছে। ইংরাজ-সমাজে আজকাল আমার পুস্তক বিক্রয় বেশ হইতেছে।"

নোগুচির সঙ্গে তাঁহার পল্লীগৃহে যাত্রা করিলাম। ট্রামে নগরের শেষ সীমা পর্য্যন্ত আসিয়া রেলে বসিলাম। পাড়াগেঁয়ে দৃশ্য—চষা জমি, চালা ঘর, বাঁশের বাকারির বেড়া, দরমার টাটি ইত্যাদি দেখিতে দেখিতে একটা গ্রাম্য ষ্টেসনে আসিয়া নামিলাম। নির্জ্জন পল্লীপথ—গাছের ঝোপের ভিতর দুই চারিটা কুটির—চারিদিকে শ্যামল বাগান—জুন মাসে ফুলের বাহার কোথাও দেখি না। জাপানে ফুল-লীলা দেখিবার জন্য মে কিম্বা অক্টোবরে আসা আবশ্যক। হোটেল হইতে প্রায় ১৭।১৮ মাইল দূরে নোগুচির বাসভবন। ইনি প্রতিদিন এইস্থান হইতে কলেজে যাওয়া

আসা করেন। কুঞ্জবনের ভিতর নব নির্ম্মিত জাপানী কাষ্ঠকুটির একখানা "কাকেমনোর" উপর অঙ্কিত ছবির মত দেখাইতেছে। সঙ্কীর্ণ গলির দুই পার্শ্বে ঝোপের বেড়া। গৃহের সম্মুখে কৃষক-কুটির, ধানের ক্ষেত, শব্জীর ক্ষেত ইত্যাদি চারিদিকে দেখিতে পাইতেছি। অদূরে বৌদ্ধ-মন্দির।

নোগুচি পাঁচ বৎসর হইল এই গৃহ নির্ম্মান করিয়াছেন। খরচ পড়িয়াছিল প্রায় ৫০০০৲। বাগানের ভিতর দিয়া কাঠের মেজের নিকট পৌঁছিলাম। বসিয়া জুতা খুলিতে হইল। ডাইনে বাঁয়ে গড়ান কাগজ-প্রাচীর সরাইয়া কুঠুরিতে প্রবেশ করা গেল। এই কামরা নোগুচির পাঠগৃহ। কয়েকটা ছোট ছোট আলমারিতে কাব্য ও সমালোচনা বিষয়ক ইংরাজী গ্রন্থ সাজান রহিয়াছে। মেজেতে মাদুরের ফরাস পাতা —দেওয়ালে জাপানীচিত্র ঝুলান। পার্শ্বগৃহ অতিথিগণের জন্য রক্ষিত। দুইয়েই এক ধরণের আসবাব। বিলাতের রাজকবি ব্রিজেসের ফটো, কবি ইয়েটসের হস্তলিখিত অভিনন্দন পত্র, ফ্র্যান্‌সিস টম্‌পসনের ক্ষুদ্র "বাষ্ট" ইত্যাদি নোগুচির স্মারক বস্তুসমূহ দেখিলাম।

কথায় কথায় জানা গেল, রবিবাবু দুই তিন মাসের ভিতর জাপানে আসিতেছেন। তিনি নোগুচিকে লিখিয়াছেন যে, জাপানী শিল্প ও সাহিত্য আলোচনা করাই তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য। উভয়ে পূর্ব্বে বাক্যালাপ হয় নাই—পত্র ব্যবহারও এই প্রথম।

নোগুচির পত্নী আসিয়া যথারীতি হাঁটু পাতিয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন। ইহাঁর শিশুগণও তাহাই করিল। ভাবিলাম, ইহার নাম "সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ"। খানিকটা বিব্রত হইয়া অবনতমস্তকে বলিলাম—"আরিগাতো" অর্থাৎ "ধন্যবাদ"।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার পত্নী বোধ হয় লেখাপড়া বেশ জানেন কিন্তু ইংরাজী শিখিতে ইচ্ছা করেন না কেন? অথচ আপনি

নিজে ত ইংরাজীকেই প্রথম হইতে বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। নোগুচি বলিলেন, "আমি আজকালকার "নব্য" নারী পছন্দ করি না। আমার স্ত্রীও এই সকল হুজুগ ভালবাসেন না। আমার বাল্যকাল ইংরাজি ভাষাভাষী সমাজে কাটিয়াছে—আমি বহুকালাবধি জাপানের খাঁটি স্বদেশী প্রভাব হইতে দূরে ছিলাম। কিন্তু আমার হৃদয় পুরাপুরি জাপানীই রহিয়াছে। আমি পাশ্চাত্য আদর্শের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন জাপানে চাহি না। আমাদের চিরপরিচিত পল্লীজীবন, কুটিরগৃহ, নীরবতা ও শান্তিপ্রিয়তা বর্ত্তমান যুগেও আমি পছন্দ করি। পাশ্চাত্যের হৈ চৈ, প্রগল্‌ভতা, নগর-সভ্যতা ও কৃত্রিমতা আমার ভাল লাগে না। আশা করি, সমগ্র জাপানে আমাদের স্বদেশী আদর্শই রক্ষিত হইয়া যাইবে।"

আমরা কাকাস্থ ওকাকুরাকে জাপান-আত্মার বাণী-মূর্ত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি। তাঁহার ভারতহিতৈষণায় আমরা তাঁহাকে আমাদের স্বদেশীয় একজন ভাবিতে অভ্যস্ত। এইরূপে ভগ্নী নিবেদিতা পর হইয়াও আমাদের নিজের লোক বিবেচিত হন। ওকাকুরার Ideals of the East অর্থাৎ "প্রাচ্য জগতের আদর্শ" এবং Awakening of Japan অর্থাৎ "জাপানের জাগরণ" গ্রন্থদ্বয়ে আমরা জাপানকে চিনিতে পারি—সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য জগতের মর্ম্মকথাও শুনিতে পাই। কবি নোগুচিকেও ওকাকুরার সতীর্থ সুহৃৎ দেখিতে পাইতেছি। ওকাকুরা আজকাল পরলোকে—কিন্তু নোগুচি তাঁহার স্থান কিছু কিছু অধিকার করিতে পারেন। ভারতবাসীর এই কথাটা জানা আবশ্যক। অবশ্য নোগুচিকে পাকা দার্শনিক বা প্রগাঢ় পণ্ডিত বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই।

বিলাতে থাকিতেই নোগুচি-প্রণীত The Spirit of Japanese Poetry অর্থাৎ "জাপানী কাব্যের অন্তর-কথা" নামক সমালোচনা গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলাম। তাহাতেই লেখককে বুঝিতে পারি। তিনি

জাপানী সাহিত্যের মর্ম যে ভাবে প্রচার করিয়াছেন, তাহা হইতেই বুঝিয়াছিলাম, চিত্রসমালোচক ওকাকুরা এবং সাহিত্যসমালোচক নোগুচি এক গোত্রের অন্তর্গত। তবে এই সকল প্রচার-কার্য্যে খানিকটা অত্যুক্তি ও বাড়াবাড়ি সর্ব্বত্রই দেখা দেয়।

ভাবুকতা ও সংযম সমগ্র এশিয়ার প্রাণস্বরূপ। প্রাচ্য সাহিত্যে ও শিল্পে তাহার পরিচয় যথেষ্ট। নোগুচি স্বয়ং এই ভাবুকতা ও সংযমের উপাসক। ইঁহার কবিতায় ও গদ্য রচনায় এই দুই লক্ষণ দেখিতে পাই। জাপানী সাহিত্যের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়াও ইনি এই দুই দিক ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। অনেক স্থলে মাত্রা যারপর নাই বাড়িয়া গিয়াছে! জাপানী সাহিত্যে সংযম ও নীরবতা সম্বন্ধে নোগুচি তাঁহার লণ্ডনের এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন :—

"Japanese poetry, at least the old Japanese poetry is different from westem poetry in the same way as silence is different from voice, night from day. The latter always naturally enough fails through being too active to properly value inaction, restfulness or death ; to speak shortly, the passive phase of Life and the world. * * * Oh, our Japanese life of dream and silence ! * * The Japanese poetry is that of the moon, stars and flowers, that of a bird and waterfall for the noisiest. If we do not sing so much of Life and the World it is not from the reason that we think their value negative, but from our thought that it would be better in most cases, to leave them alone, and not to sing of them is

the proof of our reverence towards them. Besides, to sing the stars and flowers in Japan means to sing life, since we human beings are not merely a part of nature but nature itself."

অর্থাৎ "জাপানীরা স্বপ্ন ও নীরবতা ভালবাসে। আমাদের সাহিত্যে ফুলের কথা, তারার কথা, চাঁদের কথাই বেশী। অত্যধিক হৈ চৈ বা আওয়াজ আমরা পছন্দ করি না। খুব জোর পাখীর রব অথবা নির্ঝরের ঝরঝর পর্য্যন্ত আমরা আদর করিয়া থাকি। ইয়োরোপের উৎকট উন্মাদনা আমাদের স্বভাববিরুদ্ধ। আমরা প্রকৃতির সঙ্গে এক হইয়া জীবন যাপন করিতে চাহি।"

বৈদিক সাহিত্য হইতে রবীন্দ্র-সাহিত্য পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধেও নোগুচির এই কথা প্রযোজ্য। দার্শনিক-সমালোচক কবি নোগুচিকে ভারতবাসীর জানা আবশ্যক। ধ্যানী বুদ্ধের প্রভাব-প্লাবিত য়ামাতোদেশে প্রকৃতিপূজা, অতীন্দ্রিয়-পরায়ণতা, অসীমে প্রীতি প্রদর্শন প্রকটিত হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? অথচ অধ্যাপক ডিকিন্‌সন তাঁহার নব প্রকাশিত "এপ্পিয়ার‍্যান্সেজ্" গ্রন্থে জাপানকে এশিয়ার সন্তান এবং ভারতের শিষ্য ও "গুরু ভাই" ভাবিতে পারেন নাই। তিনি কয়েকটা ব্যাঙ্ক ও দোকান গৃহে ইলেক্ট্রিক লাইট, রেলওয়ে ষ্টেসনের আধুনিক বন্দোবস্ত এবং কয়েকজন হ্যাটকোটপরা অধ্যাপক ও ব্যবসায়ী দেখিয়া সমগ্র জাপানকে ইয়োরামেরিকার মফঃস্বল মাত্র বিবেচনা করিয়াছেন। জাপানকে ডিকিন্‌সন বুঝেন নাই। খাঁটি জাপানকে বুঝিতে হইলে নোগুচির মত ব্যাখ্যাকার খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। আর চোখ খুলিয়া স্বাধীনভাবে জাপানী সমাজের ভিতরবাহির দেখিতে হইবে। ভাবুক নোগুচি "কবি"-শীর্ষক কবিতায় তাঁহার শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

The Poet.

The roses live by eating of their own beauty and
then die :
He too is fed on his own poem.
His poem ? yea, his very flesh in the grasp of the
moment !
What a cry of the Soul and flesh in the grasp of the
moment !

* * * * *

His song is the funeral chant for his own death of
every moment ;
Through death,or birth, (he is the poet of the moment
sad life,)
Into the menace of human life he awakes.
The roses live by the eating of their own beauty and
die.
His flesh and soul shall ruin themselves as the bones,
Ana float as shipwrecked masts over the greyness
of waste.

"The Lotus" কবিতায় ভাবুক বলিতেছেন :—

The one lotus whiter than prayer,
Before me rose fall as a dream,
With the Sunlight fallen through the clouds,
The flower smiled the sorrow of Heaven.

In her voice of dew she says :—

"The gate of sorrow is Heavens gate,

The price of admittance is only the tea ;

The fire of silence makes thy soul white."

কবিতাত্রয় "পিল্‌গ্রিমেজ" পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত। এই কবিতা-সংগ্রহ সম্বন্ধে একজন ইংরাজ সমালোচক লিখিয়াছেন :—

"This Buddhistic sensitiveness to the Universal is also implicit throughout the whole of Mr. Noguchi's poems. * * * The Japanese poet is passionately absorbed in the exquisite beauty of each succeeding moment in earthly life; but the power which each moment has over him is derived from the fact that he perceives in its beauty a suggestion, an apparition of the Eternal. Lament for the transitoriness of earthly beauty is never far from Mr. Noguchi's poetry, but the consolation of feeling the universal behind all beauty is never far off either." অর্থাৎ "বৌদ্ধ আদর্শের প্রেরণা নোগুচির সাহিত্যে দেখিতে পাই। ইনি বিশ্ব-প্রীতির প্রচারক। ইনি জগতের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইঁহার কাব্যে সাংসারিক সৌন্দর্য্য বিরাট বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের ইঙ্গিত মাত্র। জগতের সৌন্দর্য্য চিরস্থায়ী নয়। এই কথা দুঃখের সহিত বার বার নোগুচি বলিতেন। কিন্তু দুনিয়ার সনাতন চিরস্থায়ী সৌন্দর্য্যের কথায় চিত্ত সর্ব্বদাই প্রফুল্ল।"

নিউ ইয়র্কের রূপশিল্পী ও সমালোচক ম্যাক্স্‌ওয়েবারকে যে সুর

সাধিতে দেখিয়াছি জাপানের কবি নোগুচিও সেই সুরই সাধিতেছেন। এই সুর আমাদের "গীতাঞ্জলি"র সুর।

"ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।" ইত্যাদি।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে রুশ যুদ্ধের পূর্ব্বে তোকিওর প্রসিদ্ধ অধ্যাপক নিতোবে নোগুচি প্রণীত From the Eastern Sea নামক কবিতাগ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন :—

"Here, then, is a poet whom we can proudly claim as our kith and kin and yet who has shaken off the cobwebs of our poetical tradition, who in fact, has freed himself from the narrowing influences at home and is singing with all his might in the free open air of a mighty sentiment." অর্থাৎ "এই কবি আমাদেরই ঘরের লোক। অথচ ইনি আমাদের গতানুগতিক পথ ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইনি নূতন কাব্যপথ খুলিয়া একটা নূতন জগতের বার্ত্তা আনিয়াছেন।"

নোগুচি সম্বন্ধে অধ্যাপক প্রশ্ন করিতেছেন :—

"Is he a type of our race or is he to be a solitary exception ? Does he stand for the essence of the nation or for a mere incident ? It may well before literary Japan to ponder over these questions in the light of the writings of Yone Noguchi." অর্থাৎ "নোগুচি কি জাপানে একমেবাদ্বিতীয়ং থাকিয়া যাইবেন ? না ইঁহার জুড়িদার এবং চেলা জাপানে আরও দেখা দিবেন ?"

আমি নোগুচিকে নব্য জাপানের বাণী মূর্ত্তি দেখিলাম। নোগুচি

জাপানীর জাপান বুঝিয়াছেন—জাপানীর জাপান প্রচারিত করিতেছেন। বর্ত্তমান যুগের জাপানকে যত গভীর ভাবে বুঝিব ততই দেখিতে পাইব যে, জাপানের সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ নর নারীর হৃদয় নোগুচির ভাষায় ও ভাবেই নাচিয়া উঠে। ইয়োরামেরিকার প্রভাবে জাপানের নিজস্ব নষ্ট হয় নাই। এখনও ভারতবর্ষ এবং জাপানের সম্বন্ধ বিষয়ে বলিতে পারি—

"উঠিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষদ্বার
আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে যাঁর।"

জাপান আজিও হৃদয়ে হৃদয়ে ভারতবর্ষের বাণীই প্রচার করিতেছে—জাপান বিংশ শতাব্দীতেও ভারত-মণ্ডলেরই অন্তর্গত। নোগুচি রবীন্দ্র-নাথেরই সহোদর। "গীতাঞ্জলি "এবং "পিল্‌গ্রিমেজ্‌" এক খনি হইতেই উদ্ভূত। অবশ্য কেবল মাত্র এই সুরই এশিয়াবাসীর সুর নয়। অন্যান্য সুরও এশিয়ারই নিজস্ব। সে দিকেও যেন দৃষ্টি থাকে।

নোগুচি-পত্নী চা লইয়া আসিলেন। কবি বলিলেন—"ওকাকুরার 'বুক্‌ অব্‌ টী' পাঠ করিয়াছেন কি? তাহাতে আমাদের 'চা-মঙ্গল' বিবৃত হইয়াছে। জাপানী ভাষায় তাহার নাম 'চানউ'। অতি সমারোহের সহিত চা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। আমার স্ত্রী ঘরের ভিতর সেই অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করিয়াছেন। কাজেই আপনার ইহা দেখা হইল না।" বলা বাহুল্য চায়ে দুধ ও চিনি নাই। কাঠের পেয়ালায় তিক্ত সবুজ বর্ণের গরম চা পান করা গেল। জাপানে গাভীর অভাব, এই জন্য জাপানীরা দুধ ঘি ব্যবহার করে না। আজকাল রেওয়াজ হইতেছে।

নোগুচি মাতৃভাষায়ও প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। প্রধানতঃ সাহিত্য-

কোন কোনটা ইংরাজিতে অনূদিত দেখিতে পাই। Through the Torii অর্থাৎ "তোরণ দ্বারের ভিতর" নামক ইংরাজী গদ্য-গ্রন্থে কতক-গুলি সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এই পুস্তকে নোগুচির দেশী ও বিদেশী, জাপানী সমাজ ও সভ্যতা, প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, ইয়েটস্, রসেটি, অস্কার ওয়াইল্ড, তোকিও, কিয়োতো, কাব্য, শিল্প ইত্যাদি নানা বিষয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তা-পূর্ণ রচনা স্থান পাইয়াছে। এইগুলি পাঠ করিলে নোগুচির ইঙ্গিত ও মত অবগত হওয়া যায়। জাপানী সাহিত্যে অতিশয় সংক্ষিপ্ত সূত্রের আকারে একপ্রকার কবিতা আছে। তাহার নাম "হোক্কু"। হোক্কু আমাদের দোঁহা। তবে ভারতবাসীর পক্ষে এই কবিতাপদ্ধতি কিছু নূতন। "What is the Hokku poem ?" এবং "Again on Hokku" প্রবন্ধদ্বয়ে ভারতীয় সাহিত্য-প্রেমিকগণ নূতন তথ্য পাইবেন।

সঙ্গীত, চিত্রকলা ইত্যাদি বিষয়ে গল্প করিতে করিতে দুইজনে মাঠে বাগানে কৃষকপল্লীর ভিতর দিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। বহু দিন পরে বাঁশ-বনের তলদেশ চক্ষুগোচর হইল। একটা মন্দিরে খানিকক্ষণ কাটান গেল। সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখি, উঠানে জল ছিটাইয়া নোগুচি-পত্নী সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালিয়াছেন। পরে যথারীতি জাপানী খানায় যোগদান করিলাম। রুই মাছের ঝোল রান্না হইয়া-ছিল—কাঁচা মাছ পাতে দেওয়া হয় নাই। "চপষ্টিকে" সুবিধা হইল না—চামচের সাহায্য লইতে হইল।

নৈশ-ভোজনের পর গল্প চলিতে লাগিল। মাস খানেক হইল The Spirit of Japanese Art অর্থাৎ "জাপানী চিত্র-শিল্পের অন্তর কথা" নামক নোগুচির নূতন পুস্তক বাহির হইয়াছে। অন্যান্য পুস্তকের ধুয়াই ইহাতেও আছে। নোগুচির সকল লেখাই কতকগুলি খাপছাড়া

পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য বা খাঁটি দার্শনিকতা নোগুচি-সাহিত্যে দেখি নাই।

সকলকে "সায়োনারা" বলিয়া বিদায় হইলাম। নোগুচিপত্নী জাপানী ভাষায় হাসিয়া বলিলেন—"আবার আসিবেন"।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে—বর্ষার মেঘে চন্দ্রালোক কিছু নিস্তেজ।

টেক্‌নিক্যাল্‌ স্কুল

জাপানের প্রত্যেক বিদ্যালয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষার আয়োজন আছে। অধিকন্তু একমাত্র শিল্পের জন্যই কতকগুলি স্বতন্ত্র শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় সকলগুলিই সরকারের অধীন—সরকারী শিক্ষাবিভাগের অন্তর্গত।

তোকিওতে ছোট-বড় অনেক টেক্‌নিক্যাল স্কুল আছে। সর্ব্বপ্রধানের নাম "হাইয়ার টেক্‌নিক্যাল স্কুল"। এই বিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের সঙ্গে নিউইয়র্কে আসিবার সময়ে জাহাজে আলাপ হইয়াছিল। তিনি তখন জার্ম্মাণি, সুইর্জাল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশের তড়িৎ-কারখানা পরিদর্শন-পূর্ব্বক স্বদেশে ফিরিতেছিলেন। আজ তোকিওর এই শিল্পশালার প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখা করিলাম। প্রিন্সিপ্যাল একজন প্রবীণ ব্যক্তি—বিশ বৎসরের অধিককাল এই কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। নাম তেজিমা

ইনি প্রথমেই ভারতীয় ছাত্রগণের কথা পাড়িলেন। এই বিদ্যালয়ে এক্ষণে বয়ন-বিভাগে, রঞ্জন-বিভাগে এবং পোর্সিলেন-বিভাগে তিনচারিজন ভারতীয় ছাত্র লেখাপড়া শিখিতেছে। ইহারা অধ্যাপকগণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছে। কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল মহাশয় বলিলেন—"ইহারা গণিতে বড় কাঁচা। শিল্পবিদ্যালয়ের প্রত্যেক বিভাগেই গণিতের প্রয়োজন। ভারতীয় ছাত্রেরা এই কথা জানিয়া পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইলে সুফল লাভ করিতে পারিবে।" বিগত ৭।৮ বৎসরের ভিতর কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র এই বিদ্যালয় হইতে শিখিয়া দেশে ফিরিয়াছে। তেজিমা তাহাদের নাম করিলেন। ইনি বারে বারে বিশেষ করিয়া বলিলেন—"আমরা

ভারতীয় ছাত্রগণের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বসিয়া আছি। তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিতে আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত। জাপানে কোন ভারত-বাসীর অবজ্ঞা হইবে না।" তোকিওর সকল মহলেই ভারতবাসীর প্রতি জাপানের সস্নেহ-দৃষ্টি লক্ষ্য করিতেছি। কাব্যবিশারদের যুগ আর নাই মনে হইতেছে। যে কয় দিন এইরূপ চলে সেই কয় দিন ভারতবাসীরই সুবিধা।

রঞ্জন, বয়ন, তড়িৎ, চীনা মাটির কাজ, বাস্তু ও গৃহনির্ম্মাণ ইত্যাদি নানাবিষয়ে ওস্তাদ তৈয়ারি করা এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। এই বিদ্যা-লয়ে শিক্ষালাভ করিয়া যুবকেরা জাপান-সরকারের নানা কার্য্যে নিযুক্ত হয়। জাপানে যে সকল রাসায়নিক অথবা এঞ্জিনীয়ারিং কারখানা আছে সেই সমুদয়ের কর্ত্তারাও এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে কর্ম্ম দিয়া থাকেন।

তোকিওর এই বিদ্যালয়ের প্রত্যক ছাত্রকে কতকগুলি সাধারণ বিষয় শিখিতে হয়। আজকাল শিল্প ও ব্যবসায়ের সকল মহলেই ন্যূনাধিক পরিমাণে এই সমুদয়ের কাজ আবশ্যক। নিম্নে তালিকা প্রদত্ত হইতেছে:—

নীতি, গণিত, পদার্থবিদ্যা, চিত্রাঙ্কণ, যন্ত্রের ছবি, ধন-বিজ্ঞান, কারখানার স্বাস্থ্যরক্ষা, ফ্যাক্টরী-নির্ম্মাণ, হিসাবরক্ষা, ইংরেজী ভাষা, ব্যায়াম-শিক্ষা।

তেজিমার সঙ্গে বিদ্যালয়ের সকল বিভাগ ঘুরিয়া দেখিলাম। টেক্‌-নিক্যাল স্কুল দুনিয়ার সর্ব্বত্রই একপ্রকার—নূতন বা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার কিছু নাই। কেবল ভাবিতে লাগিলাম—"মাত্র ১৫ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া গবর্ণমেণ্ট এই বিদ্যালয়ের গৃহ, আসবাব, যন্ত্র, হাতিয়ার, কারখানা, ল্যাবরেটারী ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়াছেন। এত অল্পব্যয়ে ভারতবর্ষে একটা উচ্চ অঙ্গের শিল্প-বিদ্যালয় আমরা তৈয়ারী করিতে পারি না কেন? অথচ এই বিদ্যালয়ে বর্ত্তমানে ১০০০ ছাত্র শিক্ষা

পাইতেছে। আর এই সকল ছাত্রই জাপানী-শিল্পের ধুরন্ধর হইতেছে।" তেজিমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বার্ষিক ব্যয় সর্ব্বসমেত কত ?" ইনি উত্তর করিলেন—"অধ্যাপকগণের বেতন দিতে প্রতি বৎসর ২৫০০০৲ খরচ হয়। সর্ব্বসমেত প্রায় ১০০ শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। ইঁহারা সাধারণতঃ ৭৫।১০০৲ মাসিক বেতন পাইয়া থাকেন। মাসিক ৪০০।৪৫০৲ টাকার উর্দ্ধে কোন ব্যক্তি বেতন পান না। এই উচ্চহারে বেতনপ্রাপ্ত অধ্যাপকের সংখ্যা বেশী নয়।" ছাত্রদত্ত বেতন হইতে এই খরচের প্রায় অর্দ্ধেক উঠিয়া আসে—অপর অর্দ্ধ গবর্ণমেণ্টের কোষাগার হইতে পাওয়া যায়।

জাপানে শিক্ষক, অধ্যাপক ইত্যাদির মাসিক বেতন অতি অল্প। প্রত্যেক দেশেই শিক্ষাবিভাগের ব্যক্তিগণ অন্যান্য বিভাগের লোকজন অপেক্ষা অল্প আয়ে জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। জাপানে ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। এখানে উকিল, ডাক্তার, মহাজন, শিল্পী, কণ্ট্রাক্টর, ব্যবসায়ী ইত্যাদি ব্যক্তিগণ প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন—অথচ ইম্পীরিয়াল্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ অধ্যাপকগণও তিন চারিশত টাকার বেশী বেতন পান না। তাঁহারা এই অল্প আয়েই সন্তুষ্ট। ভারতীয় যথার্থ ব্রাহ্মণগণের আদর্শ জাপানী-শিক্ষক-মহলে দেখিতে পাইতেছি। নব্য-ভারতীয় অধ্যাপক ও শিক্ষক মহাশয়গণ এবং বিদেশফের্ত্তা "স্পেশ্যালিষ্ট" বা ওস্তাদগণ সেই দারিদ্র্যের আদর্শ ভুলিয়া যাইবেন কি ?

এক বিভাগে দেখিলাম, বহুসংখ্যক নিতান্ত অল্পবয়স্ক বালক তড়িতের যন্ত্রাদি নির্ম্মান করিতেছে। অধ্যাপক নাকামুরা এই সকল বালকের তৈয়ারী বহুসংখ্যক শিল্প-যন্ত্র দেখাইলেন। ইঁহারই সঙ্গে আট্‌লাণ্টিক-বক্ষে আলাপ হয়।

ত্রিশ বৎসর হইল এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রথম প্রথম একজন জার্ম্মাণকে বিদ্যালয়ের কর্ত্তা করা হইয়াছিল। তাহার পর বিদেশীয় সাহায্য আবশ্যক হয় নাই। এক্ষণে একজন ইংরাজ এবং একজন ইয়াঙ্কি বিদ্যালয়ে কর্ম্ম করিতেছেন। ইহাঁদিগকে সাধারণ হইতে উচ্চতর হারে বেতন দিতে হয়। কিন্তু চুক্তি মাত্র তিন বৎসরের। জাপানীরা এইরূপ চুক্তি করিয়া বিদেশীয় ব্যক্তি নিযুক্ত করিতে সিদ্ধহস্ত। দুই তিন বৎসর পর ইহারা বিদেশীয় লোক বদলাইয়া থাকে। সঙ্গীত-বিদ্যালয়েও এইরূপ দেখিয়াছি।

নব্য-জাপানে পাশ্চাত্য সাহিত্য

জাহাজে মচিজুকি-প্রণীত "জাপান টুডে" গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলাম। তাহার এক অধ্যায়ে ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছুবৌচির নাম পাই। মচিজুকি লিখিয়াছেন:—"In 1889 a Professor of Literature was added to the faculty at the suggestion of Dr. Tsubouchi. His ambition was to save the national literature from the decadence it had suffered for upwards of thirty years while the public mind was occupied with political problems. He was confident of bringing out in Japan a new sort of literature profiting by the convergence of oriental and occidental civilisations. Under the guidance of the Professor, who was and still is, one of the foremost dramatists, novelists and critics in Japan, the Department of Literature has done much towards harmonising the thoughts of the East and the West, and placing the study of literature and drama in Japan on a scientific basis."

পাশ্চাত্য নাট্য, কাব্য ও গদ্য সাহিত্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া জাপানী সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করা ছুবৌচির উদ্দেশ্য ছিল। মাতৃভাষা এবং স্বদেশীয় সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-বিধান বিষয়ে ছুবৌচি কাউণ্ট ওকুমার প্রিয় বন্ধু। বলিতে কি, মাতৃভাষার সাহায্যে উচ্চতম শিক্ষা

প্রদানের ব্যবস্থা করিবার জন্যই ওকুমা তাঁহার ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। সে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের কথা। তখন জাপানী ভাষা নিতান্ত নগণ্য ছিল। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জ্জনের জন্য জাপানী-দিগকে তখন ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইংরাজী ভাষার উপর নির্ভর করিতে হইত। এমন কি, তখনও জাপানী ভাষায় দুইচারি খানা উচ্চ অঙ্গের অনুবাদ গ্রন্থই বাহির হয় নাই—মৌলিক গ্রন্থ ত দূরের কথা। সেইসময়ে ইম্পিরিয়্যাল ইউনিভারসিটিতেও বিদেশীয় ভাষার সাহায্যেই বিদেশীয় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি জাপানী সমাজে প্রচারিত করা হইত। এই যুগে দূরদর্শী শিক্ষাপ্রচারক, নব্য জাপানের অন্যতম জন্মদাতা ওকুমা প্রচার করিলেন যে, খাঁটি স্বদেশী বিদ্যালয় প্রবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত জাপানের উদ্ধার নাই।

"Count Okuma had a conviction that the independence of a nation in its true sense must be based upon the efficient use of its own language, so that any higher study might be prosecuted in the vernacular tongue." অর্থাৎ "যে দেশের সকল উচ্চশিক্ষায় দেশীয় ভাষার ব্যবহার হয় একমাত্র সেই দেশই যথার্থ স্বাধীন।" কাউন্ট ওকুমা আজকাল জাপানের প্রধান মন্ত্রী। ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহারই নায়কতায় পরিচালিত হইতেছে।

ওকুমা মাতৃভাষাকে সকল উপায়ে ঐশ্বর্য্যশালিনী করিতে প্রবৃত্ত—অধ্যাপক ছুবৌচি জাতীয় সাহিত্যকে জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পদে উন্নত করিতে কৃতসঙ্কল্প। কিন্তু উভয়েই বিশ্বশক্তির উপাসক—দুনিয়ার সকল প্রকার উচ্চবিদ্যা মন্থন করিতে উভয়েরই সমান অনুরাগ। বর্ত্তমান জাপানের আদর্শও ইহাই। যুবক ভারতও কি ইহাই বুঝে নাই? ওকুমা ও ছুবৌচির কার্য্যপ্রণালী ভারতের সর্ব্বত্রই ত দেখিতে পাইতেছি।

বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে ছুবৌচির বাসভবনে উপস্থিত হইলাম। গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ছুটি। জুতা খুলিয়া প্রবীণ অধ্যাপকের পাঠগৃহে প্রবেশ করিলাম। আলমারীভরা জাপানী, চীনা ও ইংরাজী গ্রন্থ। জাপানী আতিথ্যের চা-পান দ্বারা যথারীতি আপ্যায়ন হইল।

ছুবৌচি ফরাসী অথবা জার্ম্মাণ জানেন না—ইংরাজীর সাহায্যে ইয়োরামেরিকার মর্ম্ম গ্রহণ করেন। দর্শন বা ইতিহাসের দিকেও ঝোঁক অতি অল্প। খাঁটি সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়াই জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। সাহিত্যের মধ্যেও নাট্যসাহিত্যই ছুবৌচির প্রধান আলোচ্য বিষয়। ফরাসী ও জার্ম্মাণ সাহিত্যের ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিবার অভ্যাসও ইঁহার আছে: বিশেষভাবে সেক্‌সপীয়ার ঘাঁটিয়াই ইঁহার আনন্দ।

ইনি ইংরাজীতে কথা বলিতে কিছু অপারগ এই জন্য পুত্রের সাহায্য লইলেন। পুত্র ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট—সম্প্রতি তিন বৎসর বিলাতে কাটাইয়া ফিরিয়াছেন। লণ্ডনে নাট্যকলা এবং বিশেষ ভাবে নৃত্যবিদ্যা শিখিতেছিলেন। বড় বড় থিয়েটারের কর্ত্তাদের অধীনে অভিনয় নৃত্যাদি শিখিবার সুযোগ পাইয়াছেন।

ছুবৌচির সঙ্গে ইংরাজী সাহিত্যের সকল যুগ সম্বন্ধেই দুএক কথা হইল। প্রাচীনতম বীডা হইতে বার্ণাড্‌শ পর্য্যন্ত সকল স্তরের কথাই ইঁহার জানা আছে। আমরা ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষার অভিমান করিয়া থাকি—ইংরাজী সাহিত্যে পাণ্ডিত্য লইয়া ভারতবাসীর একটা গৌরব আছে। কিন্তু সে গৌরবের কোন মূল্য নাই। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে অমরা অ-আ-ক-খ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫।২০ বৎসর কাল এই সাহিত্য আলোচনা করিতে বাধ্য। যদি আমরা ঘরে বসিয়া রুশ কিম্বা জার্ম্মাণ সাহিত্যে এই পরিমাণ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিতাম, তাহা হইলে সত্য সত্যই বড়াই করিবার উপায় থাকিত। ছুবৌচি ঘরে বসিয়া কোন

বিশ্ববিদ্যায়ের নিয়মে ল্যাংল্যাণ্ড, চসার ইত্যাদির রচনা মুখস্থ করিতে বাধ্য না হইয়া এ্যাংলো-স্যাক্সন হইতে নবীনতম সাহিত্য পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছেন। ছুবৌচির ইংরাজী সাহিত্যে পাণ্ডিত্য সত্যই গৌরবের সামগ্রী। অথচ তিনি কখনও জাপানের বাহিরে যান নাই। এক্ষণে ইঁহার বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। ছুবৌচির সংস্পর্শে আসিয়া একটা অভিনব দৃষ্টি লাভ করিলাম মনে হইতেছে।

ছুবৌচি জাপানী নাট্য-সাহিত্য, রঙ্গালয় ও নৃত্যকলার উন্নতি বিধানের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। ইঁহার সমালোচনায়ও নাটকব্যবসায়িগণের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে।

ভারতীয় সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা জানিবার জন্য ইঁহার বিশেষ আগ্রহ দেখিলাম। সংস্কৃত নাটকীয় সাহিত্যের পরিচয় ইঁহার কিছু কিছু আছে। সেক্সপীয়ারীয় নাটকসমূহের মধ্যে কোন্ গুলি জাপানীরা পছন্দ করেন? এই প্রশ্নের উত্তর পাইলাম—"বিষাদাত্মক নাটকগুলিত জগৎ-প্রসিদ্ধ। কিন্তু Tempest এবং Midsummer Night's Dream এর আদর আমাদের সমাজে বিশেষভাবে দেখা যায়। কল্পনার খেলা এই গুলিতে বেশী আছে। ইনি জিজ্ঞাসা করিলেন "ভারতবর্ষে শুনিয়াছি ট্র্যাজেডি নাটক লিখিত হইত না?" আমি উত্তর করিলাম, "যদি রঙ্গমঞ্চের উপর কতকগুলি আত্মহত্যা এবং খুনাখুনি দেখান বিষাদাত্মক নাটকের একমাত্র লক্ষণ হয়, অথবা শেষ অঙ্কে কতিপয় নটনটীর মরা লাস দেখাইয়া দর্শকগণের হৃদয়ে বীভৎস রস সৃষ্টি করার নাম ট্র্যাজেডি বা বিয়োগান্তক নাটক হয়, তাহা হইলে ভারতীয় সাহিত্যে ট্র্যাজেডি হয়ত দেখিতে পাইবেন না। কিন্তু খুনাখুনি, রক্তারক্তি, বিষপান, আত্মহত্যা ইত্যাদি না দেখাইয়াও মানব-জগতের চূড়ান্ত বিষাদ দেখান যায়। সেই বিষাদে দর্শকমণ্ডলীর চিত্ত করুণরসে

আরও হয়। গ্রীক দার্শনিক্ এ্যারিষ্টটলের ব্যাখ্যা অনুসারে ট্র্যাজেডি শব্দ গ্রহণ করিলে বহু বিচিত্র প্রণালীতে ট্র্যাজেডির উৎপত্তি হইতে পারে স্বীকার করিতে হইবে। যেখানে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব, যেখানে আবেষ্টনের সঙ্গে মানব-শক্তির বিরোধ, যেখানে সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তি দণ্ডায়মান সেইখানেই ট্র্যাজেডির বীজ রহিয়াছে। এইরূপ আদর্শের দ্বন্দ্ব, মানব ও প্রকৃতির বিরোধ, ব্যক্তি ও পরিবারে কলহ হিন্দুসাহিত্যে অনেক আছে। বস্তুতঃ যেখানে এরূপ দ্বন্দ্ব ও বিরোধ নাই সেখানে উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যই আছে কি না বলিতে পারি না। ট্র্যাজেডিই দুনিয়ার সাহিত্যে একমাত্র গভীর ও সূক্ষ্ম পদার্থ। ভারতীয় সাহিত্যে ট্র্যাজেডি নাই এ কথা বলিলে বুঝা যাইবে যে, ভারতবর্ষের কবিগণ জগতের গভীরতম ও উচ্চতম সমস্যাগুলির আলোচনা করেন নাই। বস্তুতঃ বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস সকলেই অসংখ্য ট্র্যাজেডির নমুনা রাখিয়া গিয়াছেন। সেইগুলিতে বেশ বুঝিতে পারি যে, Sweetest songs are those that tell of saddest thought. অর্থাৎ "মধুর সে গান যাহা বিষাদে ভরা"। সেই সমুদয়ের কাহিনী শুনিলেই অথবা অভিনয় দেখিলেই হৃদয় করুণরসে অভিষিক্ত হইয়া যায়। ফলতঃ এ্যারিষ্টটলের মতানুসারে ভারতীয় সাহিত্যে ট্র্যাজেডির সংখ্যা কম নয় বলিব। অথচ ভারতীয় রঙ্গালয়ে মুর্দ্দাফরাস অথবা শ্মশানঘাটের বাড়াবাড়ি হয় নাই।"

গীতিকাব্য বা লীরিক্ সম্বন্ধে কিছু আলাপ হইল। ছুবৌচি শেলীকে ভালবাসেন। Prometheus Unboundএর কথা উঠিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "জাপানী কাব্যে ইহার অনুরূপ কোন কাহিনী আছে কি?" ছুবৌচি বলিলেন—"প্রাচীনকালে কতকগুলি বৌদ্ধ লোকসাহিত্যে এই ধরণের একটা গল্প পাই। সেই গল্প অতিশয় বৃহৎ। তাহার দুএক অধ্যায়ে একজন সাধু বা পুরোহিতের কথা আছে। তিনি দুই

পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর এক সেতু নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অকৃতকার্য্য হন। সেই সাধুর নাম এন্।" এই গল্পের চিত্রও পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় অষ্টম নবম শতাব্দীর অঙ্কিত চিত্রের একখানা নকল চিত্র দেখিলাম। ইহাতে সাধু এনের মূর্ত্তি রহিয়াছে।

ছুবৌচি কয়েকখানা সেক্সপীয়ারীয় নাটকের জাপানী অনুবাদ করিয়াছেন। ইহার "রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েট" জাপানে সুপ্রসিদ্ধ। জাপানের ইম্পিরিয়াল একাডমি ছুবৌচিকে সেক্সপীয়ারের জাপানী অনুবাদের জন্য পুরস্কার দিয়াছিলেন। বিলাতের যেমন রয়্যাল সোসাইটি, ফ্রান্সের যেমন সুপ্রসিদ্ধ একাডেমী, জাপানের সেইরূপ ইম্পিরিয়াল য়্যাকাডেমী। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও অন্যবিধ পণ্ডিতগণ এই পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হন। স্বয়ং মিকাডো নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন।

ইলেক্‌ট্রিক তারের কারখানা

আজকাল দুনিয়ার সর্ব্বত্র তড়িতের ব্যবহার দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। স্থলপথে টেলিগ্রাফ, জলপথে কেবল্‌গ্রাফ, টেলিফোন, অর্ণবযান, রেল, ট্রাম ইত্যাদি যত বাড়িতেছে—ইলেক্‌ট্রিসিটির প্রয়োজনীয়তা তত বেশী বুঝা যাইতেছে। ব্যবসায়, বাণিজ্য, গমনাগমন, সংবাদপ্রদান ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যে প্রত্যহই তড়িৎশক্তির প্রভাব দেখিতে পাই। অধিকন্তু বর্ত্তমান যুগের যুদ্ধবিদ্যায়ও ইহার স্থান অতিশয় উচ্চ। প্রত্যেক রাষ্ট্রের সমর-বিভাগ ও নৌ-বিভাগ এক একটা তড়িতের ফ্যাক্টরী চালাইতে অথবা অধীনে রাখিতে বাধ্য। ইলেক্‌ট্রিসিটির প্রয়োগে ওস্তাদ না হইলে বিংশ শতাব্দীতে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া ধৃষ্টতা মাত্র।

তড়িতের ব্যবহার করিতে হইলে দুই প্রকার বস্তুর আবশ্যক হয়। প্রথমতঃ নানা প্রকার যন্ত্র, দ্বিতীয়তঃ তার। প্রত্যেক দেশের পথ-বিভাগ, রেলওয়ে-বোর্ড, সেনাবিভাগ, এবং অর্ণবযানবিভাগ এই দুই প্রকার বস্তুর প্রধান ক্রেতা। অধিকন্তু শিল্পী, ব্যবসায়ী, টেলিফোন-কোম্পানী, ট্রাম কোম্পানী, ফ্যাক্টরীর মালিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকগণ, আলোক-সরবরাহকারিগণ ইত্যাদি নানা শ্রেণীর লোকও এই দুই বস্তু ক্রয় করিতে বাধ্য।

জাপানীরা বহুকাল বিদেশ হইতে এই সকল বস্তু আমদানী করিয়াছিল। স্বদেশে ইলেক্‌ট্রিক তার বা যন্ত্রের কোন কারখানা ছিল না। কিন্তু এখানকার "স্বদেশী ওয়ালারা" অল্প কয়েক বৎসরের ভিতর অদ্ভুত

এবং টেলিফোনের জন্য তার বিদেশ হইতে আমদানি করা হইতেছে না। স্বদেশী ফ্যাক্টরীতে তড়িতের তার তৈয়ারি হইতেছে। কিন্তু জলপথে সংবাদ পাঠাইবার জন্ত তারসম্বন্ধে জাপানীরা এখনও খাঁটি স্বদেশী হইয়া উঠিতে পারে নাই।

তোকিও সহরের অনতিদূরে সিঞ্জকু পল্লী। এখানে ইলেক্‌ট্রিক তারের একটা ফ্যাক্টরী আছে। প্রায় বিশ বৎসর হইল এই কার্য্য আরব্ধ হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে কারখানার মাল বাজারে বিক্রয় হইতেছে। কারখানার বর্ত্তমান মালিক শ্রীযুক্ত মাৎসুমোতো। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কারবারের সূত্রপাত করেন।

মাৎসুমোতোর সঙ্গে কারখানা দেখা হইল। ইহাঁর একজন সহকারী কারখানার সকল বিভাগ দেখাইলেন। প্রথমে রবারের ঘরে প্রবেশ করিলাম। ইলেক্‌ট্রিক তারকে রবার পেছাইয়া লইতে হয়। এইরূপ না করিলে তারের ভিতরকার তড়িৎ বাহির হইয়া যাইতে পারে। তারকে এই উপায়ে বাহিরের প্রভাব হইতে রক্ষা করার নাম "ইনসুলেশন"। আমরা ল্যাবরেটরীতে, টেলিগ্রাফ আপিসে, টেলিফোনের কলে, তড়িতের আলোকে যে সমুদয় তার দেখি সবই "রক্ষা করা" তার। তার অনেক উপায়ে "ইন্‌সুলেট" করা যাইতে পারে। রবার দ্বারা ইন্‌সুলেট্‌ করা প্রধান উপায়।

প্রদর্শক বলিলেন—"জাপানে রবারের গাছ নাই। ইকোয়েডর, পেরু, বলিভিয়া ইত্যাদি দক্ষিণ আমেরিকার দেশপুঞ্জ হইতে আমাদিগকে রবার আমদানি করিতে হয়।" প্রথম অবস্থায় রবারের চাপ দেখিতে কাঠের মত। এই রবারকে কলের সাহায্যে ছেঁচিয়া পরিষ্কার করা হইতেছে। তাহার পর গন্ধক, প্যারাফিন ইত্যাদির সঙ্গে ছেঁচা রবার মিশ্রিত করা হয়। এই জন্তও কল আছে। এই কলে দেখিলাম,

মিশ্রিত পদার্থের রূপ শুক্‌না কৃষ্ণবর্ণ আমসত্ত্বের মত হইয়াছে। পরে প্রকাণ্ড চাদরের আকারে রবারের আমসত্ত্বকে একটা কলে গুটান হইতেছে। গুটাইবার সময়ে এক প্রকার শ্বেতাভ চূর্ণ ব্যবহার করা হয়। দেখিতে উহা ছাতু বা ময়দার মত। প্রদর্শক বলিলেন—"এই বস্তু মাইকার গুঁড়া (বা অভ্র চূর্ণ)।" বড় চাদরগুলিকে যথানির্দ্দিষ্ট বিস্তৃতি অনুসারে কাটিবার জন্যও কলের ব্যবস্থা আছে।

পরে এক কামরায় আসিলাম। এখানে বহুসংখ্যক কল চলিতেছে। এক একটাতে এক এক প্রকার তারের সঙ্গে রবার জড়ান হইতেছে। কোন কলের সাহায্যে এক সঙ্গে তিনটা রবারের পাত তামার তারের উপর পেঁচান হইয়া যায়। কোন কলে তার রবার ফুঁড়িয়া নিজের আবরণ প্রস্তুত করিয়া লইতেছে—ইত্যাদি।

রবার-জড়ান তারের উপর আবার সূতা পেঁচান হইয়া থাকে। এই এই জন্যও বহুসংখ্যক কল আছে। বয়ন-কারখানায় এই ধরণের কল বিশেষ আবশ্যক হয়। এই সকল কলের দ্বারা রেশমী অথবা তুলার সূতা তারের সর্ব্বোপরিস্থ আবরণে পরিণত হইতেছে।

তার এইরূপে ইনসুলেট করিবার পর ৫।৭ ঘণ্টা ধরিয়া তাপের ভিতর রাখা হয়। অত্যুচ্চ মাত্রায় তাপ প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাপের প্রভাবে গন্ধক, প্যারাফিন ও রবারের মিশ্রণ একটা অবিচ্ছিন্ন নূতন পদার্থে পরিণত হয়। এইরূপ তাপপ্রদানকে "ভালক্যানাইজ্" করা বলে। তাহার পর তার ঠাণ্ডাজলে ভিজাইয়া পরীক্ষা করা হয়।

এক ঘরে দেখিলাম—তারের আবরণ কাগজে প্রস্তুত হইতেছে। শুনিলাম, টেলিফোনের জন্য রবার-জড়ান তার ব্যবহার না করিলেও চলে। সাধারণতঃ অল্পদূরবর্ত্তী দুই স্থানকে সংযুক্ত করিবার জন্য টেলিফোনের তার আবশ্যক হয়। এই কাজের জন্য কাগজের আবরণই যথেষ্ট।

রবারের আবরণে এবং কাগজের আবরণে একটা প্রভেদ আছে। রবার জড়াইবার পূর্ব্বে তামার তার গলান টিনের ভিতর দিয়া চালাইয়া লইতে হয়। তাহার ফলে রাঙের আবরণ তারের উপর পড়ে। রাঙের আবরণ লাগাইবার ব্যবস্থা এই কারখানাতেই আছে। এতদিন পর্য্যন্ত তামার তার জাপানের অন্যান্য ফ্যাক্টরী হইতে কিনিয়া আনা হইত। প্রদর্শক একটা ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন—"এখন হইতে এই সকল ঘরে আমরা নিজেই তার প্রস্তুত করিয়া লইব। এই দেখুন নূতন কল বসান হইতেছে।"

সীসার তারও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাটির নীচে যে সকল তার পোঁতা হয় সেইগুলি সাধারণতঃ সীসা-নির্ম্মিত। তামার তারের মত সীসার তারও ইন্‌সুলেট করিবার ব্যবস্থা এই কারখানায় দেখা গেল। প্রণালী কথঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। তুলা ও রেশমী সূতার আবরণ এই জন্য আবশ্যক হয় না। পাটের দড়ি বা সূতাদ্বারা সীসা ইন্‌সুলেট করিতে হয়। অধিকন্তু রবার, "পিচ্", প্যারাফিন্ ইত্যাদি নানা পদার্থ গলাইয়া এক প্রকার তীব্রগন্ধযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ আল্‌কাত্‌রাসদৃশ তরল পদার্থ প্রস্তুত করা হয়। এই তরল পদার্থে ভিজান দড়ি তারের চতুর্দ্দিকে পেঁছান হইতেছে।

মাৎসুমোতোর কারখানা জাপানে এই কারবারের পথ-প্রদর্শক। এই জন্য প্রথম প্রথম অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। বর্ত্তমানে যথেষ্ট লাভ হইতেছে। আজকাল এখানে সর্ব্বসমেত প্রায় ৩০০ পুরুষ ও স্ত্রী কার্য্য করে। কলগুলির কোনটা বিলাতী, কোনটা জার্ম্মাণ, কোনটা আমেরিকান মাল।

সেইকোষা ঘড়ির ফ্যাক্টরি

গুজরাতের মুসলমান ক্রোড়পতি জামাল ভারতবর্ষে সুপ্রসিদ্ধ। ব্রহ্মদেশে "জামাল-কোম্পানীর" বিরাট কার্য্য চলিতেছে। তুলা, চাউল এবং তেলের কারবারে ইঁহারা গত বৎসর ষাট লাখ টাকা লাভ করিয়াছেন।

কয়েক মাস হইল জামাল জাপানে আসিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার একজন প্রবীণ ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী জাপানে আসিয়াছেন। তিনি এই হোটেলে পার্শ্বের গৃহেই বাস করিতেছেন। জামাল-কোম্পানী ব্রহ্মদেশে তামার খনি খুঁড়িবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া ভূমি "প্রস্‌পেক্ট" বা পরীক্ষা করা হইয়াছে। কারবার খুলিবার জন্য আনুমানিক ব্যয় এবং কলকারখানা ও লোকজন ইত্যাদির খসড়াও প্রস্তুত করা হইয়াছে। এক্ষণে বিদেশ হইতে উপযুক্ত খনিতত্ত্ববিৎ এবং আকরখননে সুপটু লোকসংগ্রহের চেষ্টায় কর্ম্মচারী মহাশয় বাহির হইয়াছেন। রেঙ্গুন ছাড়িবার সময় ঠিক ছিল আমেরিকায় যাইবেন। কিন্তু সেদিন "ইণ্ডো-জাপানীজ" এ্যাসোসিয়েশনের সভায় প্রকাশ্য ভাবে বলিয়াছেন—"আমি যে সকল যন্ত্র ও উপকরণ খরিদ করিবার জন্য আমেরিকায় যাইতেছিলাম সেগুলি জাপানেই অতি সস্তায় পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং আমি এযাত্রায় আমেরিকা পর্য্যন্ত যাইব না।" এই সভায় কাউণ্ট ওকুমা উপস্থিত ছিলেন। ওকুমা এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি।

কর্ম্মচারী মহাশয় জাপানের একজন প্রসিদ্ধ মাইনিং এঞ্জিনিয়ারকে মাসিক ১৫০০৲ বেতনে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইঁহার সঙ্গে তিন বৎসরের চুক্তি করা হইয়াছে। এইরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন ইয়াঙ্কি অথবা ইংরাজকে

নিযুক্ত করিতে হইলে অন্ততঃ ৪০০০৲ লাগিত। আকরখনন-কার্য্যের জন্য ইনি ১০।১২ জন করিৎকর্ম্মা পাকা লোক চালান করিবার আয়োজন করিতেছেন। এই উপায়ে ব্রহ্মদেশে একটা ক্ষুদ্র জাপানী-উপনিবেশের বীজ উপ্ত হইয়া থাকিবে। বস্তুতঃ যুদ্ধের প্রভাবে ভারতীয় বাজারে জাপানী মালের কাট্‌তি বাড়িয়া যাইতেছে—ভারতবাসী জাপানী-ব্যবসাদার ও শিল্পিগণের সংখ্যাও অনেক হইবে। এইরূপেই ক্রমশঃ আরও অনেক নূতন ঘটনা ঘটিতে থাকিবে।

জামাল-কর্ম্মচারীর সঙ্গে একটা ঘড়ির কারখানা দেখিতে গেলাম। ভারতবর্ষে সেইকোষা-মার্কা ঘড়ি আজকাল অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। সেই ঘড়ির ফ্যাক্টরীতে ঘড়ি তৈয়ার করা দেখিতে পাওয়া গেল। কারখানায় প্রায় ১৩০০ পুরুষ ও স্ত্রী কার্য্য করে। আগাগোড়া কলে কাজ চলিতেছে। শ্রমজীবীরা কলের সম্মুখে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া ঘড়ির বিভিন্ন অংশ ধরিয়া আছে। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কল। কলসমূহ বিদেশ হইতে আমদানি করা হইয়াছে। বৎসরে ৪০০,০০০ ছোট ঘড়ি ও বড় ঘড়ি এই কারখানায় প্রস্তুত হয়। কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, চীন, ষ্ট্রেট্‌স্ সেট্‌ল্‌মেণ্টস্ ও ভারতবর্ষে প্রায় তিন লক্ষ ঘড়ি রপ্তানী হইয়া থাকে।

মাথা খাটাইয়া কাজ করিবার জন্য ৪৮ জন ওস্তাদ নিযুক্ত। ইঁহাদের মধ্যে ৮ জন মাত্র সুইর্জল্যাণ্ড, জার্ম্মানি, ইংলণ্ড ইত্যাদি দেশ হইতে কার্য্য শিখিয়া আসিয়াছেন। কারবারে ত্রিশলক্ষ টাকা খাটিতেছে। হাতরি নামক একব্যক্তি ইহার মালিক। জাপানে অনেক বড় বড় কারবার এক এক জনের সম্পত্তি—যৌথসম্পত্তি নয়। কারখানা মাত্র ২৩ বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রমজীবিরা দিনে ১১ ঘণ্টা কার্য্য করে। গৃহ হইতে খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে

করিয়া আনা ইহাদের দস্তুর। কারখানার ভিতর একটা ভোজনালয় আছে। পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা তাহাদের চিরাভ্যস্ত কাপড়চোপড় পরিয়াই কারখানায় আসে।

আজ হোটেলে একজন প্রবীন ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি কলে মাদুর বুনিবার প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন। নিজের আবিষ্কৃত পেটেণ্ট করা কল প্রায় ১৫০ প্রকার। বহুকাল নীরবে এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করিয়া বাজারে মাল ফেলিয়াছেন। এক্ষণে ত্রিশ লক্ষ টাকা লাগাইয়া কারবার বাড়ান হইতেছে।

জাপানীরা নিজের কার্য্যফল নিজে পরীক্ষা না করিয়া বাজারে বাহির হয় না। যতদিন পর্য্যন্ত সন্তোষজনক ফল পাওয়া না যায় ততদিন তাহারা পরীক্ষা ও অনুসন্ধান-কার্য্যে লিপ্ত থাকে। এই পরীক্ষার জন্য সময় ও অর্থ ব্যয় করা তাহারা অপব্যয় বিবেচনা করে না। এই জন্যই যখন তাহারা সত্যসত্যই কাজে লাগিয়া যায় তখন অল্পকালের মধ্যেই বিস্ময়জনক কার্য্য করিয়া ফেলে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে জাপানীরা যে সকল জিনিষ স্বদেশে প্রস্তুত করিতে পারিত না আজ তাহারা সেই সমুদয় জিনিষ প্রস্তুত করিয়া বিদেশে চালান দিতেছে। জাপানের গত দশ বৎসরের সঙ্গে আমাদের "স্বদেশী আন্দোলনের" যুগ তুলনা করিলে জাপানী ও ভারতীয় কার্য্য-প্রণালীর প্রভেদ বুঝিতে পারিব।

আমরা কোন এক ব্যক্তিকে ২।৩ বৎসর কাল আমেরিকায় বা জার্ম্মাণীতে শিখাইয়া আনি। তৎক্ষণাৎ তাহাকে ওস্তাদ করিয়া সুবৃহৎ কারখানা খুলিতে প্রবৃত্ত হই। জাপানীরা এইরূপ দুএকজন ওস্তাদের উপর নির্ভর করে না। ওস্তাদের কার্য্যক্ষমতা প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে যাচাই করিয়া লইবার জন্য এবং প্রয়োজন হইলে বাড়াইয়া তুলিবার জন্য তাহা-দের প্রয়াস থাকে। এইজন্য খরচপত্র করিতে তাহারা অভ্যস্ত। ভারত-

বর্ষে ১৯০৫ সালের আন্দোলন জাপানী-প্রণালীতে পরিচালিত হইতে পারে নাই—কারণ পরীক্ষা, অনুসন্ধান ও এক্স্‌পেরিমেণ্ট ইত্যাদি হইবার পূর্ব্বেই বিদেশী-বর্জ্জন সুরু হইয়াছিল। তাহার জন্য আমাদের দুঃখিত হইবারও কারণ হয় নাই। যেন-তেন-প্রকারেণ "হাতে খড়ী" হইয়া গিয়াছে।

বিদেশীয় সাহিত্যে নবীন জাপান

জাপানী পার্লামেণ্টের মেম্বার মচিজুকি এদেশে সুবক্তা বলিয়া খ্যাত। পার্ল্যামেণ্টে জাপানী ভাষাতেই আলোচনাদি হইয়া থাকে। মচিজুকি ইংরাজীতেও গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন।

ইনি "লিবার‍্যাল নিউজ এজেন্সি" নামক পত্রের সম্পাদক। দিনে দুইবার করিয়া বিদেশীয় সংবাদ প্রচার এই পত্রের উদ্দেশ্য। ইংরাজী ভাষায় ইহা সম্পাদিত হয়। জাপানের সংবাদও বিদেশে পাঠান মচিজুকির কার্য্য। মচিজুকির আফিসে দেখা করিলাম। কিওমনো পরিয়া কার্য্য চালাইতেছেন। ইনি বিলাতে বহুকাল ছিলেন—লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছেন—ব্যারিষ্টারি পাশও করিয়াছিলেন।

জাপানীর অধীনে বিদেশীয় ভাষায় সংবাদ-প্রচার জাপানে সাধিত হইত না। এই জন্য বিদেশীয় লোকেরা জাপান সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুমত ও ভুলমত পোষণ করিত। রুশ-যুদ্ধের পর জাপান ইয়োরামেরিকার রাষ্ট্রমণ্ডলে উচ্চ স্থান পাইয়া স্বকীয় মর্য্যাদা রক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছেন। দেশীয় অবস্থা বিদেশীয় ভাষায় প্রচার করা তাহার অন্যতম উপায়।

মচিজুকি "ফিনান্সিয়াল এ্যাণ্ড ইকনমিক মন্থলি" নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক। ইহাতে জাপানের ধনাগমের উপায় ও টাকার বাজার আলোচিত হয়। ভারতবর্ষে বসিয়া ইংরাজীর সাহায্যে বর্ত্তমান জাপানকে বুঝিতে হইলে এই পত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য। মচিজুকি-প্রণীত "জাপান টুডে" বহু তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ। ইনি কিছুকাল হইল জার্ম্মাণি গিয়াছিলেন। জাপানী

ভাষায় জার্ম্মাণি সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনাও করিয়াছেন। প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে একজন প্রিন্সের সঙ্গে রুশিয়ার রাজ-দরবারে উপস্থিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। আমেরিকা এবং জাপানের পরস্পর সম্বন্ধ আলোচনা করিয়া মচিজুকি একখানা ইংরাজি গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

বর্ত্তমান জগতে জাপানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মচিজুকি বিশেষ চেষ্টিত। এই উদ্দেশ্যেই ইনি লেখনী ধারণ করিয়া থাকেন। গ্রন্থব্যবসায়ী এবং সম্পাদক হিসাবে ইনি জাপানে সুপ্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষে ব্যবসায় প্রবর্ত্তনের সুযোগ সম্বন্ধে মচিজুকি মহাজনদিগকে পরামর্শ দিতেছেন। এদিকে বিশেষ ঝোঁক লক্ষ্য করিলাম।

সেদিন ইম্পিরিয়্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নবীন অধ্যাপকের গৃহে অনেক্ষণ কাটান গেল। ইনি জার্ম্মাণিতে পাঁচ বৎসর ছিলেন। লিইপ্‌জিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পারেটিভ ফিলজফির অধ্যাপকের সহকারী রূপে কার্য্য করিতেন। জার্ম্মাণ ভাষা এক্ষণে ইঁহার মাতৃভাষার ন্যায় সহজ। সম্প্রতি অধ্যাপক আনেসকি হার্ভার্ডে কার্য্য করিতেছেন—এই জন্য নবীন অধ্যাপক তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইঁহার নাম ডাক্তার ইশিবাসি।

নিজে খৃষ্টান—কিন্তু স্ত্রী শিন্তোমতাবলম্বিনী। ইশিবাসি জার্ম্মাণ ভাষায় শিন্তোধর্ম্ম সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ হইয়াছে। আরবী ও হিব্রু ভাষায় ইঁহার দখল আছে। বাইবেলের ধর্ম্মমত এবং প্রাচীন জাপানের ধর্ম্মমত তুলনা করা ইহাঁর উদ্দেশ্য! সম্প্রতি শিন্তোধর্ম্মের ইতিহাস মাত্র ধারাবাহিক ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

এদেশে অধ্যাপকগণের বেতন অতি অল্প। ইশিবাসি ১১০৲ মাত্র পান—ঘর ভাড়া দিতে হয় ২৫৲। খাঁটি স্বদেশী ভাবে জীবনযাপন করা অন্যান্য বিদেশ-প্রত্যাগত জাপানীর ন্যায় ইশিবাসিরও অভ্যাস।

জাপানে ইহা সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করিতেছি। বিদেশে দুই তিন বারে আট দশ বৎসর কাটাইয়াও কেহই দেশী পোষাক, দেশী আসবাব, দেশী খানা ছাড়ে না।

জাপানী নৈশভোজনে যোগদান করিলাম। স্ত্রী আসিয়া খাবার দিয়া গেলেন কিন্তু একত্র আহার করিতে বসিলেন না। ইয়োরামেরিকায় স্বামীর সঙ্গে এক টেবিলেই স্ত্রী-পুত্রেরা আহার করিতে বসে। কিন্তু জাপানে অন্য রেওয়াজ। স্বামীর আহারের পর স্ত্রী আহারে বসে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"জাপানী সাহিত্য হইতে খাঁটি শিন্তোমত বাহির করিবার কি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন? খৃষ্টীয় ষষ্ঠ সপ্তম শতাব্দী হইতে কোরিয়া, চীন ও ভারতবর্ষের প্রভাব য়ামাতো সমাজের সকল অনুষ্ঠানে মিশিয়া রহিয়াছে। কন্‌ফিউসিয় ও বৌদ্ধ-স্তরই বা কোন্‌টা? শিন্তোস্তরই বা কোনটা? বর্ত্তমান কালে অবিমিশ্রিত আসল শিন্তোমত কোথাও পাওয়া যায় কি?" ইশিবাসি বলিলেন, "শিন্তো ধর্ম্মের দুইটি লক্ষণ প্রধান—প্রথমতঃ, পূর্ব্বপুরুষ-পূজা, দ্বিতীয়তঃ সম্রাটকে দেবতা বিবেচনা করা। জাপানী সাহিত্যের যেখানে যেখানে এই দুই লক্ষণ পাইব সেখানে শিন্তোপ্রভাব স্বীকার করিব। খৃষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতাব্দীর সাহিত্যে "ম্যানোসিউ" প্রসিদ্ধ। সেই কাব্য-সাহিত্যমালার শেষাংশে বৌদ্ধ প্রভাব বিশেষ প্রকটিত—কিন্তু প্রথম ও মধ্যম ভাগে শিন্তো-তত্ত্বই বেশী পাই।"

আমি বলিলাম—"আপনি যে দুই লক্ষণের কথা বলিতেছেন তাহা ন্যূনাধিক পরিমাণে দুনিয়ার সকল সমাজেই কোন না কোন যুগে দেখা গিয়াছে। রাজার দেবত্ব এবং পূর্ব্বপুরুষ পূজা ইয়োরোপের প্রাচীন ও মধ্যযুগে অবিদিত ছিল কি? ভারতবর্ষেরত কথাই নাই। বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ। মহতী দেবতা হ্যেষা নর রূপেণ

তিষ্ঠতি॥ রাজাকে দেবতা বিবেচনা করিতে হিন্দুগণ যেরূপ অভ্যস্ত সেরূপ বোধ হয় অন্য কোন জাতি নয়। তাহা হইলে দেখিতেছি—হিন্দুরা সেরা শিন্তোমতাবলম্বী!

আর, পূর্ব্বপুরুষ-পূজা ভারতবাসীর মজ্জাগত। ঋগ্বেদের আমল হইতে আজ কলির সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পিতৃতর্পণ হিন্দুসমাজের বিশেষ লক্ষণ রহিয়াছে। পিতৃগণকে পূজা না করিয়া কোন হিন্দু কোন মঙ্গল অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন না। জাপানীরাও বোধ হয় এতদূর পিতৃপূজক নন।"

ইশিবাসি ভাবিতে লাগিলেন—"তবে কি শিন্তোমতটাও জাপানীরা ভারতবর্ষ হইতেই আমদানি করিয়াছে?" ইনি সংস্কৃত জানেন না।

কবি নোগুচি আসিয়া একদিন নূতন এক নো-মণ্ডপে লইয়া গেলেন। সেখানে কেও-বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী অধ্যাপক আমাদের জন্য বসিবার স্থান ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন।

প্রথমে দুইটা গৌরচন্দ্রিকা হইল। সম্মুখে পাঁচজন বালক আসিয়া বসিল—তাহাদের পশ্চাতে পাঁচজন প্রবীন ব্যক্তি। ইহাদের পোষাক আবরণ আটপৌরে। কোন বাদ্য যন্ত্রের ব্যবহার হইল না। বালকেরা একে একে মঞ্চের উপর আসিয়া সুর ধরিয়া দিল। প্রাচীন ব্যক্তিরা গান করিতে লাগিল। বালক নিয়মিত মাপ ও পদবিক্ষেপের রীতি অনুসারে নাচিতে থাকিল। প্রত্যেক বালক খানিকটা নূতন নূতন রীতি অনুসরণ করিল বুঝিলাম। ইহারা হাতে একখানা করিয়া পাখা রাখিয়াছিল। গানের সুর আজও সেইদিনকার মত একঘেয়ে ও গম্ভীর। নাচে আজ কিছু কর্ম্মতৎপরতা ও গতিশীলতা দেখা গেল। কিন্তু বিশেষ প্রীত হইবার উপকরণ নাই। প্রথম পালা শেষ হইয়া গেলে ছয় জন যুবকের পশ্চাতে দুইজন প্রবীণ ব্যক্তি বসিল। এইবারও পূর্ব্বেকারমত যুবকেরা সুর ধরাইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। কোন বাজনা নাই।

অবশেষে আজিকার পালা আরম্ভ হইল। ছুজুমিতে বেতাল চাঁটি সেদিনকার মতই শুনিলাম। আজ লোক দুইটি প্রায়ই বিড়ালের মত বিকট আওয়াজ করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে ভাবিলাম, কে যেন উদ্গীরণ করিতেছে। এক ব্যক্তি বাঁশী বাজাইতেছে। বাঁশীতে কোন সুর বাহির হইতেছে মনে হইল না। আমাদের দেশে শিশুরা বাঁশী হাতে পাইলে যেরূপ ধ্বনিসৃষ্টির কারণ হয় নোমণ্ডপ হইতে সেইরূপ বংশীধ্বনিই শুনিতে পাওয়া গেল।

একজন জেলে কর্মরান্ট পাখীর সাহায্যে সমুদ্রে মাছ ধরিত। আজকালও জাপানে নানা স্থানে এই উপায়ে মাছ ধরা হইয়া থাকে। পাখীকে মাছের নিকট ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মাছ গিলিয়া পাখী কূলে আসে; তাহার পর জেলেরা পাখীর গলা হইতে মাছ বাহির করিয়া লয়। আজিকার নোমণ্ডপে এইরূপ এক ধীবরের "উতা" গীত হইতেছে। অনর্থক জীবহিংসার পাপে তাহার নরকভোগ হয়। তাহার প্রেত আসিয়া বৌদ্ধ পুরোহিতদ্বারে শরণাপন্ন হইল। শেষ পর্য্যন্ত মোক্ষলাভ বর্ণিত হইয়াছে। জেলে ও পুরোহিত মুখোস পরিয়া মঞ্চে অবতীর্ণ। নোগুচি এই গল্পের এক ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন—

নোগুচি তাঁহার "*No*—the Japanese play of silence" অর্থাৎ "নীরবতার নাট্য নো" প্রবন্ধে বলিতেছেন।

"The *No* is the creation of the age when, by virtue of the Buddha's holy name, any straying ghosts or spirits in Hades were enabled to enter Nirvana ; it is no wonder that most of the plays have to deal with those ghosts of Buddhism." অর্থাৎ "নো-সাহিত্যের ভূতপ্রেত বৌদ্ধ ধর্ম্মের আনুষঙ্গিক।"

এই গেল ভূত প্রেতের কথা। নোমণ্ডপের বাহ্য আকার সম্বন্ধে নোগুচি বলেন—"This is the house of fancy where those who can only find strength from the cruelty of their five senses have no right to step in, but the Silent worshippers of the Imperfect will congregate for the holy exercise of ritual of their imagination." অর্থাৎ "নিজের হৃদয় খুলিয়া এই মঞ্চের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি কর। চোখের উপর নির্ভর করিও না।"

বাস্তবে যাহা সুন্দর নয় কল্পনার দ্বারা তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত হইয়া জাপানী "গম্ভীরার" ভক্তেরা সত্য শিব সুন্দরের উপাসনা করে।

নোগুচির মতে একঘেয়ে "উতা"গুলি নিন্দনীয় নয়। বরং "When we feel the beauty of the monotony of the *No* Drama that is gained by the sacrifice of variety, I think that our work of appreciation is just started." অর্থাৎ "একঘেয়েমির আদর করাই ত বাহাদুরী। বৈচিত্র্যের চটকে ভুলিয়া যাওয়া সহজ।"

এতগুলি অসুবিধা ভেদ করিয়া নাটক উপভোগ করা পাশ্চাত্যগণের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। এই জন্য অধ্যাপক ডিকিন্‌সন তাঁহার "Appearances" পুস্তকে বলিতেছেন—"Well, let me be frank like all westerns, so I am accustomed to life in quick time, and to an art full of episodes of intellectual contents of rapid change and rapid developments. I have lost to a great extent that power of prolonging an

emotion which seems to be the secret of Eastern art. I am bored subconsciously, as it were—where an Oriental is called into ecstasy." অর্থাৎ "আমি পাশ্চাত্য লোক। কর্ম্মতৎপরতা ভাল বাসি। সাহিত্যে উন্মাদনা চাই—চলাফেরা নাচা কুদা চাই। শান্তিতে ডুবান, নিশ্চল কল্পনার খেলা আমার ভাল লাগে না। এশিয়ার লোকেরা যে নিবিড় গাম্ভীর্য্যের তারিফ করিবে আমি তাহাতে হাই তুলিব।"

তথাপি নো-নাটককে প্রশংসা করা পাশ্চাত্যগণের ফ্যাসান। ইংরাজ ডিকিন্‌সন বলিতেছেন—"These actors are the only ones who could act Greek drama. They have quite clearly the same tradition and aim as the Greeks. * * * The Japanese have in their *No* Dance a great treasure. * * How thankful would hundreds of young men be, starving for poetry in England, if one had as a living tradition anything analogous to work upon!" "গ্রীক নাট্যই যেন নো-নাট্যে দেখিতেছি। জাপানীরা যেন গ্রীকদিগেরই মাস্‌তুত ভাই!" জাপান যে ফাষ্টক্লাশ পাওয়ার—আর ইংল্যণ্ড যে জাপানের মিত্ররাষ্ট্র!

বাঙ্গালাদেশের গম্ভীরা সম্বন্ধে কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক এই মত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন কি? এখনও দেরী আছে।

এশিয়ার জার্ম্মাণি নবীন জাপান

১৮১৫ সালে ইংরাজ জাতি ওয়াটারলুর সমরক্ষেত্রে নেপোলিয়ানকে পরাজিত করিয়া নিষ্কণ্টক বিশ্ব সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। ইহাই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ঘটনা। এই শতাব্দীতে আর দুইটি চিরস্মরণীয় সন আছে। প্রথম ১৮৬৮-৭০ খৃঃ অঃ, দ্বিতীয় ১৯০৫ খৃঃ অঃ।

১৮৭০ সাল ইয়োরোপে নবীন জার্ম্মাণির জন্ম দিয়াছে। ১৮৬৮ সালে এশিয়ায় নবীন জাপানের উৎপত্তি হইয়াছে। নবীন জার্ম্মাণি আজ ১৯১৫ খৃঃ অব্দে বিশ্বসাম্রাজ্যেশ্বর ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে মল্লযুদ্ধে ব্যাপৃত। ১৯০৫ খৃঃ অব্দে জাপান খৃষ্টান-রুষিয়ার দর্পচূর্ণ করিয়া দুনিয়ায় ইয়োরামেরিকার অহঙ্কার ও আস্ফালন খর্ব্ব করিয়াছেন। তাহার প্রভাবে ইংরাজও জাপানীকে সম্মান করিয়া চলিতেছেন। সুতরাং ১৮৬৮-৭০ খৃঃ অব্দের ঘটনাদ্বয় ১৮১৫ সালের ঘটনাকে মলিন ও হতপ্রভ করিবার জন্যই উৎপন্ন হইয়াছে দেখিতে পাইতেছি। এরূপ যে ঘটিবে তাহা কিছুকাল পূর্ব্বে পর্য্যন্ত জগদ্বাসীর জানা ছিল না।

বিশেষতঃ নবীন জার্ম্মাণি এবং নবীন জাপানের দৌড় কতখানি হইবে তাহা ১৮৬৮-৭০ খৃষ্টাব্দে কোন জাতিই আন্দাজ করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ জার্ম্মাণির জন্ম এবং জাপানের জন্ম সকলের পক্ষেই অতিশয় বিস্ময়জনক ঘটনা বিবেচিত হইয়াছিল। রাষ্ট্রমণ্ডলে জার্ম্মাণ জাতির অভ্যুদয় কোন দিন ঘটিতে পারে তাহা কোন জাতির ধারণায় আসিত না। এশিয়ার "অসভ্যজাপান"ও কোনদিন একটা কিছু করিবে তাহাত মদমত্ত ইয়োরামেরিকা কল্পনাতেও আনিত না। সেই সময়ে ইংরাজ রুষিয়াকেই

প্রধান জুজু ভাবিতেন এবং ফরাসী বিপ্লবের পাণ্ডারা কখন ইয়োরোপের কোথায় গণ্ডগোল বাধাইয়া বসে সেই ভাবনায় অস্থির থাকিতেন। "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই", কলহপ্রিয়, একতাবিহীন, অকেজো জার্ম্মাণ নরনারী সর্ব্বদা পরস্পর কামড়া কামড়ি করিয়াই মরিবে, প্রয়োজন হইলে জার্ম্মাণজাতির কোন কোন দলকে ফরাশীদের বিরুদ্ধে ইংরাজের অর্থসাহায্যে উত্তেজিত করা যাইবে—ইংরাজ রাষ্ট্র-বীরগণ এইরূপই ভাবিতেন। জার্ম্মাণেরা যতই দর্শন রচনা করুক আর কবিতাই লিখুক, গেটে, ফিক্টে, শিলারের ভাবুকতা জার্ম্মাণ-সমাজে যতই প্রচারিত হউক না কেন, যতই উহারা Fur Freiheit Gott and Fatherland গাহিয়া লোকজনকে উন্মত্ত করিয়া তুলুক না কেন, উহারা একটা ঐক্যবদ্ধ শৃঙ্খলীকৃত রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে পারিবে না, এই মত ইয়োরোপে বদ্ধমূল ছিল। কাজেই ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বিস্‌মার্ক যে কৃতিত্ব দেখাইলেন তাহা শীঘ্র শীঘ্র ইয়োরোপের লোকেরা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

এদিকে এশিয়ার জুজু ছিলেন চীন। এই বিশাল মহাদেশে ৪০ কোটি নরনারী বাস করে। ইহারা যদি জাগে, তাহা হইলে দুনিয়ার কাহারও রক্ষা নাই। কাজেই সকলে চীনের ভবিষ্যৎ লইয়াই জল্পনা কল্পনা করিতেন। সুতরাং ১৮৬৮ খৃঃঅব্দে ক্ষুদ্র জাপানের কলহপ্রিয় "দাইমো" জমিদারবর্গ এবং বিলাসপ্রিয় "শোগুণ" নবাব যখন মিকাডো সম্রাটকে সমগ্র রাজ্যের অধিকার প্রদান পূর্ব্বক দুনিয়া হইতে নব্য জ্ঞান বিজ্ঞানের আহরণে পথপ্রদর্শক হইলেন, তাহা বিশ্ববাসীর বুঝিয়া উঠা অসম্ভব হইল। বিস্মার্কের মুক্ত সমুন্নত পতকাতলে জার্ম্মাণ সন্তান সকলের সম্মিলন এবং মিকাডোর চরণতলে সমগ্র জাপানের আত্মোৎসর্গ—দুই ঘটনাই বিস্ময়-জনক ও অভাবিতপূর্ব্ব। অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছিল। যাহা ঘটিতে পারে বলিয়া কোন লোক স্বপ্ন পর্য্যন্ত দেখে নাই তাহাই ঘটিল।

নবীন জাপান এবং নবীন জার্ম্মাণি উভয়ের জন্ম যেরূপ অদ্ভুত ও অচিন্তনীয় রূপে ঘটিয়াছে—পরবর্ত্তী কালে উহাদের বিকাশ এবং বৃদ্ধিও সেইরূপ কল্পনাতীত প্রণালীতে সাধিত হইয়াছে। জাপান ও জার্ম্মাণির সূতিকাগার এবং ভ্রূণাবস্থা যেরূপ বিচিত্র, উহাদের শৈশব এবং যৌবন-কালও সেইরূপ আশ্চর্য্যজনক। আবার জাপানের ক্রমিক বিকাশই জার্ম্মাণির অভ্যুদয় অপেক্ষা বেশী কৌতুহলোদ্দীপক। কারণ জার্ম্মাণেরা অন্যান্য ইয়োরোপীয় জাতির ধর্ম্ম, ভাষা, সাহিত্য, সভ্যতা সকল বস্তুই চিরকাল ভোগ করিয়াছে। ইয়োরোপের বিজ্ঞান, দর্শন, পাণ্ডিত্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে জার্ম্মাণেরা কোন দিনই অবনত ছিল না। তাহারা একমাত্র রাষ্ট্রীয় ঐক্যের অভাবে ইয়োরোপের "নমঃ শূদ্র" বিবেচিত হইত। এই কারণ তাহারা বহুকাল পর্য্যন্ত স্বাধীনতা ও এক-রষ্ট্রীয়তার স্বপ্ন মাত্র দেখি-য়াই সন্তুষ্ট থাকিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ কবি, শিল্পী, গায়ক, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক সকলেই সেই স্বপ্ন নানা উপায়ে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সেই স্বপ্ন রোমান্টিসিজ্‌ম বা ভাবুকতা নামে জগদ্বিখ্যাত রহিয়াছে। নবীন জার্ম্মাণির সূতিকাগৃহ ও ভ্রূণাবস্থা বুঝিতে হইলে এই ভাবুকতার যুগ বুঝিতে হইবে। আজকাল তাহার যথার্থ মূল্য বুঝা বেশী কঠিন নয়। অবশ্য সেই সময়কার ইয়োরোপীয়েরা তাহার মর্ম্ম সম্যক্ বুঝে নাই।

কিন্তু নবীন জাপানের অভ্যুদয়-কাহিনীর সমান অদ্ভুত কাহিনী জগতে আর পাওয়া যায় না। জাপানীরা এশিয়াবাসী—চীনের শিষ্য—ভারতের প্রশিষ্য। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জাপানে চীন এবং ভারতের বিদ্যা, ধর্ম্ম, শিল্প, সভ্যতা, সাহিত্য ছাড়া অন্য কোন জিনিষ ছিল না। ইয়োরামেরিকার বিজ্ঞান দর্শন ইত্যাদির নাম পর্য্যন্ত জাপানে শুনা যাইত না। জাপানীরা ২৫০ বৎসরকাল সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা কঠোর ভাবে প্রচার

করিয়াছিল। বিদেশীয় নরনারীকে ম্লেচ্ছজ্ঞান করা তাহাদের স্বধর্ম্ম হইয়াছিল। কাজেই জাপানের ভ্রূণাবস্থা এবং জার্ম্মাণির ভ্রূণাবস্থা একরূপ নয়। অথচ শৈশবকাল ও যৌবনকাল উভয়েরই একরূপ দেখিতেছি। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ঘটনা এবং বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্রে জার্ম্মাণির অতি-মানুষ বলপ্রয়োগ এক গোত্রের অন্তর্গত। বস্তুতঃ জাপানকে এশিয়ার জার্ম্মাণি বলা একটা রীতি হইয়া দাঁড়াইতেছে।

আজকালকার দিনে এরোপ্লেন, জেপেলিন, ড্রেড্‌নট্‌, টর্পেডো, কামান, গোলাগুলি ইত্যাদির ব্যবহারে যে জাতি পটু তাহাকেই সভ্য এবং শিক্ষিত বিবেচনা করা হয়। বর্ত্তমান যুগের সার্টিফিকেট প্রদানের রীতি অনুসারে যুবক জার্ম্মাণি যে শীর্ষস্থান পাইতেছেন তাহা নূতন করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। আজকাল সমগ্র ইয়োরোপের বিরুদ্ধে একাকী দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান থাকা যে-সে জাতির ক্ষমতা নয়। গুণগ্রাহী ইংরাজ স্বয়ংই তাঁহার শত্রুর সামরিক "কালচার" প্রশংসা করিতে বাধ্য।

জাপানীরাও এই নব্য সভ্যতায় যথেষ্ট অগ্রগামী। রণতরী নির্ম্মাণ-বিদ্যায় জাপান-সন্তানগণ অর্ব্বাচীন শিশু মাত্র—তথাপি ইহারা দুনিয়ার সেরা জাতির সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা মাত্র ১০।১২ বৎসর কাল ফরাসী ও ইংরাজ পণ্ডিতগণের সাহায্য লইয়াছিল। তাহার পর হইতে স্বাধীন ভাবে ইহারা নূতন নূতন ধরণের রণতরী নির্ম্মাণও করিতেছে এবং রণতরীর চালনায় কৃতিত্ব দেখাইতেছে। একটা বৌদ্ধধর্ম্ম-শাসিত কুসংস্কারপূর্ণ প্রাচ্যজাতি—এত শীঘ্র ইয়োরামেরিকার নবীনতম বিদ্যায় পারদর্শী হইল কি করিয়া সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাহার কারণ খুঁজিয়া পান না!

কারণ যাহাই হউক, নবীন জাপানের যৌবনকাল তাহার ভ্রূণাবস্থা হইতেও বিস্ময়জনক, এবং উভয়ই নবীন জার্ম্মাণির ক্রমবিকাশ অপেক্ষা

বিশ্ববাসীর পক্ষে বেশী শিক্ষাপ্রদ বস্তু। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের The Japan Year Book হইতে জাপানী রণতরী সম্বন্ধে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"Japan has contributed something to the progress of naval construction of the world. It was Japan that first placed on her cruisers heavy guns for battleships and constructed torpedo-destroyers of far larger displacement than was previously known among the naval experts of the world.

* * * * *

The battle ships *Katori* and *Kashima* launched in 1905 may be considered as the last construction of the *Shikishima* type that had been universally regarded as the standard type about the beginning of the Russo-Japan war. The two battleships were superior to *Shikishima* in the number of 10 in. weapons carried. In the design of the battleship *Satsuma* hurriedly taken in hand on the eve of the Russo-Japanese War, Japan effected a marked improvement over the *Katori* and *Kashima* type. A similar improvement was effected in England when her Admiralty adopted in 1905 a special design that developed as the Lord Nelson types the first dreadnaught constructed in the world. It should be remembered for the sake of accuracy that the design of

Satsuma was completed in January 1904 while the work on the *Lord Nelson* was started in October the following year, so that Japan antedated England as regards the improvement in naval architecture which is now revolutionising the navies of the world."

দেখা যাইতেছে যে, ইংরাজেরা "ড্রেড্‌নটের" নক্‌সা প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে জাপানীরা স্বাধীনভাবে সেই ছাঁচের রণতরী গঠন করিয়াছিল। এ সময়ে জাপানী-নৌবিভাগে একজনও বিদেশীয় নাবাধ্যক্ষ বা এঞ্জিনীয়ার কর্ম্ম করিতেন না। স্বদেশীয় ওস্তাদগণ স্বদেশী কারীগরের সাহায্যে স্বদেশী ডকে একখানা নবীনতম যুদ্ধজাহাজ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন। আর সেই জাহাজ দেখিয়া ইয়োরামেরিকার ওস্তাদগণ "ধন্য ধন্য" করিতে বাধ্য হন। অথচ জাপান মাত্র ত্রিশ বৎসরকাল ইয়োরামেরিকার শাগরেতি করিয়াছেন। ইহার নাম "গুরুমারা বিদ্যা"।

"কোকুমিন"-সম্পাদক তোকুতোমি

বলা বাহুল্য ১৮৬৮ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে জাপানে কোন সংবাদপত্র ছিল না। অন্যান্য বস্তুর ন্যায় সংবাদপত্রও এদেশে মাত্র ৪০ বৎসরের যুবক। আজকাল "হোচি" নামক দৈনিক পত্র জাপানে বেশ প্রসিদ্ধ দেখিতেছি। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে কাউণ্ট ওকুমা এই পত্র প্রবর্ত্তন করেন। ইহার পূর্ব্বে আর দুইখানা কাগজ বাহির হইয়াছিল। তখনকার দিনে কোন কাগজেরই পাঠক-সংখ্যা সহস্রাধিক ছিল না। সকল পত্রই জাপানী ভাষায় সম্পাদিত হইত।

আজ একজন পার্ল্যামেণ্ট-সভ্যের সঙ্গে দেখা হইল। ইনি "পিয়ার" বা "বড় মহলে"র মেম্বার। জাপানে জনসাধারণের মধ্য হইতে গণ্য মান্য ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণকে রাষ্ট্রীয় মহাসভার লর্ড-গৃহে স্থান দিবার নিয়ম আছে। এই ব্যক্তি সেই নিয়মে বড় মহলের সভ্য। ইনি এক-খানা দৈনিক পত্রের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী। কাগজের নাম "কোকু-মিন"। ওশাকা নগর হইতে প্রকাশিত "আসাহি" এবং তোকিও নগরের "কোকুমিন" ও "হোচি" জাপানী সমাজে সুপ্রসিদ্ধ। কোকুমিন প্রত্যহ ৩০০,০০০ ছাপা হইয়া থাকে। কাগজের বয়স বিশ বৎসর মাত্র।

তোকুতোমি মহাশয় বলিলেন—"১৮৯০ খৃঃ অব্দে জাপানী রাষ্ট্রীয় মহাসভা (পার্ল্যামেণ্ট বা ডায়েট) স্থাপিত হয়। সেই বৎসরই আমি এই কাগজ আরম্ভ করি। জাপানের রাষ্ট্রশাসনে জনসাধারণের প্রতিনিধি-বর্গের প্রভাব প্রবর্ত্তিত হইবামাত্র দেশের নানা স্থানে নানা কাগজের সূত্র-পাত হইয়াছে। জাপানে আজকাল যতগুলি সংবাদপত্র এবং মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্র দেখিতে পান সবই এই বিশ বৎসরের শিশু।"

তোকুতোমির অভ্যর্থনা-গৃহে কতকগুলি চিত্র ও হস্তলিখিত স্বাক্ষর ঝুলান রহিয়াছে। ইনি প্রত্যেকটার পরিচয় দিলেন। কোনটা পূর্ব্বতন মন্ত্রী ইনোই, কোনটা বা সমরাধ্যক্ষ য়ামাগাতা, কোনটা প্রিন্স ইতো উপহার দিয়াছেন। এই সকল রাষ্ট্রবীর জাপানে "গেন্‌রো" বা "প্রবীণ" ধুরন্ধর নামে পরিচিত। ইঁহারাই মধ্যযুগের রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া মিকাডোর শাসন পুনঃ স্থাপনে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই জন্য ইঁহাদের সম্মান সমাজে অত্যধিক। রুশযুদ্ধের সময়ে পরলোকগত মিকাডো ইঁহাদিগকে প্রত্যেক বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া চলিতেন। কাউণ্ট ওকুমা এইরূপ "গেন্‌রো" ধুরন্ধরগণের অন্যতম প্রিন্স ইতো কোরিয়ায় রাজ-প্রতিনিধির কর্ম্ম করিতে যাইয়া গুপ্ত হত্যাকারীর হস্তে প্রাণ হারাইয়াছেন। এক্ষণে মাত্র দুই তিন জন প্রবীণ রাষ্ট্রবীর জীবিত আছেন। তোকুতোমি য়ামাগাতা এবং ৺ইতোর ভক্ত। ওকুমা সম্বন্ধে বলিলেন—"আমি তাঁহাকে বন্ধু বিবেচনা করি বটে, কিন্তু তীব্র সমালোচনা করিতে ছাড়ি না।"

জাপানে "পার্টিসিষ্টেম্‌" বা রাষ্ট্রীয় দল-বিভাগের কথা উঠিল। তোকুতোমি বলিলেন—"আমি বড় মহলের মেম্বার—কাজেই কোন দলের অন্তর্গত নহি। আমার কাগজও কোন দলের পৃষ্ঠপোষক নয়।"

প্রধানতঃ দুই রাষ্ট্রীয় দল জাপানে দেখা দিয়াছে। দলদ্বয়ের প্রভেদ অতি সামান্য। উভয় পক্ষীয় সভ্যেরা প্রায় একরূপ কার্য্যই চাহেন। তবে এক দল কিছু মন্থরগতি, অপর দল খানিকটা দ্রুত চলিতেছেন। প্রথম দলের নাম সেইউ-কাই। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রিন্স ইতো। দ্বিতীয় দলের নাম দোষি-কাই। ইহার প্রতিষ্ঠাতা কাউণ্ট ওকুমা। "হোচি" এই দলের মুখপত্র। "নিচিনিচি" অপর দলের মুখপত্র। হোচি অপেক্ষা এই কাগজ বয়সে এক বৎসর বড়। "আসাহি" ইত্যাদি অন্যান্য সংবাদ-

পত্রসমূহ প্রায়ই কোন দলের অন্তর্গত নয়। তোকুতোমি বলিলেন—"প্রিন্স ইতো এবং ওকুমার ভিতর যথার্থ বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু তাঁহাদের চেলারা বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়া রাষ্ট্রীয় দলবিভাগ রক্ষা করিতে অসমর্থ।"

জাপানী পার্ল্যামেণ্টের সভ্যেরা বার্ষিক ৩০০০৲ বেতন পান। যাতায়াতের খরচ সরকারী।

তোকুতোমি বিলাতী পার্ল্যামেণ্টের ইতিহাস বিশেষরূপেই অবগত আছেন। জাপানের কোন তথ্য বুঝাইতে হইলেই ইনি ইংরাজ মহাসভার নজির উদ্ধৃত করেন। কথায় কথায় "জাপানের গ্লাডষ্টোন," "জাপানের ওয়েলিংটন" ইত্যাদি উল্লেখ করা তোকুতোমির অভ্যাস। ইনি বলিলেন—"জন মর্লির সকল গ্রন্থ আমি বহুবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। এদিকে জার্ম্মাণির রাষ্ট্রবীর ট্রিট্‌স্‌কে প্রণীত গ্রন্থাদিও আমার কণ্ঠস্থ আছে।"

তোকুতোমি কিছুকাল সরকারী চাকরী করিয়াছেন। পরে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় বেড়াইতে যান। ইনি বলিলেন—"আমি কাউণ্ট টলষ্টয়ের ভক্ত। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আমি ও আমার ভাই পল্লীগৃহে গিয়াছিলাম। আমি রুশ-দার্শনিকের উপদেশ বেশী দিন কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। কারণ রাষ্ট্রনীতি আমার ব্যবসায়। কিন্তু আমার ভাই বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছে। সে এক প্রকার মধ্য যুগের মঠবাসী বৌদ্ধ সাধু বা ভিক্ষুর ন্যায় জীবন যাপন করিতেছে। 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ' এবং 'শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ' প্রচার করা তাঁহার একমাত্র কার্য্য"।

তোকুতোমির ভাই জাপানের একজন প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক। ইহাঁর রচনায় সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা, দর্শন ইত্যাদি নানা বিষয়ের গভীর আলোচনা আছে। টলষ্টয়ের উপদেশও ইনি জাপানী ভাষায় প্রচার করিয়াছেন।

তোকুতোমি নিজেও সাহিত্যসেবী। ইনি জার্মানে অথবা ইংরাজীতে গ্রন্থ রচনা করেন নাই। জাপানী ভাষায় ৭/৮ খানা পুস্তক ইঁহার লিখিত। একখানা পুস্তকের নাম "ভবিষ্য জাপান", এক খানার নাম "নবীন জাপানের যুবক সম্প্রদায়" ইত্যাদি। তোকুতোমি দুই খানা জাপানী গ্রন্থ উপহার দিয়া বলিলেন—"এই দুই খানা কয়েক মাস হইল বাহির হইয়াছে। একখানা জাপানের সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রের বর্ত্তমান সম্বন্ধ লইয়া লিখিত। অপরটিতে ১৮৭০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত দুনিয়ার রাষ্ট্রীয় সমস্যাসমূহ আলোচিত হইয়াছে। কয়েক অধ্যায়ে চীন ও জাপানের সম্বন্ধ বিশদরূপে বিবৃত। ইয়াঙ্কিস্থানের সাম্রাজ্য-বিস্তার লইয়াও একটা অধ্যায় লিখিত।"

কোরিয়া আজকাল জাপানীদের শাসনে রহিয়াছে। তোকুতোমি বলিলেন—"আমাদের অধীনে কোরিয়া দেশের স্বাস্থ্য, শিল্প ইত্যাদি উন্নতি লাভ করিতেছে। আপনি সিউল নগর দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।" কোরিয়ায় এক খানা জাপানী কাগজ সম্পাদিত হয়। তাহার নাম "কেই জো নিপ্পো"। তোকুতোমির একজন সহকারী উহার সম্পাদক। এই কাগজ তোকুতোমিরই সম্পত্তি।

ইনি বলিলেন—"আমি সর্ব্ব প্রথম জাপানী সংবাদ-পত্রে "ইণ্টার্ভিউ" বা বিশিষ্ট লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং কথোপকথন প্রকাশ করিতে থাকি। তাহা ছাড়া সামাজিক গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা, সাহিত্য-সমালোচনা, রঙ্গালয়ের কথা ইত্যাদিও আমার পূর্ব্বে কোন সংবাদ-পত্রে স্থান পাইত না।

তোকুতোমি ৺গোখ্‌লের নাম শুনিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদও রাখেন। সুরেন্দ্রনাথের কথাও ইনি জানেন। ইংরাজ ভ্যালেণ্টিন চিরল ইঁহার বন্ধু। ইনি বলিলেন—"জাপানী বৌদ্ধ মন্দিরের একজন

প্রধান ব্যক্তি কাউণ্ট ওতানি তুর্কীস্থান ইত্যাদি দেশে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করিতেছিলেন। সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বও তাঁহার আলোচ্য বিষয় হয়। তিনি আমার বন্ধু। এই সূত্রে আমি বর্ত্তমান ভারতের কিছু কিছু খবর রাখি।"

তোকুতোমির গৃহে প্রায় ৫০০০০ বৌদ্ধ পুঁথি ও মুদ্রিত গ্রন্থ আছে। ইনি বৌদ্ধ নহেন।

ব্যবসায়ি মহলের কথা

জাহাজের সহযাত্রিগণের মধ্যে দেখিয়াছিলাম, প্রায় প্রত্যেক জাপানীই কোন না কোন শিল্প অথবা ব্যবসায়ের মালিক কিম্বা ওস্তাদ। ইঁহারা ইয়োরোপ ও আমেরিকার নূতন নূতন কারবার বুঝিয়া স্বদেশে ফিরিতেছিলেন। প্রত্যেক জাহাজেই এই ধরণের লব্ধপ্রতিষ্ঠ জাপানী ইয়োরামেরিকায় যাওয়া-আসা করিয়া থাকেন। তোকিওতে পৌঁছিয়া শুনিতেছি এবং কাগজে পড়িতেছি যে, দলে দলে জাপানীরা দক্ষিণ আমেরিকায় যাইতেছেন, ভারতবর্ষে যাইতেছেন, চীনে যাইতেছেন, এবং সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বোর্ণিও, সেলিবিস, অষ্ট্রেলিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে যাইতেছেন। দেশ দেখাই ইঁহাদের একমাত্র মতলব নয়। কোথায় বাণিজ্যের কিরূপ সুযোগ আছে তাহা অনুসন্ধান করাই প্রধান উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষ হইতে একদল অনুসন্ধানকারী ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের ব্যবসায় বিভাগে জানাইয়াছেন—"আমরা যখন ভারতবর্ষে যাই তখন মাত্র পাঁচ হাজার টাকার অর্ডার পাইব আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখি যে, রেশম, ধাতু, কাপড় ইত্যাদি নানা বস্তুর জন্য প্রায় পাঁচ কোটি টাকার অর্ডার উপস্থিত।"

জাপানীরা ইয়োরামেরিকায় নূতন নূতন কায়দা শিক্ষা করে এবং দুনিয়ার সর্ব্বত্র জাপানী মাল চালান দেয়। এই জন্য জগতের সর্ব্বত্র উচ্চশিক্ষিত এবং ধনবান্ জাপানীকে পর্য্যটন করিতে দেখা যায়। এই ধরণের পর্য্যটক ভারতবর্ষ হইতে বৎসরে কতজন বাহিরে আসেন? যথার্থ ব্যবসায়ী অথবা শিল্প-ধুরন্ধর কিম্বা ব্যাঙ্কার শ্রেণীর ভারতবাসী ভারতবর্ষের

বাহিরে আসেন না বলিলেই চলে। প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর লোক ভারতবর্ষের বাহিরে দেখা যায়। প্রথম, পয়সাওয়ালা লোক প্রতিবৎসর বেড়াইতে আসেন। ইঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। ইঁহারা বিলাত দেখিয়াই দেশে ফিরেন। দ্বিতীয়তঃ, দরিদ্র ছাত্র ও শিক্ষার্থী। ইঁহাদের অধিকাংশ বিলাতে ব্যারিষ্টারি শিখেন। শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদি শিখিবার ইচ্ছা আজকাল দেখা যায়। এই ইচ্ছা লইয়া কয়েক শত ছাত্র আমেরিকা, ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীতে আছে। তাহাদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। আজকাল কয়েক লাখ ভারতীয় কুলী, মজুর, বরকন্দাজ এবং দ্বারবানও জগতের নানা স্থানে দেখা যায়। কিন্তু যে ধরণের জাপানী আমরা জগতের নানা কেন্দ্রে দেখিতে পাই সেই ধরণের ভারতবাসী কোথাও চোখে পড়ে না। এই জন্যই বিদেশ-প্রবাসী ভারতসন্তানগণ জগতের বড় বড় মহলে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন না।

জাপানে আসিয়া একজন ভারতীয় ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা হইল। ইনি জামাল-কোম্পানীর উচ্চ কর্ম্মচারী। ইনি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বাহিরে আসিয়াছেন এবং শিল্প ও ব্যবসা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন। জাপানের ব্যবসায়িমহলে ইঁহার খাতির বেশ জন্মিতেছে। এই শ্রেণীর ভারতীয় পর্য্যটক এতদিন কোথাও দেখি নাই।

কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়া জামাল-কোম্পানী তাম্রখনির কার্য্য সুরু করিবেন। তাহার জন্য একজনও উপযুক্ত ভারতবাসী নাই। বাধ্য হইয়া ইঁহারা জাপান হইতে ওস্তাদ ও কারিগর লইতেছেন। কর্ম্মচারী বলিলেন—"একজন ভারতসন্তানকে নিয়োগপত্র দিয়াছি। কিন্তু ইনি খনি-বিষয়ক বিদ্যায় পারদর্শী হইলে কি হইবে? খাঁটি ব্যবসায়ের কার্য্যে ইনি নিতান্ত অপটু। কেবলমাত্র রাসায়নিক পরীক্ষাগৃহে ইঁহাকে রাখা যাইবে।" এই ব্যক্তি নাকি বিলাতের "রয়্যাল স্কুল অব্ মাইন্‌স্"

হইতে উচ্চতম উপাধি পাইয়াছেন। তাঁহাকে কারখানার জন্য একটা ল্যাবরেটরী প্রস্তুত করিবার আনুমানিক ব্যয় নির্দ্ধারণ করিতে বলা হইয়াছিল। কর্ম্মচারী মহাশয় বলিতেছেন—"গ্রাজুয়েট মহাশয় এমন এক হিসাব দিয়াছেন তাহাতে কারখানার দশমাংশ ল্যাবরেটরীর জন্যই খরচ হয়! ব্যাপার বুঝিয়া আমি তাঁহাকে জাপানের কয়েকটা খনির কারখানা দেখাইতে লইয়া যাই। অতি সামান্য রোথো ঘরে অল্প সরঞ্জামে বিরাট ফ্যাক্টরীর রাসায়নিক পরীক্ষাকার্য্য চলিতেছে। এই সব দেখিয়া ইহাঁর চোখ ফুটিয়াছে।"

ভারতীয় শিল্প-গ্র্যাজুয়েটগণের চোখ ফুটিবার সুযোগ আদৌ নাই। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের টেবিল, চেয়ার, আলমারী ইত্যাদি সাধারণতঃ অতি মূল্যবান্ থাকে। সেইগুলির শতাংশও হয়ত প্রকৃত ব্যবসায়ক্ষেত্রে এবং শিল্প-কারখানায় আবশ্যক হয় না। জাপানীরা তাহা বেশ বুঝে। এই জন্য আকর-বিজ্ঞানে অথবা রঞ্জন-শিল্পে অথবা ঔষধ-প্রস্তুতকরণে পি, এইচ ডি, ডি, এস্ সি ইত্যাদি সর্ব্বোচ্চ উপাধি লাভ করিবার পর জাপানী যুবকগণ কুলীমজুরের মত অল্প বেতনে ফ্যাক্টরীতে, ওয়ার্কসপে কার্য্যগ্রহণ করে। তিন চারি বৎসর এইরূপ কর্ম্ম করার পর তাহারা পাকা ওস্তাদ নামে পরিচিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতীয় গ্র্যাজুয়েটগণ কারখানায় কার্য্য করিবার সুযোগ পাইবে কোথায়? অধিকন্তু, আমাদের লেখাপড়া জানা যুবকদিগের চরিত্র এত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে যে, সুযোগ পাইলেও অনেক সময়ে সেগুলির সদ্ব্যবহার করিতে প্রবৃত্তি এবং শক্তি থাকে না। এই সকল বিষয়ে চোখ ফুটাইবার জন্য উচ্চ শিক্ষিত ভারতবাসীর জাপানে আসা আবশ্যক। ইয়োরোপ ও আমেরিকার চাল-চলন দেখিয়া ভারতবাসীরা স্বদেশীয় অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা করিবার প্রণালী বুঝিতে পারিবেন না।

ঘণ্টাখানেক ট্রামে ও রিক্‌শতে চলিয়া সহরের বাহিরে একটা রবারের কারখানায় উপস্থিত হইলাম। জাপানে রবারের গাছ নাই। দক্ষিণ আমেরিকা, মালয় উপদ্বীপ, বোর্ণিও, ভারতবর্ষ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে জাপানীরা রবার আমদানি করে। বর্ত্তমান যুগে রবারের কাট্‌তি অত্যধিক বাড়িয়াছে। ইয়াঙ্কি-ধনকুবের নাকি বলিয়া থাকেন—"The twentieth century will be the Rubber age." অর্থাৎ "রবারের প্রভাবেই বিংশ শতাব্দীর ভাগ্য গঠিত হইবে।"

কারখানার এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া দেখা গেল। একজন পরিচালক সর্ব্বদা সঙ্গে ছিলেন। সেদিন ইলেকৃট্রিক তারের কারখানায় রবারের চাদর প্রস্তুত করিবার প্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়াছিলাম। আজ এখানেও সেই সমুদয়ই দেখিতেছি। তবে নানা আকৃতিবিশিষ্ট বহুবিধ রবার-সামগ্রী প্রস্তুত করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরণের ছাঁচ ব্যবহৃত হইতেছে। মটরকারের চাকার রবার হইতে "আইস্-ব্যাগ", বগলশ, নল পর্য্যন্ত সকল দ্রব্যই এই কারখানায় তৈয়ারী হয়।

কারখানা মাত্র ১৮ বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। সর্ব্বসমেত সাড়ে সাত লক্ষ টাকার মূলধন খাটিতেছে। দেড় লক্ষ টাকা মূলধনের সাহায্যে কারবার আরম্ভ করা হয়। এক্ষণে ৩৫০ পুরুষ ও স্ত্রী মজুর খাটিতেছে। সাতজন উচ্চ শিক্ষিত ইঞ্জিনীয়ার ও রসায়নজ্ঞ ওস্তাদ সকল কার্য্য চালাইয়া থাকেন। প্রতিমাসে কয়লা এবং রবার ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপকরণ সমূহের খরচ প্রায় ৪৫,০০০৲ হয়। শ্রমজীবী ও কর্ম্মচারীদিগের মাসিক বেতন মাত্র ৫০০০৲। কারখানার মাল কোরিয়া, চীন ও মাঞ্চুরিয়ায় চালান হয়। প্রদর্শক বলিলেন—"যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষ হইতেও এইবার অর্ডার আসিতেছে।"

'এই কারখানায় বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত ওস্তাদ মাত্র দুই জন। রাসায়নিক

পরীক্ষাগৃহ অতি ক্ষুদ্র। ভিতরে প্রবেশ করিয়া ইহাকে ল্যাবরেটরি বলিতে ইচ্ছা হয় না। অথচ বিদেশীয় রবার-সামগ্রী আজকাল জাপানে আর আমদানি করিতে হয় না, এবং বিদেশীয় বাজার হইতেও বিলাতী "ডান্‌লপ্‌" কোম্পানীর মাল জাপানীরা বিতাড়িত করিতে পারিতেছে।

একটা রাসায়নিক শিল্প-কারখানায় খানিকক্ষণ কাটান গেল। এখানকার ওস্তাদ শ্রীযুক্ত কাইনোশো কিয়োতো-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেছিলেন। পরে সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করা শিখিবার জন্য ফ্রান্সে গমন করেন। এক্ষণে এই পার্ফিউমারির ল্যাবরেটরিতে কর্ম্ম করিতেছেন। ল্যাবরেটরির টেবিলের উপর দেখিলাম, একখানা জাপানী মাসিকপত্র পড়িয়া রহিয়াছে। ইংরাজী ভাষায় ইহার নাম "তোকিও কেমিক্যাল সোসাইটিজ জার্ন্যাল্‌"। ইহার প্রত্যেক প্রবন্ধ জাপানীতে লিখিত।

কারখানার এক বিভাগে এসেন্স তৈয়ারি হয় অপর বিভাগে সাবান প্রস্তুত করা হয়। সর্ব্বসমেত বিশজন রসায়নজ্ঞ ওস্তাদ সর্ব্বদা ল্যাবরেটরিতে কার্য্য করেন। এতদ্ব্যতীত কয়েকজন উচ্চ শিক্ষিত সাহিত্য-পারদর্শী লেখক নানাবিধ প্রবন্ধ রচনা করিয়া একখানা মাসিকপত্র সম্পাদন করেন। তাহার দ্বারা কারখানার বিজ্ঞাপনও প্রচারিত হয়; সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সাহিত্য এবং শিল্পজ্ঞানও সমাজের ভিতর ছড়াইয়া পড়ে।

কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়—সবই মূলধনের উপর নির্ভর করে। আজকালকার দিনে দুই চারি জন ধনকুবের ব্যতীত কোন ব্যক্তি একাকী কোন কারবার করিতে পারেন না। সর্ব্বত্রই যৌথ-লেনদেন, যৌথ-শিল্প, যৌথ-কৃষি, যৌথ-ব্যবসায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। জাপানের নবযুগ মাত্র ৪০ বৎসরের কথা। এই সময়ের মধ্যে এখানে বৈষয়িক জীবনের সকল দিকেই অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছে। এই উন্নতি প্রচুর মূলধনের সাহায্য

ব্যতীত ঘটে নাই। বর্ত্তমান যুগে মূলধন সঞ্চিত থাকে ব্যাঙ্কে। এই ব্যাঙ্কসমূহ উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে ঋণ প্রদানপূর্ব্বক কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ধারা পুষ্ট রাখেন। বিগত ত্রিশবৎসরের ভিতর জাপানী ব্যাঙ্কসমূহ এ দেশের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে অশেষ সাহায্য করিয়াছে।

ব্যারণ তাকাহাসি বলিলেন—"আজকাল যে সকল ব্যাঙ্ক দেখিতেছেন তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপুরাতন "ইয়োকোহামা স্পেসিব্যাঙ্ক"। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। ইয়োকোহামা স্পেসিব্যাঙ্ক স্থাপিত না হইলে আমাদের ব্যবসা ও বহির্ব্বাণিজ্য সুবিস্তৃত হইতে পারিত না। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কতকগুলি বিদেশীয় ব্যাঙ্কের সাহায্যে আমাদের বহির্ব্বাণিজ্য চলিত। তাহাতে আমাদের যথেষ্ট লোকসান হইত। দেশ হইতে সোনারূপার টাকা ("স্পেসি") বাহিরে চালান হইত। "স্পেসি"র চালান বন্ধ করিবার জন্য এই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়।"

ব্যারণ তাকাহাসি কিছুকাল এই ব্যাঙ্কের গবর্ণর ছিলেন। ইনি জাপানের একজন নামজাদা ব্যাঙ্কার—এক সময়ে রাষ্ট্রের "ফিন্যান্স মিনিষ্টার" (Finance Minister) বা ধন-সচিবের কর্ম্মও করিয়াছেন। রুশযুদ্ধের সময়ে ইহাঁকে বিলাত ও আমেরিকা হইতে ঋণ সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ইহাঁর বয়স এক্ষণে ৬১ বৎসর। চেহারা দেখিলে মনে হইবে ৪০ বৎসর মাত্র।

ইয়োকোহামা স্পেসিব্যাঙ্ক বহির্ব্বাণিজ্যে জাপানী-মহাজনগণের বন্ধু। সেইরূপ দেশীয় কৃষিকর্ম্মে এবং শিল্পকারখানার কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য জাপানে দুইটা ব্যাঙ্ক আছে। এই ধরণের ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ জার্ম্মাণিতে ও ফ্রান্সে বেশী দেখা যায়। একটার নাম "হাইপথেক ব্যাঙ্ক" (Hyphothic Bank), অপরটার নাম "ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক" (Industrial Bank)। এই দুই ব্যাঙ্ক অতি নূতন—মাত্র দশবার বৎসরের

প্রতিষ্ঠান। গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ফ্রান্সে ও জার্ম্মাণিতে কর্ম্মচারী প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুসন্ধানের ফল অনুসারে ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে।

"হাইপথেক ব্যাঙ্কে"র উদ্দেশ্য—"For the improvement and development of agriculture and industry, capital is advanced at a low rate of interest, to be paid back in longtermed annual instalments". অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়া হয়। অথচ ধারশোধ দিবার জন্য দেনাদারকে যথেষ্ট সময় দিবার নিয়ম আছে। তাকাহাসিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্যাঙ্ক এই কারবার সমূহের উপর কর্তৃত্ব করেন কি?" ইনি উত্তর করিলেন—"কৃষিক্ষেত্র এবং শিল্প-কারখানার মালিকেরা টাকা ধার লইবার সময় তাঁহাদের কারবারের সম্পত্তি ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধক রাখেন। এই সিকিওরিটি (Security) লইয়াই ব্যাঙ্ক সন্তুষ্ট।"

নব্য জাপানে সাহিত্য-চর্চ্চা

সন্ধ্যাকালে একটা রেস্তরাঁয় প্রবেশ করিলাম। প্রতিমাসের প্রথম মঙ্গলবার তোকিওর সাহিত্যসেবীগণ এইখানে আড্ডা বসাইয়া থাকেন। ইহাঁরা নিজ নিজ ব্যয়ে নৈশভোজন সম্পূর্ণ করিয়া নিজ নিজ গৃহে চলিয়া যান। কোন সভাসমিতি, বক্তৃতা, প্রবন্ধ পাঠ ইত্যাদির ব্যবস্থা নাই। কোনরূপ আফিসী কায়দা, পত্র-ব্যবহার, নিমন্ত্রণ, আহ্বান ইত্যাদিও আবশ্যক হয় না।

আজ দেখিলাম, প্রায় বিশ জন উপস্থিত—একজন মহিলাও আসিয়াছেন। ইহাঁর নাম কামোচা। ইনি ছোট গল্প লিখিয়া প্রসিদ্ধ। শুনিলাম, গ্রন্থকার না হইলে কেহ "মঙ্গলবারের মজলিশে" যোগ দিতে পারেন না। একজন চিত্রকর, একজন চিত্রসমালোচক, একজন কবি, একজন ঔপন্যাসিক এবং একজন দার্শনিকের সঙ্গে আলাপ হইল। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেকে ইংরাজী জানেন না। যাঁহারা জানেন তাঁহাদের অনেকে ইংরাজী বলিতে বিশেষ পটু নন—অথচ বুঝিতে বেশ পারেন। কেহ কেহ জার্ম্মাণ জানেন, কেহ কেহ ফরাসী জানেন।

সকলের মুখেই এক কথা—"নব্য জাপানকে ভারতবাসীরা জানে না, জাপানীরাও নব্য ভারতকে জানে না।" আমি বলিলাম—"জাপানীরা এতদিন ভারতবর্ষকে বৌদ্ধধর্ম্মের ভিতর দিয়া জানিয়াছে—আজকাল বিদেশীয় পর্য্যটকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের ভিতর দিয়া জানে। কাজেই তাহারা যুবকভারতের কোন সংবাদ পায় না। এদিকে মাত্র রুশযুদ্ধের

পর জাপান ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছে। এই দশ বৎসরের ভিতর ভারতবাসীরা জাপানীকে কতটুকুই বা বুঝিতে পারে?"

একজন ঔপন্যাসিক বলিলেন—"দৈবক্রমে রবিবাবুর গ্রন্থাবলীর উপর ইয়োরোপের কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছে। এইজন্য নব্য ভারতকে আমরা কথঞ্চিৎ বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছি। ভারতবর্ষে অবশ্য আরও অনেক রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান কালে জন্মিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত আমরা শুনি নাই। সেইরূপ কোন জাপানী সাহিত্য-সেবীর নাম আপনারা ভারতবর্ষে শুনিতে পান না। জাপানী লেখকগণের রচনা ইংরাজীতে অনূদিত হইলে ভারতবাসীরা জাপানকে বুঝিবার সুযোগ পাইবেন। জাপানী সাহিত্যের ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ এবং ভারতীয় সাহিত্যের জাপানী ভাষায় অনুবাদ প্রচারিত না হইলে নব্য জাপানে এবং নব্য ভারতে যথার্থ সহানুভূতি ও সমবেদনা সৃষ্ট হইবে না। সম্প্রতি উভয় সাহিত্যেরই ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া সহজ। তাহা হইলে উভয় জাতি পরস্পর পরস্পরকে অনেকটা বুঝিয়া উঠিতে পারিবে।"

রবিবাবু জাপানে আসিতেছেন শুনিয়া জাপানের সাহিত্য-সংসারে একটা হৈ চৈ পড়িয়াছে। "সাধনা" গ্রন্থের জাপানী অনুবাদ প্রচারিত হইবামাত্র হাজারে হাজারে বিক্রি হইতেছে। রবিবাবুর ইংরাজী পুস্তক-গুলির কাটতিও যথেষ্ট বাড়িয়াছে। শুনিলাম, জাপানীরা "গীতাঞ্জলি" পড়িয়া বেশী রস পায় না। রবিবাবুর কথা প্রায় প্রত্যেক জাপানী দৈনিকে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইতেছে। কবিবরকে কেন্দ্র করিয়া জাপানীরা নবীন ভারতবর্ষকে বুঝিতে চেষ্টিত। ইহার পূর্ব্বে নব্য ভারতকে বুঝিবার প্রয়াস জাপানে যথার্থ ভাবে দেখা দেয় নাই।

জাপানী সংবাদপত্র ইয়োরামেরিকার নিয়মে পরিচালিত হয়। সংবাদ-দাতা লেখক ইত্যাদি সকলেই পারিশ্রমিক পাইয়া থাকেন।

সংবাদপত্রে অথবা মাসিকপত্রে প্রবন্ধ পাঠাইয়া অন্নসংস্থান করা জাপানীসমাজে অনেক দেখা যায়। পত্রিকাগুলির পরিচালকেরা ক্ষতি-গ্রস্ত হন না। "বুঝৈক্লাব" নামক মাসিকের সম্পাদক ইশিবাসির নিকট শুনিলাম—তোকিওর একজন লক্ষপতি পত্রিকা-ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি একাকী ১৮ খানা কাগজের সত্বাধিকারী। বুঝৈক্লাব ১১ বৎসর হইতে সম্পাদিত হইতেছে—মাসিক প্রায় ৩১০ পৃষ্ঠা থাকে। মূল্য বার্ষিক ৬৲। প্রতি বৎসর ১৬ বার পত্রিকা বাহির হয়। প্রত্যেক সংখ্যা ৫০০০০ ছাপা হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সংখ্যার সূচীপত্র হইতে বুঝিলাম, নাচ, গান, থিয়েটার, গল্প ইত্যাদিতে এই পত্রিকা পরিপূর্ণ। স্ত্রীলোকের মহলে এই কাগজের কাটতি বেশী।

ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান-বিভাগের কর্ত্তা ডাক্তার শিয়োজাওয়াকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"জাপানী ভাষায় ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক পুস্তক অনূদিত অথবা নূতন রচিত হইলে কত-খানা ছাপান হয়?" অধ্যাপক বলিলেন—"এক হাজার বা দেড় হাজার অপেক্ষা বেশী কপি এই ধরণের পুস্তক ছাপা হয় না।" একটা ছাপাখানার বড় কর্ত্তা বলিলেন—"বালক-বালিকাদিগের জন্য যে সমুদয় মাসিক পত্র বাহির হইয়া থাকে সেগুলির কোন কোনটা প্রায় দেড় লক্ষ ছাপা হয়।"

বুঝৈক্লাব-সম্পাদক যে লক্ষপতির উল্লেখ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম ওহাসি। ওহাসি-পরিবার ছাপাখানার ব্যবসায়েই লাভবান্ হইয়া ধনাঢ্য হইয়াছেন। ইঁহারা এক্ষণে নানা কারবার চালাইতেছেন। ইঁহাদের অধীনে এক বিরাট ছাপাখানা আছে। এখানে ছাপা, বাঁধাই, টাইপ-প্রস্তুত-করণ, মুদ্রাযন্ত্র-নির্ম্মাণ, চিত্রাঙ্কন, ফটোগ্রাফি, লিথোগ্রাফি, ব্লক-গঠন ইত্যাদি সকল প্রকার কার্য্য হইয়া থাকে। বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত একব্যক্তি এই কারখানার পরিচালক। তোকিওর ইম্পীরিয়্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে

পাশ করা এঞ্জিনীয়ার কয়েক জন ছাপাখানার যন্ত্রনির্ম্মাণ-বিভাগে নিযুক্ত। ব্লক, লিথো ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য প্রায় দুই শত শিল্পী কর্ম্ম করিতেছেন। কারখানায় সর্ব্বসমেত ১৫০০ লোক কার্য্য করে। ষ্টিরিওটাইপ, ইলেক্‌ট্রো টাইপ ইত্যাদি সকল প্রকার মুদ্রণের আয়োজন দেখিলাম। চীনা, জাপানী, ইংরাজী, জার্ম্মাণ ও ফরাসী এই পাঁচ ভাষার হরপ ব্যবহৃত হয়। চীনা বর্ণমালার জন্য ৪০০০ ভিন্ন ভিন্ন টাইপ আছে। বলা বাহুল্য, কম্পোজিটারদের এজন্য বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। কর্ম্মকর্ত্তা বলিলেন—"দিনে দশ ঘণ্টা খাটিলে একজন কম্পোজিটার ইংরাজী হরপের ২০ পৃষ্ঠা প্রস্তুত করিতে পারে। কিন্তু চীনা হরপে ১৪ পৃষ্ঠার বেশী কম্পোজ করা অসম্ভব।"

ছাপাখানায় আগাগোড়া কলে কাজ চলিতেছে। অক্সফোর্ডের ক্লারেণ্ডন প্রেসেও এইরূপই দেখিয়াছি। জাপানের এই মুদ্রণালয় বিদেশীয় মুদ্রণালয়ের সঙ্গে তুলনায় নিম্নে যাইবে না। বলা বাহুল্য, ওহাসির ১৮ খানা মাসিক এই প্রেসেই ছাপা হয়। প্রতিদিন ১৫০০ রীম কাগজ ছাপা হইয়া বাহির হইতেছে। দপ্তরীখানায় প্রতিদিন দেড় লক্ষ খানা পুস্তক বাঁধা হইয়া যায়। একটা কলে দেখিলাম, কাগজের উপর চারি রঙ্গে ছাপা হইতেছে; এক সঙ্গে দুই পীঠ ছাপা হইতেছে এবং শেষ পর্য্যন্ত ভাঁজ করা কাগজ পাওয়া যাইতেছে। কলের একধারে সাদা কাগজ দেখিতেছি—অপর অংশে ফর্ম্মা-বাঁধা মুদ্রিত কাগজ দেখিতেছি। জাপানীরা অন্যান্য বিষয়ে ইয়োরামেরিকার বিদ্যা যতখানি হজম করিয়াছে মুদ্রণেও ততটা করিয়াছে। শুনিলাম, প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা এই কারবারে খাটিতেছে। ভারতবাসীর পক্ষে ছাপাখানার কাজ চালান কিছু কঠিন নয়। কিন্তু আমাদের দেশে ছাপাই কাজের সকল বিভাগ-সমন্বিত বৃহৎ মুদ্রণালয় স্বদেশীয় লোকের হাতে বেশী নাই। জাপানে ছাপা ও বাঁধান

পুস্তক সাধারণতঃ ভারতে প্রকাশিত পুস্তকাদি অপেক্ষা দেখিতে সুন্দর। আমাদের দেশে দপ্তরীর কাজে কল ব্যবহৃত হয় না। এই জন্য পুস্তকের বাহ্য সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই না।

জাপানীরা কোন কোন জাপানী গ্রন্থে এখনও বিদেশীয় পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। আধুনিক জাপানী সাহিত্যে বিজ্ঞান ও দর্শন যাহা কিছু দেখা যায় তাহার অধিকাংশই বিদেশীয় গ্রন্থের অনুবাদ বা সঙ্কলন মাত্র। তবে এখানে কোন এক সাহিত্যের আধিপত্য বেশী নাই। জার্ম্মাণ, ফরাসী, আমেরিকান ও ইংরাজ সকল জাতিকেই জাপানীরা সমান আদর করে। জাপানী ভাষায় সকল দেশীয় সুধীবর্গের গ্রন্থই অনূদিত হইয়াছে।

একদিন সকালে তোকুতোমির গ্রন্থশালা দেখিলাম। প্রাচীন গ্রন্থ, মুদ্রা, সীল, হস্তলিখিত পুঁথি ইত্যাদি সংগ্রহ করা ইঁহার অভ্যাস। এজন্য ইঁহার প্রায় লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে।

চীনারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঠের বাক্সের ভিতর পুস্তক রাখে। কাজেই বাহির হইতে চীনাপুস্তকের সারি দেখিয়া বুঝা যায় না। তোকুতোমি আল্‌মারিগুলির ভিতর হইতে কাঠের বাক্সসমূহ এক এক খানা করিয়া বাহির করিতে লাগিলেন। কোন পুস্তক প্রায় এক হাজার বৎসরেরও বেশী পুরাতন। এক খানা "নো"-গ্রন্থ দেখিলাম। ইহা ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল। কাগজ নানা চিত্রে সুশোভিত—পুস্তকের বাক্সও সুচিত্রিত। এক খানা চীনাপুস্তক দেখাইয়া তোকুতোমি বলিলেন—"ইহাতে বর্ণমালার উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা আছে।" মধ্যযুগের জাপানীরা তাহাদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ সচিত্র প্রকাশ করিত। এইরূপ কয়েকখানা উপন্যাস দেখিতে পাইলাম।

তোকুতোমি কোরিয়া ও চীনদেশে কয়েকবার বেড়াইতে গিয়াছিলেন।

প্রাচীন দ্রব্যসংগ্রহই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কাঠ, ধাতু, ল্যাকার ইত্যাদি নানা পদার্থে নির্ম্মিত নাম-মোহর প্রায় ৩০০০ সংগৃহীত হইয়াছে। দুই হাজার বৎসরের প্রাচীন চীনা "সীল" একটা দেখিলাম।

৬০০ বৎসর পূর্ব্বে কোরিয়ায় একখানা পুস্তক ছাপা হইয়াছিল। তাহার "ব্লক" তোকুতোমির সংগ্রহের ভিতর রহিয়াছে। চারিশত বৎসরের পুরাতন চিকিৎসাগ্রন্থও কয়েক খানা এই লাইব্রেরীতে দেখা গেল।

তোকুতোমি সংগ্রাহক মাত্র নন। ইনি নিজেও গ্রন্থকার। পত্রিকা-সম্পাদন ছাড়াও সাহিত্য-সেবায় ইনি সময় দিয়া থাকেন। বহুগ্রন্থ প্রনয়ণ করিয়া ইনি অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। এই আয় হইতেই পুরাতন দ্রব্য-সংগ্রহের খরচ উঠিয়া আসে। তোকুতোমি খৃষ্টান। ইঁহার ভগ্নী শ্রীমতী য়াশিমা মহিলা-সংস্কার-সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। তোকুতোমির পিতা-মাতাও নব্য জাপানের গঠনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে য়োশিদা শোনিন জাপানের পাশ্চাত্য বিদ্যার অনুরাগী হন। তাঁহার নিকট শিক্ষা পাইয়াই সেই যুগের জননায়কগণ নূতন পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। তোকুতোমির পিতা এই যুগপ্রবর্ত্তক নূতন-পন্থী শোনিনের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। ইঁহার মাতা সেই শিক্ষা-প্রচারকেরই কন্যা। কাজেই তোকুতোমি প্রথম হইতে নবযুগের আবহাওয়াতেই গড়িয়া উঠিয়াছেন। শোনিনের জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে তোকুতোমির এক খানা বই আছে।

লাইব্রেরী হইতে বাহির হইবার সময়ে তোকুতোমি একখানা জাপানী পুস্তক দেখাইলেন। উহা ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা। এই পুস্তকে জাপানের ৩৬ জন কবির চিত্র আছে। জাপানী সাহিত্যের সর্ব্ব-প্রথম কবির নাম শিতোমারো। ইঁহাদের রচনাবলী হইতে কয়েক পংক্তি চিত্রের নিম্নে বা ঊর্দ্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে। ৩৬ জন কবির মধ্যে কয়েক

জন স্ত্রী-কবির চিত্রও দেখিলাম। একটি রমণীর কবিতা অনুবাদ করিয়া তোকুতোমি শুনাইলেন—"I am grass grown on water. If water flow I wish I could flow with water." অর্থ "জলে জাত তৃণ আমি, জলের সঙ্গেই ভাস্‌তে চাই।"

মঙ্গলবারের মজ্‌লিসে সাহিত্যসেবিগণ স্বদেশী পোষাকে আসিয়াছিলেন। কিন্তু খানা খাইলেন বিদেশীয় কায়দায়। "জাপান এ্যাসোসিয়েশন কঙ্কর্ডিয়া" বা জাপানী শান্তিপরিষদের এক অধিবেশনে দেখিলাম, সভ্যগণ বিদেশীয় পোষাকে আসিয়াছেন। নৈশভোজন পাশ্চাত্য রীতিতেই হইল।

অধ্যাপক হাত্তরির সঙ্গে এইখানে আলাপ করিলাম। ইনি চীনা-সাহিত্যে ও দর্শনে সুপণ্ডিত। ইম্পীরিয়্যাল বিশ্ববিদ্যালয় চীনা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে হাত্তরিকে পাঠাইয়াছিলেন। সম্প্রতি ইনি আনেসাকির স্থানে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতেছেন। আনেসাকি দুই বৎসর সেখানে ছিলেন। দু-এক দিনের ভিতরেই জাপানে ফিরিবেন। হাত্তরি কন্‌ফিউসিয়াস্ এবং তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে হার্ভার্ডে বক্তৃতা করিবেন।

অধ্যাপক উড্‌স্ ভারতবর্ষ হইতে ভারতীয় অধ্যাপক প্রতিবৎসর হার্ভার্ডে আমদানি করিবার উপায় আলোচনা করিতেছিলেন। দেখা যাউক, কতদূর কার্য্য অগ্রসর হয়। জাপানী অধ্যাপকগণ যে ভাবে হার্ভার্ডে যাইতেছেন তাহাতে খরচ বেশী হয় না। সেই পরিমাণ খরচ বহন করিবার শক্তি বহু ভারতবাসীরই আছে।

জাপানের আধুনিক জমিদার

প্রায় দুই ঘণ্টা রেলে চলিয়া সাকুরা নগরে উপস্থিত হইলাম। সহর ছাড়িবার পর হইতে দুই দিকে ধান্যক্ষেত্র দেখিতেছি। সর্ব্বত্র সমতল ভূমি, বর্ষার জল ও ক্ষেতের কাদা। কচি কচি ধান গাছ,—অদূরে চেরি বা মেপ্‌লের সারি—স্থানে স্থানে কলার ক্ষেত। চাষীদের ধরণধারণ, গতি-বিধি সবই প্রাচ্য ধরণের। ইয়োরামেরিকার গন্ধ কিছুমাত্র নাই। মামুলি হালে পুরাতন কায়দায়ই আবাদ হইয়া থাকে। এই আব্‌হাওয়ায় দূর হইতে লোকজনকে দেখিলে বাঙ্গালা দেশের দৃশ্যই মনে আসে। মাছ-ভাত-খাওয়া, খড়োঘরনিবাসী, অনাবৃতমস্তক, হ্রস্বাকৃতি বাঙ্গালীকে জাপানীদের সঙ্গে তুলনা করিতে সহজেই প্রবৃত্তি হয়। কোন কোন ভারতবাসী বলিয়া থাকেন—"জাপানীরা যখন নিজেদের মধ্যে মাতৃভাষায় কথা কহে তখন অনেকটা বাঙ্গালা ভাষার মতই শুনায়।" ভারতীয় অন্য প্রদেশের অধিবাসিগণ জাপানীদিগকে দেখিয়া কি ভাবিবেন জানি না। আমি ত বাঙ্গালীকে ভারতবর্ষের জাপানী বিবেচনা করিতেছি।

সাকুরা নগর বা পল্লী আমাদের মফঃস্বলের সহর বা বড় হাটের মত। এখানে তোকিওর স্বদেশী মহাল্লা বা প্রাচীন অংশই বিরাজমান। তবে বাজারের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে দোকানের ভিতর আধুনিক কল, যন্ত্র, আসবাবপত্র ইত্যাদি অনেক দেখিলাম। দ্বিপ্রহরে পাঠশালার বালকবালিকারা গৃহে ফিরিতেছে। জাপানের শিক্ষার্থীরা বিশেষ এক-প্রকার পোষাক পরিতে বাধ্য। দেখিবামাত্র তাহাদিগকে ছাত্র বলিয়া বুঝা যায়।

রিকৃশ ক্রমশঃ উচ্চতর ভূমির উপর উঠিয়াছে। দেখিতে দেখিতে খানিকটা পাহাড়-সদৃশ অঞ্চলে আসিয়া পড়িলাম। ইহারই একস্থানে সেই হোত্তা একটা কৃষিবিষয়ক পরীক্ষা-ক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে একজন কৃষিতত্ত্ববিৎ জাপানী দশ বৎসর হইতে কর্ম্ম করিতেছেন। ইনি ইম্পিরিয়্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট।

কৃষিতত্ত্ববিৎ বলিলেন—"হোত্তার পূর্ব্বপুরুষগণ শোগুণী আমলে দাইমো ছিলেন। সেই যুগে তাঁহারা শোগুণকেও কর দিতেন না—স্বয়ং মিকাডোও ইঁহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিতেন না। বস্তুতঃ দাইমো-গণ একপ্রকার স্ব-স্বপ্রধান নৃপতিস্বরূপ ছিলেন। হোত্তা-পরিবারের অধীনস্থ সামুরাই এবং প্রজাবর্গ অন্য কোন দাইমো বা শোগুণ বা সম্রাটের অধী-নতা স্বীকার করিতেন না।"

ভারতবর্ষের মধ্যযুগেও রাষ্ট্রীয় অবস্থা অনেকটা এইরূপই ছিল। ইয়ো-রোপে যাহাকে "ফিউড্যাল"-যুগ বলে তাহার আমলে কি ইংল্যাণ্ড, কি ফ্রান্স, কি জার্ম্মাণি সর্ব্বত্রই এইরূপ রাষ্ট্রীয় অনৈক্য বিরাজ করিত। জাপানের শোগুণী আমল দুনিয়ার একটা সৃষ্টি-ছাড়া জিনিষ নয়।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"শোগুণেরা মিকাডোকে ত কিয়োতোর রাজপ্রাসাদে একপ্রকার বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু অন্যান্য দাইমোদিগকে স্ববশে রাখিবার জন্য তাঁহারা কি করিতেন?" কৃষিতত্ত্ব-বিৎ বলিলেন—"যুদ্ধের সময়ে দাইমোরা সদলবলে শোগুণকে সাহায্য করিতে বাধ্য ছিলেন। অধিকন্তু বশ্যতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহাদিগকে শোগুণের ইয়েদো (বর্ত্তমান তোকিও) সহরে গৃহ ও বাস্তুভিটা রক্ষা করিতে হইত। এই গৃহে তাঁহারা বৎসরে ছয় মাস আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হইতেন।" দাইমোরা নিজেদের জমিদারী ছাড়িয়া শোগুণের আওতায় আসিয়া বাস করিতে ভাল বাসিতেন না। তাঁহাদের বিরক্তি

সমসাময়িক কাব্য-সাহিত্যে বুঝিতে পারা যায়। ডিকিন্স্ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও অনূদিত Japanese Text গ্রন্থে এই বিরহ-কাব্যের নিদর্শন উদ্ধৃত হইয়াছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"শোগুণী আমলে হোত্তা দাইমোদিগের আয় কিরূপ ছিল? স্বয়ং শোগুণের আয়ই বা কত ছিল?" উত্তর পাই-লাম—"হোত্তারা বিশেষ ধনশালী ছিলেন না। তাঁহাদিগের আয় ছিল মাত্র এক লক্ষ "কোকু" চাউল।" চারি মণে এক কোকু হয়। এক লক্ষ কোকুর অর্দ্ধাংশ মাত্র দাইমোর সম্পত্তি ছিল।

হোত্তা-পরিবার অপেক্ষা শক্তিশালী ও ধনবান্ দাইমো অনেক ছিলেন। দাইমো-পরিবারের আয় ছিল দশ লক্ষ কোকু, মাৎসুমা-পরিবারের সম্পত্তি হইতে মাত্র ছয় লক্ষ কোকু আমদানি হইত। স্বয়ং মিকাডো সম্রাট অতি দরিদ্র ছিলেন। কিন্তু তোকুগাওয়া বংশীয় শোগু-ণেরা ৮০ লক্ষ কোকু চাউলের মালিক ছিলেন। এই জন্যই তাঁহারা অন্যান্য সকলকে অধীনে রাখিতে পারিতেন। অথচ এই বংশ ষোড়শ শতাব্দীর শেষে নিতান্ত দারিদ্র্য হইতে শোগুণীপদ লাভ করে।

শোগুণের "নবাবী আমল"ও আর নাই—দাইমো-রাজন্যবর্গের জমি-দারীও আর নাই। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সেই জাপানী ফিউড্যাল যুগের নির্ব্বাণ হইয়াছে—সমগ্র দেশ মিকাডো সম্রাটের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে জনপদে বহু জাপান দেখা যাইত তখন হইতে সেখানে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে প্রায় এই সময়েই জার্ম্মাণীতেও এইরূপ একরাষ্ট্রীয়তা দেখা দিয়াছে। কিন্তু জার্ম্মাণ-জাতির ঐক্যবন্ধনের পূর্ব্ববর্ত্তী ইতিহাস রক্তাক্ষরে লিখিত। ফ্রান্সে এবং ইংল্যাণ্ডেও বহু রক্তারক্তির পর রাষ্ট্রীয় অনৈক্য ঘুচিয়াছে। কিন্তু জাপানী ফিউড্যাল যুগ এক প্রকার বিনারক্তপাতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

ইহাই জাপানী "রেষ্টোরেশনের" (বা রাজ-ক্ষমতার পুনঃ প্রতিষ্ঠার) বিশেষত্ব। জগতে আর কোথাও এইরূপ বিপ্লব দেখা যায় নাই।

প্রবল-প্রতাপ শোগুণ সবার বিনা আপত্তিতে তাঁহার ঘরবাড়ী, প্রাসাদ, দুর্গ, সৈন্যসামন্ত, রাজস্ব, ইত্যাদি সকলই মিকাডোর পদতলে সমর্পণ করিলেন। দাইমোগণও তাঁহাদের নিজ নিজ জমিদারী বিনা বাক্যব্যয়ে মিকাডোর সম্পত্তির সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিলেন। দুনিয়ার আর কোন রাজরাজড়ার বংশে এইরূপ আত্মবলিদান ঘটিয়াছে কি ?

দাইমোগণ বৃটিশ বাঙ্গালার জমিদার অথবা যুক্তপ্রদেশের তালুকদার ইত্যাদির সমান নন। তাঁহারা বৃটিশ ভারতের রুলিং চীফ্ অর্থাৎ করদ-নৃপতি অথবা ইয়োরোপীয় মধ্যযুগের ডিউক এবং মোগল আমলের রাণা, মহারাণা, নবাব ইত্যাদি পদস্থ ব্যক্তি। স্বদেশের এক অতি বিপজ্জনক অবস্থায় এই সকল নৃপতিবর্গ নিজ নিজ রাজ্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ইহা কল্পনা করিয়াও রোমাঞ্চিত হইতেছি। কথাটা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। অথচ ঘটনা সত্য—সেদিন মাত্র ঘটিয়াছে। সেই যুগের বহুলোক এখনও বাঁচিয়া আছেন।

এই যে হোত্তাবংশীয়দিগের কৃষিক্ষেত্র দেখিতে আসিয়াছি, তাঁহারাও স্বার্থত্যাগের আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। কৃষিতত্ত্ববিৎ বলিলেন—"অন্যান্য দাইমোর ন্যায় হোত্তাও একসঙ্গে দুইটি স্বার্থত্যাগ করিলেন। প্রথমতঃ তাঁহার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও অধিকার বিসর্জ্জন দিলেন। তাঁহার সামুরাই ও প্রজাবর্গ মিকাডোর অধীনতা স্বীকার করিল। হোত্তা স্বয়ং জনসাধারণের একজন হইয়া রহিলেন। দাইমোতে এবং সামুরায়ে কোন প্রভেদ থাকিল না। দ্বিতীয়তঃ হোত্তা এবং অন্যান্য দাইমোগণ সকলেই দারিদ্র্যব্রত অবলম্বন করিলেন। বিষয়সম্পত্তির এক কাণাকড়া পর্য্যন্ত

কেহই স্বহস্তে রাখিলেন না। ভূমি, দুর্গ গৃহ, আসবাব সমস্তই মিকাডোর সম্পত্তি হইয়া গেল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তাহা হইলে বিগত ৪০ বৎসরের ভিতর জাপানে ভূম্যধিকারী বা জমিদার উৎপন্ন হইল কোথা হইতে?" হোত্তার কর্ম্মচারী বলিলেন—"মিকাডো প্রত্যেক দাইমোকে কিছু কিছু নগদ টাকা দান করিতে থাকিলেন। কাহাকেও জমি প্রদান করা হইল না। দাই-মোরা কাঁচা টাকা মাত্র পাইলেন। বোধ হয় মিকাডো শতকরা ৯০ ভাগ সাম্রাজ্যের জন্য রাখিয়া ১০ ভাগ দাইমোদিগকে ফিরাইয়া দিলেন। দাইমোরা তাহা পাইয়াই সন্তুষ্ট।"

শোগুণী আমলের সঙ্গে সঙ্গে দাইমো, সামুরাই ইত্যাদি নামও জাপানী সমাজ হইতে লোপ পাইয়াছে। দাইমোদিগের বংশধরেরা কেহ ব্যবসায়ে, কেহ শিল্পে, কেহ কৃষিকর্ম্মে নগদ টাকা খাটাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ ভূমি ক্রয় করিয়া জমিদার হইলেন। এই নবীন জমিদারবর্গ সেই দাইমোবর্গ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। দুয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই।

কোন কোন ক্ষেত্রে দাইমোগণ মিকাডোপ্রদত্ত টাকাদ্বারা জমিদারী ক্রয় করিয়াছেন। সুতরাং কোথাও কোথাও প্রাচীন দাইমোবংশীয়েরা আজকাল জমিদার। কিন্তু এই জমিদারী বর্ত্তমান জগতের অন্যান্য দেশের ভূম্যধিকার মাত্র।

হোত্তা-দাইমোরা জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে সকল জনপদে রাজত্ব করিতেন তাহারই কিয়দংশ ঘটনাচক্রে এক্ষণে নব্য জমিদারীর অন্তর্গত; কিন্তু রাইয়তদিগের সঙ্গে সম্বন্ধ অন্যবিধ। তাঁহাদের প্রাচীন দুর্গে আজকাল সাম্রাজ্যের সৈন্যগণ বাস করে।

রাইয়তেরা গবর্ণমেণ্টের খাজানা স্বয়ং দেয় না—তাহাদের সকল কর্ত্তব্য জমিদারেরা পালন করেন। ভূমি হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের অর্দ্ধাংশ রাইয়ত-

দিগের প্রাপ্য, অপরার্দ্ধ জমিদারের প্রাপ্য। ভূমিতে যে দ্রব্যই উৎপন্ন হউক না কেন, জমিদার চাউল গ্রহণ করিবেন। কিন্তু জমিদার গবর্ণমেণ্টকে টাকা হিসাবে কর প্রদান করিয়া থাকেন। জমিদারে রাইয়তে ভাগবাটোয়ারার নিয়ম একপ্রকার চিরস্থায়ী। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট করের হার মাঝে মাঝে পরিবর্ত্তন করেন।

হোত্তা জমিদারী ক্রয় করিবার পর হইতেই প্রজাবর্গের উন্নতি বিধানে মনোযোগী হন। ইয়োরামেরিকার সকলপ্রকার বিদ্যা জাপানী সমাজে প্রবর্ত্তন করিবার জন্য হোত্তারা যৎপরোনাস্তি যত্ন লইয়াছেন। নব্য বিজ্ঞানসম্মত কৃষিকার্য্য প্রচলিত করিবার উদ্দেশ্যে এই পরীক্ষাক্ষেত্রের উৎপত্তি। কৃষিবিষয়ক পরীক্ষাক্ষেত্রে যে সকল কার্য্য চলিয়া থাকে তাহার অনেকগুলিই এখানে দেখিলাম। এই ক্ষেত্র প্রধানতঃ বিদ্যালয়ভাবে ব্যবহৃত হয়। নূতন নূতন শাকশব্জী, ধান ও গম, ফল ও মূল যাহাতে পল্লীর ভিতর প্রবর্ত্তিত হয় সেই লক্ষ্য সর্ব্বদা রহিয়াছে। বক্তৃতা, প্রবন্ধ-প্রচার, নিয়মিত বিদ্যাদান ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। নব নব কৃষিপ্রণালী এবং যন্ত্র ও কলের ব্যবহার জনগণকে দেখান হইতেছে। শুনিলাম, জাপানে যে সকল ফসল পূর্ব্বে উৎপন্ন হইত না সেই সকল ফসলেই কৃষিক্ষেত্রের একতৃতীয়াংশ ভরিয়া গিয়াছে।

এ্যাস্প্যারেগাস, শাঁকআলু, কুমড়া, নাসপাতি, শসা ইত্যাদির ক্ষেত দেখিলাম। নাশপাতির গাছে বাঁশের মাচা আবশ্যক হয়। ধান্য রোপণের বিভিন্ন প্রণালীর প্রভেদ পরীক্ষা করা হইতেছে। বিভিন্ন সারের ফল নিরীক্ষণ করিবার আয়োজন আছে। প্রায় ৩০ বিঘা জমির উপর কার্য্য চালান হয়। খরচ হয় বার্ষিক ১০,০০০৲। কেরাণী ও ওস্তাদের সংখ্যা ১০ জন—মজুর সাধারণতঃ ১০ জন—প্রয়োজন হইলে বাড়াইয়া লওয়া হয়।

উচ্চ পাহাড় হইতে নামিয়া নিম্নভূমিতে আসিলাম। এখানে ক্ষুদ্র

বৃহৎ বহুসংখ্যক ধান্যক্ষেত্র দেখা গেল। কোথাও জলের প্রভাব পরীক্ষা করা হইতেছে—কোথাও ভূমির প্রকৃতি পরীক্ষা করা হইতেছে—কোথাও ভিন্ন ভিন্ন সারের ফল স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষা করা হইতেছে।

উদ্ভিদ হইতে ধান বা গম ছাড়াইবার জন্য জাপানীরা পশু ব্যবহার করে না। মজুরেরা লাঠির দ্বারা শস্যের স্তূপে আঘাত করে।

ভারতীয় জাপানী

মাস তিনেক হইল জাপানী সন্তান রিউকান কিমুরা ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিমুরা বাঙ্গালাদেশে প্রায় আট বৎসর ছিলেন। জাপানের গবর্ণমেণ্ট তাঁহার খরচ বহন করিয়াছেন—আরও দুই বৎসরকাল কিমুরা গবর্ণমেণ্টর বৃত্তি পাইবেন, এইরূপ শুনা যাইতেছে।

কিমুরা গণ্যমান্য অনেক বাঙ্গালীকে চিনেন—বঙ্গের বহু জননায়কও কিমুরাকে আপনার লোক বলিয়া জানেন। গতবৎসর কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে কিমুরা বঙ্গভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তখন হইতে কিমুরার নাম ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়ে। সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ কিমুরাকে অভিনন্দন প্রদানপূর্ব্বক সমগ্র বঙ্গসমাজে ইঁহার নাম প্রচার করিয়াছেন।

কিমুরা মাহেন্দ্রক্ষণেই জাপানে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইয়োরোপীয় মহাসমরের সুযোগে জাপানীরা ভারতবর্ষের বাজার দখল করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। ভারতবর্ষীয় লোকজনের রুচি অনুসারে মাল সরবরাহ করিবার জন্য ইঁহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। "ইন্দু-জাপানীজ্ এ্যাসোসিয়েশন" এত দিন নাকে তেল দিয়া ঘুমাইতেছিলেন। এক্ষণে এই সমিতি নিয়মিতরূপে কার্য্য সুরু করিয়াছেন। কিন্তু জাপানীদের কেহই ভারতবর্ষকে বিস্তৃত ও গভীরভাবে বুঝিয়া দেখেন নাই। কাজেই কিমুরা জাপানে পদার্পণ করিবামাত্র দেশবিশ্রুত হইয়া পড়িলেন। ব্যবসায়ি-মহলে, ছাত্রমহলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, সম্পাদক-মহলে, সর্ব্বত্র কিমুরার খাতির। ইঁহাকে কোন কোন দিন সাত আট ঘণ্টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা করিতে হইয়াছে।

জাপানে ভারতীয় আন্দোলন কিমুরার আগমনে বিশেষ শক্তি লাভ করিয়াছে। ইংরাজী দৈনিক পত্রে তাহার অল্পমাত্র পরিচয় পাই। কিন্তু জাপানী পত্রসমূহে ভারতবর্ষসম্বন্ধে নানা কথা প্রায়ই বাহির হইতেছে।

এদিকে রবিবাবু আসিতেছেন শুনিয়া জাপানীসমাজ বিশেষ আগ্রহের সহিত ভারতীয় সাহিত্য আলোচনা করিতে ব্যগ্র। কিমুরা রবিবাবুকে চিনেন—তাঁহার জন্য তোকিওতে বাসগৃহ ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতেছেন। এই কারণে কিমুরার আদর সাহিত্যসংসারে যথেষ্ট বাড়িয়াছে।

কিমুরার নাম কোন ইংরাজী কাগজে দেখি নাই। সেদিন "মঙ্গলবারের মজ্‌লিশে" একজন সাহিত্য-সেবী ইঁহার সংবাদ দিয়াছিলেন। দেখা হইবামাত্র কিমুরা বলিলেন—"আমি আজকাল জাপানে মোষ্ট ফেমাস্ ম্যান 'খুবই নামজাদা লোক'। আমাকে সকলে 'ইণ্ডিয়ান কিমুরা' বলিয়া ডাকে। বক্তৃতা করিতে করিতে আমার গলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।"

কিমুরা বাঙ্গালাদেশের অলিগলি, খুঁটিনাটি, নাড়ী-নক্ষত্র সবই জানেন। আমাদের ধুরন্ধর ও জননায়কগণের হাঁড়ীর খবর ইনি রাখেন। আমাদের কাহার পেটে কত বিদ্যা, তাহাও ইঁহার বেশ জানা আছে। এমন কি, বঙ্গদেশ-সম্বন্ধে কিমুরা যত জানেন বহু বাঙ্গালী তত জানেন না। কিমুরা বঙ্গীয় নেতৃগণের সঙ্গে অতিশয় ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন। ইনি যে কত লোকের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কত বিষয় শিখিয়াছেন, তাহার অন্ত নাই। কেহ বেদান্তদর্শন, কেহ সংস্কৃত ভাষা, কেহ ব্যাকরণ, কেহ পালি, কেহ বাঙ্গালা-সাহিত্য শিখাইয়াছেন—এই কারণে ইনি বহু ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিবারস্থ একজন বিবেচিত হইয়া থাকেন। সুতরাং জাপানীসমাজে বাঙ্গালাদেশকে উন্মুক্ত করিবার পক্ষে কিমুরার যোগ্যতা অসাধারণ।

কিমুরার অধ্যবসায় এবং বিদ্যানুরাগ দেখিয়া বাঙ্গালা দেশের বহু পণ্ডিত মুগ্ধ হইয়াছেন। তোকিওতেও দেখিতেছি, ইঁহার বাঙ্গালা সাহিত্য-

চর্চ্চা বন্ধ হয় নাই। রবিবাবুর "বিচিত্র প্রবন্ধ" হইতে দুইটা প্রবন্ধের কোন কোন স্থান বুঝিবার জন্য কিমুরা হোটেলে দুই দিন আসিয়া উপস্থিত।

জাপানীরা বিদেশীয় ভাষার উচ্চারণে বিশেষ পটু হয় না। কিমুরা আট বৎসরে বাঙ্গলাদেশের একাধিক জেলায় ভ্রমণ করিয়া বহু পল্লীতে বাস করিয়া যতখানি বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, কোন ভারত সন্তান সেই পরিমাণ পরিশ্রম করিলে জগতের যে কোন ভাষা তাহা অপেক্ষা বেশী আয়ত্ত করিতে পারে। এমন কি ছয় মাস মাত্র জাপানে থাকিয়া একজন বাঙ্গালী যুবক খাঁটি জাপানীভাবে জাপানীতে কথা বলিতেছে। জাপানীরা স্বয়ংই তাহার বুৎপত্তি দেখিয়া বিস্মিত হয়। অথচ সে এখনও জাপানী পুস্তক পাঠ করিতে পারে না।

কিমুরা ভারতবর্ষ হইতে নানা গ্রন্থ লইয়া আসিয়াছেন। জাপানীদিগকে ভারতবর্ষের গৃহস্থালী ও জীবনযাত্রা বুঝাইবার জন্য নানা দ্রব্যও সঙ্গে আনিয়াছেন। হুকা, কল্কে, পান, সুপারি, ধুতী, গামছা ইত্যাদি কোন পদার্থ বাদ পড়ে নাই। শুনিলাম, কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে দর্শনবিভাগে একটা পদ দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সঙ্গে একত্রযোগে ইনি কার্য্য করিবেন। এই জন্য জাপানী ও চীনাদার্শনিক গ্রন্থ সংগ্রহ করা কিমুরার বিশেষ উদ্দেশ্য। ইনি বলিলেন—"বৎসরখানেক মধ্যে বিবাহ করিয়া ভারতবর্ষে সস্ত্রীক যাইবার ইচ্ছা আছে।"

কিমুরার ঘরে যাইয়া তাঁহার বন্ধুগণের সঙ্গে জপানী-আহার করা গেল। নানা কথার পর একটা নোট বুক দেখিলাম। ইহাতে কিমুরা তাঁহার ভারতীয় বন্ধুগণদ্বারা বিদায়পত্র স্বহস্তে লিখাইয়া লইয়াছেন। শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় হইতে সুহ্রাওয়ার্দি এবং ধর্ম্মপাল পর্য্যন্ত বহু ব্যক্তির স্বহস্ত-লিখিত মঙ্গলকামনা দেখিলাম। কেহ সংস্কৃতে, কেহ ইংরাজীতে, কেহ বাঙ্গালায়, কেহ উর্দ্দুতে লিখিয়াছেন।

প্রথম পৃষ্ঠায় কিমুরার নিবেদন পত্র এইরূপ :—

"আমি নিপ্পন হইতে আসিয়া আজ ছয় বৎসর যাবৎ আপনাদের আশ্রয়ে এই ভারতবর্ষে বাস করিয়াছি এবং আপনাদের অনুগ্রহে সংস্কৃত, পালি এবং বাঙ্গালা ভাষা অধ্যয়ন করিয়াছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে এদেশের দর্শন ও ধর্ম্মসম্বন্ধেও কিছু জ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছি বলিয়া আমি বড়ই কৃতজ্ঞ আছি। অবশ্য নিজের অভীষ্ট বিদ্যালাভ করিতে আরও ২।৩ বৎসর সময়ের প্রয়োজন হইবে। কিন্তু শারিরীক উন্নতিসাধন মানসে ও অন্যান্য বিশেষ কারণে এবার সাধারণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতেছি। অতএব প্রার্থনা যে, আপনারা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক এই পুস্তকে নিজ নিজ নাম ধাম সহ আপনাদের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ যে কোন ভাষায় কিছু লিখিয়া আমাকে সুখী ও বাধিত করিবেন। ইতি ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯১৫। বিনীত আর কিমুরা"।

রবি বাবু লিখিয়াছেন—

"একদিন এসেছিলে, হে অতিথিবর,
ধনে ধান্যে পূর্ণ ছিল ঘর।
আজ দরিদ্রের গৃহে, নাই মণি হেম,
আছে দুঃখ আছে শুধু প্রেম।"

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন—

"এক বৎসর আপনার সহিত সংলাপে এবং আপনার ঐকান্তিক বিদ্যানুরাগ ও একাগ্রতার পরিচয়ে বিশেষ প্রীতি লাভ করিতাম। মনে হইত ভারতবর্ষ যখন আমাদের স্বভূমি ছিল, আমরাও বুঝি ঐরূপই ছিলাম।"

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখিয়াছেন—

"আপনার নিকট বহু বিষয় আমার শিখিবার ছিল। চীনে ও জাপানে আমাদের ধর্ম্ম, দর্শন ও আচার কিরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে ও কিরূপ

আকৃতি গ্রহণ করিয়াছে, আপনার মত পণ্ডিতের নিকট তাহা শিখিয়া লইব, আমার এই আশা ছিল। ইংরেজি পুস্তকে যাহা পড়িতে পাই তাহাতে পিপাসা মিটে না। * * * তখন যদি বাঁচিয়া থাকি এবং সুযোগ পাই, আপনার নিকট ছাত্র হইয়া বসিব।

শ্রীযুক্ত ধর্ম্মপাল আপনাকে লিখিয়াছেন—'India is without the light of the Buddha', তাঁহার এই কথা আমি স্বীকার করিলাম না। ভারতবর্ষ হইতে বুদ্ধের জ্যোতি অন্তর্হিত হয় নাই এবং কখনও হইবে না।"

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন—

"তুমি বেশ বাঙ্গালা শিখিয়াছ। বিদেশী লোক এমন বাঙ্গালা কহিতে, লিখিতে এমন কি বক্তৃতা পর্য্যন্ত করিতে পারে, ইহা আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। তোমার বৌদ্ধধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ পড়িয়া আর বছরের সম্মিলনীতে অনেক লোক মুগ্ধ হইয়াছিল।"

শ্রীযুক্ত সুহ্রাওয়ার্দি লিখিয়াছেন—

"Let us look forward to the accomplishment of the great task about which we have often talked together the unification of the religions of the world, the diffusion of the teachings of the gentle Buddha, and the restoring in of the dawn of the Great Enlightenment."

শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"You are one of that noble band of scholars praised by such illustrious names of old as those of Fa Hian, Hiouen Thsang and Itsing who have aided in the diffusion of Indian culture beyond the limits of India and promoted the cause of Asiatic Unity."

ভারতবর্ষে কিমুরা যে ভাবে ও যে উদ্দেশ্যে জীবনযাপন করিয়াছেন পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও অসংখ্য নিপ্পন-সন্তান ঠিক সেই ভাবে ও সেই মতলবে ঘুরিতেছেন। জীবিত জাতির কর্ম্মপ্রণালী এইরূপ। কিমুরার মত লোক জাপানে অনেক আছে বলিয়াই এবং এই সকল লোকের অন্ন বস্ত্র জোগাইবার সহজ ব্যবস্থা করা হয় বলিয়াই জাপান আজ "ফার্ষ্ট ক্লাস পাওয়ার।" এইজন্যই জাপানীরা এশিয়ার জার্ম্মাণ। সজীব ভারতও এইরূপই ছিল। হীরেন বাবু সংক্ষেপে আসল কথাটা বলিয়াছেন—"ভারতবর্ষ যখন আমাদের স্বভূমি ছিল, আমরাও বুঝি এইরূপই ছিলাম।"

কিমুরাকে দেখিয়া যুবক ভারত নব্য জাপানের মূল-মন্ত্র বুঝিতে পারেন নাই কি?

জাপানীদের মধ্যে কিমুরার নিন্দুকসংখ্যাও কম নয়। তাঁহারা বলেন—"কিমুরা পি, এইচ ডি উপাধি পাইল কোথা হইতে? সেত জাপানের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট নয়। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কি জাপানের যে কোন যুবককে দর্শনাধ্যাপক পদে নিযুক্ত করিতে ব্যগ্র?" কিমুরা-বিদ্বেষীরা এই বলিয়া ভারতীয় পণ্ডিতগণের বিদ্যা বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছেন। কিমুরা বোধ হয় জাপানে প্রচার করিয়াছেন যে, এই পি, এইচ্ ডি উপাধি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত।

* *
*

ব্যবসায়—সেনাপতি ব্যারণ শিবুসাওয়া

বিদেশীয় লোকেরা জাপানের আর কাহাকে না চিনিলেও প্রিন্স ইতোকে চিনিত। সেইরূপ জগদ্বাসী অন্য কোন জাপানীর নাম না শুনিলেও কাউণ্ট ওকুমার নাম শুনিয়াছে। ওকুমা আজকাল এদেশের প্রধান মন্ত্রী—কিন্তু এই পদলাভের বহুপূর্ব্ব হইতেই তিনি দুনিয়ায় জাপানের প্রতিনিধি। অথচ তিনি কোন বিদেশীয় ভাষায় কথাও কহেন না, বক্তৃতাও করেন না, গ্রন্থও লিখেন না। বর্ত্তমান জগতে অষ্ট্রীয়ান সম্রাট জোসেফ ছাড়া বোধ হয় ওকুমার সমান বৃদ্ধ রাষ্ট্রবীর আর কেহ নাই। ইনি জাপানের শিক্ষাক্ষেত্রে, সমাজসংস্কারে, শিল্পের আন্দোলনে, সাহিত্যের আসরে সর্ব্বত্রই বিরাজমান। মন্ত্রীগিরি না করিলেও ওকুমার অবসর থাকে না। কাজেই বিদেশীয় কোন ব্যক্তি জাপানে আসিলে ওকুমার সঙ্গে একবার দেখা করিয়া যান।

জীবিত জাপানীদিগের মধ্যে অধ্যাপক নিতোবে ইয়োরামেরিকায় খানিকটা এইরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ষোল সতর বৎসর পূর্ব্বে তিনি "বুশিদো" নামক ইংরাজী গ্রন্থ আমেরিকায় প্রচার করেন। তখন সবে মাত্র চীনাসমরে জাপানে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে। নিতোবের এই গ্রন্থ জাপানীলিখিত জাপান-চিত্রের প্রথম পুস্তকস্বরূপ দুনিয়ার শেতাঙ্গমহলে সমাদৃত হইল। আজকাল রবীন্দ্রনাথের "গীতাঞ্জলি" ইয়োরামেরিকায় ভারতবর্ষের প্রতিনিধি। নিতোবের "বুশিদো" গ্রন্থও ঠিক এইরূপ জাপানপ্রতিনিধিরূপে বিবেচিত হইত। নানা ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ বাহির হইয়াছে। আমাদের মারাঠি ভাষায়ও অনুবাদ আছে।

ফলতঃ যাঁহারা জাপানের নাম শুনিয়াছেন তাঁহারা নিতোবের নামও শুনিয়াছেন। নিতোবের পুস্তক লইয়াই জাপানসম্বন্ধে বিদেশীয়গণের "হাতে খড়ি" হয়।

ভারতবর্ষে দেখিতে পাই, কয়েকজন নামজাদা লোক প্রায় সকল অনুষ্ঠানেই যোগ দিতে বাধ্য। জাপানের জাতীয় জীবনে ওকুমা, নিতোবে ইত্যাদি ধুরন্ধরগণ এই ধরণেরই কর্ণধার। এমন কোন আন্দোলন নাই যাহাতে ইঁহাদের সংশ্রব নাই। এইরূপ আর একজন প্রবীন ব্যক্তিকে প্রায় সর্ব্বঘটেই দেখিতে পাই। ইনি শিল্প-সেনাপতি ব্যবসায়-ধুরন্ধর ব্যারণ শিবুসাওয়া। বয়সে ইনি ওকুমার সমান প্রাচীন। শোগুনী আমল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ইনি নব্যজাপানের জন্ম, শৈশব ও যৌবনকাল গঠন করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

শিবুসাওয়ার সঙ্গে প্রথম দেখা হইল "জাপান এ্যাসোসিয়েশন কঙ্করর্ডিয়া"র সভায়। জাপানে ও আমেরিকায় সদ্ভাব বর্দ্ধন এবং জগতে শান্তিপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদির আন্দোলনে ইনি জাপানের একজন বড় পাণ্ডা। কয়েক বৎসর হইল ইঁহার উদ্যোগে জাপান হইতে ৫০ জন প্রধান ব্যবসায়ী আমেরিকার প্রসিদ্ধ শিল্প-কেন্দ্র পরিদর্শন করিতে বাহির হইয়াছিলেন। ইনি স্বয়ংও সহযাত্রী ছিলেন। ইনি কোন বিদেশীয় ভাষায় কথা কহেন না। ইঁহার সঙ্গে দেখা করিতে হইলে ইণ্টারপ্রেটার বা দোভাষী সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়। কাউণ্ট ওকুমা তাঁহার নিজের দোভাষীর সাহায্যে বিদেশীয় লোকজনের সঙ্গে কথোপকথন করেন।

শিবুসাওয়াকে একাধিকবার রাজস্ব-সচিবের পদ প্রদত্ত হইয়াছিল। ইনি একবারও তাহা গ্রহণ করেন নাই। স্বাধীনভাবে নানা ব্যাঙ্ক ও শিল্পের প্রবর্ত্তনে ইনি শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। মিউনিসিপ্যালিটি এবং চেম্বার অব কমার্স ইত্যাদির কার্য্যে ইঁহার যথেষ্ট উৎসাহ।

শিবুসাওয়ার আফিসে একবার সাক্ষাৎ করিলাম। ইনি বলিলেন—"তোকুগাওয়া আমলে শিল্প ও বাণিজ্য নিকৃষ্ট কার্য্য বলিয়া সমাজে নিন্দিত হইত। বণিকগণের মর্য্যাদা দেশে নিতান্ত নগণ্য ছিল। দাইমোরা রাজ্য চালাইতেন—সামুরাইগণ ক্ষাত্রধর্ম্মের উপাসক ছিল। কৃষকেরা জমি চষিত; তাহাদের জীবনের কোন মূল্য দেওয়া হইত না। সমগ্র সমাজে লড়াই করাই সর্ব্বোচ্চ নীতির মধ্যে পরিগণিত ছিল।"

কাজেই শিল্প, ব্যবসায়, কৃষিকর্ম্ম ইত্যাদি ধনাগমের উপায়সম্বন্ধে জাপানীদিগের বিদ্বেষ ও কুসংস্কার নিবারণ করা উন্নতিকামী নূতনপন্থী স্বদেশ-সেবকগণের লক্ষ্য হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবে জাপানীসমাজ ও রাষ্ট্র রূপান্তরিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে এখানকার বৈষয়িক জীবনও আগাগোড়া বদলাইয়া গিয়াছে। মিকাডোর সাম্রাজ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে দাইমোর প্রতাপ এবং সামুরাইয়ের আস্ফালন তিরোহিত হইল। পুরাতন কর্ম্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া দেশবাসী নব নব কর্ম্মক্ষেত্রে শক্তি নিয়োগ করিতে বাধ্য হইল। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়ের দিকে অস্ত্রব্যবসায়ী সামুরাইগণও ক্রমে ক্রমে ঝুঁকিতে লাগিল। ফলতঃ একটা বৈষয়িক বিপ্লবের যুগ আসিয়া উপস্থিত হইল। জাপানের এই রেষ্টোরেশন (বা রাজক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা) কাল সকল দিক হইতেই যুগান্তর আনিয়া দিয়াছে। এই জন্য জাপানী ভাষায় ইহাকে "মেজি" বা "নবাভ্যুদয়ে"র যুগ বলে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"সর্ব্বপ্রথমে কোন্ শিল্পে বা ব্যবসায়ে জাপানীরা মনোনিবেশ করেন? সেই কার্য্যে পথপ্রদর্শক বা প্রবর্ত্তক ছিলেন কাহারা?" শিবুসাওয়া বলিলেন—"প্রথমেই আমাদিগকে টাকার বাজার গড়িয়া তুলিতে হইল। দাইমোদিগের ভূসম্পত্তির পরিবর্ত্তে সাম্রাজ্য হইতে টাকা দেওয়া হইতে থাকিল। রেলপথ ও জাহাজ নির্ম্মা-

শের জন্য পাশ্চাত্যবিদ্যার আলোচনা সুরু হইল। ' বিদেশীয় লোক ও যন্ত্রের আমদানি দ্রুতবেগে চলিল। স্বদেশেও নানা এঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্ক‌স্ প্রবর্ত্তিত হইল। এই সকল কার্য্যে মূলধন যোগাইবার জন্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য বিবেচিত হয়। গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং চেষ্টা করিয়া এই সকল নূতন নূতন কর্ম্মের সূত্রপাত করেন। ক্রমশঃ দেশের জনগণ নূতন বিদ্যায় পারদর্শী হইতে থাকে এবং একটা একটা কারখানা বা ব্যবসায়ে ধন খাটাইতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু ১৮৯৪ সাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ চীনাসমরের আমল পর্য্যন্ত জাপানের নব্য শিল্প ও ব্যবসায় বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই। তখনও জনসাধারণ স্বাধীনভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ধনবৃদ্ধির আন্দোলনে যোগদান করে নাই। পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর কাল গবর্ণমেণ্ট জনগণের পিতাস্বরূপ নব নব কার্য্যের পথপ্রদর্শক ছিলেন।"

আজকাল জাপানে যে সকল বড় বড় শিল্প ও ব্যবসায়ের কেন্দ্র, অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান দেখা যায় তাহার অধিকাংশই চীনাসমরের পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। জাপানী-সমাজে স্বদেশী শিল্পের আন্দোলন সত্যসত্যই মাত্র বিশ বৎসরের শিশু। ইতিমধ্যে প্রাচীনতর ব্যাঙ্কগুলির সংশোধন ও পুনর্গঠন সাধিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলির কার্য্য সহজ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার জন্য তোকিওতে "ব্যাঙ্ক অব্ জাপান" নামক কেন্দ্র-ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। এই ব্যাঙ্ক ছাড়া আর কোন ব্যাঙ্ক আজকাল নোট বাহির করিতে পারে না। বহির্ব্বাণিজ্যে সাহায্য করিবার জন্য "ইয়োকোহামা স্পেসি ব্যাঙ্ক" স্থাপিত হইয়াছে। এদিকে দেশের ভিতর কৃষি ও শিল্প প্রবর্ত্তনে সাহায্য করিবার জন্য "ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক" এবং "হাইপথেক ব্যাঙ্ক" স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যাঙ্কেই গবর্ণমেণ্টের পরিচালনা ও কর্তৃত্ব ন্যূনাধিক রহিয়াছে। নানা ভাবে গবর্ণমেণ্ট জনগণের পিতাস্বরূপ কর্ম্ম করিতেছেন। জনসাধারণ আজকাল অনেকটা নিজ পায়ের উপর

দাঁড়াইয়া শিল্প ও ব্যবসায় চালাইতেছে সত্য—কিন্তু গবর্ণমেন্টের "সংরক্ষণ-নীতি" এবং অভিভাবকত্ব এখনও চলিতেছে। জনগণকে নূতন কোন কর্ম্মে ব্রতী করিতে হইলে গবর্ণমেন্ট স্বয়ংই আজকালও পথপ্রদর্শক হন। সকল দেশেই এইরূপ দেখা যায়।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ওসাকা নগরীর শিল্পসম্পদ কিরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে?" শিবুসাওয়া বলিলেন—"নব্যজাপানের সকল বিভাগের গোড়াপত্তন তোকিওতে হইয়াছে। তোকিওকে দেখিয়াই অন্যান্য স্থানের জনগণ কার্য্য করে। তোকিওর বৈষয়িক ইতিহাস যাহা, অন্যান্য ব্যবসায়-কেন্দ্রের ক্রমবিকাশও তাহাই। সর্ব্বত্রই গবর্ণমেন্ট অগ্রগামী ও প্রবর্ত্তক এবং জনসাধারণ পশ্চাদগামী ও শিষ্য।"

ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা কৃষক, মহাজন এবং শিল্প-সেনাপতিদিগের যাহাতে সুবিধা হয় গবর্ণমেন্ট তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেদিন "হাই-পথেক ব্যাঙ্কে"র গবর্ণরের সঙ্গে আলাপ হইতেছিল। তিনি বলিলেন—"কোন কোম্পানীর যদি একটি মাত্র পয়সাও মূলধন না থাকে অথচ তাঁহাদের বিদ্যা ও চরিত্রবল থাকে তাঁহাদিগকেও বিনাবন্ধকে আমরা কর্জ্জ দিতে পারি।" এইরূপ কৃষি-ব্যাঙ্ক জাপানে ৪৬টা—প্রত্যেক জেলায় একটা।

এই সকল ব্যাঙ্কের কার্য্যকারিতা বাড়াইবার জন্য গবর্ণমেন্ট কতকগুলি বিশেষ অধিকার প্রদান করিয়াছেন। ইহারা স্বকীয় মূলধনের দশগুণ মূল্যের ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিতে পারে। তাহার ফলে অল্প টাকাতে বেশী কাজ চলিয়া যায়। অবশ্য এই কার্য্যে ঝুঁকি অত্যন্ত বেশী। তবে স্বদেশী আন্দোলন চালাইবার জন্য পিতৃতুল্য গবর্ণমেন্ট দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীরা যাহাতে ব্যভিচার না করে তাহার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে। এইজন্য গবর্ণমেন্টের রাজস্ব-বিভাগ ব্যাঙ্কগুলিকে সকল বিষয়ে শাসন করিয়া থাকেন।

তৃতীয় অধ্যায়

এক সপ্তাহে অর্দ্ধ জাপান

নিক্কো পাহাড়

জাপানী সমাজে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে। তাহার ইংরাজী অনুবাদ এই—"Do not say Kekko (magnificent, spendid, superb) before you see Nikko," অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিক্কো দেখে নাই সে "কেক্কো" বা মনোমোহন সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করে নাই। জাপানী-দের চিন্তায় নিক্কো অপরূপ সৌন্দর্য্যের খনি। আজ সেই নিক্কো দেখিতে চলিয়াছি।

উয়েনো ষ্টেসনে গাড়ীতে বসিলাম। মহা গরম পড়িয়াছে। ধূলা বালুর দৌরাত্ম্যে গাড়ীতে স্থিরভাবে বসিয়া থাকা অসম্ভব। সহর ছাড়াইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী দুইধারে দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতেছি। একস্থানে সুমিদা নদী এবং অপর স্থানে তোনে নদী পার হইলাম। দ্বিতীয় নদী জাপানে প্রশস্ততম নদীর অন্যতম। সাধারণ সমতল ক্ষেত্রের উপর দিয়া রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের কোন বিশেষত্ব এই অঞ্চলে লক্ষ্য করিতেছি না।

সাড়ে তিন বা চারি ঘণ্টা পরে উৎসুনোমিয়া ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। এই নগর একটা "প্রেফেক্ট" বা জেলার কেন্দ্র। সমগ্র জাপানে এইরূপ

৪৬টা প্রেক্ট আছে। গাইড বলিলেন,—"এই সহরের লোকসংখ্যা ৪০,০০০।" এখান হইতে গাড়ী একটা শাখা লাইনে চলিতে থাকিল। পথে একটা জেলা-স্কুল দেখিলাম। তাহার পর হইতে ক্রমশঃ উচ্চতর ভূমির উপর দিয়া গাড়ী চলিতেছে। কুমড়া, কচু, ধনে ইত্যাদির আবাদ রেল পথের দুই ধারে দেখিতেছি। ক্রমশঃ পার্ব্বত্য বনজঙ্গলের ভিতর আসিয়া পড়িলাম। মাঝে মাঝে সরল বা "পাইন" তরুর ঝাড় দেখিতে পাইতেছি।

অদূরে পাহাড় দেখা যাইতেছে। উহাই নিক্কো পাহাড়। আকাশের কুয়াশায় পর্ব্বতগাত্রের নীলিমা কথঞ্চিৎ ঢাকা পড়িয়াছে—কিন্তু গাড়ী হইতে যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সবুজ তৃণপত্র, উদ্ভিদের আবেষ্টনই চোখে পড়ে। পাহাড় দেখিতে ঠিক যেন উল্টাভাবে রাখা করাত। পর্ব্বতের সমাবেশ একটা পাতলা তীক্ষ্ণ দন্তবিশিষ্ট নীল মৃত্তিকাস্তূপের মত বোধ হইতেছে। ত্রিভুজাকার পিরামিডসদৃশ গিরিশৃঙ্গ দেখা যাইতেছে না। সমতল ভূমি হইতে পাহাড় খাড়া মাথা তুলিয়াছে।

এই অঞ্চলের রেলষ্টেসনে দেখিতেছি, কাঠের ব্যবসায় বেশ প্রবল। পার্ব্বত্য প্রদেশে এইরূপ হইবারই কথা। পাইন গাছের সঙ্গে সঙ্গে আর একপ্রকার তরুবরের সারি ক্রমশঃ দেখা গেল। দেখিবামাত্র গাইড বলিলেন,—"এই সকল বৃক্ষের নাম ক্রপ্‌টোমেরিয়া। তিনশত বৎসর পূর্ব্বে এইগুলি নিক্কো অঞ্চলে রোপিত হইয়াছিল। দুই সারি বৃক্ষের ভিতর দিয়া পথ নির্ম্মিত হইয়াছে। উৎসুনোমিয়া হইতে নিক্কো পর্য্যন্ত এই এ্যাভিনিউ বা কুঞ্জপথ দেখিতে পাইবেন।" আজ এই বৃক্ষগুলিকে আকাশস্পর্শী বোধ হইতেছে। দুইদিকের শাখা প্রশাখা উর্দ্ধে মিলিত হইয়া সঙ্কীর্ণ পথের একটা আবরণ প্রস্তুত করিয়াছে। তাহার ভিতর দিয়া সূর্য্যরশ্মি কোথাও কোথাও উঁকি মারে মাত্র।

৪৯। নিক্কো পাহাড়ে জলপ্রপাত
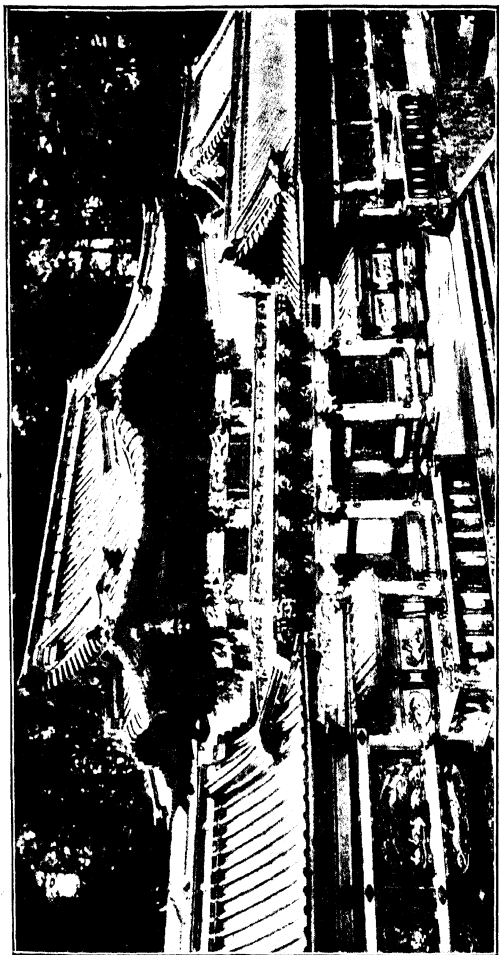
৫০। নিক্কোমন্দিরের ফটক

গাড়ী ষ্টেসনে আসিয়া দাঁড়াইল। তোকিও হইতে একশত মাইল উত্তরে আসিয়াছি। এইস্থান সমুদ্রের স্তর হইতে ২০০০ ফিট উচ্চ। অর্থাৎ হিমালয়ের টিণ্টেরিয়ায় বা ছোটনাগপুরের হাজারিবাগে যেন উপস্থিত হইয়াছি।

ট্রামে চড়িয়া হোটেলে পৌছিলাম। ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম। সঙ্কীর্ণ পথের দুই ধারে জাপানী হোটেল, সরাই, বা গৃহ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনোহারি দোকান অবস্থিত। দায়া নামক একটা পার্ব্বত্য ঝোরা বা নদী পার হইলাম। দুইটা সেতু আছে। একটা সেতু রক্তবর্ণ ল্যাকারধাতুনির্ম্মিত। ইহার উপর দিয়া সাধারণ গাড়ী বা লোকজন যাতায়াত করিতে পারে না। বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে যখন মিকাডোর প্রতিনিধি নিক্কো মন্দিরে আসেন তখন এই সেতু একমাত্র তাঁহার দ্বারা ব্যবহৃত হয়। আজ সেতুর দ্বার রুদ্ধ। অপর সেতু পার হইয়া নদীর পার্শ্ব দিয়া ট্রাম চলিতে লাগিল। নির্ঝরের সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে হোটেলে উপস্থিত হইলাম। দায়া উপত্যকা দুই সমান্তরাল পর্ব্বত শ্রেণীর অভ্যন্তরে অবস্থিত। হোটেলের গৃহে বসিয়া সম্মুখের পাহাড় দেখিতেছি। পর্ব্বতের একটা দেওয়াল যেন দৃষ্টিপথে বাধা দিতেছে। নদীর অনন্ত ঝর ঝর শব্দ অবিরাম শুনিতে পাইতেছি।

আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। অদূরের পাহাড় আর দেখিতে পাইতেছি না। ভয়ঙ্কর মেঘগর্জ্জন ঘন ঘন শুনিতে পাওয়া গেল। বাঙ্গালা দেশেও আজ শ্রাবণের বর্ষাকাল চলিতেছে। এক পশলা খুব বৃষ্টি হইয়া গেল। ধরিত্রী অনেকটা ঠাণ্ডা হইল।

আজ ১৪ই জুলাই। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের এই তারিখে ফরাসীরা তাহাদের অষ্টাদশ লুইয়ের ব্যাষ্টিল দুর্গ ধ্বংস করিয়া ইয়োরোপে নবযুগ আনয়ন করে। এই দিনে ফরাসী "রিপাব্লিক" বা স্বরাজের জন্ম। কাজেই

ফরাসী সমাজের আজ প্রধান উৎসব-তিথি। এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্য ইংরাজী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে—

"To-morrow July 14th is the French national holiday in honour of the fall of the Bastille, and though there will not be the usual celebration, all who honour France for the magnificent struggle she is waging against the Bully of Europe will show that sympathy by the display of national flags. Especially will the occasion be taken by the British and the subjects of other allied powers to show their respect for and sympathy with the great Republic in her fight for the freedom of the world."

ফরাসী-বিপ্লবের সর্ব্বপ্রধান শত্রু ছিলেন ইংরাজ। অথচ আজ ইংরাজ সেই বিপ্লবতিথি সম্মান করিতে অগ্রসর। চিরস্মরণীয় ১৪ই জুলাইয়ের ঘটনায় ফরাসীকে ধ্বংস করিবার জন্য ইংরাজ ও জার্ম্মাণ জাতিদ্বয় ব্রতবদ্ধ হইয়াছিল। অথচ আজ সেই তারিখের উৎসবে ফরাসীকে সাহায্য করিতেছেন ইংরাজ!

জাপানের তাজমহল

নিক্কোতে পাহাড় আছে, নদী আছে, উপত্যকা আছে, ছোট বড় মাঝারি উদ্ভিদ আছে, কুয়াশা-মাখা নভোমণ্ডল আছে, নিবিড় বন জঙ্গল আছে, নীরবতা ও শান্তি আছে, আর এই শান্তিভঙ্গকারী জলস্রোতের কল কল নিনাদ আছে। প্রাকৃতিক হিসাবে নিক্কো নিতান্তই রমণীয় সন্দেহ নাই—চিত্রে আঁকিবার অথবা কবিতা লিখিবার যোগ্যবস্তু। প্রকৃতিদেবী নিক্কোকে সত্য সত্যই "কেক্কো" করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

বর্ষার দিনে আসিয়াছি—এখন না আছে শীতের শুভ্রতুষার, না আছে মে মাসের চেরিকুসুম, না আছে শরৎ কালের স্বর্ণপ্রভা। নীল গিরি এবং সবুজ উদ্ভিদই এখন চোখের সহচর।

বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে ক্রুপ্‌টোমেরিয়া এ্যাভিনিউএর ভিতর দিয়া ইয়েয়সু শোগুণের সমাধিক্ষেত্র দেখিতে বাহির হইলাম। ইয়েয়সু তোকু-গাওয়া বংশের শোগুণী বা নবাবী স্থাপন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে নিক্কো পাহাড়ের এক নিভৃত স্থানে তাঁহার কবরের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সকল সৌধ ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত।

তোকিওর শিবা-পার্কে শোগুণী সমাধিক্ষেত্র দেখিয়াছি। এই স্থানেও অবিকল তাহাই দেখিতেছি। সেই তোরী বা তোরণদ্বার, সেই প্যাগোডা, সেই প্রস্তরপ্রদীপ, সেই কাষ্ঠগৃহ, সেই ত্রিভঙ্গিম বক্রগতি ছাদ সমাবেশ, সেই স্বর্ণশিল্প ও ল্যাকার-শিল্প, সেই সুচিত্রিত অন্ধকারময় গৃহাভ্যন্তর—সবই প্রথম তোকুগাওয়া শোগুণের সমাধিক্ষেত্রে বিরাজ

করিতেছে। শিবাপার্কের সৌধসম্পদ দেখা থাকিলে নিক্কোর হর্ম্ম্যাবলী না দেখিলেও চলে।

তোরী, ফটক, আস্তাবল, প্যাগোডা, ভাণ্ডারগৃহ, চৌবাচ্চা, ঘণ্টাগৃহ ইত্যাদি প্রত্যেকটার জাপানী নামে এক একটা ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হওয়া যায়। কোনটা দাইমোদিগের দান, কোনটা কোরিয়া নৃপতির দান, কোনটা ওলন্দাজ গবর্মেণ্টের দান ইত্যাদি। ভাণ্ডার-গৃহে উৎসবের জিনিষপত্র রক্ষিত হয়—বৎসরে দুইবার করিয়া এই গৃহ হইতে শোভা-যাত্রার সাজসরঞ্জাম বাহির করা হইয়া থাকে। আস্তাবলে শোভাযাত্রার ব্যবহৃত ঘোড়া রাখা হয়। সমাধিক্ষেত্রের সকল গৃহই ল্যাকারমণ্ডিত এবং সুচিত্রিত—কিন্তু আস্তাবলে কাঠের উপর কোন কারুকার্য্য নাই। এই ঘরের প্রাচীরের দিকে দেখাইয়া গাইড বলিলেন—"বানরের সারি দেখিতেছেন—উহাদের একজনের মুখ ঢাকা, একজনের চোখ ঢাকা, একজনের কাণ ঢাকা। ইহার দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে, কুদৃষ্টি দেখা উচিত নয়, কুকথা বলা উচিত নয়, এবং কুকথা শুনা উচিত নয়।"

কোন্ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে কত খরচ পড়িয়াছিল তাহার তালিকা কোন কোন স্থানে প্রদত্ত হইয়াছে। শুনিলাম, তিন শত দাইমো-জমিদার-গণের গৃহে যুদ্ধের জন্য যতটাকা সঞ্চিত ছিল তাহার সমস্তই এই ভবন নির্ম্মাণে খরচ করা হইয়াছিল! ক্রপ্টোমেরিয়া বৃক্ষের কুঞ্জপথ সম্বন্ধে গাইড বলিলেন—"মাসাৎসুনা দাইমো বিশ বৎসর কাল চেষ্টা করিয়া এই এ্যাভিনিউ প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পথ প্রায় ২২ মাইল বিস্তৃত।"

ইয়েয়স্থ বহু উপদেশ বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বহস্তে লিখিত একটি উপদেশের ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত হইতেছে—

"Life is like unto long Journey with a heavy load.

Let thy steps be slow and steady, that thou stumble not. Persuade thyself that imperfection and inconvenience is the natural lot of mortals, and there will be no room for discontent, neither for despair. When ambitious desires arise in thy heart, recall the days of Extremity thou hast passed through. Forbearance is the root of quietness and assurance for ever, look upon wrath as thy enemy. If thou knowest only what it is to conquer, and knowest not what it is to be defeated, woe unto thee! It will fare ill with thee. Find fault with thyself rather than with others. Better the less than the more." অর্থাৎ

"১। ঘাড়ে মস্ত বোঝা নিয়ে লম্বা পথ চলা যেরূপ, জীবনকেও সেইরূপ বুঝিও।

২। হোঁচট্ খেয়ে মুখ থুবড়ে' প'ড় না। সাবধানে ধীর পদ বিক্ষেপে অগ্রসর হও।

৩। এই নশ্বর মানবজীবনে পূরাপূরি সম্পূর্ণতা লাভকরা অসম্ভব। দুর্য্যোগ, কষ্ট এবং দোষ ছাড়াইয়া থাকা রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে অসাধ্য। কাজেই দুঃখ করা বেকুবি—হতাশ হওয়াও মূর্খমি।

৪। অত্যধিক লম্বাচৌড়া আকাঙ্ক্ষা মনে আসিলেই তখন একবার তোমার কোন দুঃখ, দুর্ব্বিপাক ও কষ্টের কথা মনে আনিবে। তাহা হইলে স্থির ও সংযতভাবে জীবনে অগ্রসর হইতে পারিবে।

৫। লোককে ক্ষমা করতে শিখ। ইহাতেই জীবনে শান্তি পাইবে আর মনের জোরও বাড়িবে। ক্রোধের বশীভূত হওয়াটা তোমার দুষমন্ বলিয়া জ্ঞান করিবে।

৬। কেবল জয় লাভ করতে পারাটাই বাহাদুরী নয়। পরাজিত হওয়া, হেরে যাওয়া কাহাকে বলে তাহাও বুঝিতে চেষ্টা করিবে। দুই দিকেই তোমার চোখ না থাকিলে দুনিয়ায় সাহসভরে চলিতে পারিবে না।

৭। পরের দোষ দেখিও না—নিজের দোষ খুঁটিয়া বাহির কর।

৮। অনেক সময়ে কম-পাওয়াটাই বেশী-পাওয়ার চেয়ে বেশী উপকারী।"

ইহা ঘরবাড়ী ছাড়িয়া জঙ্গলে পলাইবার উপদেশ নয়। ইয়েয়সু কর্ম্মবীর ছিলেন। তাঁহার বাহুবল ও চরিত্রবল জাপানের সংখ্যাতীত দাইমোগণকে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করাইয়াছিল। কার্য্যোপযোগী পাণ্ডিত্যের প্রভাবেই তিনি নিতান্ত নগণ্যপদ হইতে জাপান রাজ্যের শোগুণী-পদ অর্জ্জন করেন। এইরূপ আত্মপ্রতিষ্ঠ ও স্বাবলম্বী বীরপুরুষই কর্ম্ম-যোগের অনুশাসন প্রচার করিতে অধিকারী।

একটা ফটকের ভিতরে-বাহিরে-উপরে কারুকার্য্য, খোদাই ও চিত্রণ এত বেশী যে সমস্ত দিন দেখিলেও সব শেষ করা যায় না। নয় লক্ষ টাকায় এই ফটক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই ফটকের জাপানী নামে ইংরাজেরা বুঝিয়া থাকেন—"The gate where one spends the whole day."

একটা ফটকের নাম "চীনা ফটক।" সিংহ ও ড্রেগন এই দ্বারের বিশেষত্ব। এগুলি চিত্রিত নয়—কাষ্ঠদ্বারের উপর আল্গাভাবে বসান।

প্রধান গৃহের অভ্যন্তর দেখিয়া মোটের উপর শিবাপার্কের ভবন মনে পড়িল। সাজসজ্জা আসবাব পত্র ইত্যাদি এখানে কথঞ্চিৎ বিভিন্ন। ভিতরকার ছাদ এবং প্রাচীন পাত্রের চিত্রাঙ্কনও স্বতন্ত্র। দেওয়ালে জাপানের ৩ জন প্রসিদ্ধ কবিবরের চিত্র ঝুলান আছে। সে দিন

তোকুতোমির সংগৃহীত প্রাচীন পুস্তকের মধ্যে এই সকল চিত্র দেখিয়াছি। এক প্রকার সোনালি কাগজের পাত্র গৃহের মধ্যভাগে রক্ষিত হইতেছে। এইগুলি নাকি ধর্মকর্মে লাগে—প্রকৃত অর্থ বুঝিলাম না। এতদ্ব্যতীত ফুল, ফল, জানোয়ার, গাছ ইত্যাদির খোদাই অথবা চিত্র শিবাপার্কের সৌধাবলীতেও দেখা যায়। কতকগুলি গৃহে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ।

একটা কাষ্ঠদ্বারের নিকটে যাইয়া গাইড বলিলেন—"উপরে দৃষ্টিপাত করুন। পিয়নি ফুলের নীচে একটি বিড়াল নিদ্রা যাইতেছে। কাঠের খোদাই-কার্য্যে ঠিক যেন জীবিত বিড়াল দেখিতে পাইতেছি।" আর একটা ফটকে খোদাই করা ব্যাঘ্রদ্বয়ের তারিফ করিতে করিতে গাইড বলিলেন—"কাঠের উপর কারিগর কাজ করিয়াছেন—কিন্তু ঠিক যেন জীবন্ত জানোয়ারের লোম দেখিতেছি।"

ইয়েয়সুর মন্দির পূর্ব্বে বৌদ্ধ সরঞ্জামে পূর্ণ ছিল। সুবর্ণ মূর্ত্তি, সুবর্ণ পদ্মপত্র, প্রকাণ্ড বাতিদান, ঢাক, কাঁশর, ঘণ্টা, শঙ্খ, পতাকা, ধূপপাত্র ইত্যাদিতে ঘর ভরা ছিল। কিন্তু "মেজি"-যুগে বৌদ্ধধর্ম্মের পরিবর্ত্তে শিন্তোমতের প্রতি জাপান গবর্মেণ্ট সদয় হইয়াছেন। স্বয়ং মিকাডো একবার ইয়েয়সুর মন্দির দেখিতে আসেন। তখন হইতে একটা দর্পণ এবং কাগজের পাত্র গৃহাভ্যন্তরে স্থান পাইতেছে —বৌদ্ধ সরঞ্জামগুলিকে দূরীভূত করা হইয়াছে।

এই মন্দিরে বৎসরে দুইবার করিয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব প্রধানতঃ শোভাযাত্রার আকার ধারণ করে। এক মন্দির হইতে অন্য মন্দিরে তিনটা ক্ষুদ্র মন্দির বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হয়—আবার সেইগুলি ফিরাইয়া আনা হয়। অনুষ্ঠানটিকে অনেকটা রথযাত্রার মত বিবেচনা করা যাইতে পারে। সম্রাটের দূত আসিয়া

পূজার অর্ঘ্যপ্রদান করেন। সেই সময়ে দায়ার উপরকার রক্তবর্ণ ল্যাকার-সেতু খুলিয়া দিবার নিয়ম আছে।

জুন মাসে সাধারণতঃ যে শোভাযাত্রা বাহির হয় তাহার বিভিন্ন অঙ্গ নিম্নে বিবৃত হইতেছে। ঠিক যেন 'রামলীলা'র মিছিলের ফর্দ্দ।

১০০ শ্বেত পোষাকাবৃত ব্যক্তি পবিত্র বৃক্ষ বহন করে।

তাহাদের পশ্চাতে একটি দেবতা শোভাযাত্রার দলপতি হন্।

দুইটা সিংহের মুখোস বহন করিয়া ছয় জন লোক যায়।

তিনজন শিন্তোবাদক।

তিনটি শিন্তো পুরোহিতপত্নী।

দুইজন শিন্তো পুরোহিত অশ্বপৃষ্ঠে দলবলসহ অগ্রসর হন।

তিনটি অশ্ব।

১০০ গোলন্দাজ।

১০০ তীরন্দাজ।

১০০ বল্লমধারী সৈন্য।

১০০ সশস্ত্র সৈনিক পুরুষ।

১২ জন যুবক পুরোহিত ফুলের টুপি মাথায় পরিয়া থাকেন।

১০০ বিভিন্ন মুখোসপরা সৈন্য।

৪টা পাখার মত পতাকা।

অশ্বপৃষ্ঠে শিন্তো পুরোহিত তরবারি ধারণ করেন।

অশ্বপৃষ্ঠে শিন্তো পুরোহিত ধ্বজা ধারণ করেন।

তিনটি বিভিন্ন পতাকা ধারণ করিবার জন্য শ্বেত পোষাকাবৃত ব্যক্তি।

ঢাক বহন করিবার জন্য তিনজন শ্বেত পোষাকধারী ব্যক্তি।

ঘণ্টা বহনকারী।

৩০ জন বালক বানরের মুখোস পরিয়া চলে।

বানর ও তাহাদের পালক।

৬ শিন্তো পুরোহিত প্রাচীন সম্ভ্রান্তবংশীয় বেশে।

৫০ শিন্তো পুরোহিত প্রাচীন বেশে।

১২ বাদক।

১০ ব্যাধ পক্ষীহস্তে।

২ মঞ্চ।

সোনালী কাগজের পত্র বহন করিবার জন্য শিন্তো পুরোহিত।

অশ্বপৃষ্ঠে শিন্তো পুরোহিত।

এই শোভাযাত্রা দেখিলে মধ্যযুগের জাপানকে বুঝিতে পারা যায়। নিক্কোর মন্দিরগুলির ভিতর বাহির ভাল করিয়া দেখিলেও জাপানের শোগুণী আমল সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মে। সৌধগুলি সেই যুগের মিউজিয়াম বিশেষ। জাপানের বাস্তুবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা, রঞ্জনশিল্প, কাষ্ঠশিল্প, ল্যাকারশিল্প, সকলই এই সমাধিক্ষেত্রে পুঞ্জীকৃত হইয়াছে। শিন্তো-বৌদ্ধ জাপানের ধর্ম্মভাব এবং সামাজিক জীবন এই মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এইখানে আসিলে ৩০০ বৎসর পূর্ব্বেকার সোগুণী আমলের আবহাওয়া ফিরিয়া পাওয়া যায়। অজন্তা, সাঞ্চি, সারনাথ, ভারুত ইত্যাদি অঞ্চলের কারুকার্য্যে যেরূপ প্রাচীন ভারতের আর্থিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং ধর্ম্মবিষয়ক অবস্থা বুঝিতে পারি, সেইরূপ নিক্কোসৌধগুলির চিত্রাঙ্কন, খোদাই কার্য্য এবং মূর্ত্তিসমূহ নিরীক্ষণ করিলে মধ্যযুগের জাপানী-জীবন আমাদের সম্মুখে ভাসিতে থাকে।

তোকুগাওয়াবংশের প্রবর্ত্তক, য়েদো (তোকিও) নগরের স্থাপয়িতা, বীরবর ইয়েয়সু ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। ১৯১৫ সালে এই

ঘটনার তিনশত বর্ষ কাল হইল। এই উপলক্ষ্যে গত জুন মাসে নিক্কোতে মহা সমারোহে শোভাযাত্রা, নৌ-নৃত্য, মহোৎসব, পান-ভোজন, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। হোটেলের কর্ত্তা বলিলেন—"ব্যারণ শিবুসাওয়া এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন। তোকুগাওয়া শোগুণদিগের অনুচরবর্গের মধ্যে শিবুসাওয়া সর্ব্বপ্রধান এবং আজকাল বিশেষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ।"

তোকুগাওয়াযুগের বাস্তুশিল্প

ট্রামপথের শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল। নিক্কো-পল্লীর পর আর একটা পল্লীতে আসিলাম। এইখানে একটা তাম্র ধাতুর কারখানা—তামা পরিষ্কার করা হয়—প্রায় আটশত লোক কর্ম্ম করে। দশ-এগার মাইল দূরস্থিত এক পাহাড়ে তামার খনি আছে।

দায়া নদীর কিনারা দিয়া ট্রাম পথ বিস্তৃত। নীরব জনপদের মধ্যে নির্ঝরের ঝর ঝর সর্ব্বদাই শুনিতেছি। হাঁটিয়া খানিকদূর যাওয়া গেল। পার্ব্বত্য উপত্যকার দৃশ্য অনেকটা আল্‌মোড়ার পথের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। গাইড বলিলেন—"এখান হইতে চারি মাইল দূরে একটা হ্রদ আছে। সেই হ্রদ নিক্কো পল্লী হইতে ২০০০ ফিট উর্দ্ধে—অর্থাৎ সমুদ্র হইতে ৪০০০ ফিট উচ্চ। হ্রদ হইতে একটা বিপুল জলপ্রপাত পড়িয়া এই দায়া স্রোতস্বতী সৃষ্টি করিয়াছে।" শুনিলাম, জলরাশি হ্রদের ২৫০ ফিট নিম্নে লাফাইয়া পড়িতেছে। বলাবাহুল্য, তাহা হইলে এই প্রপাতে নায়াগ্রাঝোরার গৌরব উপলব্ধি করা যাইতে পারে। সকল দিক হইতে নিক্কোঅঞ্চল ও তাহার সন্নিহিত ভূখণ্ড প্রাকৃতিক হিসাবে "কেক্কো" পদবাচ্য।

বস্তুতঃ এখানে প্রকৃতির মহিমা দেখিয়া ও শুনিয়াই মুগ্ধ হইতেছি। মানুষের কীর্ত্তি দেখিয়া মনে হইতেছে, সেই ওয়ার্ডসওয়ার্থের দীর্ঘশ্বাস—"And is this Yarrow?" "এই কি সেই ইয়ারো দরিয়া?" নিক্কোর বাস্তুশিল্প আমার চোখে কেক্কো বোধ হইল না। এখানকার সৌধগুলি কাষ্ঠময় তাজমহল সন্দেহ নাই। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর ভারতীয় প্রস্তর-

শিল্প দেখিয়া কখনও "এই কি সেই ইয়ারো দরিয়া ?" বলি নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর জাপানী কাষ্ঠশিল্প দেখিয়া আশানুরূপ আনন্দ উপভোগ করিলাম না। মিশরের লুকসর-কার্ণাক দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইয়াছি—প্রাচীন মিশরীয় শিল্পের সম্মুখীন হইলে "কেকো" বা চমৎকার না বলিয়া থাকা যায় না। কিন্তু নিক্কোর সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারের লাবণ্য দেখিয়া চক্ষু-পীড়া পাইতেছে—মরমে বিস্ময়লাভ করিতেছি না।

শিবাপার্ক এবং নিক্কো উভয় স্থানের হর্ম্ম্যসমূহেই সর্ব্বপ্রথম চোখে পড়ে ল্যাকারমণ্ডিত প্রাচীর, কবাট, ছাদ ইত্যাদি। সোনালি কাজের প্রভাও দর্শকমাত্রের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। এই দুই শিল্পের নিদর্শন প্রত্যেকটার এত বেশী সঞ্চিত হইয়াছে যে, চোখ ঝলসিয়া যায়। ভিতরকার মূর্ত্তি এবং অঙ্কিত চিত্রগুলি স্বতন্ত্রভাবে দেখিলে অতি উচ্চ শ্রেণীর কারুকার্য্যই বিবেচিত হইবে—কিন্তু গৃহের ভিতর এগুলির সমাবেশে ইহাদের মূল্য অনেকটা কমিয়াছে। ঘরের বাহিরে অন্য কোথাও এগুলি আল্‌গা করিয়া প্রদর্শিত করিলে চিত্রকর ও ভাস্করের কৃতিত্ব প্রশংসিতই হইবে। কিন্তু গৃহনির্ম্মাণকারী বাস্তুশিল্পিগণ অলঙ্কার-সংস্থানের মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছেন। সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং হইয়া পড়িয়াছে।

এক কথায় বলিতে পারি যে, তোকুগাওয়াযুগের বাস্তুশিল্পে সংযমের অভাব যৎপরোনাস্তি। অল্পপরিসর স্থানের ভিতর নানা প্রকার উচ্চতম সৌন্দর্য্যের বস্তু রাশীকৃত করা হইয়াছে। এখানে কারিগরদিগের বিলাস অত্যধিক দেখিতে পাই। কিন্তু এই যুগের ভারতীয় হর্ম্ম্যে বাস্তুশিল্পের মধ্যে সংযমের সহিত সৌন্দর্য্য-ভোগের নিদর্শন আছে। তাজমহল একটা উচ্ছৃঙ্খল সৌন্দর্য্য-পিপাসার প্রতিমূর্ত্তি নয়। ইহার ভিতরকার সকল অঙ্গের পরস্পর সম্বন্ধ অতি নিপুণভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। বাস্তুশিল্পীর ক্ষমতা এই বিষয়েই বিশেষরূপে প্রকটিত। তাজমহলের অসংখ্য প্রকার

প্রস্তরকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে নিরীক্ষণ করিলে কোথাও হয়ত লাবণ্য পাইব না—সকলগুলির মিলনেই তাজমহলের গৌরব ও মহিমা। এই মর্ম্মর-শিল্পের আভ্যন্তরীণ অলঙ্কার এবং বাহ্য গঠন উভয়ই চূড়ান্ত সামঞ্জস্য ও অনুপাত-জ্ঞানের সাক্ষ্যপ্রদান করে। কিন্তু জাপানী শিল্পের সকল অঙ্গে সামঞ্জস্য পাইলাম না—প্রত্যেকটাই অত্যধিক দেখিতে পাই—কাজেই নয়ন তৃপ্ত হয় না। তাজমহলের শিল্পী নানাবিধ কারুকার্য্যের সাহায্যে একটা ভাবই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু জাপানের বাস্তুশিল্পে সকল কারিগরই নিজের নিজের চরম দেখাইতে ব্যস্ত।

রেলে বার ঘণ্টা

সকাল হইতেই অত্যধিক গরম পড়িয়াছে। যথাসময়ে রেলে বসিলাম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে একটা ছোট ষ্টেসনে নামা গেল। এই-খানে চট, তোয়ালে, জিন ইত্যাদি তৈয়ারী করিবার কারখানা আছে। এতদিন কোথাও লিনেন্ ফ্যাক্টরি দেখি নাই। আজ দেখিবার সুযোগ হইল। অবশ্য ভিতরে সকল বয়ন-কারখানাই একরূপ। সূতা প্রস্তুত করা এবং কাপড় বুনা এই দুই কাজের জন্যই কল আছে। পশম, তুলা, পাট ইত্যাদির বয়নেও এইরূপ। কারখানায় স্ত্রীমজুরের সংখ্যা বেশী বোধ হইল। লিনেন তিশি গাছের খড় হইতে প্রস্তুত করা হয়।

ষ্টেসনের নিকটে একটা সরাইয়ে আহার করা গেল। নিকো হোটেল হইতে ভাত, তরকারী, ভূট্টাসিদ্ধ, বেগুন ও কুমড়া ভাজা ইত্যাদি আনা হইয়াছিল। সরাইটা যেন গোয়ালন্দের একটা হোটেল বিশেষ। চৌকি সদৃশ মেজের উপর মাদুর বিছান রহিয়াছে—মাছি ভন্ ভন্ করিতেছে—উঠানে জলের গামলা সাজান। আহার করিবার সময়ে ঝী বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছে। প্রাচ্যদেশ ছাড়া দুনিয়ার অন্যত্র এই সকল দৃশ্য দেখিবার জো নাই।

সরাইয়ে লোক জন রাত্রিবাসও করিতে পারে—ইচ্ছা করিলে কয়েক দিবস কাটানও যায়। শয়ন-গৃহ আছে। জাপানীরা খাট বা চৌকি ব্যবহার করে না। মেজেতে মাদুর বিস্তৃত থাকে। তাহার উপর বিছানা পাতিয়া শুইতে হয়।

এই ধরণের সরাই বা চটি ষ্টেসনের নিকট অনেকগুলি দেখিলাম। খড়ো
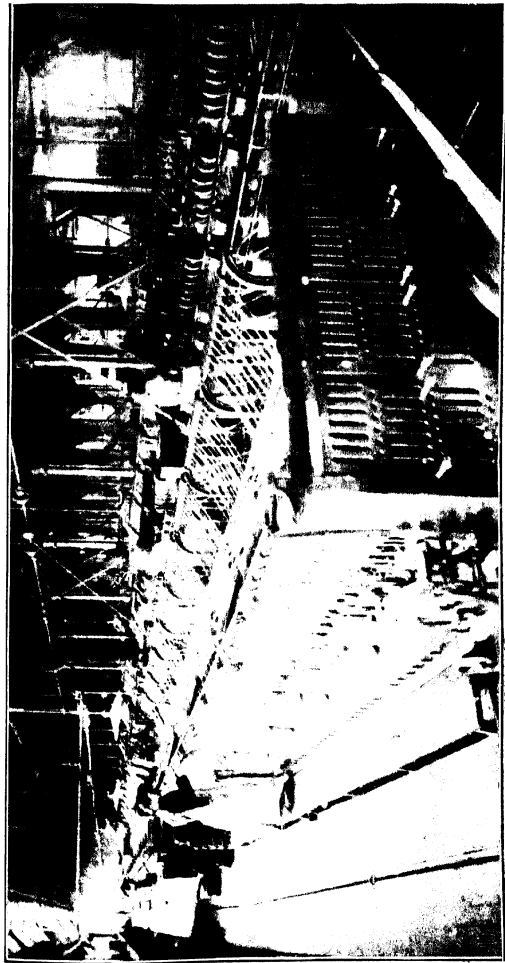
৫১। লিনেন-ফ্যাক্টরি

৫২। তিশি পচান

অথবা টিনের ছাদ, কাঠের বেড়া, অপরিষ্কার উঠান, ইত্যাদি ভারতীয় সরাইসমূহেরও আনুষঙ্গিক নহে কি? "স্বদেশী" জাপানে ও "স্বদেশী" ভারতে প্রভেদ খুঁজিয়া ত পাই না।

দ্বিপ্রহরে উৎসুনোমিয়া ষ্টেশনে গাড়ী আসিল। গরম এতবেশী যে, রেল-কোম্পানী প্লাটফর্ম্মে এবং ষ্টেসনের সকল ঘরে জল ছিটাইবার হুকুম দিয়াছেন। প্লাটফর্ম্মের উপর কয়েকটা আল্‌মারিতে দেখিলাম, এই প্রেফেক্ট বা জেলায় কৃষিজাত ও শিল্পজাত যত প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহাদের নমুনা সংগৃহীত রহিয়াছে। রেলযাত্রীরা সহজেই সেগুলি দেখিয়া লইতে পারে।

নিক্কো হইতে শাখা লাইনের গাড়ীতে আসিয়াছি—বড় লাইনের গাড়ীর জন্য খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। তোকিও হইতে গাড়ী আসিলে তাহাতে বসিয়া উত্তরদিকে অগ্রসর হইতেছি। জাপানের উত্তরার্দ্ধ অপেক্ষা দক্ষিণার্দ্ধই ঐতিহাসিকতায় প্রাচীনতর ও প্রসিদ্ধতর।

ধানের ক্ষেত দুই ধারেই দেখিতেছি—ভূট্টা ও তুঁতের চাষও স্থানে স্থানে দেখিলাম। কয়েকটা পার্ব্বত্য নদী পার হইলাম। নদীতে জল অল্প—প্রস্তরশিলার রাশিই বেশী দেখা যায়। এই নদীগুলি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে ধাবিত। পূর্ব্ব অঞ্চলের পাহাড়গুলি ইহাদের উৎপত্তি-স্থান। জাপানে সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত নদী নাই।

ক্রমশঃ খাঁটি পার্ব্বত্য প্রদেশের ভিতর দিয়া গাড়ী চলিতেছে। যেন আমেরিকার নেভাডা অঞ্চল দেখিতে দেখিতে যাইতেছি। জঙ্গলাবৃত পর্ব্বত পৃষ্ঠ, সঙ্কীর্ণ কৃষিভূমি, নিবিড়বন, সুদীর্ঘ তরুবর অথবা, ঘন ঝোঁপ এই সমুদয়ই চোখে পড়িতেছে। চারিদিকেই পাহাড়ের সমাবেশ। সন্ধ্যা-কালে ফুকুশিমা নগরের নিকটে আসিতে আসিতে অতিশয় রম্য দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। পাহাড়ের ঊর্দ্ধদেশ হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত কৃষিক্ষেত্র

৫৪। তোরী

পল্লীর "চটি" বা মুদীখানা দেখা গেল। মেজেতে শুইয়া খালি গায়ে লোকজন নিদ্রা যাইতেছে। কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নাই—মাঝে মাঝে দুই একটা গাড়ীর কোঁকর কোঁকর শুনিয়া ভাবিলাম, বোধহয় গরুর গাড়ী আসিতেছে। দেখিলাম, এগুলি অশ্ববাহিত শকট বটে কিন্তু গরুর গাড়ীর সঙ্গে এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। নির্জ্জন নীরব প্রান্তর ও পল্লীর মধ্যে একমাত্র সহচর পাইলাম ব্যাঙের ডাক। বর্ষাকালে আমাদের দেশের মত জাপানেও ভেক জাতির কন্‌সার্ট বাজিতে থাকে। নিম্নে সহস্র সহস্র ব্যাঙের গান এবং উর্দ্ধে আকাশের "ছায়াপথ" ও তারকারাজি, অদূরে নাতি উচ্চ অস্পষ্ট পাহাড়, আর সর্ব্বত্র অন্ধকার ও দুইচারিটা জোনাকী পোকা। উচ্চ কণ্ঠে গান ধরিয়া দিলাম :—

"সাধ হয় মনে, তারকারি সনে,
ধীরে উঠে চলি সুনীল গগনে,
ললিত লহরী তুলিয়া সুতানে" ইত্যাদি।

মাৎসুসিমার বাজার-পাড়ায় বৈদ্যুতিক বাতির বাহার দেখিলাম। দোকানদারেরা ঘরের ভিতরে অথবা বাহিরে শুইয়া বসিয়া গল্প গুজব করিতেছে। ভারতীয় মফঃস্বলের নৈশ দৃশ্য। তফাৎ কেবল বিদ্যুতে।

উপসাগরের কূলে

বাহিরে বেশ ঠাণ্ডা বাতাস—কিন্তু ঘরের ভিতর যেন অগ্নিকুণ্ড। রাত্রি প্রায় ১টা পর্য্যন্ত এইভাবে গেল। বসিয়া বসিয়া কয়েক সংখ্যা "Japan Magazine," নয়েস্ (Alfred Noyes) প্রণীত A tale of old Japan নামক কবিতা, এবং Hundred verses from old Japan নামক প্রাচীন জাপানী কবিতার ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করা গেল। পুরাতন জাপানী উপন্যাসে, গল্পে, কাব্যে এবং নো-নাটকে বৌদ্ধ প্রভাব বেশ বুঝিতে পারা যায়। নির্ব্বাণ-তত্ত্ব, পরকালবাদ ইত্যাদির চিহ্ন সেখানে পাই। জাপানীরা প্রেমসাহিত্যেও যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। এমন কি অষ্টম নবম দশম শতাব্দীর কবিগণও নব্য ইয়োরামেরিকার রীতিতে রোমাণ্টিক প্রণয়-কবিতা রচনা করিত। ইহা বিশেষ-বিস্ময়ের কথা।

নবম শতাব্দীর এক রাজকুমার প্রেমে পড়িয়া আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত। কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে :—

"Now, in dire distress.
It is all the same to me ;
So, then, let us meet
Even though it costs my life
In the Bay of Naniwa." অর্থাৎ

"হায়। নিদারুণ কষ্ট এবে,—
মরা বাঁচা সমান এখন ;
অতএব হো'ক্ মোদের মধুর মিলন।

৭৫। নিক্কো পাহাড়ের হ্রদ

২৬৯ পৃষ্ঠা

৫৬। দায়ার উপর ল্যাকার সেতু

এতে গেলই বা প্রাণটা চ'লে,
নানিওয়া সাগর জলে।"

ওসাকার এক নাম "নানিওয়া"। এখানে "যমুনাসলিলে সই অব তনু ডাবর"—ইত্যাদির সুর শুনিতে পাই। এই সম্বন্ধে অনুবাদক ভাষ্য করিতেছেন—" It is clear from the poem that love a thousand years ago was much the same in power and unevenness as it is today.;' অর্থাৎ "প্রেম চিরকালই এক ধরণের। হাজার বৎসর পূর্ব্বেও প্রেমিকেরা সংসারের কণ্টকে নিবিড় দুঃখ অনুভব করিত।"

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে এই রূপ গীত রচিত হইত কি? কালিদাস ও বিদ্যাপতির মাঝামাঝি যুগ এটা। তখন ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানীতেও এই ধরণের গীতি-কবিতা দেখা গিয়াছিল কি?

নৈশ অন্ধকারকে দৃষ্টিগোচর করাইবার জন্যই যেন জোনাকি পোকাগুলি মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। ঘরের ভিতরে মশকের জ্বালাতন যৎপরোনাস্তি। মশারির ব্যবহার হোটেলে প্রচলিত। চারিটার সময়েই উষার আবির্ভাব হইয়াছে। ছয়টার পূর্ব্বে ঘরের ভিতর সূর্য্যের উষ্ণ কিরণ দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। বিছানা হইতেই দেখিতে পাইলাম, একটা হ্রদসদৃশ জলাশয় সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে। তাহার মধ্যে মধ্যে কয়েকটা ক্ষুদ্র পাহাড়।

মাৎসুশিমা জাপানী সমাজে প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য বিখ্যাত। জাপানীরা কথায় কথায় বলিয়া থাকে—"আমাদের দেশে তিনটা অতি রমণীয় স্থান আছে। তাহার মধ্যে মাৎসুশিমা অন্যতম।" "মাৎসু" শব্দের অর্থ পাইন বা সরল বৃক্ষ, "শিমা" শব্দের অর্থ দ্বীপ। ইহাকে পাইন

বা সরল দ্বীপ বলা যাইতে পারে। এই জনপদে পাইন বৃক্ষের সংখ্যা অগণিত। একটা উপসাগরের চারিদিকে পাহাড়—বস্তুতঃ পার্ব্বত্য প্রদেশের অভ্যন্তরেই যেন একটা হ্রদ অবস্থিত। এই জলাশয়ের ভিতর স্থানে স্থানে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ। এই দ্বীপগুলি পর্ব্বতশৃঙ্গ বিশেষ। সর্ব্বত্রই সরল বৃক্ষের ঝাড় বিরাজমান। নিক্কো-পাহাড়ের কৃত্রিম ক্রপটোমেরিয়া এ্যাভিনিউ হইতে সাগর-কূলের এক প্রাকৃতিক পাইন-কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

মাৎসুশিমার সৌন্দর্য্য মধ্যযুগের জাপানীরাও উপলব্ধি করিয়াছিল। সেণ্ডাই জনপদের দাইমোগণ এইখানে একটা গ্রীষ্মভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রায় তিনশত বৎসরের পুরাতন একটা "ভিলা" আমাদের হোটেলের পার্শ্বেই অবস্থিত। গাইড বলিলেন—"লর্ড দাতে যখন সেণ্ডাইরাজ্যের দাইমো ছিলেন তখন এই গৃহ নির্ম্মিত হয়।" সেদিন থিয়েটারে "সামুরাই ও বারাঙ্গনা" নাটকের অভিনয়ে দাতের পরিচয় পাইয়াছি।

মাৎসুশিমায় এতদিন পর্য্যন্ত জাপানী রীতির হোটেল, পান্থশালা, সরাই বা চটি মাত্র ছিল। ইয়োরামেরিকার পর্য্যটকগণ এই সকল গৃহে বাস করিয়া সুখ পাইত না। অথচ বিদেশীয় টুরিষ্টেরা এইখানে আসিতে আরম্ভ করিলে স্থানীয় লোকজনের ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাইবার কথা। এইরূপ ভাবিয়া সেণ্ডাই প্রেফেক্টের কর্ত্তৃপক্ষ একটা উচ্চশ্রেণীর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সরকারী খরচে এই ভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। নূতন একটা পার্ক বা উদ্যান রচিত হইতেছে। উপসাগরের কূলে সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক স্থানে এই উদ্যান ও গৃহের সমাবেশ। সকল প্রকার পাশ্চাত্য আহার বিহারের ব্যবস্থা করিবার জন্য একটা হোটেল-কোম্পানী গবর্মেণ্টের নিকট এই গৃহ ভাড়া লইয়াছেন। দুই এক

বৎসরের ভিতর এই "পার্ক-হোটেলের" সাহায্যে মাৎসুশিমা বিদেশীয় পর্য্যটকগণের মক্কায় পরিণত হইবে।

মধ্যযুগের ইতিহাস মাৎসুশিমার পর্ব্বতগাত্রে ও পর্ব্বতকন্দরে অনেক দেখিতে পাইলাম। সেতু পার হইয়া একটা দ্বীপে পদার্পণ করা গেল। ইহার ভিতর একটা কাষ্ঠময় বুদ্ধমূর্ত্তি এবং বহু প্রস্তরময় শিশু-সংরক্ষক জিজোদেবের বিগ্রহ রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে দেখিলাম, ভারতীয় কার্লাভাজা ইত্যাদি পর্ব্বত-গহ্বরের ক্ষীণ অনুকরণ করা রহিয়াছে। মৃত নরনারীর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ নানা প্রস্তরস্তূপ, কতকগুলি পর্ব্বতকন্দরে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই প্রস্তরস্তূপের উপর চীনা অক্ষরের লিপি পাঠ করিয়া বৌদ্ধ অনুষ্ঠান বুঝিতে পারা যায়। এই ধরণের কন্দর মাৎসুশিমার নানা অঞ্চলেই দেখিতে পাইলাম। স্মৃতিস্তম্ভের সর্ব্বনিম্নে চতুষ্কোণ প্রস্তর, তাহার উপর গোলাকার প্রস্তর—তাহার উপর আবার চতুষ্কোণ—তাহার উপর আবার গোলাকার এবং সর্ব্বোচ্চস্তর শিখরসদৃশ।

মাৎসুসিমার বাজার-পাড়ায় আসিলাম। এইখানে একটা ফটকের ভিতর দিয়া ক্রপটোমেরিয়া বৃক্ষের কুঞ্জপথে প্রবেশ করিলাম। এই পথে একটা বৌদ্ধ মন্দিরে আসা যায়। দাতে-বংশীয় প্রথম দাইমো এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। শুনিলাম, পরলোকগত মিকাডো মৎসুয়িতো পাইন-দ্বীপে ভ্রমণ করিতে আসিয়া এই মন্দিরে বাস করিয়াছিলেন। আজকাল যত জাপানী পর্য্যটক মাৎসুশিমা ভ্রমণে আসেন তাঁহারা সকলেই এই মন্দির দেখিয়া যান। গাইড বলিলেন—"এই পল্লীতে স্বদেশীয় লোকজনকে সাহায্য করিবার জন্য এক শ্রেণীর গাইড আছে। তাহারা তীর্থযাত্রী অথবা স্বাস্থ্যান্বেষী জাপানীগণকে সকল দর্শনীয় স্থানে লইয়া যায়।" আমি বুঝিলাম, ইহারা আমাদের দেশে পাণ্ডা নামে পরিচিত।

এখানকার পাহাড় বিশেষ শক্ত নয়, নিতান্ত নরম; স্যাণ্ডষ্টোন বা বালুকা-প্রস্তরে এই অঞ্চল গঠিত। ঘুঘু, হাঁস, ইত্যাদি পাখীর ঝাঁক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গবর্মেণ্টের আইনে এই সকল শিকার করা দণ্ডনীয়। শীতকালে বরফ পড়ে তখন এই অঞ্চলে লোকজনের গতিবিধি একপ্রকার বন্ধ থাকে। উপসাগরে স্রোত বা তরঙ্গ নাই। প্রত্যহ বৈকালে জোয়ার হয়, তখন জলের পরিমাণ কিয়ৎকালের জন্য বাড়িয়া যায়। সাধারণ নৌকা, তড়িচ্চালিত নৌকা, বাষ্প-চালিত ষ্টীমার ইত্যাদি সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেছে। কিন্তু সুবিস্তৃত বাণিজ্যের কেন্দ্র এখনও মাৎসুশিমায় গড়িয়া উঠে নাই। কোন কৃষি বা শিল্পকর্ম্মের পরিচয়ও এই জনপদে পাইতেছি না। এমন কি, সাধারণ শাকশজী, ফলমূল, মাংস, মাছ, ডিম, দুধ, মাখন ইত্যাদির জন্যও হোটেলের কর্ত্তা সেণ্ডাই-সহরে লোক পাঠাইয়া থাকেন।

মাৎসুশিমা ভারতবাসীর পুরী বা ওয়াল্টেয়ার। গ্রীষ্মের সময়ে পয়সাওয়ালা লোকেরা এখানে কিছুকাল কাটাইতে ভালবাসেন। ইহা অর্থব্যয়ের স্থান—টাকা রোজগারের পথ এখানে নাই। ঘন সবুজ পাইন তরুর হাওয়া খাইয়া যাহাদের পেট ভরে অথবা মর্ম্মর-ধ্বনি শুনিয়া যাহাদের চিত্ত উৎফুল্ল হয়, তাহারা প্রকৃতির এই বিলাসক্ষেত্রে সুখ পাইবে। অথবা যাহারা সাগরকূলে বসিয়া বিরলে লহরমালা দেখিতে চাহে, তাহাদের পক্ষেও এই স্থান প্রশস্ত। দুঃখের কথা, লহরমালা এখানে দেখিতে হইলে নৌকা করিয়া কিছুদূর যাইতে হয়।

কোম্পানীর ষ্টীমারে দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে যাইবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু গাইডের পরামর্শে একটা আলপা নৌকা ভাড়া করিয়া উপসাগর-বিহারে বাহির হইলাম। প্রাচীনকাল হইতে জাপানীদের ধারণা এই যে, দ্বীপগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ী "চর" মাত্র। একটা দ্বীপের নাম সৌভাগ্য-

দ্বীপ। কোন দ্বীপ দেবতার নামে অভিহিত, কোনটা বা প্রসিদ্ধ স্ত্রীকবির নামে বিখ্যাত। হোটেলের নিকটে সাগরে স্নানের সুবিধা নাই, জলের ভিতর জঙ্গল অত্যন্ত বেশী। আধ ঘণ্টা খানেক নৌকায় চলিয়া একটা দ্বীপে আসিলে স্নানের ঘাট পাওয়া যায়। একটা দ্বীপে একপ্রকার বাঁশ পাওয়া যায়—উহা পুরাপুরি নিরেট।

সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম। ভোজনালয়ে বসিয়া আহার করিতেছি, এমন সময়ে দেখি, ২০।২৫ জন জাপানী বালক ও বালিকা বারান্দায় আসিয়া দেখিতেছে। ইহারা রঙ্গিন "চারখানা" বা ছিটের কিওমনো পরিয়াছে, পায়ে কাঠের খড়ম, মাথায় কোন আভরণ নাই। ইহাদিগকে দেখিতে আমাদের স্বদেশীয় শিশুগণের মত। বোধ হয় ইহা-দিগকে বঙ্গীয় মুসলমান সন্তান বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। ঘরের বাহিরে আসিবামাত্র সকলে দূরে পলাইয়া গেল। আবার ভিতরে প্রবেশ করিলেই উহারা ফিরিয়া আসিতে লাগিল। পাশ্চাত্য দেশের শিশুগণকে এই ধরণের সঙ্কোচ বোধ করিতে দেখি নাই। পরে এক এক টুকরা রুটি প্রদান করিয়া ইহাদিকে বিদায় করা গেল। উহারা এই জিনিষ গ্রহণ করিবে পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। গাড়ীর সময় হইয়া আসিল—সকলকে "সায়োনারা" বলিয়া রিক্শতে বসিলাম। তাহার পর আবার সেই বাজারের পথে মুদী-দোকানদারের জটলা, জোনাকীর রোশনাই, ব্যাঙের কনসার্ট অতিক্রম করিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত।

গাইডকে প্রতিদিন ৭।।০ করিয়া দিতে হইতেছে। তাহার উপর যাতা-য়াতের খরচ আছে। এই ব্যয়কে জাপানী ভাষা না জানার মূল্য বিবে-চনা করিতেছি। মিশরেও গাইডের খরচ আবশ্যক হইয়াছিল। কোন মতে রেল-জাহাজের মাসুল মাত্র লইয়া আসিলে বিদেশ ভ্রমণ করা চলে না।

ফলতঃ, ইহারা রেলওয়ে, ষ্টীমার ইত্যাদি বিষয়ে পাকা ওস্তাদও হইতেছে —অথচ কোন বিষয়ে নিজস্ব পরিত্যাগ করিতেছে না। এদিকে ভারতবাসীরা এতদিনে স্বাধীনভাবে বাষ্পশকট বা বাষ্পজাহাজ তৈয়ারী করিতেও পারিল না, নিজ নায়কতায় চালাইতেও শিখিল না—অধিকন্তু রেলে জাহাজে চলিতে হইলে ভারত-সন্তানকে নিজ স্বভাব ও অভ্যাস বর্জ্জন করিতে হয়। ভারতীয় স্নানাহারের নিয়ম অথবা সময় এবং মলমূত্র ত্যাগের আয়োজন জলাঞ্জলি না দিলে ভারতবর্ষে চলাফেরা করা অসম্ভব। কাজেই ষ্টীম-এঞ্জিন ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে (assimilated বা) অঙ্গীভূত হইবে কেন?

আওমরি ষ্টেসনের বিশ্রামগৃহে কয়েকটা আলমারি দেখিলাম। এই সহরে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয় সেগুলি এইখানে প্রদর্শিত হইতেছে। এক প্রকার বেতের বাক্স, চুপড়ী, ট্রাঙ্ক ইত্যাদি তৈয়ারী করিতে স্থানীয় লোকেরা সিদ্ধহস্ত। এতদ্ব্যতীত ল্যাকারের নানা প্রকার জিনিষও এই সহরে প্রস্তুত হয়।

পাঁচ ঘণ্টা জাহাজে কাটিল। জাহাজে পাশ্চাত্য ধরণের খানাঘর আছে—কিন্তু কোন জাপানী এখানে আহার করিল না। জাহাজের রন্ধনালয়ে জাপানী খাদ্যই প্রস্তুত হইতেছে—একমাত্র আমার জন্য নূতন খাদ্য প্রস্তুত হইল। রুইমাছ ভাজার সঙ্গে ভাত আহার করা গেল।

জাপানীদের এইরূপ স্বাতন্ত্র্য দেখিয়া ভাবিতেছি—ইয়োরামেরিকার লোকেরা এইজন্যই জাপানের উপর বিরক্ত। পৃথিবীতে জাপানই এক-মাত্র দেশ যেখানে পাশ্চাত্য নরনারীদিগের সুবিধার জন্য বিশেষভাবে সুবিধা সৃষ্টি করা আবশ্যক বিবেচিত হয় না। কাজেই সেই জাপানের ধ্বংস না হইলে ইয়োরামেরিকা সন্তুষ্ট থাকিতে পারে কি? যাহারা দুনিয়ার

সর্ব্বত্র হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতার স্থায় বিচরণ করে, তাহারা জাপানে আসিয়া দেখে যে শ্বেতাঙ্গের কর্ত্তৃত্বে একটাও হোটেল নাই—রেলগাড়ীতে শ্বেতাঙ্গদিগের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নাই—ওয়েটিংরুমের পায়খানায় কোথাও কোথাও কমোড নাই!

হাকোদাতে বন্দরে আসিয়া জাহাজ থামিল। সমুদ্রের কিনারা হইতে পাহাড় উঠিয়াছে। পাহাড়ের গাত্রে গৃহসমূহ স্তরে স্তরে সাজান। সেনা-বিভাগের ভবনাদি এইখানে অবস্থিত—এই জন্য ফটোগ্রাফ লওয়া নিষিদ্ধ। রিকশতে করিয়া নগর দেখিতে বাহির হইলাম। নগর অনেকাংশে ইয়োকোহামার মত বোধ হইল। রুশভাষায় এবং রুশ অক্ষরে বহু দোকানের সাইনবোর্ডে বিজ্ঞাপন দেখিলাম। বাজারে বঙ্গদেশের সকল প্রকার শাক শব্জী এবং ফলমূল পাওয়া যায়। অতিরিক্ত কিছু না দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কচু, আলু, আদা, লঙ্কা, কুমড়া, লাউ, শসা, বেগুন, কড়াইশুটি, সকরকন্দ, তরমুজ, নাসপাতি, কলা, মূলা, লকেট ইত্যাদি সবই বাঙ্গালীর সুপরিচিত। বোধ হয় চেরিফল আমাদের পক্ষে নূতন। ট্রামও আছে, তড়িতের বাতিও আছে—কিন্তু ঘরবাড়ী সবই আমাদের পল্লীকুটীরসমূহের অনুরূপ।

হাকোদাতে হইতে ১৮০ মাইল দূরে আওমোরিনগর। পূরা নয় ঘণ্টার পথ। এই রেলে ডাইনিংকার অথবা স্লীপিংকার নাই। দুইধারে পাহাড় —লোকালয় কোথাও চোখে পড়ে না। কৃষিক্ষেত্রও অতি বিরল। সর্ব্বত্র বনজঙ্গল দেখিতে পাইতেছি খানিক পরে কিছুকাল পর্য্যন্ত সমুদ্রের কিনারা দিয়া রেল চলিল—বাম দিকে বৃক্ষাবৃত পর্ব্বত। স্থানে স্থানে কতকগুলি হ্রদ দেখিতে পাইলাম। এই সকল হ্রদ পার্ব্বত্য ঝোরার জলে গঠিত। সন্ধ্যার সময়ে গাড়ী অতিশয় রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যের ভিতর চলিতে লাগিল। রেলপথের চারিদিকে পর্ব্বতশৃঙ্গ। সঙ্কীর্ণ

উপত্যকার উপর সঙ্কীর্ণতর রাস্তা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। বক্রগতি পার্ব্বত্য নদী ঝর ঝর বহিয়া যাইতেছে। নিবিড় বনের উপর ক্ষীণচন্দ্রের কিরণ এক অপূর্ব্ব আলোক বিকীরণ করিতেছে। ঝরণার শব্দের সঙ্গে আওয়াজ মিশাইয়া গাড়ী গর্জ্জন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। জনপ্রাণী জীবজন্তুর সাড়া-শব্দ কোথাও নাই।

একটা ষ্টেসনে কিছু দুধ পান করা গেল। জাপানে দুধ পাওয়া একটা সৌভাগ্য বিশেষ। জাপানীরা দিনে অন্ততঃ ৫০ বার চা পান করে—কিন্তু দুধ কখনও চোখে দেখে না। খানিক পরে একটা বড় ষ্টেসনে আসিলাম। নাম ওভারো। উহা একটা সমুদ্র-বন্দর।

ষ্টেসনের ফেরিওয়ালাদের ডাক শুনিয়া মনে হয় যেন ভারতীয় রেলে ভ্রমণ করিতেছি।

রাত্রি বারটার সময়ে স্যাপ্পরো পৌঁছিলাম। ষ্টেসনে অধ্যাপক স্যাতোর পুত্র আসিয়াছিলেন। ইনি এই বৎসর এখানকার কৃষিমহাবিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি ইংরাজী বেশ বলেন। শুনিলাম, এখানকার প্রায় সকল অধ্যাপকই ইংরাজী ও জার্ম্মাণ জানেন। অধ্যাপক সংখ্যা প্রায় একশত।

স্যাতো জাপানের একজন নামজাদা লোক—স্যাপ্পরোর মহাবিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম ছাত্র ছিলেন। এক্ষণে পরিচালক ও অধ্যক্ষ হইয়াছেন। ইনি পাঁচ বৎসর জার্ম্মানিতে ছিলেন—ইংল্যণ্ড, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে ভ্রমণও হইয়াছে। গত বৎসর যখন বিলাতে ছিলাম, তখন ইনি আমেরিকায় বর্ত্তমান জাপান সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছিলেন। ইয়াঙ্কিস্থানের ধনকুবের কার্ণেগির হুজুগে একটা শান্তি-পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে। সেই পরিষদের আয়োজনে জাপানের ধুরন্ধরগণ আমেরিকায় বক্তৃতা করিতে যান এবং আমেরিকার নামজাদা লোকেরা

জাপানে বক্তৃতা করিতে আসেন। গত বৎসর স্যাতোর পালা ছিল। তাহার পূর্ব্ব বৎসর "বুশিদো"-লেখক নিতোবে নিমন্ত্রিত হইয়া ছিলেন। স্যাতো স্যাপ্পরো বিদ্যালয়ে কৃষিবিষয়ক ধনবিজ্ঞানের অধ্যাপনা করিয়া থাকেন।

ভাবিয়াছিলাম, তোকিও হইতে বহু উত্তরে আসিতেছি—বোধ হয় শীত পড়িবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কলিকাতা হইতে দক্ষিণ ইতালী ও দক্ষিণ স্পেন ইত্যাদি দেশ যত উত্তরে হোক্কাইদো দ্বীপ মাত্র তত উত্তরে। কাজেই যদিও তোকিওতে আজকাল "ডগ্ ডেজ্" চলিতেছে, এবং সকলের মুখেই "একি গ্রীষ্ম ভাই, প্রাণ আই ঢাই, ঠাঁই নাহি পাই কোথায় জুড়াই" শুনিয়াছি, স্যাপ্পরোতে পৌঁছিয়া আমাদের দেশী বসন্তের মলয় মারুৎ পাইলাম। ধুলা উড়িতেছে। রাস্তায় বাহির হইবামাত্র যুবক স্যাতো বলিলেন—"স্যাপ্পরোর রাস্তাগুলি সবই এইরূপ প্রশস্ত। আমেরিকার অনুকরণে এই নগর গঠিত হইয়াছে। সোজা সমান্তরাল ভাবে দুইদিক হইতে পথ নির্ম্মিত দেখিতে পাইবেন।"

একটা হোটেলে আশ্রয় লইলাম—ইহা জাপানীদের স্বদেশী সরাই। তবে বিদেশীয় পর্য্যটকগণের জন্য পাশ্চাত্য ধরণের কয়েকটা কামরা আছে।

———

সরকারী পশুশালা

প্রবেশদ্বারে জুতা রাখিয়া যথানির্দ্দিষ্ট ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এক জোড়া চটি জুতা নীচ হইতেই পাওয়া গেল।

সকালে উঠিয়া দেখি—সেবিকারা জাপানী ধরণের গৃহসমূহ হইতে বিছানাগুলি বাহির করিয়া আনিতেছে। দিবাভাগে গৃহের মধ্যে বিছানা রাখিবার নিয়ম নাই। আমার ঘরে কোনরূপ নড়ন চড়ন হইল না। আমার ঘরে বিদেশী আস্‌বাব। কিন্তু পায়খানা সেই ভারতবর্ষের খাস জিনিষ।

আমরা বাহির হইতে শুনিতে পাই যে, জাপানীরা ৪০।৫০ বৎসরের ভিতর অভাবনীয় রূপে সকল বিষয়ের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে। এই বিস্ময়জনক রূপান্তরপরিগ্রহ সত্যভাবে বুঝিতে হইলে একবার হোক্কাইদোতে আসা আবশ্যক। আমরা সংবাদপত্রে পড়িয়া জাপানীদের পোর্ট-আর্থার-কীর্ত্তি মাত্র বুঝিয়াছি। বস্তুতঃ পোর্ট-আর্থার ইহাদের হাজার কীর্ত্তির এক কীর্ত্তি মাত্র। জীবনের এমন কোন বিভাগ নাই যাহাতে জাপানীরা যুগান্তর প্রবর্ত্তন করে নাই। অর্দ্ধ শতাব্দীর ভিতর দেশটার চেহারাই বদলাইয়া গিয়াছে। এমন কি, জীবজন্তু, শাকশব্জী ইত্যাদির বৃত্তান্ত অবগত হইলেও বুঝিতে পারি যে, জাপানের যুগান্তর সত্য-সত্যই বিস্ময়জনক ও অদ্ভুত।

হোক্কাইদো দ্বীপের কথা ধরা যাউক। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এখানে মাত্র আদিম আইনোদিগের বসতি ছিল—আজ রেল পথে যে সকল বনজঙ্গল দেখিতেছি তাহার দশগুণ দুর্গম কানন

৫৭। বানর-ত্রয়

India Press Calcutta.
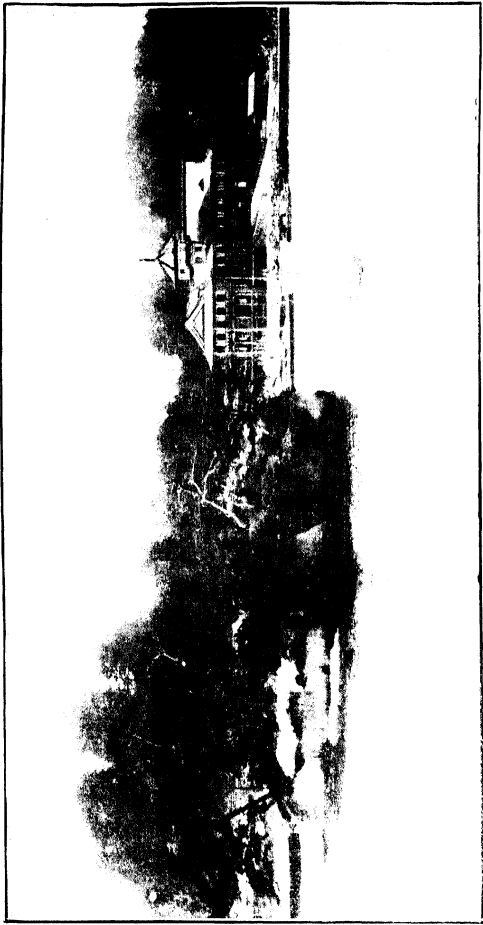
৫৮। মাৎসুসিমায় পার্কহোটেল

ছিল—আর পশুর মধ্যে ছিল টাটুঘোড়া এবং কুকুর। আজ এখানে ১৫ লক্ষ সভ্য শিক্ষিত জাপানীর বাস। গোমহিষ, বলদ, অশ্ব, মেষ, শূকর, খরগোশ, বিড়াল, মুরগী, হাঁস, তিত্তির, ঘুঘু ইত্যাদি জানোয়ারের বংশ বিশেষ সমৃদ্ধ হইতেছে। এ দিকে গোধুম, যব, আলু, ধান, লবঙ্গ, ভুট্টা, নাশপাতি, আপেল, চেরি, আঙ্গুর, ষ্ট্রবেরি, কপি, পেঁয়াজ, কড়াইসুটি, মটর, শিম, কুমড়া, টোমাটো, এ্যাস্পারেগাস ইত্যাদিতে হোক্কাইদো আজকাল "সকল দেশের সেরা।" হোক্কাইদোর অধিকাংশ ভূখণ্ডই পতিত রহিয়াছে। দেশটার বাহ্য আকৃতি বদ্‌লাইয়া যায় নাই কি?

হোটেল হইতে সরকারী পশুশালা বহুদূরে। ইহার কর্ত্তা গাড়ী পাঠাইলেন। ধুলা, হাওয়া ও গরম ভোগ করিতে করিতে যথা স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে চাষ আবাদও হয়, কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্য পশুগণের খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এগুলি বাজারে বিক্রয় করা হয় না। অভ্যর্থনা-গৃহে এখানকার সকল দ্রব্য প্রদর্শিত দেখিলাম।

একপ্রকার গোধুমের গরম রস পান করিতে করিতে দুগ্ধ-বিভাগের ওস্তাদের সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করা গেল। ইনি আমেরিকার উইস্‌কন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছেন—পূর্ব্বে তোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট ছিলেন। এই পশুশালার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন ওস্তাদ নিযুক্ত। ওস্তাদের সংখ্যা ছয় জন। ইহঁাদের কর্ত্তা ও পরিচালক একজন। ইনি কয়েকবার ইয়োরোপে ও আমেরিকায় গাভী, বলদ, মেষ ইত্যাদি ক্রয় করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

জাপানে মেষ ছিল না। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে তিন জোড়া, স্পেন হইতে তিন জোড়া এবং বিলাত হইতে তিন জোড়া

মেষ আমদানী করা হয়। মেষ-পালন এখনও জাপানী সমাজে দাঁড়াইয়া যায় নাই। গবর্মেণ্ট ইহাদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এখনও যথেষ্ট অর্থব্যয়ে পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করিতেছেন। স্যাপ্পরোর এই পশুশালায় সম্প্রতি প্রায় ১৩০টি মেষ রক্ষিত হইতেছে। বর্ত্তমানে বৎসরে একবার করিয়া মেষের লোম কাটা হয়। পশমের কাটাই, বাছাই, বুনাই ইত্যাদি জাপানীরা জানে না। তাহা শিখাইবার জন্য গবর্মেণ্ট এই পশুশালায় ক্ষুদ্রভাবে আয়োজন করিয়াছেন। জাপানে পশমের বস্ত্র তৈয়ারী করিবার জন্য কয়েকটা ফ্যাক্টরি আছে—ফ্যাক্টরির মালিকেরা অষ্ট্রেলিয়া ও বিলাতের পশম আমদানি করে। জাপানের ভিতর মেষ-পালন এবং পশম-ব্যবসায় সুপ্রচলিত হইলে এই কাঁচা মালের জন্য জাপানকে বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হইবে না। নিজ পায়ে দাঁড়াইবার জন্য গবর্মেণ্ট ৪০ বৎসর হইতে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক ফল-পরীক্ষায় নিযুক্ত। এই নীতি প্রয়োগ করার ফলেই অল্পকালের ভিতর জাপানের রূপ বদলাইয়া গিয়াছে।

জাপানে আসিয়া অবধি দেখিতেছি, দুধ অতি বিরল। মাত্র অল্পদিন হইল জাপানীরা দুধ মাখন ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। কাজেই গাইড একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়, আপনারা ভারতবর্ষে ইংরাজ আমলের পূর্ব্বে মাখন খাইতেন কি?" উত্তর দিলাম—'আজন্মকাল আমরা জানি 'আয়ুর্বৈ ঘৃতম্।'

জাপানে গোপালন-বিদ্যাও অনেকটা নূতন—গোপালন-ব্যবসায়ও অনেকটা নূতন। হোক্কাইদো দ্বীপ সম্বন্ধে এ কথা বিশেষ ভাবেই খাটে। এদেশে আমেরিকা, জার্ম্মাণির হল্‌ষ্টাইণ জেলা, সুইজর্ল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশ হইতে গোবলদ আমদানি করা হইয়া থাকে।

ঘোড়ার আমদানিও আমেরিকা হইতে হয়। যেখানে যে জীব ভাল পাওয়া যায়, জাপানীরা সেইখান হইতে সেই সমুদয় জীব আমদানি করিতে সুপটু। এইরূপেই দেশের শ্রী বদলাইয়া যায়।

স্যাপ্পরোর পশুশালায় প্রায় ২৭০টি বিদেশীয় গোবলদ আছে। প্রত্যেক গাভী প্রতিদিন প্রায় আধ মণ করিয়া দুধ দেয়। বলদগুলি মাঝে মাঝে বিভিন্ন জেলায় চালান করা হয়। এই উপায়ে জাপানী গোজাতির বংশোন্নতি সাধিত হইতেছে।

গোশালা, মেষশালা, দুগ্ধশালা ইত্যাদি দেখিলাম। শীতকালে পশুখাদ্যের অনটন সকল দেশেই হইয়া থাকে। তখন ভারতবর্ষে শুক্‌না ঘাস ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইয়াঙ্কিরা বর্ষার ঘাস বহুকাল পর্য্যন্ত তাজা রাখিবার জন্য এক কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন। একটা বায়ুহীন স্থানে এইগুলি পুঞ্জীকৃত করা হয়। পরে আবশ্যকমত এইগুলি বাহির করা চলে। জাপানীরাও সেই কৌশল প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

জাপানীরা দুধ দুহিবার সময়ে বাছুরকে দিয়া গাভীর বাঁট চাটায় না। গোয়ালা স্তনে হাত বুলাইয়া দুধ বাহির করে। জাপানীরা আমেরিকার রীতি অনুসরণ করিতেছে। দুগ্ধশালায় দেখিলাম, দুধ বাষ্পে গরম করিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাজা রাখা হইতেছে। কলে মাখম প্রস্তুত করা হয়। প্রথমে "ক্রীম" বা দুগ্ধসার তৈয়ারি করা হইয়া থাকে—পরে দুগ্ধসার হইতে মাখন তৈয়ারী হয়। ১০০ ভাগ সাধারণ দুধ হইতে ১০ ভাগ মাত্র দুগ্ধসার পাওয়া যায়। আবার ১০০ ভাগ দুগ্ধসার হইতে ২৮ ভাগ মাখন প্রস্তুত হইতে পারে। দুগ্ধসার বাহির করিয়া লইলে দুগ্ধের যে অংশ অবশিষ্ট থাকে তাহা হইতে "কন্‌ডেন্‌স্‌ড্‌ মিল্ক" বা ঘনীভূত দুধ, "মিল্ক পাউডার" বা দুধের গুঁড়া, "চীজ" বা পনির ইত্যাদি তৈয়ারি করা যায়। কিন্তু

স্তাপ্পরোর এই পশুশালায় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাহা করেন না। দেখিলাম, গোপালকেরা বাছুরগুলিকে সেই অবশিষ্টাংশ পান করাইতেছে। খাঁটি গোদুগ্ধ হইতে পনির এবং ঘণীভূত দুধ তৈয়ারি হইতেছে দেখা গেল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এবারকার প্যানামা-প্রদর্শনীতে এক প্রকার নূতন ঘণীভূত দুধ প্রদর্শিত হইতেছে। তাহার সংবাদ রাখেন কি?" দুগ্ধশালার ওস্তাদ বলিলেন—"আমরা সুইস্‌প্রণালী অনুসারে কন্‌ডেন্‌স্‌ড্‌ মিল্ক প্রস্তুত করিয়া থাকি। এই দুধের সঙ্গে চিনি মিশ্রিত হয়। এই জন্য দুধ আঠাল বোধ হয়। এবার একজন আমেরিকান যাহা উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা জল-উড়ান (ইভাপোরেটেড) দুধ। ইহাতে চিনি মিশ্রিত করা হয় না। কেবল মাত্র দুধের জলীয় অংশ বাষ্পরূপে বিতাড়িত করা হয়। এই দুধ আমি দেখিয়া আসিয়াছি—জাপানে এখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই।"

এই পশুশালার জন্য গবর্মেণ্টের বার্ষিক খরচ হয় ৭৫০০০৲। নানা বিভাগের দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া আমদানি হয় ৩৫০০০৲।

ঘোড়ার জন্য অনেকগুলি স্বতন্ত্র পশুশালা আছে। সেনাবিভাগের জন্য এবং কৃষিকার্য্যের জন্য এই সকল স্থানে উচ্চবংশীয় অশ্বের পালন, বর্দ্ধন ইত্যাদি হইয়া থাকে।

হোক্কাইদোতে সর্ব্বসমেত আটটা পশুশালা আছে। এতদ্ব্যতীত জাপান সাম্রাজ্যের দ্বীপপুঞ্জে ছোটবড় সরকারী-বেসরকারী বহুসংখ্যক পশুপালনের কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। নূতন নূতন জীবজন্তুর আমদানি এবং পুরাতন পশুজাতির বংশোন্নতি জাপানে যেরূপ দ্রুত চলিয়াছে তাহাতেই জাপানী যুগান্তরের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুগান্তর প্রবর্ত্তন করিল কে? স্বদেশী আন্দোলনের স্থাপয়িতা প্রজা-"সংরক্ষক" গবর্মেণ্ট।

একটা সুবৃহৎ লিনেন ফ্যাক্টরি দেখিলাম। ১২০০ মজুর কার্য্য করে। কারখানার আয়তন বেশ বিস্তৃত। মালগুদামে রাশি রাশি সূতা, ক্যাম্বিশ, চট, ইত্যাদি মজুত করা রহিয়াছে। গবর্মেণ্টের অর্ণব-যান-বিভাগের জন্য এইখানে মাল তৈয়ারী হয়। সেদিন নিক্কো হইতে আসিবার পথে কারখানায় যাহা দেখিয়াছি, এখানেও তাহা বড় আকারে দেখিলাম। সূতা প্রস্তুত করা হইতে চট্, তোয়ালে, জিন, ক্যাম্বিস্ ইত্যাদি ভাঁজ করা পর্য্যন্ত সবই কলে হইতেছে। তুলা, পশম, পাট, লিনেন ইত্যাদি সকল কারখানায়ই প্রায় একধরণের যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং একটা বয়ন-ফ্যাক্টরী দেখিলে সকল বয়ন-কারখানার আসবাবপত্র ও পরিচালনা দেখা হয়। এই কোম্পানীর তিশি-ক্ষেত্র আছে। সেখানে তিশিগাছ জলে পচাইয়া সূতা প্রস্তুত করিবার যোগ্য করা হইয়া থাকে। পাট পচান আর তিশিগাছ পচান এক ধরণেই নিষ্পন্ন হয়।

স্তাপ্পরোর সর্ব্বত্রই বৈদ্যুতিক বাতি দেখিতেছি, কিন্তু বিদ্যুত-চালিত ট্রাম দেখিতেছি না। ট্রামগাড়িগুলি অতিশয় ক্ষুদ্র—একটা ঘোড়ার দ্বারা টানা হয়।

ঘরে বসিয়া "হোক্কাইদোর উদ্ভিদরাজ্য" সম্বন্ধে পুস্তক পাঠ করিতেছি এমন সময়ে হঠাৎ কতকগুলি তুই-পটকা ও বন্দুকের আওয়াজ শুনিলাম। বারান্দা হইতে দেখি, রাস্তায় বহুলোক দাঁড়াইয়া গিয়াছে। হোটেলের ঝি-চাকরেরা ঘরের বাহিরে দৌড়িয়া গেল। রাস্তায়

নামিয়া আসিলাম। দেখিতেছি, একটা শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছে। ব্যাণ্ড বাজিতেছে—তাহার পশ্চাতে প্রায় ২০০ রিকৃশ চলিতেছে—কোনটাতে পুরুষ, কোনটাতে রমণী বসিয়া আছে। সংবাদ পাওয়া গেল—তোকিও হইতে ইম্পিরিয়্যাল থিয়েটারের অভিনেতৃদল স্যাপ্পরোতে কয়েকটা পালা অভিনয় করিবার জন্য আসিয়াছে। আজকার গাড়ীতে ইহারা পৌছিয়াছে। সহরময় এই সংবাদ প্রচার করিবার জন্য এই মিছিলের আয়োজন। বড় সহর হইতে মফঃস্বলে নামজাদা লোকজন আসিলে নাকি জাপানীরা এইরূপ করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে যেমন কোন ঋতুতে দার্জ্জিলিঙ্গ, শিম্‌লা, নৈনিতাল, কোন ঋতুতে মধুপুর, দেওঘর, পুরী ইত্যাদি যাইবার রেওয়াজ আছে, জাপানে সেইরূপ গ্রীষ্মকালে লোকেরা স্যাপ্পরোতে আসে। এক্ষণে এই সহরে পর্য্যটক আগমণের "যোগ" পড়িয়াছে। সহরের প্রত্যেক সরাইয়েই বহুলোক আশ্রয় লইয়াছেন শুনিতে পাই।

মাৎসুশিমা হইতে আসিবার সময়ে জাহাজে দুইটি বালকের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। উহারা "ব্যাঙ্ক অফ্ জাপানে"র গবর্ণর শ্রীযুক্ত ভাইকাউণ্ট মিশিমার পুত্র। তোকিওতে সম্ভ্রান্ত ধনীবংশীয় সন্তানগণের জন্য "পীয়ারস্ স্কুল" আছে। ইহারা সেই বিদ্যালয়ে লেখা পড়া করে। ইংরাজী বলিতে পারে মন্দ নয়। কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম, গ্রীষ্মাবকাশে ইহারা হোক্কাইদো বেড়াইতে আসিয়াছে। সঙ্গে একজন অভিভাবক আছেন। আমাদের হোটেলেই ইহারা অতিথি হইল। বাহিরে যাইবার সময় কাপড় চোপড় পাশ্চাত্য ধরণের থাকে—কিন্তু সদাসর্ব্বদা জাপানী পোষাকেই ইহাদিগকে দেখিতেছি।

ইয়োরামেরিকার লোকেরা জাপানীদিগকে আফিসী পোষাকে

দেখিয়া ভাবে যে, জাপান পুরাপুরি পাশ্চাত্য জীবন অবলম্বন করিয়াছে। সত্য কথা, জাপানীরা স্বদেশী কোন জিনিষই বিন্দুমাত্র ছাড়ে নাই। আমাদের দেশে উকিল, হাকিম, মাষ্টার, কেরাণী ইত্যাদি শ্রেণীর লোক কর্ম্মক্ষেত্রে যাইবার সময়ে কোট প্যাণ্ট চাপকান ইত্যাদি ব্যবহার করেন। এইমাত্র দেখিয়া বিদেশীয়েরা যদি ভাবেন যে, ভারতবর্ষ "পাশ্চত্য" হইয়া গিয়াছে তাহা হইলে ভারতবর্ষকে তাঁহারা যতটুকু বুঝিবেন, তাঁহারা জাপানকে মাত্র ততটুকুই বুঝিয়াছেন।

এখানকার বোটানিক্যাল উদ্যানের ভিতর একটা মিউজিয়াম আছে। পক্ষিকুলের সংগ্রহ মন্দ নয়। জাপানের আদিম নিবাসী আইনোদিগের পোষাক-পরিচ্ছদ, অস্ত্র-শস্ত্র ভল্লুক-পূজা, কৃষিশিল্প ইত্যাদি বিষয়ক নিদর্শন দেখিতে পাইলাম। অল্প সংখ্যক আইনো আজকাল হোক্কাইদোর এক নিভৃত পল্লীতে বাস করিতেছে। অতদূর যাইবার সময় করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

জাপানীদের স্বভাব-চরিত্র অতিশয় মধুর। উচ্চ মধ্যম নিম্ন নানা শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে আসিলাম—প্রত্যেককে নম্র ও বিনীত দেখিতেছি। পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম—"ফার্ষ্টক্লাশ পাওয়ারে"র নরনারীগণ অহঙ্কারী হইবে। কিন্তু সর্ব্বত্রই জাপানীদের ব্যবহারে অত্যন্ত আনন্দ পাইতেছি। বলা বাহুল্য, যথেষ্ট বিস্মিতও হইলাম।

আগে ভাবিতাম, জাপানীরা হাসে না—সর্ব্বদা মুখ লম্বা করিয়া বেরসিক ভাবে চলা-ফেরা করে। অথচ জাপানে পদার্পণ করার পর হইতে দেখিতেছি, এমন হাস্যপ্রিয় মধুরভাষী সুরসিক লোকজন খুব কমই আছে। ইহাদের ভাষা বুঝিতেছি না—তথাপি ইহাদিগকে আপনার মনে হইতেছে। ইহারা অতি শীঘ্র পরকে আপনার করিয়া

লইতে পারে। শ্বেতাঙ্গ ইয়োরামেরিকানেরা জাপানে এতটা আত্মীয়তা ও সৌহার্দ্দ্য অনুভব করে কি না জানি না।

আমি ত দেখিতেছি, জাপান ভারতবর্ষেরই যেন অন্যতম প্রদেশ-মাত্র। বাঙ্গালী মারাঠার ভাষা বুঝে না—তথাপি মারাঠাকে সকল বিষয়েই নিজের লোক বলিয়া জানে। পুণার রাস্তায় দাঁড়াইয়া মারাঠীভাষী নরনারীকে যেরূপ দেখিতাম, তোকিও-নিক্কো-মাৎসুশিমা-স্থাপ্পরোর রাস্তায়, হোটেলে, বাজারে, জাপানী নরনারীকে দেখিয়াও ঠিক সেইরূপ ভাবই মনে জাগিতেছে। ভাষার প্রভেদ সত্ত্বেও এশিয়ার হৃদয়ে ঐক্য অতি গূঢ়ভাবে রহিয়াছে। জাপানে এ কথাটা সত্যভাবে বুঝিলাম।

আদবকায়দা, সৌজন্য, শিষ্টাচার ইত্যাদি বিষয়ে আমরা মুসলমান জাতিকে জগৎ-প্রসিদ্ধ বলিয়া জানি। জাপানীদের শিষ্টাচারের রীতি দেখিয়াও মুগ্ধ হইতেছি। পাশ্চাত্য লোকেরা কথায় কথায় "থ্যাঙ্ক ইউ" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে। কিন্তু এই শব্দের ভিতরে প্রাণ থাকে কি না, বলা কঠিন। জাপানীরা সমস্ত শরীর ও মস্তক অবনত করিয়া অতিথির অভ্যর্থনা করে—অথচ এই বিনয়ের ভিতর বিন্দু-মাত্র নীচতা ও দৈন্য প্রকাশিত হয় না। নম্রতার সঙ্গে আত্মসম্মানের সংযোগ জাপানী চরিত্রের একটা বিশেষত্ব। ইহা বর্ত্তমান "মেজি-যুগের" নূতন সৃষ্টি নয়— হাজার বর্ষব্যাপী এশিয়াটিক সংস্কারের ও অভ্যাসের ফল।

স্যাপ্‌পরোর কৃষি-মহাবিদ্যালয়

চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইয়াঙ্কিস্থানের "মধ্য-পশ্চিম" এবং "মহা-পশ্চিম" প্রদেশে জনপদ ও নগর স্থাপিত হইতেছিল। প্রায় সেই সময়েই হোক্কাইদো দ্বীপে নব্য জাপানী উপনিবেশ স্থাপনের সূত্রপাত হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে মেজি-যুগ প্রবর্ত্তিত হইবামাত্র জাপানের সর্ব্বত্র নূতন নূতন কর্ম্মপ্রণালী আরব্ধ হয়। হোক্কাইদো দ্বীপের উন্নতি বিধানের জন্যও মিকাডো স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করেন। আজ এখানে যাহা কিছু দেখিতেছি, সকলই গবমেণ্টপ্রবর্ত্তিত সেই স্বতন্ত্র আয়োজনের ফল।

সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিলে কত কম সময়ে কত বেশী কাজ হইতে পারে, তাহা বুঝিবার জন্য জাপানে আসা আবশ্যক। আবার জাপানের মধ্যে হোক্কাইদো দ্বীপই তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

সম্রাট্ প্রথমে এখানে একজন শাসনকর্ত্তা পাঠাইলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন, এদেশ অতিশয় উর্ব্বর এবং ধাতুর আধার। কিন্তু কৃষি-কার্য্য, পশুপালন অথবা আকর-খনন ইত্যাদি কার্য্য চালাইবার উপযুক্ত লোকের অভাব। স্থানীয় লোকের দ্বারা এই সব করান অসম্ভব—অধিকন্তু জাপানের প্রধান দ্বীপেও তখন এই ধরণের লোক পাওয়া যাইত না। কাজেই শাসনকর্ত্তা বিদেশের শরণাপন্ন হইলেন। জাপানীরা সেই সময়ে ইয়াঙ্কিস্থানকে প্রধান গুরুরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিল। বিশেষতঃ তখন সে দেশেও নব নব জনপদ গঠনের যুগ চলিতেছিল। এই জন্য হোক্কাইদোর শাসনকর্ত্তা উপনিবেশ স্থাপনের প্রণালী বুঝিবার জন্য আমেরিকা

গমন করিলেন। ফিরিবার সময়ে কয়েকজন ইয়াঙ্কি ওস্তাদ সঙ্গে লইয়া আসিলেন। দশ বৎসরের ভিতরে এইরূপে প্রায় ৭০ জন বিদেশীয় ওস্তাদ হোক্কাইদোতে আগমন করেন। জার্ম্মাণ, রুশ, ফরাসী, ইংরাজ, ইয়াঙ্কি সকল জাতি হইতেই বিশেষজ্ঞের আমদানি হইয়াছে।

এই সকল ওস্তাদ হোক্কাইদোতে জাপানী উপনিবেশ গঠনের পথ উন্মুক্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রধান ও প্রথম কার্য্য হইল বিদ্যালয়-স্থাপন। এই বিদ্যালয়ে নূতন দেশে বসতি-প্রতিষ্ঠা এবং ভূমি-খনন ও কৃষিকর্ম্ম ইত্যাদি বিষয়ে আধুনিকতম জ্ঞান প্রচারিত হইতে থাকিল। বিশটি ছাত্র এবং একজন ইয়াঙ্কি অধ্যাপক লইয়া এই বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। আজ এখানে বিরাট মহাবিদ্যালয় দেখিতেছি—৯০০ ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে, সহকারী ও কর্ম্মচারী লইয়া একশত অধ্যাপক আছেন—ইঁহাদের মধ্যে মাত্র একজন বিদেশীয়। উদ্ভিদ, ধাতু এবং জীবজন্তু সম্বন্ধে সকল প্রকার কার্য্যকরী বিদ্যার আলোচনা এইখানে হইয়া থাকে। এখানকার অধ্যাপকগণ দুনিয়ার বিজ্ঞানমহলে সুপরিচিত। আমরা জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা লইয়া যত বড়াই করিয়া থাকি, সেইরূপ বড়াই অনেক বিজ্ঞানবীর সম্বন্ধে স্তাপ্পরোবাসিগণ করিতে অধিকারী।

উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মিয়াবে হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ডাক্তার আসা গ্রের ছাত্র ছিলেন। স্তাপ্পরোতে কর্ম্মগ্রহণ করিবার পর হইতে নানা স্বাধীন গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। ল্যাবরেটরীতে ইঁহার সঙ্গে আলাপ হইল। সম্প্রতি ইনি যে কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাহার উপকরণগুলি দেখিলাম। হোক্কাইদো দ্বীপের উদ্ভিদসমূহ

বৈজ্ঞানিক রীতিতে বিবৃত হইতেছে। হুকার-প্রণীত ভারতীয় উদ্ভিদ্ যেরূপ, মিয়াবে-প্রণীত গ্রন্থও সেইরূপ হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"উদ্ভিদের যে সমুদয় নমুনা দেখিতেছি সেগুলি সবই কি আপনি একাকী সংগ্রহ করিয়াছেন?" বৈজ্ঞানিক বলিলেন—"আমার মত আরও ২০।২২ জন সংগ্রাহকের সমবেত চেষ্টার ফল এইখানে সঞ্চিত রহিয়াছে। ২৫ বৎসর হইতে এই সংগ্রহকার্য্য চলিতেছে। কোন কোন উপকরণ বিদেশীয় পণ্ডিতগণের সংগ্রহ হইতে বিনিময়ে পাইয়াছি।"

কৃষি-মহাবিদ্যালয়ের পাঠাগারে ইংরাজী, জার্ম্মাণ, ফরাসী এবং জাপানী সকল প্রকার গ্রন্থ রক্ষিত হইয়াছে। লাইব্রেরীয়ান শ্রীযুক্ত তাকাওকা জার্ম্মাণ ভাষায় সুপণ্ডিত। ইনি জাপানী ও জার্ম্মাণ দুই ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন—ইংরাজীতেও কথা বলেন। ইনি বলিলেন—"আমাদের ছাত্রেরা প্রত্যেকে ইংরাজী, জার্ম্মাণ ও ফরাসী ভাষা শিখিয়া থাকে—তিন ভাষাতেই বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকে। অধ্যাপকগণ একমাত্র জাপানী ভাষায় বক্তৃতা করেন।" তাকাওকা "কৃষি-বিষয়ক ধন-বিজ্ঞান" বিষয়ে শিক্ষকতা করেন। ইনি লাইব্রেরীতে রক্ষিত ইয়োরামেরিকার পত্রিকাসমূহ দেখাইলেন। একমাত্র ধনবিজ্ঞান-সম্পর্কিত বিদ্যাসমূহ আলোচনা করিবার জন্য জাপানী পত্রিকাও আছে। আমেরিকান, ইংরাজ, জার্ম্মাণ ও ফরাসী পণ্ডিতগণের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ প্রায় সবই জাপানীতে অনূদিত হইয়াছে। এখানকার লাইব্রেরী আমেরিকার প্রণালীতে সাজান। তাকাওকার সঙ্গে বিদ্যালয়ের কৃষিক্ষেত্র ও পশুশালাগুলি দেখিলাম।

অধ্যাপক স্যাতো কয়েক বৎসর হইতে এই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা করিতেছেন। ইনি বলিলেন—"বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা

অধ্যাপকগণের বেতনাদিতে খরচ হয়। আর দেড় লক্ষ টাকা বিদ্যালয়ের সম্পর্কিত পশুশালা ও কৃষিক্ষেত্র ইত্যাদিতে খরচ হয়। খরচের অর্দ্ধাংশ গবর্মেণ্ট হইতে পাওয়া যায়, অপরার্দ্ধ আবাদ হইতে আসে।"

বর্ত্তমানযুগে দুনিয়ার লোকেরা যে সকল সমস্যার মীমাংসা করিতেছে, সেই সকল সমস্যার আলোচনায় যে জাতি যোগ দিতে পারিবে, তাহাকেই বর্ত্তমান যুগের জাতি বলা যাইতে পারে, আর যে পারিবে না, তাহাকে আধুনিক পদবাচ্য করা চলে না। এই হিসাবে ভারতবাসীকে আধুনিক বা বর্ত্তমানযুগের জীব বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। ত্রিশ কোটী নরনারীর মধ্যে আমরা কয় হাজার বা কয় শত বা কয় ডজন বা কয়গণ্ডা লোকের নাম করিতে পারি, যাঁহারা বর্ত্তমান যুগের কর্ম্মপ্রবাহে ও চিন্তাপ্রবাহে গা ঢালিয়াছেন? কয়জন ভারতবাসীর চিন্তা ও কর্ম্মের সংবাদ লইয়া জগতের চিন্তাবীর ও কর্ম্মবীরেরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে অগ্রসর হন? বস্তুতঃ ভারতবর্ষ নামক একটা দেশ আছে কি না তাহা জানা না থাকিলেও বর্ত্তমান বিজ্ঞানবীরগণের কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু জাপান সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। জাপানের লোকেরা বর্ত্তমান যুগের সকল আন্দোলনেই যোগ দিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্ভাবিত সত্যগুলির তালিকা করিলে বেশ বুঝিতে পারি যে, নব্য জাপান বর্ত্তমান জগতেরই একটা দেশ। অবশ্য জাপানের আবিষ্কারসমূহ বিজ্ঞান-সংসারের বিপ্লবসাধন করিবার উপযুক্ত কি না, জানি না। কিন্তু এই পর্য্যন্ত বুঝা যায় যে, এখানকার অনুসন্ধানকারীগণ যে সমুদয় গবেষণা করিতেছেন, সেগুলি দুনিয়ার অন্যান্য গবেষণাকারীগণ একবার খতাইয়া দেখিতে চেষ্টা করেন। জাপানীয় সত্য

সত্যই আধুনিক বিজ্ঞান-মণ্ডলের অধিবাসী—ভারতবর্ষের লোক সেই উচ্চ অধিকার কবে লাভ করিবে?

বর্ত্তমান যুগের জীব হওয়া কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইবার জন্য একজন জাপানী বৈজ্ঞানিকের একটা প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। তোকিও ইম্পিরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের Journal of the College of Science পত্রিকায় A study of the Geniculæ of Corallinœ রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখক এই সমালোচনার ইতিহাস জ্ঞাপন করিতেছেন। ইয়োরামেরিকার বৈজ্ঞানিকেরা এই বিষয়ে যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহার সঙ্গে জাপানী অনুসন্ধানকারীর যোগ কোথায় এই উদ্ধৃত অংশ হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

"As far as the present writer's observation extends, the literature relating to the subject in question is comparatively scarce. Nelson and Duncan jointly tried some investigations into the histology of the calcarasus algœ and left a valuable paper. Solus treated somewhat the same subject and wrote a few lines about the formation of the genicula in the *Corallinoe*, and pointed out the difference between *Amphiroa* and *Corallina* in the structure of genicula. Heydrich noticed the critical points of the primary incrustation of *Corallina* and *Lithothamnion*. He took *Corallina officinalis L*, as the representative of the *Corallinæ* and mentioned the genicular formation as an important diverging point of the two subfamilies.

The writer previously noticed several interesting facts about the geniculæ of the *Corallina* while he was examining material from Japan and Canada. Some of the views arrived at a different conclusion from those of former investigators. They will be pointed out under the proper chapters"

যেদিন ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ অন্যান্য দেশীয় চিন্তা-বীরগণের কর্ম্মসূত্র বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবেন, এবং যেদিন ভারতীয় চিন্তাবীরগণের গবেষণা খতাইয়া না দেখিলে জগতের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ অসম্পূর্ণ থাকিবেন, সেই দিন বুঝিব ভারতবর্ষ "বর্ত্তমান জগতে"র দেশ। সেদিন কবে আসিবে? জাপানে সেই দিনের আবির্ভাব হইতে মাত্র ত্রিশ বৎসর লাগিয়াছে। সেই দিন আনিবার একমাত্র উপায়—"সংরক্ষণনীতির" প্রয়োগ।

———

মৎস্যবিজ্ঞান ও সামুদ্রিক উদ্ভিদের চাষ

সাধারণ জাপানী পরিবারে মাংস খাওয়ার অভ্যাস এখনও বিশেষ প্রবল নয়। যাহারা মাংস খায় তাহারা পাখী পর্য্যন্ত উঠে। গোশূকরাদি নিতান্ত নব্য ইয়োরামেরিকাপ্রত্যাগত পরিবারে পোষাকী খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে জাপানীরা বাঙ্গালীর অনুরূপ। তবে কাঁচা মাছ খাইবার রেওয়াজ বঙ্গদেশে নাই—এই যা প্রভেদ। মাছের ঝোল, মাছ ভাজা, শুঁটকি মাছ ইত্যাদি দুই সমাজেরই সমান প্রিয়। একটা মজার কথা দেখিতেছি যে, বাঙ্গালীদের মত জাপানীরাও রুই মাছের অত্যন্ত ভক্ত। বড় বড় মহোৎসব ব্যাপারে নাকি রুই মাছের আয়োজন না থাকিলে ষোলকলা পূর্ণ হয় না।

জাপানে আসিয়া অবধি একটা নূতন খাদ্য দ্রব্যের পরিচয় পাইতেছি। তাহার নাম সী-উইড্স্ বা সামুদ্রিক উদ্ভিদ্। বাজারে এই উদ্ভিদের বিক্রয় যৎপরোনাস্তি দেখিতেছি। দোকানে শুষ্ক আকারে এই উদ্ভিদের বিক্রয় প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। জাপানের স্বদেশী হোটেলে বা সরাইয়ে এবং মিঠায়ের দোকানে সী-উইড্‌সের প্রস্তুত নানা দ্রব্য পাওয়া যায়। ইয়োরামেরিকার কোথাও এই উদ্ভিদের এইরূপ ব্যবহার বোধ হয় নাই। জাপানীরা এই বস্তু খাইতে খুব ভালবাসে—ঝালে ঝোলে অম্বলে মিঠায়ে প্রত্যেক খাদ্য দ্রব্যেই ইহার প্রয়োগ হয়। অধিকন্তু এই উদ্ভিদের ব্যবসায় হইতে জাপানে বহুল পরিমাণে টাকা উৎপন্ন হয়।

চীনারা জাপানীদের মতই এই উদ্ভিদের ব্যবহার করিয়া থাকে—জাপান হইতে তাহারা এইগুলি মণে মণে আমদানি করে।

তাম্নরো কলেজে দেখিতেছি—সামুদ্রিক উদ্ভিদ সম্বন্ধে জ্ঞান প্রচার করিবার জন্য একজন অধ্যাপক স্বতন্ত্রভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার নাম ইয়েণ্ডো। সামুদ্রিক জীবজন্তু সম্বন্ধে গবেষণা করা ইঁহার বিশেষত্ব—মাছ এবং উদ্ভিদ দুই প্রকার জীব ইঁহার আলোচ্য বিষয়। "মেরিণ বটানি", "ফিশারি", সী-উইড্স্ ইত্যাদি বিষয়ে ইয়েণ্ডো বহুকালাবধি শিক্ষকতা করিতেছেন। বলা বাহুল্য, এই সকল বিদ্যার নাম পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে শুনা যায় না।

ইয়েণ্ডো ইংরাজীতে বেশ কথা বলেন—জার্ম্মাণ ভাষায়ও সুপণ্ডিত। মৎসবিজ্ঞান সম্বন্ধে একখানা বিরাট গ্রন্থ জাপানী ভাষায় লিখিয়াছেন। ইঁহার গবেষণাসমূহ ফরাসী, ইংরাজী, আমেরিকান ইত্যাদি বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক পত্রে বাহির হইয়া থাকে। অন্যান্য জাপানী পণ্ডিতের ন্যায় ইনিও আমেরিকা, জার্ম্মাণি, বিলাত ইত্যাদি দেশ ঘুরিয়া আসিয়াছেন। বিশেষ কথা এই যে, ইয়েণ্ডো প্রায় আড়াইবৎসর কাল নরওয়েতে ছিলেন। এইখানে সামুদ্রিক উদ্ভিদ্ আলোচনা করিবার ব্যবস্থা নাকি উৎকৃষ্ট।

ইয়েণ্ডো বলিলেন—"জাপানীরা এই উদ্ভিদের ব্যবসায় করিয়া চীন হইতে বৎসরে, ৪,৫০০,০০০৲ রোজগার করে। সর্ব্বসমেত ইহার প্রায় আড়াইগুণ টাকার কারবার জাপানে চলিতেছে। কাজেই সী-উইড্স্ আমাদের নিকট তুচ্ছ খেলনার সামগ্রী নয়।"

ইঁহার গৃহে একবার আলাপ হইল—স্বদেশী পোষাক আসবাব ইত্যাদিই দেখিলাম—কলেজেও একবার দেখা হইল—তখনও কিওমনো-পরা দেখা গেল।

সামুদ্রিক উদ্ভিদের জন্ম, ক্রমবিকাশ ও বিস্তার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা

হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে আপনাদের ব্যবসায় একদিন না একদিন বন্ধ হইয়া যাইবে না কি? কারণ উদ্ভিদসমূহের জোগান ত সমুদ্রে অফুরন্ত নয়।" ইয়েগো বলিলেন—"সত্যই তাহা ঘটিয়াছে। বিগত ৪০ বৎসরের ভিতর আমাদের সী-উইড্-ব্যবসায়ীরা অত্যধিক "ফসল" টানিয়া তুলিয়াছে। তাহার ফলে সমুদ্রে ক্রমশঃ উদ্ভিদের অনটন পড়িতে থাকিল। কাজেই এই আবাদের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক আলোচনা সুরু হইয়াছে।"

আজকাল ফলের চাষ, মাছের চাষ, ডিমের চাষ—ইত্যাদি নানাবিধ চাষের কথা শুনা যায়। কৃষিকর্ম বলিলে একমাত্র ধান, চাউল, গম, যবের আবাদই বুঝায় না। জাপানে আসিয়া মুক্তার চাষও শুনিয়াছি। ইয়েগোর নিকট সামুদ্রিক উদ্ভিদের আবাদও শুনিলাম। বর্ত্তমান যুগের মানব প্রাকৃতিক শক্তি ও সুযোগসমূহের দাস হইয়া থাকিতে চাহে না। পূর্ব্বেও মানবসমাজ প্রকৃতির দাস ছিল না। এই জন্যই কৃষিকর্ম্ম ইত্যাদি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানকালে মানববিদ্যার যথেষ্ট প্রসার ও বিস্তৃতি সাধিত হইয়াছে—এই জন্য চাষ-আবাদের ক্ষেত্রও বাড়িয়া যাইতেছে। প্রকৃতি যদি মুক্তহস্তে দান করিতে থাকেন—তাহাতে মানুষের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু মানুষ প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভর করিবে না। প্রকৃতির স্বভাব অবগত হইয়া তাহাতে নিজ ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুসারে কাজে লাগাইবার জন্য মানুষ নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। এই সকল উপায়, নিয়ম ও কার্য্য-প্রণালীর উদ্ভাবনই বিজ্ঞানের কার্য্য।

ইয়েগো বলিলেন, "আমি গত বৎসর আয়র্ল্যাণ্ডে গিয়াছিলাম। সেখানে ডাব্‌লিনের রয়্যাল সোসাইটিতে সামুদ্রিক উদ্ভিদের চাষ

সম্বন্ধে বক্তৃতা দিই। এই বক্তৃতার নাম শুনিয়াই অনেকে বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিস্মিত হইবার কারণ নাই। নদীর মাছ ও সমুদ্রের মাছ সম্বন্ধে যদি নিয়ম আবিষ্কার করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ ধীবরদিগকে কর্ম্মপ্রণালী শিখাইতে পারেন, তাহা হইলে সী-উইড্‌সের "চাষ" সম্বন্ধেও সেইরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে না কেন?" এই সামুদ্রিক আবাদকে "মেরি-কালচার" বলা হইতেছে।

কয়েক বৎসর হইল সামুদ্রিক উদ্ভিদের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। জাপান গবর্মেণ্ট ইয়েণ্ডোকে বিষয়টা বুঝিবার জন্য যথাস্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইয়েণ্ডো তদারক করিয়া মন্তব্য প্রচার করেন। মন্তব্য কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, সকল সমুদ্রেই উদ্ভিদ জন্মে না। সমুদ্রের অভ্যন্তরস্থিত পর্ব্বতগাত্রের প্রকৃতির উপর ইহাদের জন্ম ও ক্রমবিকাশ নির্ভর করে। এতদ্ব্যতীত সমুদ্রজলের গভীরতা, উষ্ণতা, তরঙ্গ, স্রোত ইত্যাদিও সামুদ্রিক উদ্ভিদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। জলের মধ্যে লবণের পরিমাণও এই জীবের অনুকূল হওয়া আবশ্যক। অধিকন্তু জলের ভিতর সূর্য্যকিরণ এবং বায়ু প্রবেশ না করিলে সী-উইড্‌স্ জীবিত থাকিতে পারে না। কাজেই অত্যন্ত গভীর জলপ্রদেশ সামুদ্রিক উদ্ভিদের জন্মনিকেতন হয় না।

এই সম্বন্ধে The Economic Proceedings of the Royal Dublin Society হইতে "On the Cultivation of Sea-weeds with special accounts of their Ecology"-প্রবন্ধের স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"How far down in the water Sea-weeds can grow is a question not easily decided * * * Various experi-

ments have been carried out to ascertain the limit of Sun-Light in deep water. It is estimated that at the depth of about 500 fathoms there is absolute darkness. * * * From my own experience I have found that the amount of illumination during broad day light, penetrating to a depth of 12-13 fathoms, may be compared to clear moonlight.

* * *

Each species of algœ is adapted to enjoy a certain fixed amount of light. Some algologists attribute this phenomenon to the colour of the water. But I think I can give many examples to disprove this view. * * The light acts upon Sea-weeds something in the same way as upon landplant. In shaded place they may grow larger in size, but weaker in texture, and mostly poor in the chlorophyll grains."

ইয়েণ্ডো কিছুকাল বিলাতের প্রসিদ্ধ "কিউ বোটানিক গার্ডেনে" বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করিয়াছেন। ইনি বলিলেন—"প্রায় ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে জাপান হইতে বহু উদ্ভিদের নমুনা বিলাতের পণ্ডিত-গণ লইয়া যান। আমি সেগুলি এখানে দেখিবামাত্র গবেষণা আরম্ভ করিয়া দিলাম। কতকগুলি উদ্ভিদের বিবরণে কিছু অসম্পূর্ণতা ও ভুল ছিল। সেগুলি সংশোধন করিতে পারিয়াছি।"

কৃষিবিদ্যালয়ের "ফিশারি-মিউজিয়াম" বা মৎস্ত-বিজ্ঞান প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—এই তিন বিভাগের সংগৃহীত বস্তু এই প্রদর্শনী

গৃহে রহিয়াছে। প্রথম বিভাগের নাম মাছ ধরা, দ্বিতীয় বিভাগের নাম মৎস্য-পালন বা মাছের চাষ, তৃতীয় বিভাগের নাম মৎস্য-শিল্প। এই তিন বিষয়েই আমাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রচার করা হয়।"

মাছ ধরিবার ছিপ, বড়সি, জাল হইতে নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি পর্য্যন্ত সকল বস্তুই এখানে দেখিলাম। ভিন্ন ভিন্ন মাছের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরণের জাল, জালপাতা এবং অন্যান্য যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এই সমুদয় প্রস্তুত করিবার প্রণালীও প্রদর্শিত হইয়াছে। ছবি, ফটোগ্রাফ ইত্যাদি সাহায্যেও বিষয়টা স্পষ্টভাবে বুঝা গেল। মৎস্য-পালনের জন্য কিরূপ পুষ্করিণী খনন করিতে হয় তাহার একটা নমুনা এখানে আছে। ডিমের আকৃতি পরিবর্ত্তন, মাছের রং খোলা ইত্যাদির ক্রমবিকাশ এবং মৎস্য-জীবনের অন্যান্য বহু তথ্য মিউজিয়ামে বুঝিতে পারিলাম। Oceanography বা সমুদ্র-বিজ্ঞান-বিষয়ক নানা কল, যন্ত্র ও হাতিয়ার এই গৃহের ভিতর আছে। পূর্ব্বে এগুলি কখনও দেখি নাই। শুনিলাম, জাপানীরাও ইয়োরামেরিকানদের মত কয়েকটা যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। মাছের চামড়া, অস্থি ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া যে সমুদয় দ্রব্য প্রস্তুত করা যায়, তাহার নমুনা এখানে অনেক দেখিলাম। সামুদ্রিক উদ্ভিদের সংগ্রহও যৎপরোনাস্তি।

———

৫৯। ফুজিপর্ব্বতের দৃশ্য

৬০। কিয়োতো নগরী

India Press, Calcutta.

৩০১ পৃষ্ঠা

৬১। জাপানের রথযাত্রা

India Press, Calcutta.

চতুর্থ অধ্যায়

জাপানের দিল্লী

তোকাইদো বা কিয়োতোর পূর্ব্ব

কাল রাত্রি হইতে গুমোট গরম পড়িয়াছে। সকালে উঠিয়াই রেলে বসা গেল। সেদিন তোকিও হইতে উত্তরে গিয়াছিলাম—আজ তোকিওর দক্ষিণ-পশ্চিম, বা কিয়োতোয় "তোকাইদো", পথে যাত্রা করিয়াছি।

গাড়ীতে, আমেরিকার রীতিতে, 'পর্য্যবেক্ষণ'-কামরা আছে। এখানে বসিয়া বিশেষরূপে পশ্চাদ্ভাগ দেখা যায়। কামরার ভিতর চিঠিপত্র লিখিবার আসবাবপত্রও রহিয়াছে।

চারিদিকে পার্ব্বত্যদৃশ্য—ধানের ক্ষেত—এবং পাইনের সারি, তোকাইদোর পথেও দেখিতেছি। বাঁশের ঝাড় এই অঞ্চলে বেশীর মধ্যে চোখে পড়ে। প্রায়ই সমুদ্রের কিনারা দিয়া গাড়ী চলিতেছে। পল্লী-কুটিরগুলির সমাবেশ, কৃষকদিগের আবাস—খড়ো চালা, কাঠের বেড়া ইত্যাদি সবই খাঁটি জাপানী।

গাড়ী ঘণ্টা-দেড়েকের ভিতর কোজু ষ্টেশনে আসিল। এখানে নামিয়া অনেকে ইলেক্‌ট্রিক ট্রামে, অথবা মটর-কারে বসিলেন। অনতিদূরে হাকোনে পাহাড়। গ্রীষ্মকালে এই পাহাড়ে বাসকরা

জাপানীদের একটা বিলাসবিশেষ। এই পর্ব্বতের অভ্যন্তরের হ্রদ এবং গন্ধক-প্রস্রবণসমূহ অতি প্রসিদ্ধ। ফুজি পর্ব্বতের প্রতিবিম্ব হাকোনে হ্রদের উপর পড়িয়া থাকে। জাপানী চিত্রকরগণের কারুকার্য্যে এই প্রতিবিম্ব অনেক দেখিয়াছি। কাকেমনোতে, রেশমী পর্দ্দায়, হাত পাখার উপরে—নানাস্থানে ফুজি-হাকোনে-চিত্র দেখা যায়।

এই অঞ্চলে তুঁতের চাষ হয়। কানাগাওয়া-প্রদেশ রেশম-শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ জাপানের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব্ব-পশ্চিম—সর্ব্বত্রই তুঁতের চাষ এবং রেশমের কারখানা দেখা যায়।

গাড়ী কোজু ষ্টেশন ছাড়িবামাত্র প্রদর্শক বলিলেন—"বামদিকে হাকোনে-পর্ব্বতের সারি দেখিতেছেন; তাহার পরের সারীতে ফুজি-শৃঙ্গ দেখা যায়। কিন্তু এক্ষণে আকাশ মেঘে ঢাকা; কাজেই দেখিতে পাইলেন না।"

একজন মাত্র শ্বেতাঙ্গ কামরার ভিতর আছেন। ভারতবর্ষে প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণীতে একজন মাত্র ভারতবাসী যদি একাধিক শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে ভ্রমণ করেন—তাঁহার যেরূপ অবস্থা হয়, জাপানী রেলেও শ্বেতাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গিনীদিগের অবস্থা সেইরূপই দেখিতে পাই। ইঁহারা নিতান্ত নির্জ্জীবভাবে সময় কাটান—যেন জলের কুমীরকে ডাঙ্গায় তোলা হইয়াছে!

সহযাত্রীর মধ্যে কাউণ্ট ওকুমার পুত্র, কিয়োতো চলিয়াছেন; তাঁহার সঙ্গে একজন সরকারী কর্ম্মচারী আছেন। কিয়োতোতে মাস দুই-তিনেকের ভিতর নবীন সম্রাটের রাজ্যাভিষেক হইবে—তাহার ব্যবস্থা অতি সমারোহের সহিত হইতেছে। এই ব্যাপার পরিদর্শন করিবার জন্য, ইঁহারা এখানে একসপ্তাহ থাকিবেন। একজন প্রবীণ জাপানী অধ্যাপক গাড়ীতে আছেন; নাম মুরাকামি—ইনি তোকিওর 'ইম্পী-

রিয়্যাল' বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যশিক্ষা দিয়া থাকেন। ইনি কোন বিদেশীয় ভাষা জানেন না। কিন্তু সমাজে ইঁহার প্রতিপত্তি খুব বেশী।

পাহাড়, উপত্যকা, সুড়ঙ্গ, স্রোতস্বতী, ঝরণা ইত্যাদি দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতেছি। জাপানের নদীগুলি একপ্রকার সবই দেখা হইয়া যাইতেছে; কোন নদীই দৈর্ঘ্যে বেশী বড় নয়। জাপানের মধ্যবর্ত্তী শিরদাঁড়া-স্বরূপ পর্ব্বতমালা হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রে এইগুলি পড়িয়াছে—কাজেই সুবৃহৎ নদী এখানে দেখা যায় না। প্রস্থতেও নদীসমূহের বিস্তার অল্পই—জলের অংশও কম। পার্ব্বত্য অঞ্চলের প্রস্তরময় নদীগর্ভ সর্ব্বত্র চোখে পড়ে; এই গর্ভের এক অতি সঙ্কীর্ণ অংশ দিয়া জলের প্রবাহ চলিতেছে। উত্তরের পথে যাহা দেখিয়াছি তোকাইদোর পথেও তাহাই দেখিতেছি।

ঊর্দ্ধভূমিতে উঠিবার সময়ে গাড়ীর পশ্চাদ্ভাগেও একটা এঞ্জিন লাগান হইল। রাস্তায় একটা বৃহৎ কাগজের কারখানা দেখা গেল।

গোতেম্বা-ষ্টেসনের কাছেও কুমার-সহকারী বলিলেন—"ডাহিন দিকে পর্ব্বতমালার উপর কুয়াসা দেখিতেছেন। তাহার ভিতর দিয়া ফুজিশৃঙ্গ মাঝে-মাঝে উঁকি মারিতেছে। জুলাইমাসে ফুজি-পর্ব্বত ইহা অপেক্ষা বেশী দেখা যায় না। তবে এখান হইতে ৫।৭ মাইল গেলে, ফুজির পাদদেশে উপস্থিত হওয়া যায়। প্রতিবৎসর সাত-আট হাজার লোক এই পথে ফুজি-পর্ব্বতে আরোহন করে।"

শ্বেত মেঘপুঞ্জের ভিতর কৃষ্ণাভ মোচাগ্র-সদৃশ তরুহীন পর্ব্বত শৃঙ্গ দেখিতে পাইলাম—কয়েক মিনিটের মধ্যে উহা অদৃশ্য হইয়া গেল। ফুজি-পর্ব্বতমালার উপত্যকাগুলি স্তরে স্তরে প্রান্তরের দিকে নামিয়াছে। বহুমাইলব্যাপী পর্ব্বত-তরঙ্গের শোভা গাড়ীতে বসিয়া দেখা গেল। ফুজি-শৃঙ্গ ১২৩০০ ফিট উচ্চ।

জাপানী উপকথায় ফুজিয়ামার গল্প সুপ্রসিদ্ধ। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে, না কি, একদিন রাত্রিকালে হঠাৎ এই পর্ব্বতের উত্থান হয়; সেই সঙ্গে পর্ব্বতের দক্ষিণদিকে এক প্রকাণ্ড গর্ত্ত সৃষ্ট হয়। গর্ত্তের ভিতর জল প্রবেশ করে। আজ তাহা বিয়া-হ্রদ নামে পরিচিত।

ফুজি-পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, অন্যান্য দেবদেবীগণের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া, এই শৃঙ্গে তাঁহার বসতি স্থাপন করেন। তিনি নারীজাতির উপর বড়ই নারাজ—এইজন্য, না কি, স্ত্রীলোকেরা এই পাহাড়ে উঠে না। কিন্তু সহস্র-সহস্র যাত্রী প্রতিবৎসর পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া সূর্য্যের স্তব করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, আজকালকার পাশ্চাত্য টুরিষ্টগণও, সময় থাকিলে, একবার "Ascent of Fujiyama," বা "ফুজি-আরোহণ-পালা, সমাধা করিয়া থাকেন।

রেলপথের ধারে—কোথাও চা-বাগান, কোথাও কমলা-লেবুর বাগান, কোথাও বা পদ্মের পুষ্করিণী দেখিতেছি। সুবিস্তৃত পদ্মফুলের আবাদ, পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।

দুইটা বড় সহর চোখে পড়িল—একটার নাম শিজুকা; ষ্টেশন হইতেই ইহার সমৃদ্ধি বুঝিতে পারা যায়। অপর সহরের নাম নাগোয়া। এই নগর নব্যজাপানের এক শিল্প-কেন্দ্র। হোক্কাইদোর পথে সেন্ডাই-নগর যেরূপ, তোকাইদোর পথে নাগোয়া-নগর সেইরূপ। বিশেষভাবে পোর্‌সিলেন্‌ বা চীনামাটীর কাজের জন্য নাগোয়া বিখ্যাত। তোকুগাওয়া বংশীয় প্রথম শোগুণ—ইয়ে-যসু এই নগরে একটা দুর্গনির্ম্মাণ করেন। সেই দুর্গ একটা দেখিবার জিনিষ। বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য রণ-বিদ্যায় সুপণ্ডিত সৈনিকগণ এই দুর্গেই বাস করিতেছে।

খানিকদূর অগ্রসর হইবার পর, প্রদর্শক বলিলেন—"এই স্থানের নাম সেকিগাহারা; এইখানে এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। তাহাতে ইয়ে-যসু,

অন্যান্য দাইমোদিগকে পরাস্ত করিয়া, নিজের বংশের শোগুনী নিষ্কণ্টক করেন।" তাহার পর হইতে তোকুগাওয়া-যুগের সূত্রপাত; সেই সঙ্গে-সঙ্গে প্রাচীন গৃহবিবাদ ও অশান্তির পরিবর্ত্তে সুদৃঢ় শাসন ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য এবং শান্তির আবির্ভাব হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই যুদ্ধ ঘটে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই ডাহিন দিকে বিয়া-হ্রদের শেষসীমা দেখিতে পাইলাম। হ্রদের অপর পারে উচ্চপর্ব্বত—প্রাচীরের মত দেখাইতেছে। এই স্থান হইতে হ্রদের দৈর্ঘ্য ৭০ মাইল।

অন্ধকার বাড়িবার সঙ্গে-সঙ্গে বনজঙ্গলের নিবিড়তা বেশী লক্ষ্য করিলাম। পর্ব্বতদৃশ্য, পাইনকুঞ্জ, কচি সরু বাঁশের ঝাড়, অত্যুচ্চ ঝোপের সারি ইত্যাদি এক্ষণে দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছে। ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য গলির ভিতর দিয়া রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। চারিদিকে পাহাড় ও উদ্ভিদের শোভা বিরাজমান।

তোকিও হইতে সাড়ে-তিনশত মাইল আসা গেল; সময় লাগিল ১১ ঘণ্টা। মধ্যযুগে তোকিও হইতে কিয়োতো পৌঁছিতে ১১।১২ দিন লাগিত। প্রদর্শক বলিলেন—"তোকিও হইতে নামিয়া, নাগোয়া পর্য্যন্ত রেলপথ পুরাতন রাস্তার উপরেই নির্ম্মিত। নাগোয়ার পর, কিয়োতো পর্য্যন্ত, দাইমোরা যে পথ ব্যবহার করিতেন, রেল-কোম্পানী আগাগোড়া সেই পথ গ্রহণ করেন নাই।" শুনিলাম, ৫৩ টা চটি বা সরাই পার হইয়া পূর্ব্বেকার লোকেরা কিয়োতো হইতে তোকিও আসিত। অনেকের মুখে এই সকল চটির ধারাবাহিক নাম শুনিতে পাওয়া যায়।

কিয়োতো-ষ্টেশনে একজন উচ্চশিক্ষিত জাপানী আসিয়া দেখা করিলেন। ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, রুষিয়া, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া ইত্যাদি

দেশ ইঁহার দেখা আছে। চিত্রকলা, বাস্তুশিল্প এবং স্থাপত্য সম্বন্ধে আলোচনা করা ইঁহার কার্য্য। ওয়াকার প্রসিদ্ধ দৈনিক "আসাহি" পত্রে ইঁহার রচনা প্রকাশিত হইয়া থাকে। ভারতীয় সুকুমারশিল্প-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য এই ব্যক্তি ভারতবর্ষে যাইতে চাহেন।

'ট্যাক্সি'তে হোটেলে পৌছিলাম। রাস্তাগুলি অতিশয় প্রশস্ত। আজ জাপানে "উল্টারথের" শোভাযাত্রা। রাস্তায় লোকের ভিড় দেখিতে পাইলাম—কোলাহল ভারতবাসীর সুপরিচিত। সাধারণতঃ, তড়িতের বাতিতে সহর রোজই গুলজার থাকে; তাহার উপর আজ কাগজের চীনা-লণ্ঠন গৃহে-গৃহে ঝুলিতেছে। ট্রামগাড়ী-গুলিতেও "দেওয়ালী" উৎসবে, বিশেষ-আলোকমালা সাজান হইয়াছে।

হোটেল একটা পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত। কিয়োতোনগর চারিদিকে পর্ব্বত-প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত। কাজেই, হোটেলের গৃহে বসিয়া সমস্ত নগরটাকে সমতল পার্ব্বত্য গর্ত্তের ভিতর সন্নিবিষ্ট দেখিতেছি। হোটেলের পাদদেশ হইতে উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব্ব-পশ্চিম পর্ব্বত-প্রাচীরের পাদদেশ পর্য্যন্ত গৃহাবলীর খোলার ছাদগুলি সবই আমার নিম্নে শয়াণ রহিয়াছে; —যেন মনুমেণ্টে দাঁড়াইয়া গোটা-সহর দেখিতেছি!

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া রিক্সতে নৈশ-কিয়োতো দেখিতে বাহির হইলাম। "আষাঢ় মাসে রথযাত্রা লোকের হুড়াহুড়ি।"—আজ রাত্রে জাপানী সহরেও হুড়াহুড়ি দেখা গেল। গতসপ্তাহে একটা মন্দির হইতে অন্তমন্দিরে কয়েকটা চালি বা মন্দির স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। আজ সেইগুলি পুনরায় যথাস্থানে লইয়া যাওয়া হইতেছে। আমাদের দেশে দশহরায় বা অন্ত পূজার ভাসানের দিন ঘাড়ে করিয়া প্রতিমা
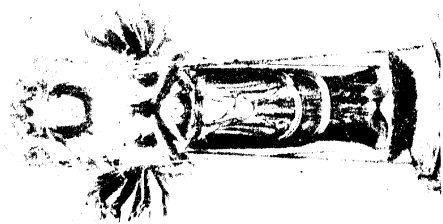
৬৩। কোয়ান্নন দেবী

৬৪। বৌদ্ধ ধর্ম্মে রুদ্রদেব

India Press, Calcutta.

লইয়া যাওয়া হয়; জাপানীরাও এই মন্দিরগুলি ঘাড়ে বহিয়া লইয়া চলিয়াছে—দড়ির সাহায্যে রথটানিবার রীতিও আছে। পঞ্জাব ও যুক্ত-প্রদেশের "রামলীলা" এবং "ভারতবিলাপ" এবং মুসলমানের "মহরম" ইত্যাদি অনুষ্ঠান, আর এই জাপানী শোভাযাত্রা—সবই এক এশিয়ার সামগ্রী।

চিত্রকলা ও স্থাপত্যশিল্প

কিয়োতো-সহরটা একটা সুবিস্তৃত বাগানের মত। ঘরগুলি যেন এক-এক বিরাট্ প্রমোদকাননের কুঞ্জগৃহ। ঊর্দ্ধে সূর্য্যতপ্ত নীল আকাশ, চারিদিকে উচ্চ-উচ্চ পর্ব্বত-প্রাচীর, সমতলভূমির উপর সবুজ তৃণপত্রের আস্তরণ। উদ্যান-তরুর ফাঁকে-ফাঁকে কৃষ্ণাভ খোলার ছাদগুলি যেন তাহাদের অনুচ্চ মাথা তুলিয়া উঁকি দিতেছে। গৃহসমূহ—মানুষের তৈয়ারি কৃত্রিম পদার্থ বোধ হয় না। প্রকৃতির সাধারণ আবেষ্টনের মধ্যে লোকাবাসসমূহ খুব খাপ খাইয়াছে। জাপানী বাস্তুশিল্পের ইহাই একটা বিশেষত্ব। মানুষের গড়া ঘরবাড়ীর সঙ্গে প্রকৃতির সামঞ্জস্য জাপানের প্রত্যেক পল্লীতেই লক্ষ্য করিয়াছি। বস্তুতঃ, প্রত্যেক দেশের নিজস্ব বাস্তুশিল্প, তাহার প্রাকৃতিক আবেষ্টনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই গড়িয়া উঠে। কিয়োতো সহরের গৃহ-সমাবেশ এবং গৃহনির্ম্মাণ-রীতি স্থানীয় প্রকৃতির সম্পূর্ণ উপযোগী। সহরটা দেখিলেই চোখ জুড়াইয়া যায়। তোকিওর গিঞ্জা-পাড়ায় এবং সরকারী ভবনসমূহে আজকালকার পাশ্চাত্য সৌধনির্ম্মাণ-রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। এগুলি জাপানের আবহাওয়ায় এবং প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক আবেষ্টনের মধ্যে খাপ খায় নাই। কিন্তু কিয়োতোতে এখনও পাশ্চাত্য বাস্তুরীতির আক্রমণ দেখিতেছি না। কিয়োতো আজও জাপানের খাঁটি স্বদেশী।

যদি কোন চিত্রকর কাগজ বা ক্যাম্বিশের উপর একখানা আদর্শ-পল্লী বা নগরের নক্সা করিতে বসেন, তাহা হইলে তিনি প্রকৃত কিয়োতো-নগরের উদ্যান-পরম্পরা ও গৃহশ্রেণীর সামঞ্জস্য ছাড়াইয়া

উঠিতে পারিবেন কি না, সন্দেহ! কিয়োতো-সহরটা একখানা কল্পনা-প্রসূত ছবির মতই মনে হইতেছে। কিয়োতো দেখিয়া শিল্পীর কল্পনা পুষ্ট হইতে পারে; কিন্তু কল্পনাদ্বারা কিয়োতো অতিক্রম করা সুকঠিন।

প্রকৃতির এই রম্যস্থানে সৌন্দর্য্যসেবক নরপতিগণ প্রায় একহাজার বৎসরপূর্ব্বে এক নগরী স্থাপন করিয়া ছিলেন। সেই নগরী য়ুরোপীয় রোমনগরীর মত অমর হইয়া রহিয়াছে। ভারতীয় হস্তীনাপুর-দিল্লী হিন্দু-মুসলমানের চিত্তে যে স্থান অধিকার করে, জাপানীর মানসক্ষেত্রে কিয়োতো-নগরীর স্থানও সেইরূপ। কত দাইমো, জমিদার, শোগুনবংশের উত্থান-পতন সাধিত হইয়া গিয়াছে, কত গৃহবিবাদ ও ঘরোয়া-সংগ্রাম ঘটিয়াছে, কিন্তু মিকাডো সম্রাটগণ এই কিয়োতো-সহরের প্রাসাদে জীবনযাপন করিয়াছেন। এই মহানগরীই জাপানী ইতিহাসের ধারাবাহিকতা ও পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়াছে; এইজন্যই এখনও রাজকীয় উৎসবসমূহ কিয়োতোতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। পর-লোকগত মিকাডোর রাজ্যাভিষেক এই নগরেই হইয়াছিল; বর্ত্তমান যুবক সম্রাটের রাজ্যাভিষেকও এই মহানগরীতেই অনুষ্ঠিত হইবে। জাপানী সমাজের সনাতন প্রথা-অনুসারে এই রাজ্যাভিষেকপর্ব্বের জন্য আয়োজন চলিতেছে। নবীনতম ইয়োরামেরিকার শিল্প-বিজ্ঞানে অধিকারী হইয়াও, জাপানীরা প্রাচীন রীতি ভুলিল না। জাপান এশিয়াকে ভুলিতে চাহে না—প্রাচীনকে প্রত্যাখ্যান করিবে না। বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্য লোকজন জাপানীদের এইকাণ্ড দেখিয়া বেশ একটুকু বিস্মিত হইতেছেন। কারণ, তাঁহাদের ধারণা জন্মিয়াছিল যে, জাপান পুরাপুরী ইয়োরামেরিকার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু সকলেই ক্রমে-ক্রমে বুঝিতেছেন যে, জাপান এশিয়ার মমতা কোন দিনই ছাড়িবেন না।

রাস্তায় দেখিতেছি, প্রত্যেক গৃহের মাদুর, চাটাই, কার্পেট ইত্যাদি রৌদ্রে শুকান হইতেছে। ঘর-বাড়ী পরিষ্কার করিবার ধূম পড়িয়াছে। প্রদর্শক বলিলেন, "জাপানী মিউনিসিপ্যালিটির নিয়মে, বৎসরে দুইবার করিয়া প্রত্যেক পরিবার ঘরের আসবাব আগাগোড়া ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিতে বাধ্য। এই বৎসর সহরে রাজ্যাভিষেক ব্যাপার, কেবল গবর্মেণ্টের আড়ম্বর মাত্র নয়, ইহা একটা জাতীয় যজ্ঞবিশেষ। দেশের প্রত্যেক নরনারীই সেই মহানুষ্ঠানে অংশীদারভাবে গৌরব অনুভব করে।" এই হিসাবে, বিলাতী রাজ্যাভিষেকে আর জার্ম্মাণ রাজ্যাভিষেকে, এবং জাপানী রাজ্যাভিষেকে আর রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকে কোন প্রভেদ নাই!

তোকিওর মিউজিয়ামে জাপানী সুকুমারশিল্পের সংগ্রহ বেশী দেখি নাই—কিয়োতোর সংগ্রহালয়ে অনেক দেখিলাম। জাপানী বন্ধুটি সঙ্গে আছেন; সম্মুখের গৃহে পুরাতন যুদ্ধসজ্জা, অস্ত্রশস্ত্র, শিরস্ত্রাণ ইত্যাদি দেখা গেল। বন্ধু বলিলেন—"এগুলি পারসীক রীতি অনুসারে গঠিত—জাপানে পারস্যের প্রভাবও আছে।" কোন-কোন আলমারিতে কাউণ্ট ওতানি-সংগৃহীত দ্রব্য রক্ষিত হইয়াছে। প্রাচীন হস্তলিপি, মাটির উপর চিত্রাঙ্কন, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দেবমূর্ত্তি ইত্যাদি তুর্কীস্থান হইতে আনীত। ভারতীয় দ্রব্যের সংগ্রহও কিছু আছে।

প্রাচীন চিত্রসমূহ যুগ-অনুসারে প্রদর্শিত হইয়াছে। জাপানী সভ্যতার প্রথমযুগ নারা-নগরে প্রকটিত হইয়াছিল। উহা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের কাল। নারা-নগর কিয়োতো হইতে অল্পদূরে অবস্থিত; খৃষ্টীয় সপ্তম হইতে নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত নারা-যুগ চলিয়াছে। নারা-যুগের চিত্রশিল্প এই সংগ্রহালয়ে নাই; ইহা, বস্তুতঃ, বাস্তুশিল্প এবং স্থাপত্যশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত হোজোবংশীয় দাইমোগণ শোগুণী করিতেন। তাঁহারা য়েডো-তোকিওর সমীপবর্ত্তী কামাকুরা-নগরে রাষ্ট্রকেন্দ্র প্রবর্ত্তন করেন। এই কামাকুরা-যুগেও ভাস্কর্য্য এবং খোদাই-শিল্পই জাপানে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু তোমা নামক একব্যক্তি চিত্রশিল্পে বিশেষ এক প্রণালী প্রবর্ত্তন করেন। আজও 'তোমা-রীতি' নামে উহা অবলম্বিত হইতেছে। রাজদরবারের নানাদৃশ্য ও ঘটনা, দাইমোদিগের জীবনযাত্রা এবং রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি তোমাচিত্রের আলোচিত বিষয় ছিল। কতকগুলি কাকেমনো দেখাইয়া বন্ধু বলিলেন—"এইগুলি-তোমারীতি-অনুসারে অঙ্কিত। এই সমুদয়ে রঙের বাহার এবং অলঙ্কারের পারিপাট্য বেশী।" তোমা-রীতির অপর নাম—Yamato School, বা 'য়ামাতো-রীতি, ; অর্থাৎ, জাপানের স্বদেশী-শিল্পকায়দা। জাপানী সমাজের ঐতিহাসিক দৃশ্য বা ঘটনা লইয়া চিত্রাঙ্কন করিতে হইলে—এই পদ্ধতিই অবলম্বিত হইয়া থাকে। Stewart Dick, তাঁহার 'Arts and Crafts of Old Japan'-গ্রন্থে বলিতেছেন—

"The eleventh, twelfth and thirteenth centuries formed a period of great literary and artistic activity. Buddhism was then in the height of its power, and there is no greater period than this in the history of Japanese art, but of these old masters we know little more than names."

মিউজিয়মে প্রদর্শিত চিত্রসমূহের অনেকগুলিতে চিত্রকরের নাম দেখিতে পাইলাম না, কেবল যুগের নাম প্রদত্ত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে (১৩৩৪—১৫৭৫) আনিকানা-বংশীয় দাইমোরা প্রতিপত্তিলাভ করেন। তাঁহাদের রাষ্ট্রকেন্দ্র কিয়োতোতেই ছিল। এইযুগে চীনের প্রভাব জাপানী শিল্পে বিশেষভাবে দেখা যায়। জাপানী

চিত্রকরগণ, মিঙ্‌বংশীয় চীনারাজগণের আমলে, অনেকটা চীনাভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। এই যুগের প্রসিদ্ধ শিল্পীর নাম সে-শু। তাঁহার সম্বন্ধে একটা গল্প 'Arts and Crafts of Old Japan' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

"At the age of forty Sesshiu, satisfied that he had learned all he could from the artists of his native country, went to China to study under the masters there ; but to his surprise and discouragement he found none there who could teach him more than he already knew. Then, said he, 'Nature shall be my teacher ; I shall go to the woods, the mountains and the streams and learn from them.' "

সে-শুর চিত্রসম্পদ তোকিওর "কোকা"-পত্রে বিবৃত হইয়াছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য-অঙ্কনের ইনি পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

আশিকাগা-যুগে চীনা-প্রভাবের অপরএক পরিচয় আছে। এই সময়ে কানো-রীতি নামক শিল্পপদ্ধতি জাপানে প্রসিদ্ধ হয়। ইহার চরম পরিণতি দেখা গিয়াছে পরবর্ত্তী তোকুগাওয়া-যুগে। তোসা-রীতির ন্যায়, কানো-রীতিও জাপানী শিল্পসংসারে বিখ্যাত ; এই দ্বিতীয় রীতি অনুসারে চিত্রকরেরা রঙের ব্যবহার করিতেন না। চীনা হস্তলিপির প্রণালী অবলম্বন করিয়া শিল্পীরা শাদা জমিনের উপর কাল-আঁচড় ফেলিতেন। "On the Laws of Japanese Painting"-গ্রন্থে Bowie কানো-রীতি সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"It took Japan captive. It had a tremendous vogue and following, and has come down to the present day

through a succession of great painters. * * * The Kano-painters are remakable for the boldness and living strength of the brush strokes, as well as the brilliancy or sheen-shading of the *Sumi*. * * * The range of subjects of the Kano School was originally limited to classic Chinese scenery, treated with simplicity and refinement and to Chinese personages, sages and philosophers ; colour was used sparingly."

কানো-রীতি অবলম্বন করিয়া চীনা-শিল্পিগণ যখন সরলতার চরমসীমা দেখাইতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই, বাস্তু-শিল্পিগণ নিক্কো-পাহাড়ের সৌধ-নির্ম্মাণে অলঙ্কার-প্রিয়তার চূড়ান্ত কুরুচি প্রকটিত করিয়াছেন। একই তোকুগাওয়া-যুগে সুকুমার-শিল্পের দুই বিভাগে দুই রীতি দেখিতেছি!

স্থাপত্যশিল্পের প্রকোষ্ঠগুলিতে নারা-যুগের কোয়ান্নন দেবীর মূর্ত্তি দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। প্রস্তর বা ধাতুর মূর্ত্তি একটাও নাই—সবই কাষ্ঠময়। কোয়ান্নন—জাপানী-বৌদ্ধ ধর্ম্মের দেবতা—ইনি কৃপা-বিতরণ করেন। ভারতীয় বৌদ্ধগণ কোয়ান্ননের সেবক ছিলেন না।—জাপানী সমাজের সর্ব্বত্র এই মূর্ত্তি দেখিতে পাই। অমিতাভ বুদ্ধ এবং কোয়ান্নন এই দুই দেবতার মূর্ত্তি বহু বনজঙ্গলে, কৃষিক্ষেত্রে, পথপ্রান্তে এবং "পোড়ো" ভূমিতে দেখিয়াছি। আমরা বাঙ্গালাদেশের যেখানে-সেখানে আজকাল যেমন শিবলিঙ্গ অথবা কালীর স্থান দেখিতে পাই, জাপানের যেখানে সেখানে সেইরূপ "আমিদা" এবং "কোয়ান্নন" দেখিতে পাওয়া যায়।

কামাকুরা-যুগের অনেকগুলি সুবৃহৎ কাষ্ঠমূর্ত্তি একগৃহে সাজান রহিয়াছে। এইগুলির বেশভূষা, হস্তধৃতযন্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন। লিখিত বিবরণ পাঠ করিয়া বুঝা গেল, এইসমুদয় দেবতা কৃপা বা কোয়ান্নন-

দেবীর সাঙ্গোপাঙ্গ। এই গৃহে বিরাট্ ধ্যানীবুদ্ধের মূর্ত্তিও দেখিলাম।

কামাকুরা-যুগের বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলি দেখিতে অতি ভীষণ ও কদাকার। কিন্তু প্রত্যেকটার ভিতর জীবনী শক্তি আছে। কাষ্ঠশিল্পি-গণ, খোদাই-কার্য্যের মধ্যদিয়া তীব্র ও উগ্র স্বভাব ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন। মূর্ত্তিগুলিকে দৈত্যের মর্য্যাদা প্রদান করিতেই প্রবৃত্তি হয়। জাপানী বন্ধু বলিলেন—"মহাশয়, এই দেবতাসমূহের অঙ্গে লাবণ্য বিন্দু মাত্র নাই। কেন জানেন? কামাকুরা-যুগে জেন্ (Zen)-সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ প্রতাপান্বিত ছিলেন। তাঁহারা কঠোরতা এবং সংযম অত্যন্ত ভালবাসিতেন। কাজেই সৌন্দর্য্য তাঁহাদের আমলে দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। অধিকন্তু, মধ্যযুগে আমাদের দেশ সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহে ভরিয়াছিল। এইজন্য দেবতাগণ সকলেই যুদ্ধপ্রিয়।" বাস্তবিক পক্ষে, সুবৃহৎ ভীষণাকৃতি দৈত্যসদৃশ মূর্ত্তিগুলির সম্মুখীন হইলে Beauty of the terror ভিন্ন অন্য কোন সৌন্দর্য্য-উপলব্ধি করা যায় না।

কতকগুলি মুখোস সংগৃহীত রহিয়াছে। নারা-যুগের মুখোসগুলি ধর্ম্মবিষয়ক। বন্ধু বলিলেন—"এইগুলিতে ভারতীয় ধর্ম্মভাব পরিস্ফুট হইয়াছে; চোখ দেখিলেই ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু আশিকাগা শোগুনদিগের আমলে নো-নাটক প্রবর্ত্তিত হয়। সেই সঙ্গে অনেক প্রকার মুখোস প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সেইগুলি দেখিলেই বুঝা যায় যে, এই সমুদয় খানিকটা বিলাসের সামগ্রী।"

কতকগুলি রুদ্রমূর্ত্তিসম্বন্ধে Cram বলিতেছেন—"Consider the poise and dash of such a splendid, sinewy thing as the Incarnation of War, the spring and the sweep of the

body, the tensity of nerve, the howling savagery of the distorted face, or again the rigid alertness, the power concentrated and controlled. In all of these the bodies are fully articulated, the faces are unmistakably portraits, yet portraits that are more than the effigies of individuals, they are amalgamations of a race, manifestations of national character. Note also the superb armour. * * * These are great statues, all of them works of the highest art : nothing better was ever produced in Europe after the fall of Rome."

বিয়াহ্‌দে সান্ধ্যবিহার

রেলে আসিবার সময়ে, বিয়াহ্রদের সামান্ত অংশ দেখিতে পাইয়াছিলাম। এই হ্রদ প্রাচীন জাপানী সাহিত্যে ও শিল্পে সুপ্রসিদ্ধ। এখানকার আট প্রকার সৌন্দর্য্য, জাপানে প্রবাদরূপে প্রচলিত। জাপানীরা এই হ্রদের কোন অংশ হইতে শরৎকালের চাঁদ দেখিতে ভালবাসে, কোন স্থানে সান্ধ্যতুষার দেখিয়া মোহিত হয়, আরএক কোণে সূর্য্যাস্ত-গৌরব উপভোগ করিতে চাহে। হ্রদের উপকূলস্থিত কোন বৌদ্ধমন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি শুনিবার জন্ত এখানকার নরনারী লালায়িত হয়। পাল তুলিয়া মাঝিরা যখন অগণিত নৌকা চালায়, তখন হ্রদের দৃশ্য অতি মনোরম দেখায়। কোন সময়ে উজ্জ্বল নভোমণ্ডল, কখনও বা নৈশবৃষ্টি, বিয়াহ্রদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। আবার জলের উপর হংস-কেলিও যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক হয়, সন্দেহ নাই।

হোটেলের পাদদেশে ট্রামে বসিলাম। দুইধারে পাহাড় এবং পার্ব্বত্য জঙ্গল। মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ পথের ভিতর দিয়া গাড়ি চলিতেছে। অবশেষে ওৎসুনগরে পৌঁছিলাম। জাপানী পল্লীর গলি, কুটীর, মাছের দোকান, ফলের দোকান ইত্যাদি সবই দেখা গেল। কাঁচা মাছ, পোড়া মাছ, ভাজা মাছ ইত্যাদি সকলপ্রকার মাছ সাজান রহিয়াছে। জাপানে নাপিতের দোকানগুলি ইয়াঙ্কি কায়দায় তৈয়ারী; পল্লীতে, সহরে—সর্ব্বত্রই এই পার্ব্বত্য-রীতি লক্ষ্য করিতেছি।

ক্ষুদ্র ষ্টীমারে বসিলাম। হ্রদের ধারে বেড়াইবার রাস্তা। ষ্টীমার হইতে রাস্তার উপরকার কাষ্ঠগৃহ এবং পার্ক ও উদ্যানসমূহ বেশ সুন্দর দেখাই-

৬৫। বিয়াহ্রদ
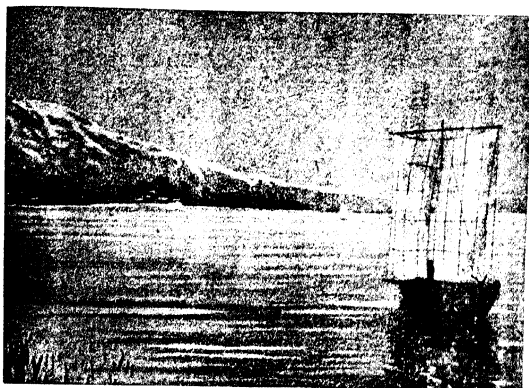
৬৬। বামদিকের মূর্ত্তিশ্রেণী

৬৭। পশ্চিম হোঙ্গাঞ্জি সম্প্রদায়ের মন্দির

৬৮। পূর্ব্ব হোঙ্গাঞ্জি সম্প্রদায়ের মন্দির

তেছে। এই সমুদয়ের পশ্চাতে উদ্ভিদ-শোভিত পাহাড় দাঁড়াইয়া আছে। পাহাড়ের অপর পার হইতে সন্ধ্যার সূর্য্য মেঘের ভিতর দিয়া কোনমতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে—এদিকে হ্রদ একটা নিস্তব্ধ পুষ্করিণীর মত শান্ত-ভাবে শুইয়া আছে। হ্রদের চারিদিকে পর্ব্বত-প্রাচীর। মেঘশূন্য আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ ভাসিবার আয়োজন করিতেছে—রাত্রি সুরু হইলেই সমগ্র আবেষ্টনের উপর চন্দ্রমার একাধিপত্য স্থাপিত হইবে।

অল্পদূর পরে-পরেই এক-একটা ষ্টেশন দেখিতে পাইলাম। কয়েক মিনিট পরে-পরেই এক-একখান ষ্টীমার যাওয়া আসা করিতেছে। জেলের ডিঙ্গি, প্রমোদ-তরণী ইত্যাদির সংখ্যাও কম নয়। ঘাটের কিনারায় জেলেরা মাছ ধরিবার আয়োজন করিয়াছে। কঞ্চির বেড়া তৈয়ারি করিয়া ইহারা মাছের ক্ষেত প্রস্তুত করিয়াছে। বেড়ার ভিতর মাছ একবার প্রবেশ করিলে আর বাহির হইতে পারে না।

খানিক পরে, একটা কাষ্ঠসেতু পার হইলাম। এইখানে একটা সঙ্কীর্ণ নদীর ভিতর আসিয়া পড়িয়াছি। সেতুর একদিক তাড়িতের বাতি দিয়া সাজান রহিয়াছে। নদীর দুইধারে বাগান দেখিতেছি। অবশেষে, যেখানে নামিলাম, সেখানে অতি নিবিড় পাইন-কুঞ্জ—উচ্চ পাহাড়ের শিরোভাগ হইতে পাদদেশপর্য্যন্ত নামিয়াছে। বৃক্ষরাজির আভায় নদীর জল ঘোরতর সবুজবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই স্থানের এক মন্দিরে, না কি, দশমশতাব্দীর স্ত্রী-ঔপন্যাসিক কমুরাসাকি শিকিবুর কলম ও দোয়াত রক্ষিত হইতেছে। ইনি "গেঞ্জি মনো গাতারি"-নামক প্রসিদ্ধ গল্পগ্রন্থের লেখক। ফুজিপর্ব্বতের মত, বিয়াহ্রদও জাপানী চিত্রকরগণের কারুকার্য্যে বিশেষস্থান পাইয়াছে। কাকেমনোতে, পর্দ্দায় এবং হাতপাখায় এই স্থানের অষ্টবিধ গৌরব চিত্রিত দেখিতে পাওয়া যায়।

বিয়াহ্রদ হইতে খালকাটিয়া কিয়োতো-সহরের ভিতর আনা হই-

য়াছে। এই জন্য পাহাড়ের ভিতর সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। এই কাজ কিয়োতোর একটা দেখিবার জিনিষ। খালের দ্বারা এই নগরের কামোনদীর সঙ্গে বিয়াহ্রদ সংযুক্ত হইতে পারিয়াছে। খালের উচ্চতম অংশ হইতে জলপ্রপাত হয়। প্রপাতের শক্তি ব্যবহার করিবার জন্য জাপানী ইঞ্জিনিয়ারেরা বিশেষব্যবস্থা করিয়াছেন। কিয়োতোর কারখানা-গুলিতে এই প্রপাতে প্রস্তুত তাড়িতের শক্তিগ্রহণ করা হয়। শুনিলাম, তোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্র এই খাল-কাটিবার প্রণালীসম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিল। পরে, তাহারই কর্ত্তৃত্বে এইখাল কাটা হইয়াছে।

বৌদ্ধ মন্দির

জাপানে প্রাসাদ, মন্দির, সাধারণগৃহ—সকলই কাষ্ঠনির্ম্মিত। কাঠে আগুন-লাগা অতি সহজ; প্রায় প্রত্যেক গৃহই, একবার অথবা একাধিক বার, ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। এই কারণে সুপ্রাচীন গৃহ আজ কাল দেখা যায় না।

দ্বাদশ শতাব্দীর স্থাপিত একটা মন্দির দেখিলাম। ইহার ভিতর ৩৩৩৩৩ কোয়ান্নমূর্ত্তি আছে, বলিয়া জনশ্রুতি। প্রকৃত প্রস্তাবে ১০০১ মূর্ত্তি বিরাজমান। কৃপাদেবীর মুখ এগারটা এবং হস্তসংখ্যা ১০০০।

সুদীর্ঘ কাষ্ঠমন্দিরের মধ্যভাগে বৃহদাকার দেবীমূর্ত্তি—কাঠের প্রতিমায় সোনালি রং করা। এইরূপ মূর্ত্তি ডাহিনে ও বামে সারি সারি অনেকগুলি সাজান। প্রত্যেকের দাঁড়াইবার রীতি এবং হস্তধৃত যন্ত্র কিছু স্বতন্ত্র। মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে কোয়ান্নের সাঙ্গোপাঙ্গোদিগের মূর্ত্তি বিরাজমান—গৃহটা দেখিয়া মন্দিরের দৃশ্য মনে পড়িল না। ভাবিলাম, যেন একটা মূর্ত্তির মালগুদামে উপস্থিত হইয়াছি!

বৌদ্ধ মন্দিরের সম্মুখে একটা পদ্মের পুকুর, তাহার ধারে একটা চটি। এইখানে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, হোঙ্গাঞ্জ-মন্দিরদ্বয় দেখিতে অগ্রসর হইলাম। বৌদ্ধধর্ম্মের হোঙ্গাঞ্জি-সম্প্রদায় দুই ভাগে বিভক্ত—পূর্ব্ব ও পশ্চিম।

প্রথমে পশ্চিম-শাখার সৌধসমূহ দেখা গেল। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কাউন্ট ওতানি এইশাখার বর্ত্তমান কর্ত্তা। অন্যান্য সৌধের ন্যায়, এই গৃহাবলীও কয়েকবার পুড়িয়া গিয়াছিল—বর্ত্তমান গৃহসমূহ সে-দিনকার তৈয়ারি।

আশিকাগা ও তোকুগাওয়া যুগের মধ্যে হিদেয়শি শোগুনের প্রবল প্রতাপ ছিল। তাঁহার আদেশে এই মন্দির প্রথম স্থাপিত হয়। এক্ষণে হিদেয়শির প্রাসাদ হইতে বহুদ্রব্য এখানকার সৌধে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। নিক্কোর সৌধ-অপেক্ষা পশ্চিম-হোঙ্গাঞ্জি-সম্প্রদায়ের গৃহসমূহ অধিকতর সুন্দর দেখিতেছি। এখানকার কাঠের খোদাই, সোনালী কাজ, ল্যাকর-শিল্প, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি উচ্চতর রুচির পরিচায়ক—প্রাচীরের পর্দ্দায় এবং ভিতরকার ছাদে যথার্থ সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচয় পাইলাম। হোঙ্গাঞ্জিতে প্রকৃত কেক্কো দেখিতেছি—নিক্কোতে দেখি নাই।

গৃহগুলিতে প্রধান পুরোহিত এবং অন্যান্য পুরোহিতগণের বাসস্থান প্রদত্ত হয়। কয়েকটা গো-মণ্ডপও রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত দুইটা বড়মন্দির দেখিতে পাইলাম—একটাতে আসিদা বুদ্ধের মূর্ত্তি, অপরটাতে একজন বৌদ্ধসাধুর মূর্ত্তি। মন্দিরের ভিতরে বৌদ্ধপূজার সকল সরঞ্জামই আছে—প্রতিমাপূজার কোন অনুষ্ঠান বাদ যায় নাই। মন্দিরদ্বয় কাষ্ঠ-শিল্পের বিরাট্ নিদর্শন। মিশরের লুক্সরকার্ণাকে প্রস্তর-শিল্পের গৌরব উপলব্ধি করিয়াছি ; হোঙ্গাঞ্জি-মন্দিরেও অপূর্ব্ব বাস্তুশিল্পের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইতেছি।

পূর্ব্ব-হোঙ্গাঞ্জি-সম্প্রদায়ের সৌধে এবং মন্দিরদ্বয়েও এই শ্রেণীর কারু-কার্য্য, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি দেখিতে পাইলাম। এই সকল গৃহনির্ম্মাণে ধনী-নির্ধন, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সাধ্যমত সাহায্য করিয়াছে—কেহ ধনদান করিয়াছে, কেহ শারীরিক পরিশ্রম দান করিয়াছে। অনেক দরিদ্র রমণী নিজেদের চুল কাটিয়া প্রকাণ্ড দড়ি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। প্রায় ৩০০ ফিট লম্বা চুলের দড়ি ৫২ টা পাওয়া গিয়াছিল। এই গুলির সাহায্যে বড় বড় কাঠ টানিয়া তোলা হইত। বৌদ্ধধর্ম্ম এখনও জীবিত আছে বলিয়াই, জনসাধারণের সমবেত সাহায্যে এই সকল বিরাট্ সৌধ নির্ম্মিত

হইতেছে। মন্দিরের এক প্রকোষ্ঠে একজন প্রচারক "কথা" বলিতেছেন; শ্রোতৃমণ্ডলী স্থিরভাবে বসিয়া শুনিতেছে।

কাশী, মথুরা ইত্যাদি সহরের অলিতে-গলিতে মন্দির দেখিতে পাই। কিয়োতোতেও তাহাই দেখিতেছি। বৌদ্ধমতাবলম্বী বিভিন্নসম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক মন্দির, মঠ এবং স্মৃতিস্তম্ভ—জাপানের এই দিল্লীনগরে রহিয়াছে। কিয়োতো জাপানী বৌদ্ধজীবনের বিরাট্ কেন্দ্র।

বলা বাহুল্য, মধ্যযুগের সকল মন্দিরই একাধারে ধর্ম্মকেন্দ্র, শিক্ষাকেন্দ্র, শিল্পকেন্দ্র ও সমাজকেন্দ্র ছিল। বর্ত্তমান যুগে মন্দিরাদির গৌরব দুনিয়ার কোথাও নাই—জাপানেও দেখিতে পাইলাম না। বিদেশীয় পর্য্যটকেরা, অথবা স্বদেশী পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ, এইসকল মন্দিরের বাস্তুশিল্প, নির্ম্মাণকাল ইত্যাদি মাত্র আলোচনা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে যেখানে সহস্র সহস্র লোকের অহরহঃ গতিবিধি হইত, আজ সেখানে দুই একজন antiquarian —archæologist এবং globe-trotter-এর পদধ্বনিমাত্র শুনিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানযুগের মানবজীবন অন্যান্য ধারায় প্রবাহিত হইতেছে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর একটা মন্দির দেখিলাম। উহা বৌদ্ধসাধু এনুকো-কর্ত্তৃক স্থাপিত। ইনি জোদো-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ছিলেন। সেই সম্প্রদায়ের জন্যই কিয়োতোতে এই সকল গৃহ রচিত হইয়াছে। একাধিক-বার সৌধগুলি আগুনে পুড়িয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমানে আমরা তোকুগাওয়া-যুগের পুনর্গঠন দেখিতেছি। একটা মন্দির ৪।৫ বৎসর মাত্র হইল পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে বিরাট্ সোণালি বুদ্ধমূর্ত্তি আছে।

মন্দিরসমূহ এক উচ্চ পাহাড়ের গায়ে সমাবেশিত। যে ফটক পার হইয়া এইসকল গৃহে আসিতে হয়, তাহা বাস্তুশিল্পহিসাবে উচ্চশ্রেণীর অন্তর্গত। জোদো-সম্প্রদায়ের এইসকল সৌধ—প্রত্যেকটা গঠনগরিমায়,

উচ্চতায়, দীর্ঘ্যে এবং আয়তনে ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতেছে। পার্শ্বস্থিত পর্ব্বতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া শিল্পীরা এইসকল বিরাট্ মন্দির-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গৃহসমূহের অভ্যন্তরে বহুসংখ্যক প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পের নিদর্শন সংগৃহীত রহিয়াছে। দেখিলে মনে হয়, যেন ইহা একটা চিত্রশালা বা আর্ট গ্যালারি—তোকুগাওয়া-যুগের "কানো"-পদ্ধতি এই চিত্র-শিল্পে সবিশেষ প্রকটিত। সারস, পাইন, ক্রিশেন্থিমম্, শুভ্র তুষার, বাঁশ, চড়ুই ইত্যাদি নানাপদার্থের চিত্র পুরোহিত-গৃহের প্রকোষ্ঠে-প্রকোষ্ঠে দেখিলাম। একস্থানে জোদো এন্‌কো'র মূর্ত্তি দেখা গেল।

জাপানী বৌদ্ধমন্দিরের কোথাও দৈন্য বা ক্ষুদ্রত্ব, দেখিলাম না। প্রাচীন মিশরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া যে বিপুলতা ও প্রাচুর্য্যের পরিচয় পাই, মধ্যযুগের জাপানীরাও সেই বিপুলতা ও প্রাচুর্য্যের গৌরব উপলব্ধি করিয়াছিল।

জাপানী বৌদ্ধমন্দিরের আবেষ্টনে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত অঙ্গগুলি লক্ষ্য করিয়াছি—

(১) দ্বিতল ফটক;
(২) ঘণ্টা-গৃহ;
(৩) প্রধান মন্দির;
(৪) সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক সাধু বা ধর্ম্মপ্রচারকের গৃহ;
(৫) প্যাগোডা বা স্মৃতিস্তম্ভ বা প্রবর্ত্তকের সমাধি;
(৬) গ্রন্থশালা;
(৭) পুরোহিত-গৃহ;
(৮) চৌবাচ্চা এবং প্রস্তরদীপ;
(৯) সাধারণ কাজকর্ম্ম চালাইবার জন্য ঘর—রন্ধনশালা ইত্যাদি।
(১০) চাকীর ঘর।

একটা মন্দিরে বিরাট্ বুদ্ধমূর্তি অবস্থিত; ইহার নাম দাইবুৎসু— 'দাই' শব্দের অর্থ "মহা" এবং 'বুৎসু' শব্দ "বুদ্ধ" শব্দের জাপানী রূপ। এই মন্দিরে কোয়ানদেবীর বহুচিত্র সংগৃহীত রহিয়াছে। দাইবুৎসুর মস্তক, কণ্ঠ এবং বক্ষস্থল মাত্র আছে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে হিদেয়শি এই "বস্তু" নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

জাপানী বাগান

বয়োবৃদ্ধ "গেন্‌রো" কাউণ্ট ওকুমার সঙ্গে আলাপ করা যেমন পর্য্যটক মাত্রেরই একটা সখ, সেইরূপ তাঁহার ওয়াসেদা-ভবনের বাগান দেখিতে আসাও বিদেশীয় 'টুরিষ্ট'দিগের একটা কার্য্যবিশেষ। শিবাপার্ক, উয়েনো-পার্ক ইত্যাদি বড় বড় সরকারী উদ্যানের পরেই ওকুমার বাগান তোকিওতে প্রসিদ্ধ। জাপানের প্রত্যেক ধনীগৃহেই একটা করিয়া ছোট, বড় বা মাঝারি বাগান আছে। কাকেমনো, কিয়োমনো ইত্যাদির ন্যায়, বাগানও জাপানী জীবনের একটা বিশেষত্ব।

উদ্যান-রচনা জাপানে একটা কলা-বিশেষ—সুকুমার শিল্পের অন্তর্গত। কাকেমনোর উপর চিত্রকরগণ যে বিদ্যার পরিচয় দেন, ভূমির উপর উদ্যান-রচয়িতারা সেই বিদ্যারই পরিচয় দিয়া থাকেন। বস্তুতঃ জাপানের বাগানগুলি দেখিলে চিত্রাঙ্কনের সৌষ্ঠব, সামঞ্জস্য এবং নৈপুণ্যই চোখে পড়ে। মনে হয়—যেন চিত্রশিল্পীরা গাছ, লতাপাতা, পাথর-সুরকি, খাল-ঢিপি, ভিটা ইত্যাদির দ্বারা মাটির উপর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। কাকেমনোর উপর অঙ্কন এবং বর্ণ-সমাবেশের যে যত্ন দেখিতে পাই, জাপানী উদ্যানসমূহেও ঠিক সেই ধরণের সাজান-গুছান দেখিতে পাই।

এইসকল বাগানে, ক্ষুদ্র-আয়তনের ভিতর বিরাট্ প্রকৃতির প্রতিকৃতি যথাসাধ্য সমাবেশিত করা হয়। নদী, ঝরণা, হ্রদ, পুষ্করিণী ইত্যাদি জলভাগ, বাগানের মধ্যে রাখিতেই হইবে। পাহাড়, উপত্যকা, পার্ব্বত্যপথ ইত্যাদিও একান্ত আবশ্যক। সকলপ্রকার উদ্ভিদ্ যত্নসহকারে যথাস্থানে রক্ষিত হইয়া থাকে। জাপানীরা বৃহদাকার তরুসমূহের বামনরূপ প্রস্তুত

৩২৪ পৃষ্ঠ

৭৪। কোয়ান্নন দেবীর বিরাট মূর্ত্তি

৭৬। নৌকাকৃতি 'পাইন' বৃক্ষ

৭৫। পিত্তলের ফিনিকস্ পক্ষী

করিতে বিশেষ পারদর্শী। প্রত্যেক বাগানে এইরূপ বামন-বৃক্ষ (dwarf trees) অনেক দেখিতে পাই। বাড়ীঘরের আসবাবের মধ্যেও বামন-বৃক্ষের সারি দেখিয়াছি।

অন্যান্য দেশের লোকেরা উদ্ভিদ্‌সমূহ জ্যামিতিক ক্ষেত্রের আকারে সাজাইয়া থাকে; কিন্তু জাপানীরা এইরূপ মাপজোক ভালবাসে না—তাহারা যথাসম্ভব প্রাকৃতিক সমাবেশই পছন্দ করে। বাগানে মানুষের হাত আছে, ইহা জানিতে না-দেওয়াই জাপানী উদ্যানশিল্পীদিগের লক্ষ্য।

কোন-কোন উদ্যানে প্যাগোডা-গৃহ নির্ম্মিত হয়—ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর উপর সেতু-নির্ম্মাণকরারদিকেও উদ্যান-রচয়িতাদিগের ঝোঁক থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রস্তর-দীপের সারি প্রায় সকল বাগানেই দেখা যায়।

জাপানী উদ্যান-সম্বন্ধে 'Impressions of Japanese Architecture'-গ্রন্থে Cram লিখিয়াছেন—

"A picture always, you must note : line, texture, form and colour, all are duly and delicately considerd, and a space of garden is composed with all the laborious study that goes to the making of a screen or kakemono."

উদ্যানরচনা-রীতি, অন্যান্য সকল শিল্পের ন্যায়, বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে-সঙ্গে জাপানে প্রবেশ করিয়াছিল। জাপানের সকল মন্দিরের আবেষ্টনেই এক-একটা সুন্দর উদ্যান। বৌদ্ধ পুরোহিতগণ জাপানের সর্ব্বপ্রথম উদ্যান-রচয়িতা ও মালী ছিলেন। ক্রমশঃ, সাধারণ গৃহের সঙ্গে, বাগান-তৈয়ারি করা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং এই বিদ্যাটা সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আশিকাগা-যুগে উদ্যানরচনা দাইমোদিগের একটা বিলাসে পরিণত হয়। চতুর্দ্দশ-পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে "ইকেবানা" বা "পুষ্পশৃঙ্গার," "নো-নাটক", "চা-নউ" বা চা-মজলিস ইত্যাদি নানাপ্রকার কলাবিদ্যার

সঙ্গে, উদ্যান-রচনাও সমাজের ভিতর স্থায়ীঘর করিয়া বসে। বস্তুতঃ, বর্ত্তমানকালে জাপানে যেসকল আদব-কায়দা, রীতিনীতি, সৌজন্য-শিষ্টাচার ইত্যাদি দেখিতেছি, সেগুলি সবই আশিকাগা-শোগুণদিগের আমলে এদেশে বদ্ধমূল হইয়াছে। একটা বিশেষকথা এই যে, এই যুগেই চিত্র-শিল্পী সে-শু তাঁহার প্রাকৃতিক দৃশ্যবিষয়ক চিত্রসমূহ অঙ্কন করিয়াছিলেন। Landscape gardening-এর যুগে landscape artist-এর প্রাদুর্ভাব—স্বাভাবিক নহে কি?

আশিকাগা-যুগের একটা বাগান দেখিবার জন্য সহর ছাড়াইয়া বহুদূরে যাইতে হইল। কুমড়ার ক্ষেত এবং বাঁশের ঝোপের ভিতর দিয়া 'রিকশ' চলিল। বাগানের ভিতর কতকগুলি গৃহে প্রাচীন চিত্র দেখিতে পাইলাম। বিখ্যাত চিত্রকরগণের কার্য্য কাকেমনোতে অথবা কাগজের প্রাচীরে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। পাখী, উদ্ভিদ, চীনা দার্শনিক কন্‌ফিউশিয়াস্‌, বুদ্ধ, লেওজ্‌ ইত্যাদির চিত্র দেখা গেল। আশিকাগা-শোগুণদিগের হস্তলিপি এবং তাঁহাদের ব্যবহৃত কোন-কোন দ্রব্যও এইসকল প্রকোষ্ঠে প্রদর্শিত হয়।

জাপানের হোমর-কবি—শিতোসাবোর একটা কাষ্ঠমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। প্রদর্শক বলিলেন, ইহা প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। একটা পিত্তলের জিনিষ পক্ষী দেখা গেল। প্রদর্শক বলিলেন, "এই বাগানে একটা সোণার মন্দির বা 'কিঙ্কাকু' আছে। তাহার শিরোভাগে এই পাখীটি ছিল। ইহা ৫২০ বৎসরের পুরাতন।" এই সকল বস্তু দেখিতে দেখিতে বারান্দায় আসিলাম। একটা কিম্ভুত-কিমাকার পাইনগাছ দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি, এমন সময়ে বাগানের একব্যক্তি বলিলেন, "গাছটাকে নৌকার আকৃতি অনুসারে গড়িয়া তোলা হইয়াছে। নিম্নভাগের শাখা-প্রশাখাগুলিকে এই জন্য বিশেষরূপে নোয়াইয়া বাঁকাইয়া রাখা হইয়াছে। এই গাছটাও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর।"

৭৭। জাপানীবাগান—কিঙ্কাকু-ভবন

৭৮। বিলাসী শোগুণ—আশিকাগা যোশিমিৎসু

৩২৭ পৃষ্ঠা

৭৯। 'দোশিষা'-বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি—

শ্রীযুক্ত হারাদা

India Press, Calcutta.

এইসকল দেখিয়া, "কিঙ্কাকু"র নিকট আসিলাম। এই প্যাগোডা-ভবনের ভিতরকার ছাদ সোণালিবর্ণে রঞ্জিত। অমৃতসরের স্বর্ণমণ্ডিত শিখমন্দিরের সঙ্গে এই জাপানী Golden Pavilion-এর তুলনা করা চলে না। ঘরটা ত্রিতল—প্রথম ও দ্বিতীয় তলে বুদ্ধ, কোয়ান্নন ইত্যাদির মূর্ত্তি বিরাজিত। প্রথম তলে আশিকাগা যোশিমিৎসু সন্ন্যাসিবেশে উপবিষ্ট রহিয়াছেন—এইরূপ একটা কাষ্ঠমূর্ত্তি দেখিলাম। ইনিই এই প্যাগোডা এবং উদ্যান রচনা করাইয়াছিলেন (১৩৯৭ খৃঃ)।

কিঙ্কাকু একটা ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর ধারে অবস্থিত। ইহার বারান্দা হইতে বাগানটা বেশ সুন্দর দেখা যায়। শুনিলাম, এইখানে বসিয়া শোগুণেরা নাকি আকাশের চাঁদ দেখিতেন। এখান হইতে ঠিক সম্মুখে একটা পর্ব্বত দেখা যায়। প্রদর্শক বলিলেন, "একজন সম্রাটের আদেশ অনুসারে ঐ পাহাড়কে একবার গ্রীষ্মকালে রেশমাবৃত করা হইয়াছিল। শীতকালে বরফ পড়িয়া পাহাড়কে শুভ্রবর্ণ প্রদান করে—রেশমের শুভ্র-আবরণে পাহাড় গ্রীষ্মকালে শীতঋতুর কথা স্মরণ করাইয়া দিত—এইজন্যই মিকাডোর ঐরূপ আদেশ।" ভারতীয় নবাব ওয়াজেদ আলি সা ইত্যাদি এই ধরণের সৌখীন ছিলেন।

কিঙ্কাকু হইতে মুঠো-মুঠো গোধুম পুষ্করিণীর জলে ফেলিতে লাগিলাম। তৎক্ষণাৎ মহা উল্লাসের সহিত সহস্র-সহস্র নানাবর্ণশোভিত রুই, কাৎলা-ইত্যাদি মাছ সেইগুলি খাইতে আসিল। এই দৃশ্য অতি চমৎকার।

বাগানের একাংশে কয়েকটা ক্ষুদ্র গৃহ রহিয়াছে। তাহার ভিতর "চা-নউ" বা চা-মঙ্গল অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শকের সঙ্গে সেইঘরে প্রবেশ করিয়া আনুষ্ঠানিক চা তৈয়ারি দেখিলাম। চা গুঁড়াকরা হইতে বাটিতে ঢালিয়া পরিবেষণকরা পর্য্যন্ত—সকলকার্য্যসম্বন্ধেই বাঁধা-নিয়ম আছে। এমন কি, কোন্ ব্যক্তি কোথায় বসিয়া কিরূপভাবে চা-পান করিবে,

তাহারও নিয়ম আছে। এইসকল কার্য্যের জন্য বিশেষপ্রকার গৃহও নির্ম্মিত হয়। জাপানী ধনীগৃহে 'চা-নউ'র জন্য স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

কিস্কাকু ইত্যাদি ভবন এবং উদ্যানে আশিকাগা-শোগুণ অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছিলেন; নানাস্থান হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্র আনাইয়া তিনি তাঁহার প্রাসাদের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিতেন। কিস্কাকু-বাগানে যোশিমিৎসু কিরূপ বিলাসভোগ করিতেন, ক্যাপটেন্ ব্রিঙ্কলি-প্রণীত 'History of the Japanese People'-গ্রন্থ হইতে তাহার পরিচয় দিতেছি—

"Yoshimitsu prayed the Emperor to visit this unprecedentedly beautiful retreat and Go-Komatsu complied. During twenty days a perpetual round of pastimes was devised for the entertainment of the Sovereign and the Court nobles—couplet-composing, music, foot-ball, boating, dancing and feasting. All this was typical of the life Yoshimitsu led after his resignation of the Shogun's office. Pleasure-trips engrossed his attention—trips to Ise, to Yamato and so forth. He set the example of luxury, and it found followers on the part of all who aimed at being counted fashionable."

রেশমের কারবার

তোকিওতে 'নিশিমুরা কোম্পানী'র দোকানে রেশমের উপর নানা-প্রকার সেলাইকার্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এই সুকুমার-শিল্পের প্রধান কেন্দ্র কিয়োতো। এইখানে নিশিমুরা কোম্পানীর কারখানা এবং প্রধান আফিস অবস্থিত।

কেবল রেশম-শিল্প কেন, জাপানের সকলপ্রকার "স্বদেশী" শিল্পই কিয়োতোতে গড়িয়া উঠিয়াছে। একহাজার বৎসর ধরিয়া যে নগর দেশের রাজধানী ছিল, তাহার আশ্রয়ে—চিত্রকর হইতে মালাকর পর্য্যন্ত—সকল শিল্পীই সংরক্ষিত হইবার কথা। 'জাপানীর জাপান' বুঝিতে হইলে, এই কিয়োতোতেই আড্ডাগাড়া আবশ্যক।

কিয়োতোর অল্পদূরে নারা এবং ওসাকা। ওসাকার প্রাচীন নাম নামিয়া। এই তিন নগরের সঙ্গে প্রাচীন ও মধ্যযুগের জাপানী জীবনও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অক্সফোর্ডের 'ক্লারেণ্ডন প্রেস' হইতে 'A Hundred Verses from old Japan'-নামক একখানা পুস্তিকা বাহির হইয়াছে। ১২৩৫ খৃষ্টাব্দে একজন কবি, সপ্তমশতাব্দী হইতে তাঁহার সময় পর্য্যন্ত, জাপানী কবিগণের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র রচনা সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ক্লারেণ্ডন প্রেসের সেই সঙ্কলন, ইংরাজী অনুবাদসহ, প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিতর, কবিতাবলীর উপযুক্ত, প্রাচীন চিত্রও আছে। এই সকল প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক কবিতায় কিয়োতো, নারা এবং ওসাকার সমাজই চিত্রিত রহিয়াছে। একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে—

"Short as the joints of bamboo reeds
That grow beside the Sea
On pebble beach at Naniwa,
I hope the time may be,
When thou art away from me."

কিয়োতোর আব-হাওয়ায় না-আসিলে, জাপানীর জাপান সম্যক্ বুঝা যায় না। দশ-এগার বৎসর পূর্ব্বে একজন ইয়াঙ্কি রমণী জাপানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তখন রেলের প্রতাপ আজকালকার মত বেশী ছিল না। রিকশতে জাপান-ভ্রমণ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। বলা বাহুল্য, তখনকার কিয়োতো-সম্বন্ধে একথা বিশেষরূপেই প্রযোজ্য। তাঁহার 'Jin-rikisha-days'-গ্রন্থে দেখিতে পাই—

"Kioto remains the home of the arts, although no longer the seat of the government. For centuries it ministered to the luxury of the two courts, which gathered together and enlarged lists of artists and artisans, whose descendants, live and work in the old home. Kioto silks and crapes, Kioto fans, porcelains, bronzes, lacquer, * * and embroideries preserve their quality and fame and are dearer and better than any other."

বাস্তবিকপক্ষে, ভারতবর্ষের দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, মুর্শিদাবাদ ও ঢাকা যাহা —জাপানের কিয়োতোও তাহা। কলিকাতা দেখিলে স্বদেশী-ভারত বুঝা যায় না; সেইরূপ তোকিও-মাত্র দেখিলে স্বদেশী-জাপানের জীবনী-শক্তি ধরিতে পারা সুকঠিন।

'নিশিমুরা কোম্পানী'র কারখানাগুলিতে অনেকক্ষণ কাটাইলাম।

রেশমের উপর রং-লাগান এবং চিত্র-আঁকা দেখিয়া চিকণ ও সেলাই-শিল্প দেখিতে লাগিলাম। অল্পবয়স্ক যুবকগণ অতিশয় উচ্চ অঙ্গের কার্য্য করিতেছে। ইহারা সকলেই কাগজের উপর চিত্র-আঁকিতে সিদ্ধহস্ত। সরু স্থঁচের সাহায্যে সেলাই এরূপ দক্ষতার সহিত হইতেছে যে, মনে হয় যেন রেশমের উপর চিত্রই অঙ্কিত হইতেছে। জীবজন্তু, প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদি নানাবিষয়ের প্রতিকৃতি অর্দ্ধ-প্রস্তুত দেখিতে পাইলাম। কোন যুবক সমুদ্রের তরঙ্গ প্রকাশ করিতে ওস্তাদ, কোন ওস্তাদ সিংহ-সেলাই করিতে স্থনিপুণ। নানাবর্ণের রেশমী স্থতা চূড়ান্ত সামঞ্জস্যের সহিত ব্যবহৃত হইতেছে। যেন দর্শকমাত্রেই প্রকৃত সমুদ্রের ফেনিল অম্বুরাশির সম্মুখীন, অথবা জীবন্ত সিংহের চক্ষু ও লোম যেন তাহার মূর্ত্তি ঝলসিয়া দিতেছে। দোকানের ম্যানেজার বলিলেন—"আমরা ভারতীয় কারিগর পাইলে, তাহাদিগকে এই বিদ্যা শিখাইতে প্রস্তুত আছি। অন্ততঃ পাঁচবৎসরকাল সাগ্রেদী না করিলে কেহ এই শিল্পে পারদর্শী হইতে পারিবে না।"

জাপানের রেশমী "কারচুপী" বা সেলাই-শিল্প সম্বন্ধে ইয়াঙ্কি রমণী লিখিয়াছেন—

"Their range of stitches, their ingenious methods and combinations, and the variety of effects attained with the needle and a few strands of coloured silk, easily place the Japanese first among all embroiderers. * * They can simulate the hair and fur of animals, plumage of birds, the hard scales of fishes and dragons, the bloom on fruits, the dew on flowers, the muscles of bodies, tiny faces and hands, the patterned folds of drapery, the

clear reflection of lacquer, the glaze of porcelains, and the patina of bronzes in a way impossible to any but the Japanese hand and needle. * * * A needle-worker attains every colour-effect of the painter."

রেশম-কীট-পালন এবং তুঁতের চাষ জাপানে বহুকাল অবধি চলিতেছে। ভারতবাসী এবিষয়ে জাপানীর পশ্চাৎপদ নহেন। তবে জাপানীরা ১৫।২০ বৎসর হইল নব্য-ইয়োরামেরিকার কল-যন্ত্র ইত্যাদির ব্যবহার সুরু করিয়াছে। ভারতবর্ষে "পোলু"-পোষা এবং রেশমের "ঘানি" মামুলি কায়দায়ই চলিতেছে। অবশ্য জাপানে এখনও এই সনাতন পন্থা অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়।

নব্য রেশমশিল্পের কার্য্য-প্রণালী এবং যন্ত্রাদি জাপানীরা ফরাসীদেশ হইতে আমদানি করিয়াছে। বলা বাহুল্য, স্বয়ং গবর্মেণ্ট এই ব্যাপারের প্রবর্ত্তক ছিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে জাপানের Imperial Sericultural Institute হইতে 'Sericultural Investigations'-নামক একখানা বৃহদাকার গ্রন্থ ইংরাজিতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ২৫ বৎসরের ভিতর জাপানে আধুনিক রেশমশিল্পের ক্রমবিকাশ কিরূপ হইয়াছে, তাহা বিবৃত আছে। প্রকৃতপক্ষে, এই গ্রন্থে নব্য রেশম-বিজ্ঞান এবং রেশম-শিল্পসম্বন্ধে সকলপ্রকার তথ্য ও তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে। অধ্যায়গুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

1. General Sketch on Silk-worm Rearing and Filature.
2. Experiments on Mulberry Cultivation.
3. Experiments on Silk-worm Rearing.
4. Physiological Researches and Pathological Researches on Silk-worm.

5. Experiments on Filature.

একজন কর্ম্মচারী কিয়োতোর Sericultural Institute-এর তাঁত-ক্ষেত্র, রেশমমিউজিয়ম, ল্যাবরেটরি এবং কারখানাগুলির ভিতর লইয়া গেলেন। নূতন কিছু দেখিবার নাই: তবে, লিখিবার কথা এবং ভারতবর্ষে প্রয়োগ করিবার জিনিষ অনেকই আছে। এই ধরণের কারখানা, অনুসন্ধানালয় এবং পরীক্ষাগৃহ ইত্যাদি যত দেখিতেছি, ততই ভাবিতেছি —অভিভাবক ও সংরক্ষকের সাহায্য না পাইলে, কোনদেশের লোকেই নূতন-নূতন পথে অগ্রসর ও কৃতকার্য্য হইতে পারে না।—ভারতীয় শিল্পের সংরক্ষক ও অভিভাবক কোথায়?

একদিনের বৃত্তান্ত

জাপানী খৃষ্টানদিগের তত্ত্বাবধানে কিয়োতোতে একটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে; তাহার নাম "দোশিষা"। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি শ্রীযুক্ত হারাদা দশবৎসর পূর্ব্বে একবার ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী-শিক্ষা-বিভাগে হারাদার সঙ্গে দেখা হইল। জাপানী খৃষ্টানেরা তাঁহাদের জাতীয়স্বভাব কোন বিষয়েই পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ন'ন। কথাবার্ত্তায়, চালচলনে এবং আদব-কায়দায় কোন জাপানীকে দেখিয়া তিনি বৌদ্ধ, কি শিন্তো-মতাবলম্বী, কি খৃষ্টান বুঝা যায় না। খৃষ্টধর্ম্ম জাপানে পরকীয় সভ্যতার অধীনতা প্রবর্ত্তন করে নাই। বরং, ইয়োরামেরিকার ধর্ম্মপরিষৎসমূহের সঙ্গে এখনপর্য্যন্ত জাপানী গির্জ্জাসমূহের যতটুকু বাধ্য-বাধকতার সম্বন্ধ রহিয়াছে—তাহাও ছিন্ন করিবার চেষ্টা জাপানে অত্যন্ত প্রবল। তোকিওর প্রধান খৃষ্টান-প্রচারক শ্রীযুক্ত এবিনার ন্যায়, অধ্যাপক হারাদাও শীঘ্রই জাপানী খৃষ্টধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা আশা করিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"চীনের খৃষ্টান সমাজও শীঘ্রই ইয়োরামেরিকার পরিষৎসমূহের অধীনতা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে কি?" হারাদা বলিলেন—"চীনা-খৃষ্টানেরা এখনও স্বদেশী অর্থে চীনের ভিতর গির্জ্জা ও পরিষৎ স্থাপন করিতে পারেন নাই। কাজেই, বিদেশীয় প্রভাব ও আধিপত্য এড়ান, চীনাদের পক্ষে কিছুকাল অসাধ্য।" প্রাচ্যজগতে, খৃষ্টধর্ম্মপ্রচার করিয়া, পাশ্চাত্যেরা তাঁহাদের ক্ষমতা-বিস্তারের সাহায্য পান। ধর্ম্মপ্রচার তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার বাড়াইবার উপায়স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু জাপান 'ফার্ষ্ট্‌ক্লাশ পাওয়ার'

—কাজেই জাপানী খৃষ্টসমাজে পরাধীনতা সহ্য হইবে কেন? বিদেশ হইতে ধর্ম্ম আমদানী করিলেই, বিদেশের অধীনতা-স্বীকার করিতে হয় না—জাপানী ইতিহাসের প্রত্যেকযুগেই এই সত্য প্রচারিত।

ওসাকা হইতে একজন ব্যবসায়ী হোটেলে আসিয়া দেখা করিলেন। ইনি ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধীধারী—গ্র্যাজুয়েট। ইঁহার পিতামহ তোকুগাওয়া-যুগে একজন প্রসিদ্ধ প্রদেশ-শাসক ছিলেন। বর্ত্তমানে ইঁহার পরিবারস্থ লোকজন বড়-বড় শিল্প-কারখানা ও ব্যবসায়ের মালিক। যুবক স্বয়ং আমদানী-রপ্তানীর কার্য্যে লাগিয়াছেন।

যুবকের সঙ্গে তিনচারটা ফ্যাক্টরী দেখিতে বাহির হইলাম। কোন কোন কারখানার মালিক ইঁহার আত্মীয়। 'রামি'-নামক একপ্রকার চীনা-উদ্ভিদের ছাল হইতে সুতা প্রস্তুত করিবার কল দেখা গেল। এই সুতার কাপড়ও কলের তাঁতে প্রস্তুত হইতেছে—বয়ন-ফ্যাক্টরীর কলযন্ত্র এবং কার্য্যপ্রণালী তুলা, লিনেন ইত্যাদিসম্বন্ধে যেরূপ, রামি সম্বন্ধেও সেইরূপ।

চীনামাটির কাজ দেখিবার জন্য যুবক কিয়োতোর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারখানায় লইয়া গেলেন। শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দেব এই কারখানা হইতে দুইজন জাপানী কারিগরকে আমাদের দেশে লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং এখানে কিছুকাল কাজ শিখিয়াছেন, শুনিলাম। পাথর-গুঁড়া করা হইতে কলাই-করা বাসনের উপর রং লাগান পর্য্যন্ত, সকল কার্য্যপ্রণালী দেখা গেল। আমাদের স্বদেশী বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে বৃন্দাবনের "প্রেম-মহা-বিদ্যালয়ে" আধুনিক Ceramics-বিদ্যা শিখান হইয়া থাকে। জাপানে শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র মজুমদার গোয়ালিয়র-রাজ্যে একটা সরকারী-কারখানা খুলিয়াছেন।

কারখানার মালিক শ্রীযুক্ত হিরায়োকা, সকলবিভাগ তন্ন-তন্ন করিয়া দেখাইলেন। একটা সংগ্রহালয় দেখিলাম—ইহার ভিতর দুনিয়ার

প্রত্যেকদেশ হইতে আনীত চীনামাটির কাজ রক্ষিত হইয়াছে। সত্যসুন্দর দেবের তৈয়ারি একটা ব্র্যাকেটও দেখিলাম। হিরায়োকা বলিলেন—"ডেনমার্কের কারিগরেরা রংঙের ব্যবহারে বিশেষ পারদর্শী।"

নানাপ্রকার গল্পের সঙ্গে হিরায়োকার চা-নউ-গৃহে সান্ধ্যভোজন করা গেল। ইহাঁর পত্নী বাহিরে গিয়াছেন বলিয়া অতিথি-সৎকার করিতে পারিলেন না, হিরায়োকা এইজন্য দুঃখ জানাইলেন।

আরাশিয়ামা পাহাড়ে স্রোতস্বতী

সেদিন কিয়োতোর পূর্ব্বপ্রাচীর-স্বরূপ পাহাড়ের অপরপারে বিয়াহ্রদ দেখিয়াছি। আজ বিকালে পশ্চিমসীমাস্থিত পাহাড়ের পাদদেশ দেখিতে যাইতেছি। এই পাহাড়ের নাম আরাশিয়ামা।

কুমড়া, কচু, ধান ইত্যাদির ক্ষেত দেখিতে-দেখিতে ট্রামের ভিতর ঘণ্টাখানেক সময় কাটাইলাম। ক্রমশঃ নিবিড় বাঁশবনের ভিতর দিয়া গাড়ী চলিল; সন্ধ্যাকালে একটা ঘাটের ধারে উপস্থিত হইল। কতকগুলি ছোট-বড়-মাঝারি গৃহ এবং সরাই নদীর কিনারার রাস্তায় অবস্থিত। রাস্তার উপর চৌকি-পাতা রহিয়াছে; কোন-কোনটায় লোক উপবিষ্ট। ঘাটে-ঘাটে নৌকাবাঁধা—কতকগুলি নৌকার উপর সাধারণের বসিবার জন্য আসন দেখিতে পাইলাম। অপর-পারেও এইরূপ—চৌকি, চা-গৃহ। সেতুপার হইয়া অপর-পারে গেলাম না। নদী এখানে বেশী গড়ান এইজন্য স্রোতস্বতীর কল-কলনিনাদ অনেকটা নির্ঝরের মত শুনিতে পাইতেছি।

একখানা নৌকাভাড়া করিয়া জলে ভাসিলাম। খুব পরিষ্কার জল; কিন্তু গভীরতা অতিশয় অল্প। নানানৌকায় নানালোক নদীর উপর শীতলবায়ুসেবন করিতেছে। নদীর ভিতর মাঝে-মাঝে বিশাল প্রস্তরখণ্ড এবং দুইধারে উচ্চপর্ব্বত। পর্ব্বতমালাদ্বয় নানাবৃক্ষে সমাবৃত। প্রধানতঃ, পাইন এবং ক্রিপ্টোমেরিয়া গাছই চোখে পড়িল। কিন্তু দো-ভাষী বলিলেন —"এইসকল পাহাড়ে প্রাচীনযুগের শোগুণ এবং মিকাডোরা চেরি-তরু এবং অন্যান্য বৃক্ষও লাগাইয়াছেন। স্রোতস্বতী নিতান্ত সঙ্কীর্ণ। তরুসমাচ্ছাদিত উচ্চপর্ব্বতের শিরোদেশ যেন আকাশে মিশিয়াছে, মনে হয়।

ফলতঃ, সবুজ উদ্ভিদের ছায়ায় জলের বর্ণ ঘোরতর সবুজ হইয়া পড়িয়াছে। নদীর গতি কিছু বক্র—এই জন্য অল্পদূর নৌকাবাহিয়া গেলেই চারিদিকে পর্ব্বতবেষ্টিত হ্রদের ভিতর ভাসিতেছি, বোধ হয়। গতবৎসর আসোবোনে নাইল-নদীর উপর বেড়াইবার সময় বক্রগতি নদীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়াছিলাম। কিন্তু দক্ষিণ-মিশরের পর্ব্বতসমূহ কৃষ্ণ'গ্রাণাইট্'ময় আর জাপানের আরাশিয়ামা হরিৎবর্ণ তরুকুঞ্জে সুশোভিত।

এই নদীর ধারে মিকাডোর একটা প্রাসাদ আছে। উহা সময়ে-সময়ে গ্রীষ্মভবনস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। তোকু-গাওয়া-যুগে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। দোভাষী বলিলেন, "বিরাট্ প্রাসাদের রীতিতে এই গৃহ নির্ম্মিত হয় নাই ক্ষুদ্র চা-নউ-গৃহের নিয়মে এই গ্রীষ্মভবন রচিত।"

নৌকায় বসিয়া কোন-কোন মাঝি মাছ ধরিতেছে। পাহাড়ের গায়ে একটা রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। নৌকা হইতে দুইখানা গাড়ী যাইতে দেখিলাম। একটা সরাইয়ের লোক আসিয়া নৌকায় আহার্য্য দিয়া গেল —ভাত, বেগুনভাজা, শঁসা এবং দুগ্ধহীন জাপানী চা পাইলাম।

নদীতে উজান বাহিয়া সাত মাইল গেলে, জলপ্রপাত দেখিতে পাওয়া যায়। অতদূর অগ্রসর হইবার সময় নাই।

কিয়োতোতে দিনে যেরূপ গরম, রাত্রেও সেইরূপই দেখিতেছি। ভারতবর্ষে গ্রীষ্মকালের রাত্রে রাস্তায়, বারাণ্ডায়, রোয়াকে, ঘরের ভিতরে, বাহিরে, উঠানে জল ছিটাইয়া অথবা ঢালিয়া, ঠাণ্ডা করিতে হয়; তাহার পর, চৌকি অথবা ফরাস পাতিয়া, খালিগায়ে শুইয়া-বসিয়া সময় কাটাইতে হয়। জাঁপানীদিগকেও এইকয়দিন রাত্রিকালে ঠিক সেইরূপে জীবনযাপন করিতে দেখিতেছি। দিবাভাগে নগরের দৃশ্যও ভারতবাসীর পরিচিত। দরজা বন্ধ করিয়া, ঝাঁপের আড়ালে অথবা পর্দ্দা লটকাইয়া, নানাউপায়ে সূর্য্যতাপ হইতে ঘরকে রক্ষা করা হয়। চব্বিশ ঘণ্টা ধরিয়া হাতপাখার ব্যবহার

চলিতে থাকে। "পাখা ধরে ধরে হাতব্যথা করে, তবু ঘাম ঝরে—নিস্তার নাই।" একটা মন্দিরে দেখিলাম, একজন পুরোহিত যোগাসনে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে মন্ত্রপাঠ করিতেছেন—আর ডাহিন-হাতে পাখাও চালাইতেছেন!

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাচীন জাপানে বৃহত্তর ভারত

জাপানী বৌদ্ধের সারনাথ

প্রাচীন জাপান ভারত-মণ্ডলের অন্তর্গত ছিল। সেই যুগের এশিয়ায় বৃহত্তর ভারতের নানা উপনিবেশ বিরাজ করিত। এইরূপ এক উপনিবেশের প্রভাবেই জাপানে সভ্যতার সূত্রপাত হয়। আজ জাপানের সেই ভারত-কেন্দ্র দেখিতে চলিয়াছি। নারা-নগরী জাপানী বৌদ্ধদিগের বারাণসী বা সারনাথ। এইখানেই কোরিয়া হইতে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রথম আনীত হয়। কোরিয়ার ভাষায় নারা-শব্দের অর্থ নাকি, "আমি এই জনপদের অধিপতি।" বুদ্ধদেব যেন এই অঞ্চলের কর্ত্তা হইলেন। সে আজ ১৩০০ বৎসরের কথা।

কিয়োতো হইতে ঘণ্টা-দেড়েকের মধ্যে রেল নারায় লইয়া আসিল। দোভাষী সঙ্গে আছেন। এই পথে চা-বাগান বেশী চোখে পড়িল। জাপানী বাঁশ-গাছের একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করিতেছি। লম্বা সরু বংশদণ্ড সোজা উঠে। আমাদের দেশে গুঁড়ির কাছে এক সঙ্গে অনেকগুলি দণ্ড গজাইয়া থাকে। প্রত্যেকটাই একটা সুবৃহৎ ঝোপের সন্তানস্বরূপ দেখা যায়। এখানে প্রত্যেকটা স্বতন্ত্রভাবে একাকী দণ্ডায়মান।

পথে মমোয়ামা-ষ্টেসন সম্বন্ধে প্রদর্শক বলিলেন—"পরলোকগত সম্রাটের কবর এইখানে আছে। মহাসমারোহের সহিত এই কবর-স্থাপন

অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পুরাতন জাপানী রীতি অনুসারে একটা উচ্চ ঢিপি নির্ম্মিত হইয়াছে।" শুনিলাম, এই অঞ্চলে মধ্যযুগে বহু অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। তোকুগাওয়া যুগের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জাপানী নেপোলিয়ান হিদেয়শি-শোগুণ এই স্থানেই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাসাদের আসবাবসমূহ পরে কিয়োতোর নানা মন্দিরে স্থান পাইয়াছে। পশ্চিম-হোন্‌গাঞ্জির সৌধসমূহে হিদেয়শি-প্রাসাদের ফটক, চিত্রাবলী, কাষ্ঠমূর্ত্তি, কাকেমনো ইত্যাদি দেখিয়াছি।

উজিনদী পার হইলাম—বিয়াহ্রদ হইতে ইহার উৎপত্তি। সে দিন ষ্টীমলাঞ্চে উজির উপর খানিকদূর আসা হইয়াছিল। এখানে নাকি জোনাকি পোকার বাহার দেখা যায়। সন্ধ্যার পর মশার উপদ্রব জাপানের সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করিয়াছি

রেলষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে ইংরাজীতে স্থানীয় দর্শনযোগ্য বস্তুর নাম লেখা রহিয়াছে। জাপানের প্রত্যেক ষ্টেসনের নাম জাপানী ও ইংরাজী দুই ভাষায় লেখা হয়। বিদেশীয় পর্য্যটকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য "দেখিবার স্থান"-সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়।

নারায় পাশ্চাত্য ধরণের হোটেলও আছে। কিন্তু স্বদেশী সরাইয়ে আশ্রয় লইলাম। তবে ইহার দুই একটা কামরায় বিদেশীয় কায়দার আয়োজন আছে।

য়াম্মাদোর সরাইয়ের মত নারার এই সরাইয়েও হাল্‌কা কাগজের দেওয়াল। ঘর হইতে ঘরে সহজেই যাওয়া-আসা করা যায়—দেওয়ালগুলি কনিষ্ঠ অঙ্গুলির সাহায্যে ডাইনে কিম্বা বামে সরাইয়া দিলেই হইল। সুতরাং দরজা বন্ধ করিবার রীতি নাই—তবে জিনিস চুরির আশঙ্কা অল্প।

হোটেলের নীচে জুতা রাখিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে হইল। ডাল-ভাত,

বেগুণ-ভাজা, কুমড়া-ভাজা ও রুইমাছ-ভাজার দ্বারা মধ্যাহ্ন-ভোজন সারা গেল। জাপানে কেহ ডাল খায় না। শিমের বীজ সিদ্ধ করিয়া একপ্রকার ডালজাতীয় তরল পদার্থ তৈয়ারি করান হইয়াছিল। পাচি-কারা বেগুণ ও কুমড়াতে বেশন লাগাইয়া খাঁটি বাঙ্গালী-আহার্য্য প্রস্তুত করিয়াছিল। খাদ্যদ্রব্য সমস্তই ফরমাইস দেওয়া জিনিস।

খুব গরম পড়িয়াছিল—দ্বিপ্রহের পর বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। ঝম্‌ঝমের পর টুপুর-টাপুর গুঁড়ি-গুঁড়ি চলিতেই থাকিল। বর্ষার আকাশে ধোঁয়াটে অন্ধকার কিছু কালের জন্য স্থায়ী হইয়া রহিল।

এই সরাইয়ে কয়েক জন শ্বেতাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গিনী পান্থ্রী জাপানী-খাদ্য খাইবার জন্য আসিয়াছেন। ইঁহাদের কেহ কেহ জাপানী ভাষায় কথা বলিতেছেন।

নারা-মিউজিয়ামে ভারতবর্ষ

প্রথমেই মিউজিয়াম দেখিলাম। একটা সুবিস্তৃত পার্কের এদিকে-ওদিকে হরিণ বিচরণ করিতেছে। মিউজিয়াম এই বাগানে অবস্থিত। সারনাথের "ডিয়ার পার্ক" কি নারায় স্থানান্তরিত হইয়াছে?

প্রাচীন জাপানের মূর্ত্তিশিল্প, চিত্রকলা, হস্তলিপি, যুদ্ধাস্ত্র, রণবেশ, হস্ত লিখিত পুঁথি ইত্যাদি সকল প্রকার দ্রব্য সংগৃহীত রহিয়াছে। ভারত-বর্ষের মিউজিয়ামসমূহে দেখিতে পাই, ধ্বংসস্তূপ হইতে প্রাপ্ত পদার্থ সংগৃহীত থাকে। নারা-মিউজিয়মের মূর্ত্তিগুলি এইরূপ উদ্ধারকার্য্যের ফল নয়—জাপানের প্রসিদ্ধ মন্দিরসমূহের অধ্যক্ষগণ এইগুলি স্বেচ্ছাক্রমে মিউ-জিয়ামে পাঠাইয়াছেন।

এই ভবনে পদার্পণ করিবামাত্র মনে হইল, যেন মথুরা, লক্ষ্ণৌ, সারনাথ ইত্যাদি কেন্দ্রের মূর্ত্তি-সংগ্রহালয়ে প্রবেশ করিতেছি। অষ্টম শতাব্দীর জাপানে আর ভারতে কি কোন প্রভেদ ছিল না? নারায় আসিয়া ভারতবর্ষেরই এক প্রান্তে রহিয়াছি, ভাবিলাম।

জাপানী বৌদ্ধদেবতাগণের নাম ও পরিচয়, ভারতীয় মহাযান বৌদ্ধ-দেবদেবীর নাম ও পরিচয় হইতে, কথঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। কিন্তু নাম যাহাই হউক, মূর্ত্তিগুলি দেখিলে সবই এক ছাঁচে ঢালা বোধ হয়। পুরো-হিতই বলা হউক অথবা সাধুই বলা হউক, দেবতাই বলা হউক অথবা দেবতার অনুচরই বলা হউক—মোটের উপর বুদ্ধ, শিব, অবলোকিতেশ্বর, বিষ্ণু ইত্যাদির ছায়া প্রায় প্রত্যেকটাতেই পাওয়া যায়। জাপানী কোয়ান্নন দেবী, জিজোদেব, ফুদোদেব, আমিদা ইত্যাদি

মোটের উপর এক বুদ্ধমূর্ত্তিরই উনিশ-বিশ মাত্র। ইয়োরামেরিকার কোন খৃষ্টান এইগুলি দেখিলে ভারতীয় প্রধান প্রধান দেবতা হইতে জাপানী দেবদেবীর পার্থক্য সহজে বুঝিতে পারিবেন না। প্রভেদ বুঝিবার জন্য গভীরতর অভিজ্ঞতা আবশ্যক হইবে। এমন কি, নারাতে যে সমুদয় মূর্ত্তি দেখিতেছি, সেগুলির মুখশ্রীতে পীতাঙ্গজাতির বিশেষ লক্ষণ কিছু পাই না। আমরা ভারতবর্ষে বর্ত্তমানকালেও যে সমুদয় প্রতিমা পূজা করিয়া থাকি, এগুলিকে তাহার পার্শ্বে বসাইলে কোন দোষ হইবে না।

একটি দেবতার নাম কোকুজো বোসাৎসু। এই রঙ্গিন কাষ্ঠময়ী মূর্ত্তি প্রাচীন ভারত হইতে আমদানি হইয়াছিল। মিউজিয়ামের কর্ত্তারা এই তথ্য ইংরাজীতে লিখিয়া রাখিয়াছেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর কথা।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর একটি কাষ্ঠমূর্ত্তি দেখিলাম। ইহার নাম হোশো ন্যোরাই। নিম্নে লিখিত আছে—

"Said to have been brought from ancient India."

অর্থাৎ ভারতবর্ষ হইতে আনীত বলিয়া প্রবাদ।

অষ্টম শতাব্দীতে একজন হিন্দু কাষ্ঠশিল্পী জাপানে বহু মূর্ত্তি গড়িয়াছিলেন। তাঁহার নাম মোন্দোশি—তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে কোন কথা জানা যায় না।

মোন্দোশি-গঠিত সাতটি দেবমূর্ত্তি মিউজিয়ামে আছে। প্রত্যেকটা কাষ্ঠনির্ম্মিত এবং ল্যাকার-মণ্ডিত। মূর্ত্তিসমূহের নাম ভারতবাসীর অপরিচিত। মূর্ত্তিগুলির নীচে ইংরাজীতে লেখা আছে—

(১) অশূর-ও, (২) কেনতৎসুব-ও, (৩) করুর-ও, (৪) কুবেন্দরাইও-ও, (৫) ছিরা-কর-রাইও-ও, (৬) কিন্নর-ও, (৭) বিকৎশূররাইও-ও।

বুদ্ধদেবের শাক্যসিংহ নাম জাপানে 'শাকা' হইয়াছে। শাক্যসিংহের নগর 'ওশাকা' নামে খ্যাত। নারার নিকটেই ওশাকা। জাপানী বৌদ্ধগণ শাকাদেবের দশজন শিষ্য স্বীকার করিয়া থাকে। মিউজিয়ামে পাঁচ জনের মূর্ত্তি আছে—মুণ্ডিত মস্তক ভিক্ষুগণকে দেখিলেই চেনা যায়। এইগুলির গঠনকর্ত্তাও মোন্দোশি। শিষ্যগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—(১) মোকেনে-রেন্, (২) ফুরুণা, (৩) বাকারা, (৪) কাসেন ইয়েন, (৫) সুবোদাই।

কোয়ান্নন দেবীকে কোন কোন পণ্ডিত জাপানী অবলোকিতেশ্বর বলিয়া থাকেন! (?) ষষ্ঠ শতাব্দীর একটি মূর্ত্তি দেখিলাম। কোরিয়ার ভাস্কর ইহার গঠনকর্ত্তা বলিয়া প্রবাদ চলিতেছে। ইহা বোধহয় জাপানের সর্ব্বপুরাতন স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন।

অষ্টম শতাব্দীর জাপানী বৌদ্ধেরা ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য মুখোস পরিয়া নাচ-গান করিত। সেই নাচ-গানের নাম গিগাকু। এই গিগাকুই চতুর্দ্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে নো-নাটকে পরিণত হইয়াছে। অষ্টম শতাব্দীর বৌদ্ধ-মুখোস অনেকগুলি দেখিলাম।

পিত্তলাদি ধাতুর ব্যবহারও প্রাচীন জাপানে অজানা ছিল না। সুবৃহৎ ঘণ্টাগুলি সবই পিত্তলনির্ম্মিত—নারা এবং কামাকুরার বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তি পিত্তলেরই বস্তু—সেদিন কিয়োতোর সুবর্ণ প্যাগোডার উপর পিত্তলের ফিনিক্স পাখী দেখিয়াছি। নারার মিউজিয়ামে পিত্তলের ঢালাই হইতে প্রস্তুত মূর্ত্তিশিল্প দেখিলাম। দুইজন দণ্ডায়মান শিষ্য সহকারে আমিদা (অমিতাভ) বুদ্ধ পদ্মাসনে উপবিষ্ট। রচনায় সৌন্দর্য্য আছে। আয়তনে বৃহৎ নয়।

আমরা ভারতবর্ষে পরলোকের দেবতা যম এবং তাঁহার কেরাণী চিত্রগুপ্তের ভয়ে অস্থির থাকি। জাপানীরাও যমদেবের কল্পনা

আমাদের ধরণেই করিয়াছে। মিউজিয়ামে তিনটি বিকট মূর্ত্তি দেখিলাম। মধ্যবর্ত্তীটির নাম যেম্মা-ও, দুইপার্শ্বের মূর্ত্তিদ্বয়ের নাম শিরো-কু এবং শিম্যো।

শিম্যো আমাদের চিত্রগুপ্তের জাপানী সংস্করণ—তাঁহার হস্তে কলম। দোভাষী বলিলেন—"বালক-বালিকাদিগকে নীতি শিখাইবার জন্য আমাদের জননীগণ প্রথম হইতে পরলোক ও নরকের কথা গল্প করিয়া থাকেন। মিথ্যা কথা বলিলে যমের দূত জিহ্বা কাটিয়া দিবে ইত্যাদি।" শুনিলাম, প্রতি বৎসর ১০ই জুলাই তারিখে জাপানী মাতারা যমদেবের পূজা করিয়া থাকেন।

শিশুজীবন-সম্পর্কিত আর একটি দেবতা জাপানে সুপরিচিত। যেখানে-সেখানে এই দেবতার মূর্ত্তি দেখিয়াছি। ইঁহার নাম জিজো। ইনি বালক-বালিকাদিগের মৃত্যুর পর তাহাদের আত্মার অভিভাবক হন। আমরা ষষ্ঠীমাতার পূজা করিয়া থাকি—কিন্তু এই ঠাকুরুণ জীবিত শিশুগণের রক্ষাকর্ত্রী।

আমরা কার্ত্তিককে দেব-সেনাপতি বলিয়া থাকি। জাপানের বৌদ্ধেরাও রণদেবতার পূজা করে। হাচিমান্ জাপানীদের সংগ্রাম-দেব। নারাতে এই দেবতার একটি মন্দির আছে। এতদ্ব্যতীত দ্বাদশ সংখ্যক যুদ্ধদেব জাপানী সমাজে পরিচিত। নানাযুগের চিত্রকর ও ভাস্করেরা এই সমুদয় রুদ্রমূর্ত্তির কল্পনা করিয়াছেন। মিউজিয়ামে নবম শতাব্দীর কতকগুলি যুদ্ধদেবতা দেখিলাম। এইগুলির গঠনকর্ত্তা কোবো দাইশি। এই ব্যক্তি জাপান হইতে চীনে যাইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের এক বড় ঘাঁটি হইতে নির্ব্বাণতত্ত্ব শিখিয়া আসেন।

দেখিতেছি, আমরা পুরাণ ও তন্ত্রের সাহায্যে ভারতবর্ষে যে সমুদয় দেবদেবীর পূজা প্রবর্ত্তন করিয়াছি, জাপানী বৌদ্ধেরাও সেই সমুদয়

দেবতাই পূজা করিতেছে। মূল ভারত হইতে এই সমুদয়ের কল্পনা জাপানে আসিয়াছিল কি না, আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। বোধ হয় আসিয়াছিল। এই পর্য্যন্ত সহজেই বুঝা যায় যে, প্রতিমা-পূজার ক্রমবিকাশ হিন্দুনামে ভারতবর্ষে যেরূপ, বৌদ্ধনামে নিপ্পণ-দেশেও সেই-রূপ। ভারতীয় হিন্দু-সমাজের দেবতত্ত্ব এবং জাপানী বৌদ্ধদিগের দেবতত্ত্ব একই ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে।

মিউজিয়ামে নারার সমীপবর্ত্তী জনপদসমূহ হইতে সংগৃহীত নানা মূর্ত্তি ও চিত্র দেখিলাম। অষ্টম শতাব্দীর পরবর্ত্তী যুগসমূহেরও কতিপয় নিদর্শন রহিয়াছে। অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে (৭১০ খৃঃ অঃ) নারাতে রাজধানী স্থাপিত হয়। কোরিয়া হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীতে (খৃঃ অঃ ৫৫২) বৌদ্ধ ধর্ম্মের আমদানী হইয়াছিল। ভারতবর্ষে তাহার বহু পূর্ব্বে কালিদাস-বিক্রমাদিত্যের যুগ প্রকটিত হইয়া গিয়াছে। হর্ষবর্দ্ধনের পর উত্তর ভারতে পালবংশ তখন কর্ত্তৃত্ব করিতেছিলেন। সেই যুগে ভারতবর্ষে বিষ্ণু, শিব ইত্যাদির পূজা প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। মহাযান-মতাবলম্বী বৌদ্ধদিগের দেবদেবীগণ ভারতীয় অন্যান্য দেবদেবীগণের পরিবারে মিশিয়া যাইতেছিলেন। জাপানের বৌদ্ধধর্ম্ম বুঝিতে হইলে ভারতীয় ইতিহাসের এই কথাগুলি মনে রাখিতে হইবে। যে তত্ত্ব ভারতবর্ষে হিন্দুত্ব আখ্যা গ্রহণ করিতে থাকিল, তাহাই এশিয়ার প্রাচ্যত দেশে বৌদ্ধ নামে পরিচিত হইয়াছে। জাপানের বৌদ্ধধ আর ভারতের পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্মে কোন প্রভেদ আছে কি সন্দেহ—প্রভেদ এই যে ভারতবাসীরা বুদ্ধ শব্দটা ব্যবহার করে না কিন্তু মূর্ত্তিকল্পনা, মূর্ত্তিপূজা, পূজার অনুষ্ঠান, পুরোহিতদিগের নিয়ম, ব্র আরাধনা, আরতি, নাচগান, বাজনা, কথকতা ইত্যাদি সবই প্রায় এ ধরণের। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় জনসাধারণ যেমন অসংখ্য ধর্ম্মসম্প্রদা

বিভক্ত—জাপানী বৌদ্ধেরাও সেইরূপ অগণিত দলের অন্তর্গত। সম্প্রদায়-গুলির বিশেষত্ব বুঝান সাম্প্রদায়িকগণের পক্ষেও কষ্টসাধ্য।

৩৩ কোটি দেবতার দেশে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"-দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রতিমা-পূজার পশ্চাতে যোগ, ধ্যান, আত্মোপলব্ধি, ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তি "সাযুজ্য", সামীপ্য ইত্যাদি বিরাজ করিত। জাপানী বৌদ্ধেরাও অগণিত দেবদেবীর সকাম পূজার পশ্চাতে বৈদান্তিক অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আমরা যাহাকে ব্রহ্ম বলি, বৌদ্ধদর্শনে তাহার নাম বুদ্ধ। ব্রহ্ম যেমন একটা মাথা খাটাইয়া বাহির করা "এ্যাব্‌ষ্ট্রাকশন" মাত্র, জাপানী-দের চিন্তায় বুদ্ধও সেইরূপই একটা এ্যাবষ্ট্রাকশন। এইরূপ নির্গুণ দেশকাল-বিবর্জ্জিত এ্যাবৃষ্ট্রাকশন দুইদেশে মূর্ত্তিপূজার অন্তরালে জাগরুক রহিয়াছে।

কোরিয়া-শিল্পীর কোয়ায়ন সম্বন্ধে Cram বলিতেছেন—"It is of the sixth century: pure Korean, or, if not that, then the earliest of all Japanese work and executed under Korean orders. In any case, it is Korean in style, and absolutely priceless to any student of the historical development of art. It is a strange sexless figure, tall and slim, mysterious and baffling to a degree. The drapery is formalised and decorative, conventionalism raised to the nth power, but the type and the modelling of the head and hands are almost classical. The pose, too, while reserved and formal has yet a certain suave grace that is most and appealing." অর্থাৎ "এইটাষ ষষ্ঠশতাব্দীর কাজ। বোধ হয় কোরিয়ান শিল্পী এইটা করিয়াছিলেন। অথবা যদি জাপানী শিল্পীর কারিগরি ইহাতে

থাকে, তাহার পরিদর্শক নিশ্চয়ই ছিলেন কোরিয়ান্ ওস্তাদ। কোয়ান্নন স্ত্রী কি পুরুষ বুঝিবার জো নাই। রোগা পাতলা লম্বা মূর্ত্তি। কোন জীবিত নরনারীর মূর্ত্তি এইরূপ দেখা যায় না। এটা একদম খাঁটি কাল্পনিক চেহারা। কিন্তু হাত এবং মুখের গড়ন অতি সুন্দর। আর দাঁড়াইবার ভঙ্গীও চিত্তাকর্ষক।

মিউজিয়ামের কাষ্ঠমূর্ত্তিগুলি দেখিয়া উচ্চতম শ্রেণীর শিল্পকর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়। কারিগরেরা ভারতবাসীই হউন, বা চীনা বা কোরিয়ান হউন অথবা যামাতো-সন্তানই হউন তাহাদের কার্য্য দেখিবামাত্র শিল্পশক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। প্রত্যেক মূর্ত্তির ভিতর দিয়া জীবন যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বেশভূষা, ধরণধারণ, ভাবভঙ্গী, সবই অতিশয় দক্ষভাবে কল্পিত হইয়াছে। কোথাও দয়া, কোথাও ভক্তি, কোথাও প্রতাপ, কোথাও স্নেহ, কোথাও শান্তি যেন দর্শকের সম্মুখে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান। মূর্ত্তিগুলিকে দেবমূর্ত্তি বলিয়া না জানিলেও দর্শকের বুঝিতে কষ্ট হয় না। অষ্টম শতাব্দীর নারা-যুগ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর কামাকুরা-যুগ পর্য্যন্ত জাপানী মূর্ত্তিশিল্পীরা অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

নারা-মাহাত্ম্য

সরাইওয়ালীর পুত্র ওয়াসেদা-বিশ্ববিদ্যালয়ে ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষা করিতেছে। গ্রীষ্মাবকাশে নারায় আসিয়া বাস করিতেছে। সেদিন তোকিওতে অধ্যাপক শিয়োজাওয়ার নিকট শুনিয়াছিলাম—এই দুই বিদ্যা শিখিবার জন্যই প্রায় ১০০০ ছাত্র ওয়াসেদা-বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়াছে। শিয়োজাওয়া এই বিভাগের কর্ত্তা।

যুবক ইংরাজীতে গ্রন্থাদি পাঠ করে—কিন্তু সম্যক বুঝিতে পারে না। গ্রন্থগুলির কঠিন শব্দসমূহের জাপানী অনুবাদ লিখিয়া রাখিবার জন্য একখানা খাতা আছে। বলা বাহুল্য ইংরাজীতে কথা বলা ইহার পক্ষে অসম্ভব। জেলাস্কুলের দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণীতে আমাদের যতটা ইংরাজী দখল ছিল এই যুবকের দখল ততটা। অথচ সর্ব্বপ্রসিদ্ধ ইয়োরামেরিকান পণ্ডিতগণের রচনার সহিত পরিচিত করান হইতেছে। মাতৃভাষাকে বিদ্যা-শিক্ষার মুখ্য দ্বারস্বরূপ গ্রহণ করিয়াও একটা নবীন জাতি বিদেশীয় উচ্চতম জ্ঞানের অধিকারী এইরূপেই হয়।

নারা আজকাল একটা জাপানী জেলার প্রধান নগর। এখানে শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ের কোন বিশেষত্ব নাই। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এই নগরে যখন রাজধানী ছিল তখন এখানে ধর্ম্মচর্চ্চারই প্রধান কেন্দ্র ছিল। বস্তুতঃ বৌদ্ধ পুরোহিতগণের ক্ষমতা অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছিল। ইয়োরোপীয় ইতিহাসের মধ্যযুগে ধর্ম্মনেতা পোপ এবং দেশ-নায়ক নরপতির মধ্যে যেরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়াছিল জাপানেও সেইরূপ ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল। পুরোহিতগণের প্রভাব ও আওতা হইতে

দূরে থাকিবার জন্যই অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে মিকাডোগণ কিয়োতোতে রাজধানী প্রবর্ত্তন করেন। তাহার পর আজ ১৬০০ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এই জনপদ কত যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু মোটের উপর নারা-নগরীর ধর্ম্মচর্চ্চা এবং ধর্ম্মপ্রভাব অন্তর্হিত হয় নাই। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের মেজিযুগ বৌদ্ধধর্ম্মকে সুনজরে দেখে নাই—শিন্তো-মতই এই যুগে রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মরূপে গৃহীত হইয়াছে। কাজেই জাপানের সর্ব্বত্র বৌদ্ধ অনুষ্ঠানের মহিমা অবসন্ন দেখিতে পাই। নারাতেও বৌদ্ধ মন্দিরাদির দুর্দ্দশা অল্প-বিস্তর লক্ষ্য করিতেছি। যাহা হউক, এখনও নারা প্রাচীন বৌদ্ধ-জীবনের ধ্বংসাবশেষ বহন করিয়া জাপানী সভ্যতার আদিম যুগের পরিচয় দিতেছে। নারাতে আসিয়া মন্দির, প্যাগোডা, কোয়াম্বন, হাচি-মান, ঘণ্টা, তোরী, হরিণের পাল, প্রস্তর-প্রদীপের সারি ইত্যাদিই দেখিতে হইবে। অন্য কোনপ্রকার বস্তু এখানে নাই।

সর্ব্বপ্রসিদ্ধ দর্শনযোগ্য বস্তু এখানকার "দাইবুৎসু" বা বিরাট বুদ্ধ। মূর্ত্তি পিত্তল-নির্ম্মিত—অষ্টম শতাব্দীর রচনা। মন্দির এবং মূর্ত্তি দুই-ই বহুবার পুড়িয়া গিয়াছে। এক্ষণে ষোড়শ শতাব্দীর মূর্ত্তি এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মন্দির দেখিতে পাই।

নারা যে অঞ্চলে অবস্থিত তাহার নাম য়ামাতো। ইহাই জাপানের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সর্ব্বপুরাতন স্থান। এই জনপদের নাম হইতেই জাপানীরা সমগ্র দেশকে য়ামাতো বলে এবং জাপানী জাতীয়ভাবকে "য়ামাতো দামেশি" (Yamato Damashi) বলে। পঞ্চনদ ও আর্য্যাবর্ত্তের নামে হিন্দুর মনে যে সকল ভাব জাগে, য়ামাতোর নামে নিপ্পনবাসীদের সেই ভাব উদিত হয়। "য়ামাতো"কে হিন্দু পুরাণের "যমকোটি" বিবেচনা করা হইতেছে।

য়ামাতো-প্রদেশে বহুবার বহু যুদ্ধ ঘটিয়াছে। নারার উপর আক্রমণ

দুইবার ঘটিয়াছে—একবার দ্বাদশ শতাব্দীতে আর একবার ষোড়শ শতাব্দীতে। দাইবুৎসু দুইবারই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। যুদ্ধের অনলেই জাপানের প্রায় প্রত্যেক কাষ্ঠ-শিল্প একাধিকবার ভস্মীভূত হইয়াছে। সাধারণ আগুনে কাঠের বাড়ী, কাঠের মন্দির, কাঠের প্রাসাদ, কাঠের মূর্ত্তি বেশী নষ্ট হয় নাই।

দুনিয়ায় নারার এই দাইবুৎসুর সমান বিশাল মূর্ত্তি বোধ হয় আর নাই। মিশরের কোথাও এইরূপ বিরাট গঠন দেখি নাই। জাপানীরা বৃহদাকার গৃহনির্ম্মাণে এবং খোদাই-কার্য্যে ও স্থাপত্য-শিল্পে প্রচুর নিদর্শন দেখাইতে পারে, একথা জাপানে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে ভাবিতাম না। বিরাট ও বৃহতের দৃষ্টান্ত দিতে হইলেই সাধারণতঃ মিশরের কথা মনে হইত।

ধ্যানোপবিষ্ট বুৎসুর উচ্চতা ৫৩ ফিট। পদ্মাসনের উচ্চতা ১০ ফিট। এই আসনের পরিধি ৬৮ ফিট। বিগ্রহের পশ্চাতে প্রভামণ্ডল বিরাজিত। তাহার দৈর্ঘ্য ৮৩ ফিট এবং প্রস্থ ২৫ ফিট। মূর্ত্তি দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম না—গাল দুইটা অত্যধিক স্ফীত—চোখের ভঙ্গীতে ধ্যানের গরিমা নাই। সমগ্র মুখমণ্ডলে গাম্ভীর্য্য, শান্তি ও সংযমের পরিচয় পাই না।

মন্দিরের সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড পিত্তল-প্রদীপ। শুনা যায়, লঙ্কাদ্বীপ হইতে যে পবিত্র অগ্নি আনিত হইয়াছিল তাহা ইহার ভিতর রক্ষিত ছিল। মন্দিরের ভিতর মূর্ত্তির পশ্চাতে অষ্টম শতাব্দীতে ব্যবহৃত নানাবিধ দ্রব্য সংগৃহীত রহিয়াছে।

পুকুরে মাছের খেলা দেখিতেছি, মৎস্যগুলিকে রুটির টুকরা খাওয়াইতেছি। মাঠে হরিণের সঙ্গে আলাপ করিতেছি। হরিণকে বিস্কুট খাওয়ান নারা-যাত্রীদিগের একটা কার্য্যবিশেষ। আমাদের দেশে কোথাও ময়ূর পবিত্র, কোথাও হরিণ পবিত্র ইত্যাদি। সেই সকল স্থানে এই সমুদয়

জীবের হত্যা নিষিদ্ধ। নারাতে হরিণ পবিত্র—কোন ব্যক্তি হরিণ হত্যা করিলে কঠোর শাস্তি পায়।

কথিত আছে, অষ্টম শতাব্দীতে কাসুগা ফুজিয়ারা নামক প্রসিদ্ধ মন্ত্রি-বংশের স্থাপয়িতা শ্বেত হরিণে বসিয়া নারাতে পদার্পণ করেন। সেই হরি-ণের শৃঙ্গে দ্বাদশ শাখা ছিল। এইরূপ হরিণ আজকাল দেখা যায় না।

এই অঞ্চলের পাহাড়গুলি সবই ঘন সবুজ কৃষ্ণাভ পাইনে পরিপূর্ণ। একটা পর্ব্বতপৃষ্ঠে কেবল মাত্র কচি সবুজ ঘাস জন্মিয়া থাকে। দূর হইতে রঙ্গিন রেশমের টুপি বলিয়া ভ্রম হয়। এইজন্য পাহাড়ের নাম টুপি-পাহাড়। এখান হইতে ধনধান্য-পুষ্পেভরা যামাতো-প্রদেশের সম্পূর্ণ দৃশ্য দেখা যায়।

টুপি-পাহাড়ের একদিক দাইবুৎসু এবং অন্যান্য বৌদ্ধ মন্দির—অপর দিকে শিন্তো-মতাবলম্বীদিগের প্রধান তীর্থক্ষেত্র। ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে এখানে মহাধুমধামের সহিত উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

এই মন্দির সম্বন্ধে ইয়াঙ্কি রমণী তাঁহার Jinrikisha Day-গ্রন্থে বলিয়াছেন—"The Kasuga temple is the very cathedral of Shintoism, a place of many court-yards, surrouuded by gates, buildings painted bright Shinto red, with sacred straw ropes and symbolical bits of rice paper hanging before the open doors."

বৌদ্ধ-মন্দিরের ভিতর মূর্ত্তির গৌরব এবং নানাপ্রকার পূজা-সামগ্রীর জাঁকজমক দেখা যায়। শিন্তো-মন্দিরে "ষোড়শোপচারের" লেশ মাত্র নাই। কতকগুলি কাগজের টুকরা মালার আকারে ঝুলান থাকে। এইগুলি পিতৃপুরুষগণের আত্মার আবাসস্বরূপ পূজিত হয়। সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাতে তালি দেওয়া এবং মস্তক অবনত করা পূজার অনুষ্ঠান। এইরূপ সাদাসিধা আড়ম্বরহীন ধর্ম্মানুষ্ঠান মূর্ত্তি-পূজকের ধর্ম্মে দেখিতে পাইব না।

কাসুগা মন্দির ক্রিপ্টোমেরিয়া, কর্পূর, চেরি এবং মেপ্‌ল-তরুর বাগানে অবস্থিত। সমগ্র আবেষ্টন ঘোরতর কৃষ্ণাভ সবুজবর্ণ। কিন্তু তোরী, মন্দির ইত্যাদি গভীর রক্তবর্ণ ল্যাকারে মণ্ডিত। মন্দিরের প্রবেশপথে দুই সারি প্রস্তর-প্রদীপ সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবে। প্রধান মন্দিরের বারান্দায় বহুসংখ্যক পিত্তলের প্রদীপ ঝুলিতেছে। শিন্তো-মতাবলম্বীরা তাঁহাদের মন্দিরে প্রদীপ উপহার দিয়া থাকেন। পিতৃপূজার ধর্ম্মে পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্দেশ্যে বাতি প্রদান করা অন্যতম লক্ষণ। ভারতবর্ষেও আমরা "বংশে বাতি দেওয়া" কথাটা বেশ জানি। হিন্দুমতে বংশে বাতি দিবার জন্যই পুত্রের জন্ম হয়। বংশরক্ষা-প্রয়াসী হিন্দুরাও কি শিন্তো-মতাবলম্বী?

ছোট মন্দিরের সম্মুখস্থ এক গৃহে দুইটি বালিকা নৃত্য দেখাইল। একজন প্রৌঢ়া রমণী কোতো-যন্ত্র বাজাইলেন। সামিসেনের মত কোতোও জাপানীসমাজে সুপ্রচলিত বাদ্যযন্ত্র। ইহাতে সাতটা তার থাকে। কোতো আকারে বৃহৎ, মেজেতে শোয়ান। হাতে তুলিয়া বাজাইতে হয় না। একজন পুরোহিত এই তিনজনের সঙ্গত অনুসারে গাহিতে থাকিলেন। সুর অনেকটা নো-গীতের অনুরূপ। গায়কের মস্তকে কৃষ্ণবর্ণ শিন্তো টুপি।

নারার বাজারে নূতন বেশী কিছু দেখিবার নাই। বেশীর মধ্যে দেখিলাম, নো-নাটকের দৃশ্যাবলীর ক্ষুদ্র অনুকরণস্বরূপ কাঠের ও ল্যাকারের খেলানা। নারাজেলার কমার্শ্যাল মিউজিয়াম সহরের পার্কে অবস্থিত। জাপানের প্রত্যেক জেলাকেন্দ্রে মিউনিসিপ্যালিটি স্থানীয় শিল্প ও কৃষি পরিপুষ্ট করিবার জন্য একটা করিয়া সংগ্রহালয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মিউজিয়ামে দ্রব্য-বিক্রয়ের নিয়মও আছে।

জাপানী-সরাই এবং সাধারণ গৃহেরও অভ্যন্তরগুলি অতি সুন্দর। টেবিল, চেয়ার অথবা বিশাল আয়নার আড়ম্বর নাই। নিতান্ত সাদাসিধা

আসবাব— আসবাব একপ্রকার নাই বলিলেই চলে—বিছানা ঘরের ভিতর রাখা হয় না। নরম মাদুরের আবরণ মেজের উপর রহিয়াছে—বেশ সুন্দর কাঠের ফ্রেমে ঈষৎ শ্বেত কাগজ মোড়া রহিয়াছে—ইহাই গড়ান বেড়া। দেওয়ালে দু-একখানা কাকেমনো ঝুলিতেছে। কোথাও ধূলা ময়লা জমিবার কিঞ্চিন্মাত্রও সম্ভাবনা নাই। মেজের ম্যাটিং, দেওয়ালের কাগজ এবং সর্ব্বত্র সুন্দর কাটা কাঠের বাহার চোখের আনন্দ দান করে। প্রত্যেক গৃহে, সরলতা, শান্তি এবং সংযম যেন মাখান রহিয়াছে। বাগান ত ঘরের সঙ্গে আছেই—যদি স্থানাভাব হয় গামলার ভিতর বামনতরুসমূহ আনিয়া একটা উদ্যান রচিত হইয়া থাকে। জাপানীরা আটপৌরে জীবনেও সৌন্দর্য্যের আদর করিয়া থাকে। নিত্য নৈমিত্তিক কাজে এরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জাতি জগতে বেশী নাই। অথচ জাপানীরা দরিদ্র ও মিতব্যয়ী জাতি। বিলাসী না হইয়াও সৌন্দর্য্যনিষ্ঠ হওয়া যায়।

অষ্টম শতাব্দীতে কোবো দাইশি (৭৭৪-৮৩৫) চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। এইরূপ বহু জাপানী যুবক চীনে প্রেরিত হইত। একজন নারাবাসী কবি নাকামারো আবে তাঁহাদের অন্যতম। চীনা-পঞ্জিকা ও কালনির্ণয় বুঝিবার জন্য ইঁহাকে পাঠান হইয়াছিল। স্বদেশে ফিরিবার সময়ে চীনা-বন্ধুগণ তাঁহাকে বিদায় ভোজ দেন। নৈশ-ভোজনের পর চাঁদ দেখিয়া কবি নিম্নলিখিত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন—

"While gazing up into the sky,
My thoughts have wandered far ;
Methinks I see the rising moon
Above Mount Mikasa
At far-off Kasuga."

আকাশে তাকাতে গিয়ে,
মন গেল চ'লে দূরে ;
দেখিলাম যেন চাঁদের উঠা
মিকাশা গিরি শিখরে—
সে সুদূর কাসুগা-পুরে !

নারার "টুপি-পর্ব্বতের" নাম মিকাসা। কাসুগা মন্দির ইহার পাদদেশে অবস্থিত। কবি চীনে চাঁদ দেখিবামাত্র স্বদেশের চন্দ্রোদয় কল্পনা করিলেন। অষ্টম শতাব্দীর জাপানী কবিতায় আধুনিকতম যুগের মানবাত্মা বিরাজ করিতেছে।

নারার নিকটবর্ত্তী একটি স্রোতস্বতী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কবিতা উদ্ধৃত হইতেছে। ইহা নবম শতাব্দীর রচনা।

"All red with leaves Tatsuta's stream
So softly purls along,
The everlasting Gods themselves
Who judge 'twixt right and wrong
Never heard so sweet a song."

ভাসা-পাতায় লাল তাৎসুতা দরিয়া
যায় গড়িয়ে মধুর রবে ;
অমর দেবতাগণও, যাঁরা
পাপ পুণ্যের বিচারক ভবে,—
এই সুন্দর গান শুনেছেন কবে ?

নারার মেপল-তরু প্রসিদ্ধ। বুদ্ধদেব হাচিমানের মন্দির মেপ্‌ল-বাগানে অবস্থিত। একজন কবি রেশমী কাপড় অপেক্ষা মেপ্‌ল-পত্রের সৌন্দর্য্য বেশী প্রশংসাযোগ্য বিবেচনা করিতেছেন। এইজন্য দেবতার নিকট তিনি কোন উপঢৌকন আনেন নাই।

"I bring no prayers on coloured silk
To deck thy shrine to-day
But take instead these maple leaves
That grow at Tamuke ;
Finer than silk are they."

রঙিন রেশমে লেখা গান
আনি নাই তোমার মন্দিরে,
মেপল্‌তরুর পাতাগুলি সহ
শোভে এরা তামুকে-গিরি শিরে;—
হারায় এরা রেশমী শ্রীরে।

দ্বাদশ শতাব্দীর একব্যক্তি তাহার প্রণয়িণীর কৃপালাভ করিবার জন্ত কোয়ান্নন (কৃপা) দেবীর নিকট প্রার্থনা করিতেছে। এই ব্যক্তি নারার নিকটস্থ পার্ব্বত্য পল্লীর অধিবাসী।

"Oh ! Kwannon, Patron of this hill,
The maid for whom I pine,
Is obstinate and wayward, like
The guests around thy shrine.
What of these prayers of mine ?"

হা কোয়ান্নন্‌ ! গিরিবাসিনি !
প্রিয়ার তরে মোর হিয়া শুকায় ;
তোমার দেউলের মাথায় ঝড় যেমন
তার বিরাগ নিগ্রহ মোরে কাঁদায় ;
এই ক্রন্দন কি তোমার কানে না যায় ?

ষষ্ঠ শতাব্দীর জাপানী নালন্দা

আধুনিক নারা-নগরীতে অষ্টম শতাব্দীর বৌদ্ধ ও শিন্তো-জীবন দেখিলাম। অনতিদূরে ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর জীবন-চিহ্ন বর্ত্তমান কালেও দেখা যায়। ওসাকা-নগরীর সন্নিহিত সাকাই-বন্দরে কোরিয়ার বৌদ্ধপ্রচারকগণ জাপানে প্রথম পদার্পণ করেন। এই কারণে য়ামাতো-প্রদেশ জাপানী সভ্যতার প্রাচীনতম নিদর্শন বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। প্রাচীনতম ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে ইংরাজের নবীনতম দিল্লী পর্য্যন্ত ভূখণ্ড যেমন ৪০।৫০ মাইল বিস্তৃত, সেইরূপ সাকাই, ওসাকা, নারা, কিয়োতো, উজি ইত্যাদি জনপদসমূহ ৪০।৫০ মাইল ভূখণ্ডে অবস্থিত। এই ভূখণ্ডে য়ামাতো-প্রদেশ প্রধান স্থান অধিকার করে। ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত সাকাই-নারা জনপদ প্রসিদ্ধ ছিল। তার পর হইতে কিয়োতো অঞ্চল প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু মোটের উপর সমগ্র অঞ্চলকে একই সভ্যতা-প্রবাহের অন্তর্গত বিবেচনা করা আবশ্যক।

য়ামাতো-প্রদেশের ভিতর দিয়া রেলে চলিতেছি। চারিদিকে কেবল ধান্যক্ষেত্র। আধ ঘণ্টার মধ্যে গাড়ী হইতে নামিলাম। ডাহিনে কিছু দূরে সবুজ নীল পাহাড়—তাহার পাদদেশে হরিয়ুজি-বিহারের প্যাগোডা-চূড়া দেখিতে পাইতেছি।

ধানের ক্ষেতের ভিতর দিয়া রিক্‌শ চলিতে থাকিল। খানিক পরে পল্লীর মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। রাজপুত্র শোতোকু তাইশি (৫৭৩-৬২১) এই পল্লীতেই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি রাণী সুইকোর প্রতিনিধিস্বরূপ কার্য্য চালাইতেন—স্বয়ং রাজা হন নাই। সে ষষ্ঠ

শতাব্দীর কথা—সেই যুগের রাজপ্রাসাদ এবং বিহারের কিয়দংশ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। কোরিয়ার শিল্পী ও ধর্ম্মপ্রচারকগণ জাপানে আসিবার পর এইখানেই তাঁহাদের প্রথম মন্দির, মঠ, বিদ্যালয় ইত্যাদি নির্ম্মাণ করেন। এই যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের কোন সৌধ জাপানের কুত্রাপি দেখা যায় না। অসভ্য জাপান যেদিন এবং যেখানে সভ্যতার আলোক প্রথম প্রাপ্ত হইয়াছিল, আজ সেইদিনের স্মৃতিস্তম্ভ যথাস্থানে দেখিতে আসিয়াছি। সৌভাগ্যক্রমে প্রাচীনতম জাপানী সভ্যতার নিদর্শন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। যেস্থানে যেভাবে কোরিয়ার প্রচারকগণ সৌধাদি নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন, ঠিক সেইস্থানে সেইভাবেই কয়েকটা সৌধ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বহুসংখ্যক গৃহ নানা যুগে ও নানাকারণে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু সম্রাট, দাইমো এবং পুরোহিতগণ যথাসম্ভব পুরাতন রীতি রক্ষা করিয়া সেগুলির সংস্কার করাইয়াছেন। ফলতঃ আজ বিংশ শতাব্দীতেও জাপানী সভ্যতার শৈশবকাল সম্পূর্ণরূপে বুঝিবার সুযোগ পাইতেছি।

হরিয়ুজিতে জাপানী সভ্যতার শৈশবাবস্থা দেখিতেছি সত্য—কিন্তু ইহা এশিয়াটিক্ সভ্যতার শৈশবকাল নহে। জাপানে যখন কোরিয়ার বৌদ্ধগণ গুরুগিরি করিতে আসেন, তখন কোরিয়ায় এবং চীনে সভ্যতার মধ্যাহ্নকাল বলিতে হইবে। ভারতবর্ষে তখন কালিদাস-বিক্রমাদিত্যের পরবর্ত্তী যুগ। এশিয়ার পশ্চিমপ্রান্তে তখন মহম্মদের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে মাত্র। কিন্তু মুসলমান গৌরব সুরু হয় নাই। ইয়োরোপে তখন বর্ব্বর যুগের তাণ্ডব চলিতেছে। বস্তুতঃ তখন ভারতীয় প্রভাবের মণ্ডলে এশিয়াবাসী জীবন যাপন করিত। সেই পূর্ণাঙ্গ ভারতীয় সভ্যতা এবং ভারতশিষ্য চীন ও ভারতপ্রশিষ্য কোরিয়ার উত্তরাধিকারীরূপে জাপান জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে জীবন আরম্ভ করিল। এই কারণে হরিয়ুজিতে

জাপানের শৈশবযুগ দেখিয়া আদিম মানবের পরিচয় পাইতেছি না—বরং শ্রেষ্ঠতম শিল্পজ্ঞান এবং সমাজ-জীবনের লক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। অন্যান্য জাতিপুঞ্জ সভ্যতার অ, আ, ক, খ হইতে হাতে খড়ি দিয়াছে—কিন্তু জাপান একটা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সভ্যতা লইয়াই জন্মগ্রহণ করিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে আমেরিকার নব ভূখণ্ডে যেরূপ ইয়োরোপের সমাজজীবন পুরাপুরি স্থানান্তরিত হইয়াছিল—তাহার ঠিক এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে এশিয়ার তৈয়ারী মাল জাপানে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। আমেরিকার সঙ্গে ইয়োরোপের যে সম্বন্ধ, জাপানের সঙ্গে এশিয়ার সম্বন্ধ ঠিক তাহাই। এই কারণেই শিশুজাপানে শিশুত্ব দেখিলাম না—একটা প্রৌঢ় জীবনের চরম পরিণতি দেখিতেছি। ভারত ও চীনের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীর হরিযুজিবিহারে পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে। নারা-নগরীতে মিউজিয়াম, কাসুগা-মন্দির এবং দাইবুৎসু দেখিয়া যাহা বুঝিতে পারি নাই—নারার ৮।১০ মাইল দূরস্থিত হরিযুজি-পল্লীতে আসিয়া তাহা বেশ অনুভব করিতেছি। আমাদের নালন্দাবিহার কিরূপ ছিল তাহার ইঙ্গিতও এইখানে পাইলাম।

হরিযুজির গৃহসংস্থান, পথসমাবেশ, মন্দির-সংখ্যা ইত্যাদি দেখিলে একটা নবীনতম বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রের আবহাওয়া মনে পড়ে। কুটীর-সমূহ হয় ছাত্রাবাস, না হয় অধ্যাপকগৃহ; মন্দির ও মঠগুলি একাধারে শিল্প-মিউজিয়াম, গ্রন্থশালা এবং উপাসনা-গৃহ ও বক্তৃতালয়। বলা বাহুল্য, মধ্যযুগের মানবজীবন ধর্ম্মতত্ত্ব ও দেবতত্ত্ব ইত্যাদির দ্বারা অনু-শাসিত হইত। কাজেই হরিযুজি-বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরণধারণ, রীতিনীতি একটা ধর্ম্মশালা, বিহার বা পুরোহিত-সংঘের নিয়মাধীন ছিল। বস্তুতঃ সেই যুগে বিদ্যালয় নামে স্বতন্ত্র কোন প্রতিষ্ঠান জগতের কুত্রাপি ছিল না, অধ্যাপক নামেও কোন স্বতন্ত্র সম্প্রদায় জগতে দেখা দেয় নাই।

ভারতের নালন্দা, কাইরোর এল্-আজার, বিলাতের অক্সফোর্ড এবং জাপানের হরিয়ুজি একসঙ্গে বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয়রূপে বিরাজ করিত।

দোভাষীর সাহায্যে স্থানীয় পুরোহিতগণের সঙ্গে আলাপ করিলাম। ইঁহারা বলিলেন—"পূর্ব্বে এই পল্লীতে ৬৬ মন্দির ছিল—এক্ষণে মাত্র ১৫ টা দেখিতে পাইবেন।" প্রধান সৌধগুলি দেখিতে অগ্রসর হইলাম। প্রথমে একটা তোরণদ্বার পার হইতে হইল। প্রশস্ত পথের দুইধারে কতকগুলি পুরোহিত-গৃহ। প্রাচীনকালে এইরূপ এক গৃহে প্রধান পুরোহিতের কার্য্যালয় ছিল—আজকালও এখানে আফিস দেখিলাম।

এই ভূমির পর খানিকটা উর্দ্ধে দুই চারি ধাপ উঠিতে হইল। এইখানে মঠের দরজায় উপস্থিত হইলাম। ফটক দ্বিতল—ফটকে দুইজন দ্বারপালক দণ্ডায়মান। এই দুই মূর্ত্তি প্রত্যেক বৌদ্ধ-মন্দিরের দ্বারদেশে দেখিয়াছি। এই দুই মূর্ত্তিকে নাইও (Ni-o) বলে। ইহাদের গঠন বিশাল ও ভীষণ—দেখিলেই প্রচণ্ড রুদ্রমূর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শুনিলাম, ইহাদের নাম ইন্দ্র ও ব্রহ্মা। দৈত্য-দানবগণকে মন্দিরাদি পুণ্য-স্থান হইতে দূরীভূত করিবার জন্য এই দুই রাজদেবের প্রতিষ্ঠা হয়।

পুরোহিতগণ বলিলেন—এই ফটকটি ষষ্ঠ শতাব্দীর রচনা—কোন কালেই ইহা আগাগোড়া নষ্ট হয় নাই। কয়েক বৎসর হইল ইহার স্থানে স্থানে সংস্কার সাধন করিতে হইয়াছে।"

এই ফটক একটা প্রশস্ত বারান্দার মধ্যস্থলে অবস্থিত। এইরূপ চারিটি বারান্দাদ্বারা একটি সুবিস্তৃত চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ তৈয়ারি হইয়াছে। বারান্দাগুলির ছাদ আছে—প্রাঙ্গণের আকাশ মুক্ত। এই প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে ডাইনে ও বামে দুইটি সৌধ দণ্ডায়মান। এই দুইটিও ফটকের মত প্রাচীনতম কালেরই রচনা। বজ্রপাতে, অগ্নিকাণ্ডে, অথবা যুদ্ধানলে এই সৌধদ্বয়ের অনিষ্ট হয় নাই। ডাইনের সৌধের নাম কোন্দো বা

প্রধান মন্দির—বামের সৌধটি প্যাগোডা। ফটকের অপর দিকে সুবৃহৎ বক্তৃতা-গৃহ। ইহা বজ্রাঘাতে একবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল—এক্ষণে দশম-একাদশ শতাব্দীর পুনর্গঠন বিদ্যমান। বক্তৃতালয়ের সম্মুখে একটা পিত্তলের দীপ অবস্থিত। এই ধাতুগঠিত দীপের রচনা অন্যান্য জাপানী প্রস্তর-দীপের অনুরূপ। বক্তৃতালয়ের নিকটে দুই পার্শ্বের বারান্দায় দুইটি গৃহ মুখোমুখি নির্ম্মিত। একটাতে ঘণ্টা থাকে—অপরটি ঢাকের ঘর

একজন পাশ্চাত্য বাস্তুবিজ্ঞানবিৎ এই সৌধসমূহ সম্বন্ধে বলিতেছেন—"This group of buildings—gate, temple and pagoda—is the most precious architectural monument in Japan, indeed in all Asia, for it not only marks the birth of Japan as a civilised power, but from it we can reconstruct the architecture of China, now swept out of existence and only a memory. And its artistic value is no less, small as they are, these buildings are almost unequalled in Japan for absolute beauty, and they have remained the type from which all the architecture of the nation has developed." অর্থাৎ "এইগুলি হইতে প্রাচীন চীনের বাস্তুশিল্পও বুঝিয়া লইতে পারি। চীনে পুরাণা শিল্পের নিদর্শন আজকাল নাই বলিলেই চলে। আর পরবর্ত্তী কালে জাপানে যাহা কিছু হইয়াছে তাহার গোড়াও এই গৃহসমূহে। কাজেই এশিয়ার ইতিহাসে এইগুলির মূল্য যৎপরোনাস্তি।"

কোন্দো বা প্রধান মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, মধ্যস্থলে কতকগুলি দেবমূর্ত্তি স্থাপিত। পিত্তলের বুদ্ধের এক পার্শ্বে পিত্তলের আমিদা, অপর পার্শ্বে পিত্তলের ইয়াকুশি বা স্বাস্থ্যদেবতা। চারি কোণে চারিটি

দ্বারপাল অসৎনাশ করিবার জন্য দণ্ডায়মান। প্রধান মূর্ত্তিত্রয়ের ঊর্দ্ধে ছাদ হইতে তিনটা স্বতন্ত্র ছাতা ঝুলিতেছে। ছত্রগুলি চিত্রিত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তিসমাবেশের দ্বারা শোভিত। পুরোহিত একটি মূর্ত্তিসম্বন্ধে বলিলেন —"এটি দক্ষিণ ভারত হইতে আমদানি করা হইয়াছে বলিয়া জনশ্রুতি। শোতোকুতাইশিএই দেবতার বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন।" দেবতার বিশ হাত—প্রত্যেক হাতে স্বতন্ত্র আভরণ।

হরিয়ুজি-বিহারের বহু মন্দিরেই নাকি ভারতীয় স্থপতিগণের গঠিত মূর্ত্তি অনেক আছে। কোন্দোর ভিতরকার দেওয়ালগুলি সুচিত্রিত। কাঠের উপর খড় ও মাটি লেপিয়া চূণকাম করা হইয়াছিল—এই সাদা জমিনে চিত্র-শিল্পিগণ তাঁহাদের নমুনা রাখিয়া গিয়াছেন। এই গুলির অঙ্কন, বর্ণ-সমাবেশ, ভঙ্গী এবং আকৃতি দেখিলে ভারতীয় চিত্রশিল্প হইতে পার্থক্য করা কঠিন। অজন্তার কথা মনে পড়ে। দেবদেবীগণের মূর্ত্তি-অঙ্কনেও হরিয়ুজি-শিল্পীরা ভারতবর্ষকেই প্রচার করিয়া ফেলিয়াছেন। কোরিয়ার ধর্ম্মপ্রচারকগণ ভারতীয় প্রভাবের কতটা অধীন ছিলেন, এই প্রাচীন চিত্রগুলি দেখিলে তাহা বেশ বুঝিতে পারি।

প্যাগোডা ছয়টা ছাদে বা স্তরে সম্পূর্ণ। ইহার সর্ব্ব নিম্ন তলের চারি দিকে বৌদ্ধধর্ম্মবিষয়ক কাহিনীর মূর্ত্তি দেখিতেছি। প্রত্যেক দিকে শুমিসেন নামক পাহাড় প্রস্তুত করা হইয়াছে। শিল্পিদিগের পর্ব্বত গড়া দেখিয়া চীনা-রীতি ধরিতে পারা যায়। শুমিসেন-পর্ব্বত জাপানীদের স্বর্গ অর্থাৎ ভারতবর্ষের কোন অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া প্রবাদ। এই কাল্পনিক শুমিসেন-পর্ব্বতের ভিতর একটা করিয়া গহ্বর প্রস্তুত করা হইয়াছে। অজন্তা ইত্যাদির পর্ব্বতকন্দরে যেরূপ বৌদ্ধ-সমাজের সকল তথ্য চিত্রিত রহিয়াছে, সেইরূপ হরিয়ুজি-প্যাগোডার নিম্নতম তলে চারিটি কন্দরে বৌদ্ধধর্ম্মের চারিটি তথ্য মূর্ত্তিসহ প্রচারিত হইতেছে। এক দিকে দেখিলাম, বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-

যাত্রা—শিষ্যগণ দুঃখে বিভোর। এই নির্ব্বাণের দৃশ্যে পশুপক্ষীদিগের দুঃখ দেখান হয় নাই। মূর্ত্তিগুলি মৃত্তিকানির্ম্মিত—কিন্তু শয়ান বুদ্ধের অঙ্গ সোনালি রঙ্গে রঞ্জিত। দ্বিতীয় কন্দরে বুদ্ধের কবর প্রদর্শিত হইয়াছে। তৃতীয় কন্দরে দুইজন বোসাৎসু বা বোধিসত্ত্ব বক্তৃতা করিতেছেন। চতুর্থ কন্দরে আমিদা, কোয়ান্নন ইত্যাদি স্থাপিত। এই সকল মূর্ত্তি-নির্ম্মাণে চুন্নি নামক স্থপতির নাম জানিতে পারা যায়।

বক্তৃতা-গৃহে তিনটি মূর্ত্তি স্থাপিত। মধ্যস্থলে ইয়াকুশি এবং দুই ধারে সূর্য্য ও চন্দ্র দেবতাদ্বয়। এই গৃহের দেওয়ালে কাঠের জালি দেখিয়া ভারতীয় শিল্পের ইঙ্গিত পাইলাম।

শুনিলাম, প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এখানে বৌদ্ধ-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে জনসাধারণের কোন সংস্রব নাই।

প্রধান সৌধসমূহের চতুষ্কোণ-প্রাঙ্গন হইতে বাহিরে আসিলাম। প্রথমে এক গৃহে হরিযুজি-স্থাপয়িতা শোতোকুর চিত্র দেখা গেল। তাহার পর আর এক গৃহে হরিযুজি-পল্লীর প্রাচীন সম্পদ নানা নিদর্শন সহ বুঝান হইয়াছে। মূর্ত্তি, চিত্র, হস্তলিপি, মুখোস ইত্যাদি বহু বিষয়ক দ্রব্য এই সংগ্রহালয়ে দেখা গেল।

এই সকল গৃহ হইতে অনতিদূরে ইয়াকুশি-দেবের অষ্টকোণ মন্দির দেখিতে আসিলাম। এই দেবতার খাতির জাপানে অত্যধিক। রোগমুক্ত হইয়া লোকেরা ইয়াকুশির নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। নাবিকেরা সমুদ্র-পথে হঠাৎ বিপন্ন হইলে ইয়াকুশির নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে। তাহার ফলে যদি ত্রাণ পায় তাহা হইলে উহারা এই মন্দিরে নানা উপঢৌকন পাঠাইয়া দেয়। এইরূপে উপঢৌকন অত্যধিক জমা হইয়াছে দেখিলাম। পুরুষেরা সাধারণতঃ তরবারি উপহার দিয়া থাকে—স্ত্রীলোকেরা আয়না,

চিরুণী ইত্যাদি প্রদান করে। ইয়াকুশি-দেবের পূজা মাসে দুইবার করিয়া হয়।

বিহার-স্থাপয়িতা নরপতির প্রাসাদ দেখিবার জন্য কিছু দূরে যাইতে হইল। এখানে প্রথমে একটা অষ্টকোণ মন্দির দেখিলাম। ইহার মধ্যে কোয়ান্নন্ মূর্ত্তি। শুনিলাম, শোতোকু তাইশি একটা স্বপ্নের ইঙ্গিত অনুসারে এই মন্দির স্থাপন করেন।

পার্শ্বেই প্রাসাদ। তাহার এক প্রকোষ্ঠে "শারি" প্রস্তর রক্ষিত হইতেছে। ইহা নাকি বুদ্ধদেবের বাম দিকের নয়নতারা। প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে পুরোহিতেরা এই প্রস্তর পূজা করিয়া থাকেন। স্বতন্ত্র পয়সা না দিলে শারি কেহই দেখিতে পায় না। দেখা গেল, স্ফটিকের পাত্রের ভিতর ক্ষুদ্র প্রস্তরকণা রহিয়াছে। এই পাত্র পরপর পর্দ্দাদ্বারা আবৃত। মহা সম্ভ্রম ও সতর্কতার সহিত খুলিয়া পুরোহিতগণ শারি দেখাইলেন।

রেলে ১৫ মাইল আসিয়া তেম্নোজিতে পৌঁছিলাম। এই ষ্টেশন ওসাকার একটা পাড়ায় অবস্থিত। দোভাষী বলিলেন—"ঐ দেখুন প্যাগোডা। উহাও শোতোকু তাইশি কর্ত্তৃক ষষ্ঠ শতাব্দীতেই স্থাপিত হইয়াছিল।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

এশিয়ার ম্যাঞ্চেষ্টার

দেহাত্মক বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ারাম

জাপানী ঐতিহাসিকগণ ওসাকাকে শোতোকুতাইশি এবং কোরিয়ার বৌদ্ধ প্রচারকগণের প্রথম কর্ম্মকেন্দ্ররূপে গৌরব প্রদান করিবেন। তেন্নো-জির প্যাগোডা দূর হইতে দেখিয়া এইরূপ ভাবিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই গাড়ীর জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখি, চারিদিকে "চিম্‌নির" জঙ্গল। অসংখ্য ধূমনির্গমের নলে ওসাকাকে একটা সুবৃহৎ কারখানায় পরিণত করিয়াছে। জাপানের প্রাচীনতম কেন্দ্রে বর্ত্তমান জগতের নবীনতম নিদর্শন পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে। তোকিওর কলযন্ত্র ফ্যাক্টরি ইত্যাদি দেখিয়া ওসাকার রূপ কল্পনা করা যায় না। তোকিওতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের চিহ্ন এখনও অনেক আছে—ওসাকা পুরাপুরি আধুনিক নগর। এখানে তেন্নোজি-বিহার আজকাল একটা খাপছাড়া পদার্থ। ইয়াঙ্কিস্থানের শিকাগো অথবা ইংরাজের ম্যাঞ্চেষ্টার যেন নিপ্পনদেশের এই সাগরকূলে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

শ্রাবণ মাসে ওসাকাতে যেরূপ গরম পাইতেছি কলিকাতায়ও এত দেখা যায় না। রাস্তার দুই ধারের দোকানদারেরা ছাদে-ছাদে তার লাগা-ইয়া কাপড়ের আবরণ প্রস্তুত করিয়াছে। এই কারণে গলির ভিতর সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে না। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে

এইরূপ করিবার প্রয়োজন হয়—মিশরের কাইরোতেও এইরূপে গলি ঢাকিবার ব্যবস্থা দেখিয়াছি। যাঁহারা বলিয়া থাকেন, ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ বলিয়া ভারতীয় চরিত্র উন্নত হইতে পারে না, তাঁহারা এক-বার ওসাকায় আসিয়া বাস করুন। ত্রিশ বৎসরের ভিতর নিতান্ত গ্রীষ্ম-পীড়িত মশকপ্রধান ম্যালেরিয়া-বাথানেও একটা ম্যাঞ্চেষ্টার গড়িয়া উঠি-য়াছে—ইহা স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন।

আমরা ভারতবর্ষে মুক্তি, নির্ব্বাণ, ত্যাগ, বৈরাগ্য, সংযম, ইন্দ্রিয়দমন, ব্রহ্মচর্য্য, ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বোধ-হয় এই সমুদয়ের ব্যবহার আরও বেশী ছিল। হয়ত কথা অনুসারে কাজও হইত। বর্ত্তমান কালে ব্যক্তিগত জীবনে, এবং সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে এই সমুদয় তত্ত্বের প্রয়োগ কতটা আছে জানি না। কিন্তু শব্দগুলি মুখে আওড়ান এখনও আমরা বন্ধ করি নাই। "ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে"—এ কথা আমরা বোধহয় চিরকালই বলিব। কথাটা যেন ভবিষ্যতে কার্য্যেও পরিণত হয়।

দুনিয়ার অন্যান্য সমাজে এই সকল শব্দ অথবা তত্ত্বের রেওয়াজ এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। ইংরাজ ও ইয়াঙ্কি—কেহই ব্রহ্মচর্য্য, বৈরাগ্য, ইন্দ্রিয়দমন ইত্যাদির ধার ধারে না। জাপানেও দেখিতেছি, এখানকার লোকেরা "ইন্দ্রিয়ারাম" এবং "দেহাত্মক বুদ্ধি"কে ভারতবাসীর আদর্শানু-সারে গর্হিত বিবেচনা করে না। খাওয়া-দাওয়া স্ফূর্ত্তিকরা—সকল প্রকার ভোগ প্রবৃত্তির চূড়ান্ত প্রশ্রয় দেওয়া—দুনিয়ার মানবের স্বধর্ম্ম দেখিতেছি। তথাপি দুনিয়ার লোক উন্নত মস্তকে জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করি-তেছে। তথাপি ইহাদের শারীরিক শক্তি এবং সামরিক বলের হ্রাস হইতেছে না। তথাপি ইহারা প্রয়োজন হইলে একসঙ্গে লক্ষ লক্ষ নর-নারী প্রাণ দিতেছে। পরকালে ইহাদের কি হইবে তাহা ত জানি না—

ইহকালে দেখিতেছি, জপানী বল, ইংরাজ বল, ইয়াঙ্কি বল, সকলেই পার্থিব সুখের কোন বস্তুতে বঞ্চিত হইতেছে না। আর ভারতবাসী পরকালে নন্দন কাননে বিচরণ করিবেন কি না কে বলিতে পারে? বর্ত্তমানে ত দেখিতেছি, সুখ, আনন্দ, স্ফূর্ত্তি, ভোগ ইত্যাদি কাহাকে বলে, ভারতবাসীর অভিধানে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভারতবাসীর না আছে শরীরে বল, না আছে চিত্তে শক্তি, না আছে ঘরে চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়, না আছে হাটে-বাজারে বাগানে-পাহাড়ে খেলা-ধূলা আমোদ-প্রমোদ। ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়াও দুনিয়ার লোক "ফার্ষ্ট ক্লাশ পাওয়ার" হইবার উপযুক্ত হইতে পারে। আর আমরা সংযম, সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদি আওড়াইয়াও একটা বড় ধরণের ব্যবসায় চালাইতে অসমর্থ হইতেছি। আমরা দেশে যেসকল কার্য্যকে নিতান্ত ঘৃণিত, জঘন্য ও পাশবিক বিবেচনা করি তাহা সত্ত্বেও জগদ্বাসী পৃথিবীতে কৃতকার্য্য হইতেছে। আমাদের হিসাবে যেসকল নরনারী চরিত্রহীন অথবা নীতিভ্রষ্ট সেই সকল নরনারী বাদ দিলে বর্ত্তমান জগতের কোন সমাজে লোক খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এই কথাটা সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণের গভীর ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

কাম, কাঞ্চন, কীর্ত্তি—এই তিন বস্তু আমাদের ভারতীয় চিন্তায় আধ্যাত্মিক জীবনের অন্তরায়। এগুলিকে পুরাপুরি না হউক—অন্ততঃ খানিকটা দাবিয়া রাখা আমাদের দেশে চরিত্রবত্তার লক্ষণ। কিন্তু ইয়োরামেরিকার লোকেরা (এবং জাপানীরাও) কোন বিষয়েই সংযমপালনের বিশেষ আবশ্যকতা আছে, স্বীকারই করে না। "জন্মগ্রহণ করিয়াছ—যে ক্ষেত্রে যাহা পার করিয়া যাও"—ইহাই সকল জাতির ব্যক্ত অথবা অব্যক্ত নীতি। কীর্ত্তির কথাই ধরা যাউক—ইহা ত সাধুপুরুষগণেরও ব্যাধি—"last infirmity of noble minds." যশের আকাঙ্খা ত্যাগ করিতে জগতে

কয়জন পারে? ভারতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিগণ কীর্ত্তির বাসনা বর্জ্জন করিয়াছেন এবং করিতে উপদেশ দেন। কিন্তু জগতের লোক কীর্ত্তি অর্জ্জন করিবার জন্যই ব্যস্ত। তাহারা জানে—"সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে।"

তাহার পর কাঞ্চনের কথা। টাকা পয়সার প্রতি লোভ নাই ইংল্যাণ্ডে, আমেরিকায় অথবা জাপানে এরূপ লোক আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। হয়ত ভারতবর্ষে এরূপ লোক খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইবে না। "ঘুশ খাওয়া" দুনিয়ার সর্ব্বত্র প্রচলিত। আমেরিকায় অর্থগৃধ্নুতা আব-হাওয়ার সঙ্গে যেন এক প্রকার মিশিয়া রহিয়াছে। বিলাতের কার্য্যালয়-সমূহে ঘুশ দিবার ও লইবার রেওয়াজ বেশ আছে। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরাও "টিপ্" পাইলে মিষ্টভাবে "ধন্যবাদ" শব্দ ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত। ট্যাক্সির গাড়োয়ান হইতে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার পর্য্যন্ত সকলেই পদমর্য্যাদা অনুসারে "টিপ্" অর্থাৎ বকৃশিষ অর্থাৎ ঘুশ লইয়া থাকেন। সরকারী কাজে চুরি বাটপাড়িও সর্ব্বত্রই সুপ্রচলিত। বৎসর দুএক হইল জার্ম্মাণ গবর্মেণ্টের সেনাবিভাগে এইরূপ "করাপ্‌শনের কলঙ্ক" প্রচারিত হয়। একজন উচ্চ-পদস্থ সেনাধ্যক্ষ চৌর্য্য অপরাধে দণ্ডিত হন। এই জার্ম্মাণ অর্থগৃধ্নুতার সঙ্গে জাপানী অর্থগৃধ্নুতা লিপ্ত ছিল। জার্ম্মাণ সরকারের অনুসন্ধানে একজন জাপানী নাবধ্যক্ষের চৌর্য্যবৃত্তি ধরা পড়ে। জাপান সরকারকে তৎক্ষণাৎ জানান হয়। জাপানী নাবধ্যক্ষের শাস্তি হইয়াছে। জাপানে আসিয়া অবধি প্রতিদিন শুনিতেছি, আজ অমুক পার্ল্যামেণ্ট সভ্যকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে—আজ অমুক ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে জেলে পাঠান হইল ইত্যাদি। ইহাদের অপরাধ—সরকারী টাকা "মারিয়া লওয়া," "এম্‌বেজ্‌লমেণ্ট," ঘুশ খাওয়া, অর্থ পৈশাচিকতা ইত্যাদি। এমন কি, এখানে মন্ত্রি-পরিষৎকেও বিশ্বাস করা চলে না। বহুক্ষেত্রে বহু মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ঘুশ খাওয়ার অভিযোগ

হইয়াছে। বর্ত্তমান ওকুমা-মন্ত্রি-পরিষদের আমলে নাকি কর্ম্মচারীগণের চরিত্র খানিকটা নিষ্কলঙ্ক। তথাপি কাণাঘুষা বেশ চলিতেছে। কাগজ পত্রে প্রকাশিত হয়—"মন্ত্রীবর ওকুমা চিরকাল স্থায়পরায়ণতা, চরিত্রবত্তা, লোভহীনতা, কাঞ্চন-সংযম ইত্যাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া আসিয়াছেন। তথাপি তাঁহার আমলে অমুক অমুক বিভাগে উৎকোচ-গ্রহণের জনরব প্রকাশিত হয় কেন?" শেষ পর্য্যন্ত একদিন কাগজে পড়িলাম—ওকুমার প্রধান সহকারী ভাইকাউন্ট মহাশয়ের বিরুদ্ধে ঘোরতর অভিযোগ তোলা হইয়াছে। এই কারণে ওকুমা-মন্ত্রী-পরিষৎ মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিলেন। কাঞ্চনের স্পৃহা জাপানে কম কি? তথাপি জাপান "ফার্ষ্ট ক্লাশ পাওয়ার"! সুতরাং অর্থপিশাচ বলিয়া ভারতবাসী অবনত, এরূপ ভাবা অশুচিত।

কীর্ত্তির আকাঙ্ক্ষা বা কাঞ্চনের আকাঙ্ক্ষা ভারতবাসীর চিন্তায় পাপস্বরূপ—কিন্তু জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, এই পাপ ভারতবাসীরই একচেটিয়া নয়।

এইবার কামের কথা—এ বিষয়ে আলোচনা না করাই ভাল। ইয়োরামেরিকার সমাজে কামবিষয়ক সংযম কাহাকে বলে, তাহা জানা নাই। আমাদের "ব্রহ্মচর্য্য"-পালন এবং সতীত্ব এসকল দেশের পারিবারিক ও সামাজিক নিয়মে স্থান পাইতেই পারে না। সকলেই চোখ বুজিয়া জীবনযাপন করে—পরস্পর পরস্পরের ভিতরকার কথা না জানিলেও সহজেই অনুমান করিয়া লয়। অসংযম, অনিয়ম বা ব্যভিচার, মারাত্মক দোষরূপে গৃহীত হয় না। যে কোন ভারতবাসী ইহাদের কাণ্ড দেখিলে শিহরিয়া উঠিবেন।

জাপানেও এই কথা—উচ্চ শ্রেণী, মধ্য শ্রেণী, নিম্ন শ্রেণী—সকল শ্রেণীর লোকই বেশ্যাসক্ত। প্রকাশ্যভাবে বেশ্যালয়ে যাওয়া-আসা নিন্দিত নয়। ইয়োরামেরিকার খৃষ্টানেরা বেশ্যা-শব্দ ব্যবহার করিতে নারাজ—কিন্তু

বেশ্যাবৃত্তি বলিলে যাহা বুঝা যায়, তাহার পরিমাণ জাপানে যেরূপ, পাশ্চাত্য সমাজেও সেইরূপ। অতএব দেখা যাইতেছে, বেশ্যাসক্ত সমাজও পোর্ট-আর্থরে প্রাণ দিবার জন্য লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে পাঠাইতে পারে। আর আজ পাশ্চাত্য দেশের এইরূপ সংযমহীন সমাজসমূহ হইতেই বহু লক্ষ যুবক ও প্রাচীন লোক ইয়োরোপের কুরুক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়া মহাযুদ্ধ করিতেছে। কাজেই কথায় কথায় ভারতীয় চরিত্রের অবনতিকে আমাদের অকৃতকার্য্যতার কারণরূপে সপ্রমাণ করা উচিত নয়।

বিশুদ্ধ আমোদপ্রমোদ, সংযত ইন্দ্রিয়ারাম, নির্ম্মল আনন্দভোগ ইত্যাদি ত এই সকল দেশে আছেই। ভারতবাসীর মত নিরানন্দ ও নিৰ্জ্জীবভাবে দুনিয়ার কোন লোক জীবন ধারণ করে না। ওসাকাতে হোটেলের জানালা হইতে দেখিতেছি, শত শত বালক, যুবক, বৃদ্ধ, ঘোলো-পাওয়া নদীতে একসঙ্গে দল-বাঁধিয়া সাঁতার দিতেছে। সন্ধ্যার পর সহর দেখিতে বাহির হইলাম। প্রত্যেক রাস্তায় ও গলিতে নরনারীর সংখ্যা অত্যধিক। সকলেই নৈশ-ভোজনের পর বেড়াইতে বাহির হইয়াছে—কাহারও চিত্তে উদ্বেগ নাই, আশঙ্কা নাই—দৈন্য নাই। কেহ রাস্তার আলো দেখিতেছে—কেহ দোকানগৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভিতরকার সাজান জিনিষগুলি দেখিতেছে—কেহ ধীরে ধীরে পায়চারি করিতেছে। নৈশ-ওসাকার লোকজন, গতিবিধি এবং আলোকমালা দেখিয়া নৈশ-শিকাগো মনে পড়ে। থিয়েটার, বায়স্কোপ, নাচগান, বাজনা ইত্যাদি বহির্মুখী জীবনের সকল অনুষ্ঠানই জাপানের এই নবীন নগরে রাশীকৃত। পার্কে যাইয়া দেখি, সেখানেও লোকের ভিড়। প্যারিসের আইফেল-স্তম্ভের অনুকরণে ওসাকায় একটা টাওয়ার আছে। রাত্রিকালে বৈদ্যুতিক বাতির শোভায় ইহা সমুজ্জল থাকে। ইলেকট্রিক লিফ্‌টের সাহায্যে লোকে শিখরে উঠিতে পারে—সেখান হইতে সমগ্র নগরের নৈশদৃশ্য দেখা যায়।

একবার রাত্রিকালে নৌকায় বাহির হইলাম। ক্ষুদ্র তরণী বিদ্যুতের শক্তিতে চলিতেছে। এইরূপ প্রমোদতরী ওসাকায় সহস্র সহস্র দেখিতে পাই। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক বজরা, পান্সি, ছিপ ইত্যাদিও নানা চীনা লণ্ঠনের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া খালে ও নদীতে ভাসিতেছে। কোনটা হোটেল বা রেস্তরাঁ বা সরাই—কোনটা বা সৌখীন নরনারীগণের বিহার-নৌকা। সহরের ভিতর দিয়া খাল ও নদী অনেক গিয়াছে। ওসাকায় স্থলপথের সংখ্যা বেশী কি জলপথের সংখ্যা বেশী, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন মনে হয়। এই কারণে ওসাকাকে এশিয়ার ভেনিস বলা হইয়া থাকে। রাত্রিকালে নৌকা হইতে দুইদিকে দেখিতেছি, নাচগান, বাজনা, আমোদ-প্রমোদ, বিশ্রাম, আনন্দ ইত্যাদির আয়োজন। নৈশ-ওসাকায় কুত্রাপি চিন্তা, উদ্বেগ, আশঙ্কা, দুঃখ নাই।

সহর হইতে কিছু দূরে একটা পাহাড়ে বেড়াইতে গেলাম। মেপল্-তরুর জঙ্গলে এই পাহাড় সমাবৃত। মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র ঝরনা বহিয়া যাইতেছে—দুইধারে উচ্চ পাড়। বক্র পথে পাদদেশ হইতে প্রায় ১৫০০ ফিট ঊর্দ্ধে উঠিলাম। ঝরণার উৎপত্তি স্থানে একটা সুবৃহৎ জলপ্রপাত। প্রায় ১০০ ফিট নিম্নে জল লাফাইয়া পড়িতেছে। এই পথে বহু জাপানী নর-নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সকলেই গরমের দিনে বৃক্ষসমাচ্ছাদিত পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে চলিয়াছে! অনেকে কিছুকাল এইখানে কাটাইবে। এজন্য বহু সরাই এবং হোটেল পার্ব্বত্য কুঞ্জবনে দেখিতে পাইলাম। জলপ্রপাতের সম্মুখস্থ একটা সরাইয়ে কয়েক ঘণ্টা কাটান গেল। একটা তাজা মিরুগেল মাছ ধরাইয়া বাঙ্গালী ঝোল প্রস্তুত করান হইল। বেগুন, আলু, কাঁচা-লঙ্কা ইত্যাদির ঝোল বহুদিন পরে আস্বাদন করিলাম। দোভাষী মহাশয় কাঁচা মাছই খাইলেন।

জাপানীরা সৌন্দর্য্যপ্রিয় এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনুরক্ত। জাপানের

ভিতর যতগুলি রমণীয় স্থান আছে সকলগুলির নাম ও বিবরণ ইহাদের সকলেরই জানা থাকে। ইহারা মাসের নাম করিতে হইলে, সেই মাসে যে ফুল বেশী ফুটে, তাহার উল্লেখ করে। ইহাদের চিত্রকলায় দেশের নদনদী, বন, উপবন, পর্ব্বত, হ্রদ, সাগর কূল ইত্যাদি সবই চিরস্থায়ী হইয়াছে। আজ দেখিলাম, কতিপয় চিত্রবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এই কোবায় আসিয়া চিত্রাঙ্কন করিতেছে। Feudal and Modern Japan অর্থাৎ "পুরাতন ও নবীন জাপান" নামক গ্রন্থে Knapp লিখিয়াছেন—'It is not uncommon to read in the public journals that some prominent noble or minister of state is journeying to view some famed cherry blossom grove, and there soon follows the poem which the vision of beauty is sure to evoke from his pen." অর্থাৎ "কোন বিখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক হয়ত একদিন চেরিরসমের কুঞ্জে বেড়াইতে গেলেন। পরদিন সংবাদ-পত্রে দেখিলাম রাষ্ট্রবীর মহাশয় সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া একটা কবিতা লিখিয়া ফেলিয়াছেন। জাপানীসমাজে এইরূপ যখন-তখন শুনা যায়।"

জাপানীদের সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা এবং প্রকৃতি-পূজা দু'একদিনের জিনিষ নয়। অষ্টম শতাব্দীতেও জাপানী গ্রন্থকারেরা দেশের বৃত্তান্ত লিখিতে যাইয়া প্রকৃতির সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিবৃত করিতেন। এই সকল ভৌগোলিক পুস্তক পাঠ করিয়া জনসাধারণ স্বদেশের প্রকৃত মূর্ত্তি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিত এবং দেশের পরিচয় লাভ করিবার জন্য পর্য্যটনে বাহির হইতে উৎসাহিত হইত। স্বদেশ-প্রেম জাগাইবার পক্ষে এইরূপ ভূগোলরচনা এবং প্রকৃতি-পূজা অল্প সাহায্য করে নাই। প্রকৃতি-সেবক য়ামাতো-সন্তান আপনা-আপনিই স্বদেশভক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ওসাকার ফ্যাক্টরি ও মিউনিসিপ্যালিটি

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ওসাকাতে একটিও কলকব্জা যন্ত্র ইত্যাদি ছিল না। আজ এখানে কলের চরকাই আছে বিশলক্ষেরও অধিক। বিলাতের ম্যাঞ্চেষ্টারে চরকার সংখ্যা ইহার দ্বিগুণ মাত্র।

চীনে, কোরিয়ায় এবং এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে মাল যোগান ওসাকার মহাজনগণের কার্য্য। ভারতবর্ষের বাজার দখল করিবার জন্যও ইঁহারা লালায়িত। এশিয়ার এই ম্যাঞ্চেষ্টার আসল ম্যাঞ্চেষ্টারের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে।

ওসাকার একজন জাপানী খৃষ্টান ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ হইল। নাম তানাকা। ইনি কিয়োতোর দোশিষা-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছেন। পৃথিবী পরিভ্রমণও ইঁহার হইয়াছে। ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"চীনারা ত কয়েক মাস হইল জাপানী মাল বয়কট সুরু করিয়াছে। তাহার ফলে আপনাদের ক্ষতি হইতেছে কি?" তানাকা বলিলেন—"যথেষ্টই হইতেছে। আমাদের বহু মহাজনের ঘরে মাল পচিতেছে। ইয়োরোপীয় যুদ্ধের ফলে জার্ম্মাণ এবং অষ্ট্রিয়ান মাল ভারতবর্ষ, দক্ষিণ-আমেরিকা ইত্যাদি দেশে আসিতে পারিতেছে না। এই সকল বাজারের কিয়দংশ জাপানীদের হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু চীনা বয়কটে আমাদের যত অনিষ্ট হইতেছে তাহা পূরণ হওয়া সহজ নয়। চীনেই জাপানের বৃহত্তম বাজার। ওসাকার সমৃদ্ধি চীনের উপরই নির্ভর করে।"

জাপানে তুলার চাষ নাই—বিদেশী তুলা আমদানি করা হয়। ওসাকা তুলার কাপড়ের কলের জন্যই বিখ্যাত। ভারতীয় ধুতি প্রস্তুত করিতে

এখানকার শিল্পীরা জানে না। তানাকা, ধুতি দেখিবার জন্য, একবার হোটেলে আসিলেন।

ছোট-বড়-মাঝারি সকল প্রকার কারখানার সংখ্যা ৭০০০এর কম হইবে না। পশম, ধাতু, তেল, জাহাজ, দিয়াশলাই, যন্ত্র, সাবান, সিগারেট, ঔষধ, ছাতা, রং, কাগজ, বাতি, ল্যাকার, কার্পেট, খেলে, লোহার সিন্দুক, বাদ্যযন্ত্র, ঘড়ি ইত্যাদি নানা বিষয়ের কারখানা ওসাকায় দেখিতে পাওয়া যায়। রেশমের ফ্যাক্টরি এখানে নাই। সাত আট হাজার টাকা মূলধনের কারবার নিতান্ত কম নয়। কোটি টাকা মূলধনের কারবার বোধ হয় দশ বারটা মাত্র হইবে। লক্ষ টাকা মূলধনের কারবারই সাধারণতঃ দেখিতে পাই।

একটা সুবৃহৎ চামড়ার কারখানায় গেলাম। এখানে আজকাল রুশ গবর্মেণ্ট যুদ্ধের জন্য ঘোড়ার সাজ ইত্যাদি প্রস্তুত করাইতেছেন। ম্যানেজার বলিলেন—"মহাশয়, ফ্যাক্টরি দেখান সম্প্রতি অসম্ভব। কোন বিদেশীয় লোককে রুশ সেনাবিভাগের দ্রব্যাদি দেখিতে দিলে রুশ গবর্মেণ্ট দুঃখিত হইবেন।"

একজন উচ্চশিক্ষিত যুবক ব্যবসায়ী চামড়ার কারখানা দেখাইতে সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইনি বলিলেন—"মহাশয়, আমার মাতা যদি জানিতে পারেন যে, আমি এই ফ্যাক্টরিতে আসিয়াছিলাম তাহা হইলে আমাকে শুদ্ধ না করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে দিবেন না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম —"সে কি রকম?" যুবক বলিলেন, "চামারেরা জাপানে অস্পৃশ্য জাতি। ইহাদিগকে 'ইত্তা' বলে। ইহাদিগকে যদি স্পর্শ করি তাহা হইলে আমরা অশুদ্ধ হইয়া যাই। পুনরায় শুদ্ধ করিবার জন্য আমাদের উপর নুন ছিটান হইয়া থাকে।"

একটা কাচের কারখানা দেখিলাম। বড় বড় কাচের পাত্র এখানে

তৈয়ারি হয় না। নানা প্রকার গ্লাশ, বাতি ইত্যাদি ঢালাই-করা তৈজসপত্র এই ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত হয়। বালু ও চুণ কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে মিশাইয়া আগুনের ভাটিতে গলান হইয়া থাকে। এই গলান বস্তুই কাচ। পরে ইহা নানা আকারের ছাঁচে ঢালিতে হয়। নানা ভাটির সম্মুখে এই ঢালাই কাজ দেখিলাম। নিতান্ত শিশুগণকে এই কারখানায় কষ্টজনক কাজ করিতে দেখা গেল। এখান হইতে বহু বাক্স কাচের বাসন কলিকাতায় ও বোম্বা-ইয়ে রপ্তানি হইতেছে, শুনিলাম।

ওসাকায় লোকসংখ্যা ১,৪০০,০০০। তাহার মধ্যে মজুরের সংখ্যা লক্ষাধিক। ম্যাঞ্চেষ্টারের মত এই নগরে বড় বড় "tenement house", বা শ্রমজীবি-ব্যারাকের ভিতর কুলীদিগকে থাকিতে হয় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরে ইহারা বাস করিবার সুযোগ পায়। এই জন্য শ্রমজীবি-মহলে স্বাস্থ্যহানি বেশী হয় না।

প্রতি বৎসরই এই শিল্প ও ব্যবসায়ীকেন্দ্রের উন্নতি সাধিত হইতেছে। কাঠের বাড়ী আগুনে প্রায়ই পুড়িয়া যায়। নূতন গৃহ নির্ম্মাণের সময় মিউনিসিপ্যালিটি প্রশস্ত রাস্তা তৈয়ারি করিবার ব্যবস্থা করেন। পূর্ব্বে যেখানে সঙ্কীর্ণ গলি ছিল, আজ সেখানে কলিকাতার হ্যারিসন রোড দেখিতে পাই। আমেরিকার রীতিতে বড় বড় ইষ্টক-প্রাসাদও সর্ব্বত্র মাথা তুলিতেছে। বহির্ব্বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ওসাকাবন্দরে বিরাট পোতাশ্রয় নির্ম্মিত হইতেছে। আগামী বৎসর ইহা কার্য্যোপযোগী হইবে। নবীন জাপানের নবীনতম জীবন বুঝিতে হইলে ওসাকাতে আসা আবশ্যক।

কয়েক বৎসর হইল এই দৈনিকোন্নতিশীল নগর সম্বন্ধে একখানা ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রে "ওসাকায় পুনর্ব্বার"-শীর্ষক প্রবন্ধ বাহির হইয়া-ছিল। নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"But Osaka still has its narrow streets, mile after mile of shops, factories, warehouses, and markets, with goods of every conceivable description blocking up the way and myriads of toilers active as bees in a hive. How do these people live, what do they make, and with whom do they trade? Countless thousands busily employed outside the modern factories, engaged in home industry, each supplying its quantum of goods for consumption in Japan, in China or in India. Countless thousands inside the big factories at spindle and loom, grimy beings young and old, bottle flowers, machine shop denizens, soap makers, all these and thousands more are concentrated on the few square miles of Osaka. * * * Away beyond the crowded city, in the harbour districts are more miles of shipping and shipmakers, carpenters and block makers, iron works and iron workers, more grime and activity; all representing the real Great Powers of the world, Capital and Labour; away beyond the crowded city landward the twinkling lights in the farmer's houses in the evening show them to be still at work. The day's work in the fields is done, but they are still busy—they are factory workers, too, busy at home with articles for export, tooth-brushes and all sorts of things for what they provide cheap labour,

and which find a market in far away Australia, in South America and even in London itself. Toilers by day and toilers by night, the industry of the race is typified in Osaka." অর্থাৎ "সঙ্কীর্ণ গলির সংখ্যা আজও ওসাকায় কম নয়। দোকান, গুদাম, ফ্যাক্টরীতে গলির দুইধার ভরা। রাস্তাগুলি মালে অবরুদ্ধ। লোকজনের কর্ম্মতৎপরতা সর্ব্বত্র লক্ষ্য করা যায়। যেন চাকের মৌমাছিগুলি ভ্যান্‌ভ্যান্ করিতেছে। কোথাও বা বড় কারখানা কোথাও বা কুটির-শিল্পের আয়োজন। অসংখ্য প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। সবই জাপানের জন্য নয়। চীন এবং ভারতবর্ষের বাজারেও ওসাকার মাল চালান হইয়া থাকে। সহরের বাহিরে জাহাজঘাটায়ও লোহা লক্কর, যন্ত্র, খালাসী, ছুতার, কুলী, কামার মিস্ত্রীর দৃশ্য। মহাজনগণের মূলধনের পরিচয় যেমন পাইতেছি—শ্রমজীবিগণের কর্ম্মঠতাও সেইরূপ দেখিতেছি। সহর ছাড়াইয়া পল্লীতে পড়িলেও জাপানী জীবনের কর্ম্মপ্রবণতা বুঝিতে পারি। দিবাভাগে কৃষিকার্য্য হয়। তাহার পর রাত্রিকালে কৃষকেরা কুটির-শিল্পে মগ্ন। এই কৃষকগণের কুটিরশিল্পের মাল অষ্ট্রেলিয়ায়, ইংলণ্ডে, দক্ষিণ আমেরিকায় রপ্তানি হইবে। জাপানীরা দিনরাত পরিশ্রম করে। জাপানী জাতির শ্রম-স্বীকার বুঝিবার জন্য ওসাকায় আসা কর্ত্তব্য।"

বয়ন-ফ্যাক্টরির কয়েকজন পরিচালকের সঙ্গে আলাপ হইল। একজন তোকিওর টেক্‌নিক্যাল বিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছিলেন। নাম হিরাগা। ইঁহার কারখানা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সাকাই-বন্দরের নিকট অবস্থিত। সাকাই বর্ত্তমানকালেও বাণিজ্য-কেন্দ্র রহিয়াছে। এখান হইতে নৌকা চালাইয়া কোরিয়া যাইবার প্রথা এখনও চলিতেছে। কয়েকজন কোরিয়াযাত্রী মাঝির সঙ্গে দেখা হইল।

ওসাকার ট্রামগুলি মিউনিসিপ্যালিটির সম্পত্তি। ফ্যাক্টরীরেও এই-রূপই দেখিতেছি। মেয়রের একজন সহকারী বলিলেন—"আমি কয়েক বৎসর ফ্রান্সে ও বিলাতে মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্য শিক্ষা করিয়া আসিয়াছি। বিলাতী স্বাস্থ্যরক্ষার প্রণালী ওসাকাতে অবলম্বন করা একপ্রকার অসম্ভব দেখিতেছি। বিলাতে পায়খানার ময়লা নলের সাহায্যে জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু জাপানীরা এই ময়লা নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে না। আমাদের দেশে জমির সারের জন্য এই সকল ময়লা রক্ষা করা হইয়া থাকে। কাজেই পাশ্চাত্য দেশের মিউনিসিপ্যাল-ব্যবস্থা জাপানে প্রবর্ত্তিত হওয়া এখনও সুদূর ভবিষ্যতের কথা।"

এখানকার ডেপুটি-মেয়র শ্রীযুক্ত ডাক্তার সেকি ওসাকার একজন প্রসিদ্ধ ধন-বিজ্ঞানবিৎ। ইনি বলিলেন—"এতদিন তোকিও, কিয়োতো এবং ওসাকা এই তিন নগরের মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তা গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন। অল্পদিন হইল জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচনের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।" সেকিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ওসাকা জাপানের শিল্পকেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিল কেন?" উত্তর পাইলাম—"ওসাকার অপর পারে কিউসিউ দ্বীপ। এই দ্বীপে কয়লা ও লৌহের খনি আছে। জাপানে আর কোথাও এই দুই ধাতু উৎপন্ন হয় না। কিউসিউ হইতে ওসাকার ভিতর অতি সহজে কয়লা আমদানি করা চলে। খালের ভিতর দিয়া সাধারণ নৌকাগুলি স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিতে পারে। এই জন্যই ওসাকানগরে এতগুলি কারখানা গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছে। অধিকন্তু আমাদের বাজার প্রধানতঃ চীনে ও কোরিয়ায়। ইয়োকোহামা হইতে ওসাকা এই দুই বাজারের নিকটে। তাহা ছাড়া, জাপানের প্রাচীনতম যুগেও এই নগর বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। বস্তুতঃ, কিউসিউ হইতে জাপানের সর্ব্বপ্রথম মিকাডো প্রধান দ্বীপের এই বন্দরেই পদার্পণ করেন।

তাহার পর য়োদা-গাওয়া নদী বহু খালের জন্মদাত্রী হয়। সে আজ আড়াই হাজার বৎসরের কথা। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম-প্রচারের যুগেও এশিয়ার সঙ্গে ভাবের ও কর্ম্মের আদান-প্রদান এই কেন্দ্রেই সাধিত হইত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে হিদেয়শি ওসাকাতে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন—সঙ্গে সঙ্গে বন্দরের উন্নতিও সাধন করেন। এই অঞ্চল হইতেই জাপানী নেপোলিয়ন কোরিয়ায় অভিযান পাঠাইয়াছিলেন। এবং জাপানের দুর্দ্দান্ত দাইমোদিগকে সন্ত্রস্ত রাখিতেন। হিদেয়শির দুর্গ আজও দেখিবার জিনিষ।"

অবশ্য তোকুগাওয়া-যুগে জাপানের সঙ্গে বিদেশের বাণিজ্য পুরাপুরি স্থগিত থাকে। কিন্তু শোগুণেরা ওসাকাকে শিল্পকেন্দ্রে পরিণত করিতে এবং এখানে অন্তর্ব্বাণিজ্যের সুবিধা সৃষ্টি করিতে যার পর নাই চেষ্টিত ছিলেন। প্রাচীন খালগুলি ইঁহাদের আমলে বিশেষ উন্নতি লাভ করে।

কিউসিউ দ্বীপে যত লোহ উৎপন্ন হয় তাহাতে জাপানীদের অভাব পূরণ হয় না। জাপানকে বিদেশ হইতে প্রচুর লোহা আমদানি করিতে হয়। চীন ও মাঞ্চুরিয়ার খনিসমূহ হস্তগত করিবার নিমিত্ত এই জন্যই জাপানের এত আগ্রহ। বর্ত্তমান যুগে কয়লা ও লৌহ যে দেশের আয়ত্ত নহে তাহার উন্নতি দ্রুত চলিতে পারে না।

হোটেলের পার্শ্বেই একটা প্রকাণ্ড সৌধ নির্ম্মিত হইতেছে। সমগ্র মেজের লোহার কাঠামো খাড়া করা হইয়াছে। এই লৌহ"-ফ্রেমের" উপর ইট-পাথরের গাঁথনি বসান হইবে। আমেরিকাতে এবং ইয়োরোপেও এই ধরণের গৃহনির্ম্মাণই আজকাল বেশী দেখা যায়। বৃহতন্ববিশিষ্ট উচ্চ ভবনসমূহকে ভূমিকম্পের প্রভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্য লোহার কাঠামো বিশেষ উপকারী।

শুনিলাম, টাউনহলের জন্য এই সৌধ নির্ম্মিত হইতেছে। খরচ হইবে

১৫ লক্ষ টাকা। একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি সমস্ত টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহার ভগ্নীপতির সঙ্গে আলাপ হইল। ইনিও একজন ধনী মহাজন। নানাপ্রকার কারবারে ইঁহার টাকা খাটিতেছে।

মহাজনটি সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া আসিয়াছেন। ইনি একজন গোঁড়া বৌদ্ধ। আমাদের দেশে যেমন গৃহদেবতা, ঠাকুরঘর ইত্যাদি থাকে জাপানী গৃহেও সেইরূপ "কামিদান," "বুৎসুদান" ইত্যাদি দেব-মন্দির থাকে। মহাজন তাঁহার গৃহের বৌদ্ধমন্দির যত্নসহকারে দেখাইলেন। একটা সোনালি ল্যাকারমণ্ডিত আলমারির ভিতর একখানা গোটা মন্দিরের সকল আসবাব রহিয়াছে। মূর্ত্তি, বাতি, ধূপদান, ফুল, নৈবেদ্যের বাসন, ঘণ্টা, ধর্ম্মগ্রন্থ ইত্যাদি সকল বস্তুই দেখিলাম। হিন্দু পূজা-পদ্ধতিতে আর জাপানী বৌদ্ধ পূজা-পদ্ধতিতে কোন প্রভেদ নাই। কয়েকখানা পুস্তক দেখাইয়া বন্ধুটি বলিলেন—"এই গুলি চীনা অক্ষরে লিখিত সংস্কৃত পুস্তক। আমিদা বুদ্ধ স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতল সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন। সেই উপদেশ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ।"

বৌদ্ধ মন্দিরে এক রাত্রি

(৭ই আগষ্ট ১৯১৫)

তোকিওতে পৌঁছিয়া দেখি, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশ। ছুটির সময়ে জাপানী অধ্যাপকগণ মফঃস্বলে যাইয়া গ্রাম্য বিদ্যালয় খুলিয়া বসেন। জনসাধারণের ভিতর এই উপায়ে উচ্চতম বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের উপদেশ প্রচারিত হয়।

বৌদ্ধ সাহিত্যাধ্যাপক তাকাকুসু, নানাস্থান ঘুরিয়া কিছুকালের জন্য কোয়া-পাহাড়ে আশ্রয় লইয়াছেন। এখানে ইঁহার বক্তৃতা নাই। মন্দিরে মন্দিরে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহের জন্য কয়েক সপ্তাহ এখানে কাটাইবেন।

তাকাকুসুর পত্র পাইয়া কোয়া-পাহাড়ে বেড়াইতে গেলাম। ওসাকা হইতে চল্লিশ মাইল যাইতে হয়। ট্রামে ও রেলে কিছু দূর আসা গেল। এইখানে একটা পার্ব্বত্য স্রোতস্বতী—অপর পারে উপত্যকা ও পাহাড়। এই পার্ব্বত্য পথে ১২।১৪ মাইল যাইতে হইবে—রেল অথবা ট্রাম নাই।

গরমে অস্থির—নদীর কিনারায় একটা সরাইয়ে তরমুজ খাওয়া গেল। পরে খেয়া-নৌকায় পার হইয়া রিক্শতে বসিলাম। ভুট্টা, বাঁশ, ধান ও তুঁতের ক্ষেতের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছি। চারি দিকে উচ্চ পাহাড়। গ্রাম্য কুটীর, রাস্তা, দোকান ও বালক-বালিকা ভারতীয় পার্ব্বত্য পল্লীর দৃশ্যই স্মরণ করাইয়া দেয়। জাপানের এত জায়গা দেখিলাম—কোথাও পশুপক্ষীর পরিচয় বেশী পাইলাম না। মাঝে মাঝে দুই চারিটা কাকের ডাক শুনিয়াছি মাত্র—অবশ্য মাছের ঝাঁক সর্ব্বত্রই দেখা যায়। আর দু-একটা সর্পও চোখে পড়িল।

রিক্শ বদলাইয়া ডুলিতে বসিলাম। এখান হইতে পার্ব্বত্য বক্রপথে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিতে হইবে। আলমোড়া-যাত্রার কথা মনে পড়িল। তবে ভারতীয় পাহাড়ে ব্যবহৃত ডাণ্ডি জাপানী ডুলি অপেক্ষা অধিকতর আরামদায়ক। এখানকার ডুলি আমাদের স্বদেশী ডুলিরই মত।

আল্‌মোড়ার পথে পাইনের সারি সর্ব্বত্র দেখা যায়—এখানে পাইন এবং ক্রিপ্‌টোমেরিয়া এই দুই জাতীয় তরুবর দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। উভয়ই দেখিতে অনেকটা এক প্রকার। এদিকে রাস্তার নিম্নে পার্ব্বত্য ঝরণা বা নদী বহিয়া যাইতেছে। কোয়া-পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে সর্ব্বদা হিমালয়ের কথাই ভাবিতে লাগিলাম। প্রাকৃতিক দৃশ্যে কোন প্রভেদ নাই। এইরূপে তিনহাজার ফিট ঊর্দ্ধে উঠিলাম। এখন বেশ ঠাণ্ডা লাগিতেছে।

এক জায়গায় দেখি, আকাশে মালপত্র পাঠান হইতেছে। কোয়া পাহাড়ের উচ্চতম শৃঙ্গের সঙ্গে নিম্নতম উপত্যকার যোগ-সাধন করা হইয়াছে। টেলিগ্রাফের তার যে ভাবে পাহাড় হইতে পাহাড়ে লইয়া যাওয়া হয়, সেই ভাবে মোটা তারের সাহায্যে শৃঙ্গে শৃঙ্গে সংযোগ সাধিত হইয়াছে। এই তারের সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহ চুপড়ি ঝুলিতেছে। এই গুলির ভিতর মাল রাখিয়া দেওয়া হয়। চুপড়িগুলি তাড়িতের শক্তিতে ঊর্দ্ধে আপনা-আপনি চলিয়া যায় এবং নিম্নে আপনা-আপনি নামিয়া আসে। শুনিলাম, এই ধরণের চুপড়িতে মানুষের যাতায়াতও নাকি সুরু করা হইবে। অভিনব দৃশ্য বটে।

সন্ধ্যাকালে যথাস্থানে পৌঁছিলাম। পথে বহু তীর্থযাত্রীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে—কেহ উঠিতেছে, কেহ নামিতেছে। কেহ পদব্রজে, কেহ ডুলিতে। এই নগর বা পল্লী একটা বিরাট তীর্থক্ষেত্র। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে কোবো দাইশি এই সুরম্য স্থানে মন্দিরাদি স্থাপন করিয়া যান।

তাঁহার প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধসম্প্রদায় আজ পর্য্যন্ত কোয়া পাহাড়কে তাঁহাদের প্রধান তীর্থস্থান বিবেচনা করেন। শুনিলাম, এখানে নয়শত মন্দির আছে বলিয়া জনশ্রুতি। বর্ত্তমানে প্রায় ৫০টা ছোট বড় মাঝারি মন্দির বা মঠ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ এক মন্দিরে রাত্রিবাস করিলাম। তাকাকুসু পার্শ্ববর্ত্তী মন্দিরে বাস করিতেছেন।

দার্জ্জিলিঙ্গে তিব্বত-পর্য্যটক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাসের গৃহে জাপানী বৌদ্ধ পুরোহিত কাওয়া গুচি বাস করিতেন। তাঁহার সঙ্গে এক-জন জাপানী যুবকও ছিলেন। ইনি তিন বৎসর কাল ভারতবর্ষে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া কোয়া পাহাড়ের বৌদ্ধবিদ্যালয়ে অধ্যাপক হইয়াছেন। ইঁহার নাম হাসেবে। পূর্ব্বে ইনি ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি পাইয়াছিলেন। হাসেবে বলিলেন—মন্দিরসমূহের পুরোহিত-গণের জন্য এখানে একটি মহাবিদ্যালয় আছে। আমি ছাত্রগণকে সংস্কৃত শিখাইয়া থাকি। প্রায় ৪০০ পুরোহিত সংস্কৃত শিখিতেছে।" হাসেবে সংস্কৃত বেশী জানেন না—ভাণ্ডারকার-প্রণীত "সংস্কৃত পাঠ" পর্য্যন্ত ইঁহার বিদ্যা। এই গ্রন্থই এখানে পড়ান হইতেছে। যাহা হউক, বুঝা যাই-তেছে, জাপানীরা একটা ভারতীয় আন্দোলন শীঘ্রই পাকাইয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর। নানা মহলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

মন্দিরে আশ্রম-বালকেরা অতিথি-সেবা করিতেছে। রান্নাবাড়া, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বিছানা করা ইত্যাদি সবই যুবক পুরোহিতগণ স্বহস্তে করিল। মঠ-মন্দিরে নারী জাতির প্রবেশ নিষেধ। পুরোহিতেরা সক-লেই অবিবাহিত থাকিতে বাধ্য। মৎস্য-মাংসের ব্যবহারও মন্দিরে চলিতে পারে না। মন্দিরাদির অভ্যন্তরস্থিত গৃহসমূহের সাজসজ্জা, আস-বাব-পত্র সবই অন্যান্য জাপানী গৃহের অনুরূপ। একটা সুন্দর বাগানও আছে। দোভাষী বলিলেন—"এই মন্দিরে আমি সাত বৎসর পূর্ব্বে এক-

বার আসিয়াছিলাম। সঙ্গে ছিলেন সপত্নীক ফরাসী পর্য্যটক। তাঁহাদের জন্য হোটেল হইতে খাদ্য দ্রব্য আনিতে হইয়াছিল।"

প্রত্যূষে মন্দিরের দেবগৃহে "সাম-গান" আরম্ভ হইল। যুবক পুরোহিতগণ যথোচিত পোষাক পরিধান করিয়া মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। ভাষা বুঝিলাম না—আওয়াজে বুঝিলাম, হিন্দু উপাসনা আর বৌদ্ধ উপাসনা আর গ্রীক রীতির খৃষ্টীয় উপাসনা সবই এক জাতীয়। ধরণ-ধারণ, আদব-কায়দা, কণ্ঠস্বর, কোন বিষয়েই পার্থক্য লক্ষ্য করা কঠিন। পৃথিবীর সকল লোক যদি কোন এক ভাষায় কথা কহিতে পারিত, তাহা হইলে দুনিয়ায় কোন প্রকার দ্বন্দ্ব থাকিত কি না সংন্দেহ।

কয়েকটা মন্দির দেখিয়া প্রধান মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। ইহার নাম "কোন্দো"। কোয়া পাহাড়ের কোন মন্দিরে আমিদা বুদ্ধের মূর্ত্তি নাই। কোবো দাইশি ইয়াকুশি দেবকে বুদ্ধ-বিগ্রহভাবে পূজা করিতেন। তাঁহার সম্প্রদায়ে ইয়াকুশি-বুদ্ধের মূর্ত্তি সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কোন্দোতেও তাহাই দেখিলাম। এখানে ধ্যানোপবিষ্ট কোবোর মূর্ত্তিও রহিয়াছে। কোবো তাঁহার সম্প্রদায়ে বুদ্ধের অবতাররূপে পূজিত হন।

এই বিরাট মন্দির-নগরের সর্ব্বত্র কোবো দাইশির কীর্ত্তি প্রকটিত রহিয়াছে। তিনি কোথায় বসিয়াছিলেন, কোথায় হাত ধুইয়াছিলেন ইত্যাদিও যত্নসহকারে প্রদর্শিত হয়। কোন্দো হইতে কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া এক সুবিস্তৃত গোরস্থান দেখিলাম। ক্রিপ্‌টোমেরিয়া তরুর কুঞ্জের ভিতর বহুসংখ্যক কবর ও স্মৃতিস্তম্ভ রহিয়াছে। দোভাষী বলিলেন—"কোবোদাইশি সম্প্রদায়ের লোকেরা এই গোরস্থানে সমাধিপ্রাপ্ত হইবার জন্য লালায়িত। জাপানের নানাস্থান হইতে মৃতব্যক্তির চুল, নখ বা বেশভূষার কিয়দংশ এখানে পাঠান হয়। এই সমুদয় চিহ্নের উপরই কত আকৃতি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে।"

গোরস্থানের অন্তে একটা মন্দির—তাহার মধ্যে অসংখ্য প্রদীপ জ্বলিতেছে। একটা প্রদীপ দেখাইয়া পুরোহিত বলিলেন—"কোবো দাইশি স্বহস্তে ইহা প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন। তখন হইতে ইহা একবারও নির্ব্বাপিত হয় নাই।" এই মন্দিরের পশ্চাতে কোবো দাইশির কবর।

পথে একস্থানে কতকগুলি জিজো মূর্ত্তি দেখিলাম। দোভাষী কাঠের হাতায় করিয়া মূর্ত্তিগুলির মস্তকে জল ছিটাইতে ছিটাইতে বলিলেন—"শিশুগণের আত্মার হিসাব রাখিতে রাখিতে জিজোদেব ক্লান্ত। এই জন্য জননীরা ইঁহাকে এইরূপে ঠাণ্ডা করিয়া থাকেন।"

জাপানে সংস্কৃত-প্রবর্ত্তক কোবো দাইশি

জাপানী বৌদ্ধ মহলে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর হইতেই পুরোহিত কোবো দাইশির নাম শুনিতেছি। কাল সেই জাপানী মহাত্মার প্রতিষ্ঠিত তীর্থক্ষেত্রে রাত্রি যাপন করিলাম। কোবো দাইশি খৃষ্টীয় ৭৭৪ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার দুইশত বৎসর পূর্ব্বে কোরিয়ার বৌদ্ধ প্রচারক-গণ জাপানে আসিয়া নূতন ধর্ম্ম, সাহিত্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সম্রাট শোতোকু তাইশি এই বিদেশীয় প্রচারকগণের সংরক্ষক ছিলেন এবং স্বয়ং বৌদ্ধ আদর্শে জীবন যাপন করিতেন। তাঁহাকে জাপানের অশোক বিবেচনা করা যাইতে পারে।

কোবো দাইশির পূর্ব্বে চীন, কোরিয়া ও ভারতবর্ষ হইতে সমাগত সুধীবৃন্দই জাপানে জ্ঞানালোক বিস্তার করিতেন। খাঁটি য়ামাতো-সন্তানের কৃতিত্ব হরিয়ুজিযুগে (অর্থাৎ ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে) দেখা যায় না। অষ্টম শতাব্দীতে অর্থাৎ নারাযুগেও জাপানের স্বদেশী শিল্পী, পুরোহিত ও অধ্যাপকগণ বিশেষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন নাই। অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে নিপ্পনবাসী কোবো দাইশি প্রাদুর্ভূত হন। ইনি একাধারে কবি, চিত্রকর, ভাস্কর, দার্শনিক, শিক্ষক ও লিপিকর ছিলেন। ইনি চীনে যাইয়া মূলকেন্দ্র হইতে সকলপ্রকার বৌদ্ধবিদ্যা শিখিয়া আসেন এবং পরে স্বসমাজে তাহা সুপ্রচারিত করেন। চীনে ভারতপর্য্যটক চীনাপণ্ডিত হুয়েন্থ সাংয়ের স্থান যেরূপ, জাপানে চীনপর্য্যটক নিপ্পনসন্তান কোবো দাই-শির স্থান সেইরূপ। ইনি জাপানের সর্ব্বপ্রথম "স্বদেশী" পণ্ডিত। ষষ্ঠ শতাব্দীর শোতোকু তাইশির পর অষ্টম শতাব্দীর কোবো দাইশি আজও

জাপানী সমাজের সকল মহলে সাধুসন্ত, পীর বা বুদ্ধাবতাররূপে পূজা পাইতেছেন। এই দুই মহাত্মার জীবনকথা না জানিলে জাপানী সভ্যতার গোড়ার কথা জানা হয় না।

আজকাল জাপানীরা কোবো দাইশির জন্ম-তিথি উপলক্ষ্যে মহোৎসব করিয়া থাকেন। সাত আট বৎসর হইল এইরূপ উৎসবে কিয়োতো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিজ্ঞানাধ্যাপক তানিমোতো জাপানী ভাষায় এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহার ইংরাজী অনুবাদ "জাপান ক্রনিক্‌ল্" নামক ইংরাজী দৈনিকে বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধের নাম—"Kobo Daishi—His position in the history of Japanese civilisation." অর্থাৎ "জাপানী সভ্যতায় কোবো দাইশির স্থান।"

কোরিয়া এবং চীনের ভাষা জাপানে সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। ক্রমশঃ সংস্কৃত ভাষার প্রবর্ত্তনও আবশ্যক হইয়া উঠে। কোবো দাইশির পূর্ব্বে কোন কোন জাপানী পণ্ডিত সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার চেষ্টায়ই সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগ জাপানে বদ্ধমূল হয়।

তানিমোতো বলিতেছেন—"Though this language had been known in some small degree before, it was due to the fforts of the great Kobo Daishi that Sanskrit took deep oot in this country.

In the book published during the Kyoto era (about 1716 A.D.) entitled Sittan-san-mitsu-sho it is recorded hat Sanskrit was first inculcated in Japan by Kobo Daishi. Among Kobo Daishi's various works there remains still book concerning the Sanskrit language entitled Sittan-bo-narabini-Shakugi." অর্থাৎ "১৭১৬ খৃষ্টাব্দে 'সিত্তান্-সান্-

মিৎসু-শো' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে উল্লিখিত আছে যে, কোবো-দাইশীই জাপানে সংস্কৃত ভাষা প্রবর্ত্তন করেন। কোবো-প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে একখানা জাপানী পুস্তিকা আছে। তাহার নাম "সিত্তান্-জিবো-নরবিনি-শাকুশি।"

"This book, of course, apart from the deep secret meaning attached thereto, is quite simple and naive from the stand point of language, being the translation of the first number of the Sanskrit spelling-books consisting of twelve volumes, and may well be compared to an English primer." অর্থাৎ " 'সেত্তান্-জিবো'-গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় অতি গূঢ়তত্ত্ব। কিন্তু ভাষা অতি সহজ ও সরল। বস্তুতঃ 'সংস্কৃত বর্ণমালা' বা 'সংস্কৃতশিক্ষা প্রথম ভাগ' ইত্যাদি শ্রেণীর গ্রন্থের জাপানী অনুবাদ বিবেচনা করা যাইতে পারে।"

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে জাপানে "কানা" নামক নূতন লিপি প্রচারিত হইয়াছে। লিপি-সংস্কারকগণ জটিল এবং দুর্ব্বোধ্য বহুসংখ্যক চীনা চিত্র-লিপির স্থানে ৫০টা সহজ ও সরল অক্ষর উদ্ভাবন করেন। এই অক্ষরগুলি দেখিতে অনেকটা দেবনাগরী অক্ষরের মত। অধ্যাপক তানিমোতো বলেন —"When one compares them with the Sanskrit, one will be impressed with the striking similarity. * * * If the fifty syllable table were taken from the Sanskrit it would not be unreasonable to conclude that the first Sanskrit Scholar Kobo Daishi was the inventor of these new characters." অর্থাৎ "জাপানী কানা-লিপির উৎপত্তি যদি ভারতবর্ষ হইতে হইয়া থাকে তাহা হইলে কোবোকেই তাহার প্রবর্ত্তক বলিতে হইবে।"

কাল রাত্রে তাকাকুস্থকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোবো দাইশির মত সংস্কৃত প্রচারকের নাম জাপানী ইতিহাসে পাওয়া যায় কি?" ইনি বলিলেন—"খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে তোকুগাওয়াযুগের শেষ অর্থাৎ বর্ত্তমান মেজিযুগের আরম্ভ পর্য্যন্ত আমি ৩০০ জাপানী সংস্কৃত বৈয়াকরণিকের নাম পাইয়াছি। অবশ্য ইঁহারা অনেকেই পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের অনুকরণ মাত্র করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি যে, জাপানী ইতিহাসের কোন যুগেই আমাদের দেশে সংস্কৃত-চর্চ্চা বন্ধ ছিল না। আমি আজকাল জাপানে সংস্কৃত প্রচারের তথ্যসমূহই অনুসন্ধান করিতেছি।" এই বলিয়া সহকারীকে একখানা কাপড়ে ঢাকা পুঁথি আনিতে বলিলেন। পুঁথিখানার ভিতর জাপানী কানা এবং চীনা চিত্রলিপি দেখিলাম। তাকাকুস্থ কোন কোন পংক্তি দেখাইয়া বলিলেন—"এই দেখুন দেবনাগরী অক্ষর। দুঃখের কথা, আমার গৃহে এক্ষণে নাগরী লিপিতে লিখিত জাপানী সংস্কৃত গ্রন্থ একখানাও নাই। নাগরী লিপি জাপানে সুপ্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রত্যহ পাইতেছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"জাপানীরা ভারতীয় বিদ্যাসমূহ চীনা গুরুগণের নিকট শিক্ষা করিত। চীনারা সংস্কৃত ভাষা তাহাদের চিত্রলিপিতেই প্রচার করিত না কি? চীনে বোধ হয় দেবনাগরী কখনও সুপ্রচলিত হইতে পারে নাই। তাহা হইলে জাপানীরা সংস্কৃতভাষা শিখিবার সময়ে দেবনাগরী শিখিত কোথা হইতে?"

তাকাকুস্থ বলিলেন—"জাপানীরা চীনে যাইয়া শিখিত বটে কিন্তু চীনারাই চীনে একমাত্র গুরু ছিলেন না। চীনের বিদ্যালয়ে, মঠে ও মন্দিরে বহুসংখ্যক 'ব্রাহ্মণ বিশপ্' বা ভারতীয় পুরোহিত বাস করিতেন। জাপানী শিষ্যেরা চীনের যেখানেই বিদ্যার্জ্জনের জন্য যাইত, সেখানেই একসঙ্গে চীনা এবং হিন্দু অধ্যাপকের সংশ্রবে আসিত। কাজেই ভার

তীয় মূল প্রস্রবণের পরিচয়ও জাপানে পৌঁছিত। অধিকন্তু বহু ভারতীয় অধ্যাপক চীন হইতে জাপানে আসিয়াছিলেন। সুতরাং দেবনাগরী অক্ষর শিখিবার সুযোগ জাপানীরা যথেষ্টই পাইয়াছিল, বলিতে হইবে।"

সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন্‌সাঙ ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন। তিনি যখন স্বদেশে ফিরিয়া আসেন তখন তাঁহার নিকট জাপানী ছাত্রেরা ভারত-তত্ত্ব শিক্ষা করে। এইরূপ দুইজনের নাম শুনিলাম—দোশো এবং গেম্বো। কোবো দাইশির একশত বৎসর পূর্ব্বেকার কথা।

দক্ষিণ চীন সম্বন্ধে তাকাকুসু বলিলেন—"বৌদ্ধ-প্রধান আসল চীন ক্যাণ্টন অঞ্চলে পাইবেন। ক্যাণ্টন-বন্দরে বস্তুতঃ সমগ্র এশিয়ার প্রভাব পৌঁছিত। কেবল ভারতবর্ষ নয়, পারস্য এবং সুদূর আরব হইতেও এই নগরে লোকজনের আসা-যাওয়া ছিল।" প্রাচীনকালের জাপানীরা ক্যাণ্টনকে "port of white and dark barbarians" বলিত। অর্থাৎ 'শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ বর্ব্বরগণের বন্দর' বলিত। শ্বেতাঙ্গে চীনাদিগকে বুঝিতে হইবে—আর "কৃষ্ণাঙ্গ" ত ভারতবাসীর মার্কামারা পরিচয়। ভারতবর্ষের সঙ্গে জাপানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লেন-দেন বেশী ছিল কি না, বলা যায় না। ভারতীয় বণিকগণ দৈবক্রমে একবার জাপানে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা জাপানী সমাজে তুলার বীজ বিতরণ করে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর "কোজিকি" নামক জাপানী ইতিহাস-গ্রন্থে এই বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। তাকাকুসু বলিলেন—"আজকাল আমাদের রাষ্ট্রীয় সঙ্গীতে দুইটি ভারতীয় সুর ও তালের নাচগান বাজনা রক্ষিত হইতেছে। চম্পাদেশ (আধুনিক কালে যাহার নাম কোচিন চায়না বা ফরাসী চীন) হইতে ভারতীয় বাদক ও গায়ক আসিয়া নারা-নগরের এক মন্দিরে এই রীতি প্রবর্ত্তন করেন।"

আমাদের দেশে যাঁহারা পালের বাঙ্গালা, চোলের দাক্ষিণাত্য,

"ভারতীয় জাহাজ ও বহির্ব্বাণিজ্য এবং বৃহত্তর ভারত ইত্যাদি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন, তাঁহাদের পক্ষে হোরিয়ুজি-নারা এবং শোতোকুতাইশি-কোবোদাইশি ইত্যাদির যুগ বিশেষরূপেই আলোচ্য বিষয় সন্দেহ নাই। অজন্তার চিত্রকলা বাঙ্গালার ভাস্কর্য্য মহাযান সংস্কৃত সাহিত্য ইত্যাদির প্রভাব বুঝিতে হইলে সমগ্র এশিয়া খণ্ডে বিচরণ করিতে হইবে। এইজন্য ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের চীনে আড্ডা গাড়া আবশ্যক।

৯০। দাতেবংশীয় প্রথম দাইমো

India Press. Calcutta.

জাপা

ভাবিয়াছিলাম, জাপানে

মফঃস্বল মাত্র। চক্ষু-কর্ণের বি

বাতি-সমন্বিত পাঠশালা-বহুল সংব

জাপান।'

বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে যদি তড়িতে

ঘাটে কয়েকখানা মানোয়ারি জাহাজ ও 'ড্রে

স্থানে কোন কোন সময়ে দু-একটা আকাশ-য

হইলে বাঙ্গালীরা বুঝিবে যে, তাহারা জাপানেই বা

পূজক অনাবৃত মস্তক পল্লী-কুটীরবাসী মাছ-ভাত-খা

পরিধানকারী বাঙ্গালী জাপানে নিজের আত্মীয়স্বজনকেই

এখানে বসিয়া লণ্ডন নিউইয়র্কের সামান্যমাত্র আভাসও পাওয়া

কলিকাতার চৌরঙ্গী অথবা বোম্বাইয়ের ফোর্টমহাল্লা হইতে ইয়োরা

কার যতটুকু পরিচয় পাই, জাপান হইতে তাহার বেশী পরিচয় পাই না

বস্তুতঃ, ভারতবাসী যদি ইয়োরামেরিকা দেখিবার পূর্ব্বে জাপানে পদার্পণ করেন, তাহা হইলে প্রথমেই মনে মনে প্রশ্ন করিতে বাধ্য হইবেন— "জাপানীরা ভারতবাসী হইতে পৃথক্ কিসে?"

ইয়োকোহামা-বন্দরে, তোকিওর গিঞ্জা-মহাল্লায় এবং ফ্যাক্টরি-পাড়ায় আর ওসাকার সর্ব্বত্র ইয়োরামেরিকার ধরণে বাড়ী-ঘর মাথা তুলিতেছে। জাপানের আফিসে, কর্ম্মকেন্দ্রে এবং কারখানায় প্রধান কর্ম্মচারীরা পাশ্চাত্য 'হ্যাট্'-'কোট্' পরিধান করিয়া থাকেন। উচ্চশিক্ষিত জাপানীরা কোন

-বিভাগ এবং পোত-
য়া থাকে। রণ-তরী-
য়ার' ও 'অ্যাড্‌মিরালগণ'
কথাবার্ত্তা উচ্চতর শ্রেণীর
অন্যান্য স্থানের ন্যায় জাপানেও
বশেষ বলবত্তী নয়। এইসকল
রা সকল বিষয়ে পাশ্চাত্য ভাবা-
ইয়োরামেরিকার একটা নিম্নশ্রেণীর

নে ইয়োরামেরিকা অতি সামান্য প্রভাব
-চাপ্‌কান-পরিধানকারী, পাগ্‌ড়ী-শামলা-আঁটা
ন বিদেশী পর্য্যটক মধ্যযুগের ভারতবর্ষকে যদি
বিবেচনা করিতে পারিতেন অথবা বর্ত্তমান ভার-
ট'ধারী মুষ্টিমেয় লোক-জনকে দেখিয়া কেহ যদি ভারত-
চাত্য দেশ বিবেচনা করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি জাপা-
য়েক সহস্র সরকারী কর্ম্মচারীর আফিসী জীবন এবং গোটাকয়েক
্যাক্টরি' দেখিয়া জাপানী জাতিকে ইয়োরামেরিকার পূরাপূরি গোলাম
বিবেচনা করিবেন। এইরূপ বিবেচনার ফলেই পাশ্চাত্য পর্য্যটকগণ প্রচার
করিয়াছেন যে, জাপানে জাপানীত্ব বা "য়ামাতো দামাশী" আর নাই!

বাস্তবিক পক্ষে যতটুকু কলকারখানা, বাড়ীঘর, আদবকায়দা ইত্যাদি
পাশ্চাত্য সমাজ হইতে আমদানি না করিলে দুনিয়ায় আত্মরক্ষা করা
অসম্ভব, জাপানীরা তাহার একতিলও অতিক্রম করেন নাই। পল্লীগ্রামের
কথা ছাড়িয়া দিলাম—বড় বড় সহরের সাধারণ পাড়ার কথাও ছাড়িয়া দিলাম
—এমন কি, কারখানাবহুল, আফিসপ্রধান অঞ্চলেও 'হ্যাট'-'কোট'ধারী

পানী কয়জন চোখে পড়ে ? ট্রামে, রেলে, 'রিক্‌শতে', পদব্রজে শ্চাত্য বেশধারী জাপানী দেখিতেই পাই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে । যেসকল ব্যক্তিকে পাশ্চাত্য পোষাকে দেখিয়াছি, তাহাদিগকে খিবামাত্র বুঝিয়াছি যে, ইহারা এই বেশকে একটা দুর্ব্বহ ভারস্বরূপ বেচনা করে,—ইহা এখনও "রপ্ত" হয় নাই। আমাদের দেশে উকীল, াটর্ণী, ডাক্তার, কণ্ট্রাক্টার, ডেপুটি, ইস্কুল মাষ্টার ইত্যাদি ব্যক্তিগণ ময়ে সময়ে বিদেশীয় পোষাক ব্যবহার করেন; কিন্তু ঘরে ফিরিয়া এই াবর্জ্জনা পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইঁহারা শান্তি বা "আয়েস" পভোগ করেন কি ? জাপানে বিদেশীয় পোষাকের "রেওয়াজ" ঠিক ই ধরণের; অধিকন্তু কোন রমণীকে 'গাউন'-পরা দেখি নাই। পাঁচ-াতবার দুনিয়ায় ঘুরিয়া আসিয়াও কোন জাপানী ব্যবসায়ী অথবা াষ্ট্রনায়ক অথবা অধ্যাপক গৃহে পাশ্চাত্য পোষাক ব্যবহার করেন না। ত লোকের সঙ্গে ঘরে দেখা করিয়াছি, প্রত্যককেই খড়ো চটিতে কিয়োমনো"-পরিধানে দেখিয়াছি।

পাশ্চাত্য খাদ্যের ব্যবহারও কোন জাপানী গৃহে আছে কি না, সন্দেহ। াশ্চাত্য ধরণের "হোটেল" কোন সহরে একাধিক নাই বলিলেও চলে— াতবড় ওসাকাতেও মাত্র একটি 'হোটেল'। এই সকল 'হোটেলে' পান-ভাজন করিবার জন্য জাপানীরা কদাচিৎ আসিয়া থাকে। বড় বড় াষ্ট্রীয় অথবা অন্য কোনপ্রকার উৎসবাদির জন্যই 'হোটেলে' খাওয়া-দাও-ার ব্যবস্থা হয় মাত্র।

কোন জাপানী-গৃহে পাশ্চাত্য ধরণের চা পান করি নাই। যাঁহারা বদেশীয় জীবনধারণে সুপটু, এমন কি, তাঁহারাও স্বদেশী, দুগ্ধহীন, চিনি-ীন সবুজ চা-পাত্রের "ক্বৎ" পান করাইয়াছেন। আমরা "স্বদেশী" দেখাইবার জন্য অনেক সময়ে চিনির বদলে গুড় এবং লিভারপুলী নুনের

বদলে কালোমুন ব্যবহার করিয়া থাকি। জাপানী জন-নায়কগণ এরূপ লোক দেখানো "স্বদেশী" করেন না। জাপানীরা একাধিক বার বিদেশে যাইয়াও য়ামাতো দামাশী রক্ষা করিতেছেন। ইহাই জাপানের বিশেষত্ব।

হিন্দুরা যাহাকে "অখাদ্য" বা "নিষিদ্ধ" খাদ্য বলে সেই ধরণের "নিষিদ্ধ" খাদ্য-তালিকা জাপানেও ছিল। আজকাল সেই নিষেধ আর প্রতিপালিত হয় না। গো-শূকরাদি-ভক্ষণ জাপানী-সমাজে বেশ চলিতেছে; কিন্তু কয়জন জাপানী মাংস-ভক্ষণ করেন তাহাও অঙ্গুলির সাহায্যে গণনা করা যায়। বিগত ৪০।৫০ বৎসরের ভিতর যাঁহারা বিদেশে যাইতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের গণ্ডীর বাহিরে মাংস-ভক্ষণ এখনও প্রচলিত হয় নাই। তাঁহারাও গৃহে সাধারণতঃ সনাতন মাছ-ভাত খাইয়াই জীবন-ধারণ করেন। এদিকে আজও বৌদ্ধ পুরোহিতমহলে মাংস-ভক্ষণ নিষিদ্ধ রহিয়াছে। নব্য শিক্ষিত বিদেশ-প্রত্যাগত জাপানীদের সংখ্যা অপেক্ষা প্রাচীন-মতাবলম্বী জনগণের সংখ্যা কত বেশী, তাহা আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই।

জাপানে আজও মুচি, চামার, ডোম ইত্যাদি জাতি অস্পৃশ্য। ইহাদিগকে 'এত্তা' বলে। জাপানী স্ত্রী-সমাজে পর্দ্দা নাই; কিন্তু রমণী-স্বাধীনত্ত।এখানে যতটুকু, তাহা আমাদের মহারাষ্ট্র-প্রদেশে আছে। বারমাসে তের পার্ব্বণ, প্রতিমা-পূজা, শোভাযাত্রা, মুখোস-নৃত্য, নৈবেদ্য, আরতি, পিতৃপূজা, ভূত-প্রেতে বিশ্বাস—ইত্যাদি-বিষয়ক সংস্কার বা কুসংস্কার জাপানের যে কোন অঞ্চলে এবং যে কোন মহলে বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা পুরাণ-তন্ত্রের দোহাই দিয়া ধর্ম্ম ও সমাজের জন্য যতগুলি নিয়ম করিয়াছি, আমিদাবুদ্ধের নামে জাপানীরাও ঠিক ততগুলি নিয়ম প্রচার করিয়াছে। আমরা ত্রিশ কোটী নরনারীর দেশে আজও তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর পূজা করিয়া থাকি। রুষ-দর্প-ধ্বংসকারী নবীন এশিয়ার

দাতা য়ামাতোবাসিগণও সংখ্যায় আমাদের ½ অংশ হইয়াও এতগুলি
ঃ-দেবীরই উল্লেখ করিয়া থাকে। জাপানের যত বেশী দেখিতেছি, ততই
।তেছি, জাপানীরা ইয়োরামেরিকা হইতে কয়েকটা 'ড্রেড্‌নট', 'এরো-
ং', 'বাষ্প-পোত', 'ইলেক্‌ট্রিসিটি' ও 'ফ্যাক্টরী' আমদানি করিয়াছে।
'গুলির সাহায্যে বর্ত্তমান যুগের প্রতিযোগিতায় অন্যান্য জাতির সমকক্ষ
য়া যায়; কিন্তু এইগুলির প্রভাবে জাপান অন্যান্য জাতির নকলকারী
র হইয়া পড়ে নাই। আত্মরক্ষা এবং শত্রু-ধ্বংস করিবার জন্য যতটুকু
ন যন্ত্র আবশ্যক, ঠিক ততটুকুই জাপানীরা যথাস্থানে সন্নিবেশিত
রতেছে।

জাপানী-জীবনের অন্যান্য অঙ্গগুলি উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দিবার জন্য
।-নায়কগণ বেশী মাথা ঘামান নাই। অবশ্য নূতন কর্ম্ম ও চিন্তার
বেষ্টনে পুরাতন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের যতখানি পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী,
হা সাধিত হইতেছে এবং হইতে থাকিবে। জীবন বিকাশের নিয়মই
রূপ। ফলে দেখিতেছি—জাপানীরা রুষিয়াকে বিধ্বস্ত করিয়া ইয়ো-
মেরিকার বিচারে "ফাষ্ট-ক্লাশ পাওয়ার" উপাধি পাইল—অথচ
রতবর্ষের সুপরিচিত লেন-দেন, রীতি-নীতি, ভাব-ভঙ্গী, "হাঁচি টিক্‌টিকি
থি-নক্ষত্র", পুরোহিতের আজ্ঞা, ভুতুড়ে কাণ্ড, তীর্থযাত্রা, প্রেতপূজা,
তৃশ্রাদ্ধ, পিণ্ডদান সবই পুরাদস্তুর চালাইতেছে।

এই বৎসর কিয়োতোতে রাজ্যাভিষেক হইবে। প্রাচীনতম যুগে
ঃ অনুষ্ঠানের জন্য যে সকল রীতি অবলম্বিত হইয়াছিল, ঠিক সেইসকল
তির অনুষ্ঠান ১৯১৫ সালেও অবলম্বিত হইবে। যে জাতীয় শিল্পীরা
ধরণে কাষ্ঠ চিরিয়া মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়াছিল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়
দে ইংরাজের বন্ধুভাবে জার্ম্মাণীকে যুদ্ধে হারাইয়াও, জাপানীরা সেই
তীয় শিল্পীগণকে রাজ্যাভিষেকের সকল অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করিয়াছে।

জাপান ইয়োরামেরিকার মফঃস্বল নয়; অথচ জাপান ফার্ষ্ট-ক্লাশ পাওয়ার; এই জন্যই পাশ্চাত্ত্যেরা জাপানকে বুঝিতে পারে না—ভারতবাসী জাপানীকে বুঝিতে পারিবে কি? "ফার্ষ্ট-ক্লাশ পাওয়ার" হইবার জন্য কোন্ কোন্ গুণ থাকা আবশ্যক তাহা বুঝিতে না পারিলে, জাপানের এই "মিষ্টরি" বা রহস্য বুঝা যাইবে না।

ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় লোক-জনের ভাষা বুঝিতাম—তাহাদের সঙ্গে তাহাদের মাতৃভাষায় কথা বলিতে পারিতাম; তথাপি ঐ সকল সমাজে নিজকে খাপছাড়া বোধ করিয়াছি—উহারাও আমাকে যেন তাহাদের নিজের করিয়া লইতে পারে নাই। জাপানী নর-নারীর ভাষা বুঝি নাই—সর্ব্বত্র বোবার মত চলাফেরা করিয়াছি; অথচ যে-কোন সহরে বা পল্লীর যে কোন রাস্তায় দাঁড়াইয়া, কলিকাতার দৃশ্যই দেখিতেছি, মনে হইয়াছে। ট্রামে, রেলে গাড়ীভরা লোক দেখিয়া, অনাত্মীয়, অপরিচিত, অজ্ঞাতকুলশীলের সংস্রব বুঝি নাই। ইহাদের হাঁটুনি-চাহনি, ইহাদের দাঁড়াইবার ভঙ্গী, কথা বলিবার ভঙ্গী, ইহাদের হাসিঠাট্টা, সসম্ভ্রম সলজ্জ-ভাব, ইহাদের অভিবাদন-প্রথা এবং অতিথি-সেবা—সকল বিষয়েই ভারতবর্ষকে পাইয়াছি। এই সমুদয়ে ইয়োরামেরিকার গন্ধ-মাত্র নাই। পাশ্চাত্ত্যেরা জাপানী-ভাষা বুঝে না—আমিও বুঝি না; কিন্তু আমি জাপানে নিজের ঘর পাইয়াছি। পাশ্চাত্ত্যেরা এখানে "স্পেল্," "মিষ্টরি" বা "রোমান্স" মাত্র অর্থাৎ গূঢ় রহস্যময় একটা কিছু দেখিয়া যায়। জাপান প্রাণে-প্রাণে এশিয়ার অন্তর্গত—কতকগুলি লোহা-লক্কড় মাত্র ইয়োরামেরিকা হইতে আমদানি করিয়াছে। বিদেশীয় অনুষ্ঠানগুলি কি পরিমাণে এবং কি ভাবে স্বদেশীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত করিয়া লইতে হয়, জাপানে আসিলে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

ইয়োরামেরিকার অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রহণ করিতে যাইয়া জাপান

অবিকল নকল করে নাই। এদেশের 'ফ্যাক্‌টরী,' 'ল্যাবরেটরী,' পাঠশালা, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি দেখিলে তাহা বেশ বুঝিতে পারি। পাশ্চাত্য দেশে কোন একটা কাজ করিতে যত খরচ হয়, জাপানে তত হয় না; অথচ কাজের ফল সমানই। বাড়ী-ঘর, টেবিল-চেয়ার, আসবাব-পত্র ইত্যাদিতে জাপানীরা যথাসাধ্য অল্প খরচ করিয়া থাকে। বহু অনাবশ্যক ব্যয় হইতে এইরূপে অব্যাহতি পাওয়া যায়। আমরা, ভারতবর্ষে কোন কিছু গড়িয়া তুলিতে হইলে, পাশ্চাত্য ফর্দ্দ-অনুসারে বাহিরের অনুষ্ঠানেই অত্যধিক খরচ করিয়া বসি। কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে, শরীর সুস্থ থাকে না শুনিয়া যথাসর্ব্বস্ব-ব্যয়ে পায়খানা প্রস্তুত করা আমাদের অভ্যাস; অথচ পরক্ষণেই দেখি, একবেলা আহার করিবার পয়সাও নাই। আমাদের শিক্ষা-বিভাগে শিক্ষক-সংখ্যার পরিমাণে পরিদর্শক-সংখ্যা বেশী এবং লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরী, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির তুলনায় গৃহ নির্ম্মাণে খরচ যৎপরোনাস্তি হয় না কি ? অথচ জাপানীরা বাঁশের চোঙ্গাদ্বারাও জলের কল প্রস্তুত করে—তাহাতে ইহাদের কোন লজ্জা নাই।

আর একটা বিষয় নব্য জাপানের সর্ব্বত্র লক্ষ্য করিতেছি। ইহারা বহুপুরাতন অতীতের কথাও ভাবে না—সুদূর ভবিষ্যতের কথাও ভাবে না। এমন কি, পোর্ট-আর্থারে রুষিয়াকে পরাজিত করিবার পূর্ব্বে জাপানীরা কিরূপ ছিল, তাহাও আজকাল ইহাদের স্মরণে নাই। দশ বৎসর পূর্ব্বকার কথাও ইহারা ভুলিয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে ত্রিশ বৎসর পরে কি হইবে, জাপানীরা তাহা ভাবিয়াও গলদঘর্ম্ম হয় না। আগামী ৫।৭।১০ বৎসরের মধ্যে যাহা যাহা করণীয়, একমাত্র সেই বিষয়ই ইহারা আলোচনা করিতে অভ্যস্ত। ইংলণ্ডে এবং আমেরিকায়ও এইরূপই দেখিয়াছি। বলা বাহুল্য, ভারতের কোন কোন যুবক-মহল ব্যতীত এইরূপ বর্ত্তমান-নিষ্ঠা আমাদের সমাজে দেখা যায় না। আমরা, হয়

ভবিষ্যতের "মহামিলনে"র স্বপ্ন দেখিতেছি, নয় 'পালে'র বাঙ্গালার, বিক্রমাদিত্যের ভারতের অথবা বৈদিক যুগের গৌরব-স্মৃতি প্রচার করিতেছি।

এইরূপ হইবার কারণও আছে। অবনত জাতির পক্ষে বর্ত্তমান যুগ নৈরাশ্যের ও অবসাদের কাল—অতীত এবং ভবিষ্যৎ তাহার হৃদয়কে ভাবুকতায় পুষ্ট করিয়া থাকে। যাহারা সজীব জাতি, তাহারা প্রত্যেক দিনই একটা করিয়া নূতন বেদ, নূতন পুরাণ, নূতন তন্ত্র গড়িয়া লয়। ইহাদের মূলমন্ত্র লংফেলোর কবিতায় আমাদের দেশী ছোকরারাও জানে।

ইংলণ্ডের লোকেরা ৫।৭ বৎসরের বেশীদিনকার অগ্রপশ্চাৎ ভাবে না। ইয়াঙ্কিরা ৫।৭ বৎসরের বেশী অতীত ও ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারে না। নিপ্পনবাসীও ৫।৭ বৎসরের অধিক কাল সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার করে না।

নবীন জার্ম্মাণী এবং নবীন ইতালীও এইরূপ বর্ত্তমান-নিষ্ঠ; কিন্তু অল্পকাল পূর্ব্বেও জার্ম্মাণ এবং ইতালীয় উভয় জাতিই অতীত ও ভবিষ্যৎ লইয়া থাকিত। বিস্মার্কের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে জার্ম্মাণেরা "ভবিষ্যতের পানে মোরা চাহি আশা ভরা আহ্লাদে" গাহিয়া জীবনযাপন করিত। ম্যাট-সিনির পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে ইতালীয়েরা অতীত "গৌরব-কাহিনী মম বাণী" গাহিয়া ভগ্ন শুষ্ক বুকে আশা ধ্বনিয়া তুলিত।

নবীন জাপানের কোন কর্ম্মক্ষেত্রেই আজকাল বিদেশীয় কর্ম্মচারী প্রায়ই দেখা যায় না; অথচ জাপানীরা কি শিক্ষা-বিভাগে, কি রণ-বিভাগে, কি কৃষি-বিভাগে সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই বিদেশীয় ওস্তাদগণের তত্ত্বাবধানে কার্য্য সুরু করিয়াছিল। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে যে জাতি সকল বিষয়ে পরকীয় সাহায্যের উপর নির্ভর করিত, আজ সেই জাতির কোন মহলেই বিদেশীয় ব্যক্তি দেখিতেছি না। এরূপ আত্ম-নির্ভরতা

এত শীঘ্র বিকসিত হইয়াছে যে, দর্শকমাত্রেই ভাবিয়া স্তম্ভিত হইবেন।

প্রবাসী জাপানীরা লোক-জনের সঙ্গে বেশী মিশে না। বিদেশে জাপানীদিগকে দেখিলে মনে হইবে, ইহারা নিতান্তই অমিশুক, বেরসিক জাতি; ইহারা হাসিতে জানে না অথবা যদি কদাচিৎ কাষ্ঠহাসি হাসে, তাহাতে হৃদয় ফুটিয়া বাহির হয় না। ইহাদের চোখে-মুখে ভগবান যেন কোন ভাব না আঁকিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। শেক্সপীয়ার বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সঙ্গীতপ্রিয় নয়, সে কুচক্রী হইতে বাধ্য। জাপানীর বদন-মণ্ডলে অতিগাম্ভীর্য্য দেখিয়া বিদেশীয়েরা উহার চরিত্র-সম্বন্ধে ঠিক এই ধারণাই করিয়া থাকে। জাপানীরা কুচক্রী, ষড়্‌যন্ত্রকারী, নীচাশয় এবং ক্ষুদ্রান্তঃকরণ—দুনিয়ার বাজারে তাহাদের নামে এই অখ্যাতি প্রচারিত। ভারতীয় নর-নারী-সম্বন্ধে বিদেশীয়গণের অন্যান্য বিষয়ে ধারণা যাহাই হউক না কেন, ইহারা তাহাদের নিকট বেশ পরিহাস-রসিক, মুক্ত-প্রাণ, দিলদরিয়া ও আন্তরিকতাময় বলিয়া পরিচিত। চীনারাও তাহাদের নিকট ভারতবর্ষীয়গণের অনুরূপ বিবেচিত হয়; কিন্তু জাপানীকে কেহ কখনও সরল, সহজ, মনে করেন না।

জাপানে পদার্পণ করিয়া দেখিতেছি, জাপানীজাতি নিতান্ত "ওভার-সিরিয়াস্" নয়—ইহাদিগকে অতিগম্ভীর বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। ইহাদের 'মুচ্‌কে হাসি'র ভিতরে জটিলতা, কুটিলতা, বা বিদ্রূপের কোন চিহ্ন নাই। ইহাদের সহাস্য বদন দেখিয়াও হৃদয়ের অন্তরতম স্থান পর্য্যন্ত পৌছান যায়। দুনিয়ার অন্যান্য লোকেরা যেমন হাস্যপ্রিয় ও সুরসিক জাপানীরাও স্বদেশে এইরূপই। তবে ঘরের কথা, কুলের কথা, হাঁড়ির কথা কেহ অপরকে বলে কি? জাপানীরাও অন্যান্য জাতির মত বিদেশীয়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় ঐ সকল বিষয়ে চাপিয়া যায়। বাক্য-সম্বন্ধে

সংযম-পালন ইহাদিগকে বিদেশে কিছু বেশী করিতে হয়। প্রত্যেক প্রবাসী জাপানী আমাদের আদর্শ নরপতি দিলীপের মত সর্ব্বদা "গূঢ়াকা-রেঙ্গিত" রূপে জীবনযাপন করেন। আকার এবং ইঙ্গিতের দ্বারা হৃদয়ের ভাব প্রকাশ না করা জগতের ডিপ্লম্যাট রাষ্ট্রবীরেরই স্বধর্ম্ম। বিদেশগামী জাপানীরা এই হিসাবে সকলেই রাষ্ট্রবীর ও ডিপ্লম্যাট। ডিপ্লম্যাট্-দিগের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া কোন দেশের কোন লোকই সন্তুষ্ট হয় না। এইজন্য প্রবাসী জাপানীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ে কোন লোকেরই পেট ভরে না।

প্রবাসী জাপানীদিগের দায়িত্ব অত্যধিক। সমগ্র জাপানেরই দায়িত্ব অত্যধিক। ইয়োরামেরিকার নানা উৎস হইতে নূতন নূতন জ্ঞান অর্জ্জন না করিলে জাপানের চলিতে পারে না—অথচ ইয়োরামেরিকা স্বতঃই জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বী। জাপানের প্রতি পদবিক্ষেপ অতি তীব্র দৃষ্টিতে সমালোচিত হয়—জাপান সমগ্র জগতের পরীক্ষা ও সমালোচনার বস্তু। ১৯০৫ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিশু-জাপানের প্রতি কোন কোন ইয়োরামেরি-কান্ জাতির একটা প্রীতি ও বাৎসল্য ছিল। কিন্তু রুষ-বিজয়ী যুবক জাপানের বিরুদ্ধে সমগ্র ইয়োরামেরিকা বীতশ্রদ্ধ। কাজেই প্রত্যেক প্রবাসী জাপানীর প্রত্যেক উঠা-বসা, প্রত্যেক নড়নচড়ন, অতিশয় সাব-ধানতার সহিত সম্পন্ন হয়। ইহারা সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন চিত্তে আশঙ্কিত হৃদয়ে বিদেশী সমাজে চলা-ফেরা করে। কোন ব্যক্তি সামান্য মাত্র দোষ করিলে উদীয়মান ফার্ষ্ট ক্লাশ পাওয়ারের "প্রেষ্টিজ" বা প্রতিপত্তি নষ্ট হইবে। বনি-য়াদী ঘরের লোকেরা জানে তাহাদের "সাত খুন মাপ"; কিন্তু যুবক-জাপানের সেই সাহস নাই। আত্মরক্ষার জন্য তাহাকে পদে পদে চিন্তিত থাকিতে হয়। এই দায়িত্ব-জ্ঞান, উদ্বেগ এবং আত্মরক্ষার চিন্তা লইয়া জাপানীরা বিদেশীয়ের নিকট দিল্‌দরিয়া মেজাজ-সরিফ থাকিতে পারে

কি ? ইহাদিগকে শেক্‌স্‌পীয়ারের সূত্র-অনুসারে বাহ্যতঃ "ফিট ফর ট্রাটা-জেম" অর্থাৎ চক্রান্তে নিপুণ বলিতে পারি বটে। কিন্তু ইহাই তাহাদের আত্মরক্ষার উপায় ; সুতরাং সর্ব্বপ্রধান গুণ ও ধর্ম্মরূপে সম্মানযোগ্য।

রুষ-বিজয়ী জাপান-সম্বন্ধে তিনটা কলঙ্ক এশিয়ায় রটিয়াছে। প্রথম কথা কাব্য-বিশারদ বলিয়া গিয়াছেন—"জাপান ভারতের মিত্র নয়।" দ্বিতীয় কথা—জাপান কোরিয়া দখল করিয়া পুরাদস্তুর সাম্রাজ্য-লিপ্সার পৃষ্ঠপোষক হইতেছে ; তাহার ফলে কোরিয়ায় পোলাণ্ডের "ট্র্যাজেডি" সুরু হইয়াছে। তৃতীয় কথা—ইয়োরামেরিকার চীন্-বাটোয়ারা-কার্য্যে জাপান সহায় হইতেছে। চীনেও "বৃহত্তর জাপান"-গঠনের আকাঙ্ক্ষা দেখা যাই-তেছে ; সুতরাং নবীন এসিয়ার জন্মদাতা এসিয়াবাসীর হৃদয়ে যে আশা জাগাইয়াছিল স্বয়ং তাহা নির্ম্মূল করিতেছে— জাপানের অভ্যুদয়ে এসিয়ার উপকার হইল না। এসিয়াবাসী এইরূপ ভাবিতে পারেন। এইরূপ ভাবি-য়াই জাপানকে "জিঙ্গো," "বুলি" ইত্যাদি বলা এসিয়াবাসীর দস্তুর হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য ইয়োরামেরিকার জাতিপুঞ্জই এই ধুয়া তুলিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট হইতেই এসিয়াবাসী জাপানবিদ্বেষ শিখিতেছে।

জাপানীরা দিগ্বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা করে—ইহা সন্দেহ করিবার প্রয়ো-জন নাই। জাপানের ইম্পিরিয়ালিজম্ সত্য কথা। জাপানে আসিয়া দেখিতেছি, ইয়োরামেরিকার লোকেরা জাপানের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলে, এসিয়ার লোকেরাও এ বিষয়ে যাহা ভাবে তাহা অমূলক নয়।

জাপান ধাপে ধাপে এইরূপ বিশ্ব-বিজয়ী বীরের মর্য্যাদা লাভ করি-তেছে। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে নবীন জাপানের জন্ম হয়—১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের দুই-এক বৎসর এদিক-ওদিকে নব্য জাপানের সকল প্রকার অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান যথার্থরূপে প্রবর্ত্তিত হয়। তাহার দশ বৎসরের ভিতর জাপান চীনকে পরাজিত করিয়া দুনিয়াকে জানাইল—"আমি একটি নূতন শক্তি—আমার

নাম জানিয়া রাখ।" তাহার দশ বৎসর পরে জাপান রুষিয়াকে হারাইবা-মাত্র দুনিয়ার বড় বড় লোক তাহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল—"আস্তে আজ্ঞা হ'ক্—আমাদের বৈঠকে আসিয়া বসুন। আপনি আর আজকাল একটি সাধারণ শক্তিমাত্র নন। আপনি একটি মহাশক্তি—একটি ফার্ষ্ট-ক্লাশ পাওয়ার অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তি। এই শ্রেণীর শক্তি জগতে আর ছয়টি মাত্র আছে। আর আপনি তাঁহাদের সঙ্গে এক পংক্তিতে ভোজন করিবার অধিকারী।" তাহার পর দশ বৎসর চলিয়া গেল। আজ ইয়োরোপে মহা কুরুক্ষেত্র চলিতেছে। এই কুরুক্ষেত্রে জাপান যদি জার্ম্মাণীর মিত্র থাকিতেন, তাহা হইলে এশিয়ায় যে কি কাণ্ড হইত তাহা একমাত্র ইংরাজ-বীর স্যার এডওয়ার্ড গ্রেই জানেন। যাহা হউক, এই যুদ্ধের সুযোগে জাপানের বহির্ব্বাণিজ্য কতগুণ বাড়িয়া যাইতেছে দশ বৎসর পরে তাহার হিসাব হইবে। আজ হইতে জাপান যথার্থ "ওয়ার্লড্ পাওয়ারে"র পদে উন্নীত হইতে চলিল।

প্রত্যেক দশ বৎসরে কোন জাতির এরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছে কি? অথচ জাপানের এই ধারাবাহিক ক্রমোন্নতি নিতান্ত ন্যায্য উপায়ে সাধিত হইয়াছে। আগামী দশ বৎসরের ভিতর চীন, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আমেরিকা ইত্যাদি দেশে জাপানী বাণিজ্যের বিস্তারও অতি স্বাভাবিক নিয়মেই সাধিত হইবে। ইহা বন্ধ করিবে কে?

একটা উদীয়মান 'ওয়ার্ল্ড্ পাওয়ারে'র পথ রুদ্ধ করিবার জন্য বনিয়াদী ওয়ার্ল্ড্ পাওয়ারেরা যে বদ্ধপরিকর হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইয়োরামেরিকা এই কারণেই জগতে জাপান-বিদ্বেষ রটাইয়া থাকে; কিন্তু এই বুলি এসিয়াবাসীরাও আওড়ায় কেন? যে গুণের জোরে জাপান ত্রিশ বৎসরের ভিতর 'ওয়ার্ল্ড্-পাওয়ারে'র মর্য্যাদা লাভ করিতেছে, সেই গুণের অভাবে এসিয়াবাসী আজ সকল বিষয়েই আত্মরক্ষা করিতে

অসমর্থ। আমি আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ বলিয়া কি যে ব্যক্তি আত্মরক্ষা ও আত্মপুষ্টি করিতে সমর্থ, তাহাকে হিংসা ও তিরস্কার করিব ? বোধ হয়, নিস্তেজ ও নপুংসক মাত্রেরই মানসিক অবস্থা এইরূপ।

কোন উদারপন্থী ভারতসন্তান হয়ত বলিবেন :—"না হয়, জাপানীরা দুনিয়ায় বহির্বাণিজ্য বিস্তার করুক্। তাহার বিশ্ব-সাম্রাজ্যের আকাঙ্ক্ষা জাগিল কেন ? বেচারা কোরিয়াকে সে গোলাম করিয়া রাখে কেন ? চীনের প্রতি তাহার লোলুপ দৃষ্টি কেন ? চীন ও কোরিয়া জাপানের গুরু—তাঁহাদের প্রতি প্রেম, ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনই রুষ-বিজয়ী জাপানের একমাত্র কর্ত্তব্য।"

কথাটা ভাল ; কিন্তু বর্ত্তমান দুনিয়ার রাষ্ট্রমণ্ডলে ইহা কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব। জাপান যদি ভাল মানুষ ভাবে বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে চীন বা কোরিয়ার উদ্ধার আছে কি ? মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত ইত্যাদি প্রদেশে ইয়োরোপীয় "স্ফিয়ার অব্ ইন্‌ফ্লুয়েন্স" (প্রভাব-মণ্ডল) এবং "স্ফিয়ার অব্ ইন্‌টারেষ্ট" (স্বার্থমণ্ডল) রহিয়াছে যে! চীনের বন্দরে বন্দরে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রীয় শাসন চলিতেছে কেন ? চীনের অভ্যন্তরে কুত্রাপি বিদেশীয় জনগণের সম্বন্ধে বিচার করিবার ভার চীনা আদালতে নাই কেন ? কোরিয়া চীনের অন্তর্গত প্রদেশ থাকা সত্ত্বেও রুষিয়ার হস্ত-প্রসার বন্ধ হয় নাই কেন ? "এক্‌স্‌ট্রাটেরিটোরিয়ালিটি," "কন্‌সেশন," "ট্রীটি-পোর্ট" ইত্যাদির অর্থ কি ?

বস্তুতঃ চীন-সাম্রাজ্যের কর্ত্তারা যদি তাহাদের চল্লিশ কোটি নরনারীর আবাসস্থল হইতে ইয়োরোপীয় "প্রভাবমণ্ডল" ও "স্বার্থমণ্ডল"গুলি তুলিয়া দিতে পারিতেন, তাহা হইলে জাপানকে কোরিয়া দখল করিতে হইত না, মাঞ্চুরিয়ায় প্রভাব বিস্তার করিতে হইত না, চীনের ভাগ-বাটো-য়ারায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতে হইত না। চীন যতদিন দুর্ব্বল ও নিকর্ম্মা থাকিবে

ততদিন জাপানের আরাম নিদ্রা অসম্ভব; কারণ ততদিন বিদেশীর প্রতাপ হইতে জাপানের নিজেরই আত্মরক্ষা করা কঠিন। জাপান আত্মরক্ষা করিবার জন্য চীন-সাম্রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহার জন্যই তাহাকে রুষিয়ার সঙ্গে লড়িতে হইয়াছিল। তাহার এক চিহ্ন পোর্ট-আর্থারের ঘটনা—তাহার অন্যতম ফল কোরিয়া-অধিকার। যদি জাপানের রুষ-বিজয় লইয়া আমরা গৌরব করি তাহা হইলে জাপানের সাম্রাজ্য-নীতি নিন্দা করিব কেন?

সপ্তম অধ্যায়

বৃহত্তর জাপান

পরাধীন এশিয়া

বহুদিন পরে পরাধীন মানবের দেশে উপস্থিত হইলাম ; হনলুলু হইতে কাইরো পর্য্যন্ত এক জাপান ছাড়া এশিয়ার কুত্রাপি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নাই। এশিয়াবাসীর এশিয়া কোথাও দেখিতে পাই না। আমেরিকান এশিয়া, জার্ম্মাণ এশিয়া, ফরাসী এশিয়া, ওলন্দাজ এশিয়া, পর্ত্তুগীজ এশিয়া, রুশ এশিয়া, বৃটিশ এশিয়া ইত্যাদি পাশ্চাত্য শাসিত এশিয়ার টুকরায় একশত কোটী নরনারী খণ্ডশঃ বিভক্ত। কোন কোন জনপদে এশিয়াবাসীর নামে মাত্র স্বাধীনতা আছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই সকল দেশ দুনিয়ার অন্যান্য জাতির "প্রভাব-মণ্ডল" মাত্র। বোধ হয় পুরাপুরি পরাধীনতা অপেক্ষা এই ধরণের অর্দ্ধ-স্বাধীনতা বা সিকি-স্বাধীনতা বেশী কষ্টকর ও অধিকতর অনর্থের মূল।

১৯১০ সাল হইতে কোরিয়া সম্পূর্ণরূপে জাপান-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছে—ইহাকেই বৃহত্তর জাপান বলিতেছি। বহুকাল হইতে রুশিয়া কোরিয়াকে নিজ করতলগত করিতে সচেষ্ট ছিলেন। কোরিয়ার নরপতি বা জনসাধারণ নিজ বাহুবলে আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হন।

তাঁহাদের অভিভাবক চীন-সম্রাটও কোরিয়াকে রুশ-প্রভাব-মণ্ডল হইতে বাঁচাইতে পারেন নাই। জাপান রুশিয়ার শক্তি বৃদ্ধিতে ভীত হইয়া কোরিয়ায় হস্তক্ষেপ সুরু করেন। ঘটনাচক্রে প্রথমতঃ এই অঞ্চলে জাপানী প্রভাব-মণ্ডল স্থাপিত হইল—রুশিয়ার প্রভাব দূরীভূত হইল। আজ এখানে জাপান-শাসিত দেশ দেখিতেছি। এখানে চীনারা আদৌ আসে না—রুশিয়ার আস্ফালন আর নাই—কোরিয়াবাসীর স্বাধীনতা অন্তর্হিত। কোরিয়াবাসী দুনিয়ার সর্ব্ব কনিষ্ঠ পরাধীন জাতি—বাঙ্গালী সর্ব্বজ্যেষ্ঠ।

ওসাকা হইতে ২৬ ঘণ্টায় ফুসান বন্দরে পৌঁছিয়াছি। সকাল হইতে ১৪ ঘণ্টা রেলে কাটাইতে হইয়াছে। প্রায়ই সমুদ্রের ধারে ধারে গাড়ী চলে। অপর পারে জাপানের ক্ষুদ্র-বৃহৎ দ্বীপপুঞ্জ। স্থলের দিকে জাপানের সুপরিচিত পাইন-সমাচ্ছাদিত পাহাড় ও উপত্যকা, ধান্যক্ষেত্র, ভুট্টার জমি, বাঁশ ও খোলার ঘর। কোন কোন কুটিরে ভারতীয় ঢেঁকি দেখিতে পাইলাম। ক্ষেতে ক্ষেতে মানুষাকৃতি বংশদণ্ড পশুপক্ষী তাড়াইতেছে। তোকিও হইতে ৭০০ মাইল উত্তরে স্যাপ্পরো গিয়াছি—আজ তোকিওর ৭০০ মাইল দূরস্থিত প্রধান দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছিলাম। কোথাও কোন পল্লী-কুটিরে ভারতীয় দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষ অস্বাস্থ্যের লক্ষণ নাই। অত্যধিক বিলাসভোগের চিহ্ন আছে কি না জানি না—সহজে বোঝা কঠিন। কিন্তু অনশন অর্দ্ধাশন ইত্যাদির পরিচয় কোথাও পাইতেছি না।

ওসাকার নিকটেই কোবে-বন্দর। তাহার পর ক্ষুদ্র-বৃহৎ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দাইমোদিগের নগর অতিক্রম করিলাম। মিয়াজিমা নামক নগরে টুরিষ্ট মাত্রেই একবার নামিয়া থাকেন। উত্তর অঞ্চলের মাৎসুশিমার ন্যায় ইহা সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য বিখ্যাত। প্রত্যেক জাপানীই আমাদের আগ্রার মত এই স্থানের নাম মুখস্থ রাখে। এইখানে একটা দ্বীপ আছে—তাহার উপর একটি মন্দির সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়াছে। মন্দিরের

প্রবেশ-পথের কিয়দংশ সমুদ্র-গর্ভে অবস্থিত। একটা "তোরী" জলের মধ্যে দণ্ডায়মান। ইহা দেখিবার জন্যই লোকেরা এখানে আসে। মিয়াজিমার দৃশ্যাবলী বহু কাকেমনোতে ও রেশমী কারচুপীতে এবং হাত-পাখায় অঙ্কিত দেখিয়াছি।

ক্রমশঃ শিমনোসেকির সমীপবর্ত্তী হইতে থাকিলাম। এই অঞ্চলের পাহাড়গুলি কথঞ্চিৎ তরুহীন এবং শ্বেতশক্ত বালুকাময়। রেলপথ যে কত সুড়ঙ্গ খুঁড়িয়া বাহির হইয়াছে তাহার অন্ত নাই।

শিমনোসেকি বন্দর নব্য জাপানের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকান কমডোর পেরি জাপানে পদার্পণ করিবার পর তোকুগাওয়া শোগুণেরা ইয়োরামেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য-সন্ধি প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু কোন কোন দাইমো এই সকল সন্ধির বিপক্ষে ছিলেন। তাঁহারা ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বিদেশীয় জাহাজসমূহ আক্রমণ করিলে ইংরাজ, পর্ত্তুগীজ, ফরাসী, আমেরিকান এবং ওলন্দাজ জাহাজের কর্ত্তারা সমবেতভাবে শিমনোসেকি অবরোধ করেন। নব্য বিজ্ঞান-চালিত কামানের প্রভাবে দাইমোরা সহজেই পরাস্ত হন। তখনও জাপানে মিকাডো সম্রাটের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয় নাই। যাহা হউক জাপানীরা বিদেশীগণকে প্রচুর অর্থদণ্ড দিতে বাধ্য হইল—এবং এই ঘটনায় তাহাদের চোখ ফুটিয়া গেল। শিমনোসেকিতে জাপান প্রথম বুঝিতে পারেন যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রাচীন বিদ্যাবুদ্ধির সাহায্যে প্রতিযোগিতা করা অসম্ভব।

শিমনোসেকির দ্বিতীয় ঘটনা জাপানীজাতির গৌরবযুগ প্রবর্ত্তন করিয়াছে। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে জাপান অল্প কালের মধ্যে একটা শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইতেছিল। ইয়োরামেরিকার জাতিপুঞ্জ জাপানীর উন্নতির মাত্রা প্রথমে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। পরে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কোরিয়া-সমস্যা লইয়া চীনের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ হয়।

তাহাতে শিশু-জাপান প্রবল পরাক্রান্ত চীন-সাম্রাজ্যকে পরাজিত করে। তাহার ফলে চীনের কিয়দংশ জাপানের প্রভাব-মণ্ডলে আসিয়া পড়ে। ১৮৯৫ সালে চীনা-জাপানী সন্ধি এই শিমনোসেকি নগরে স্থাপিত হয়। এই ঘটনায় জাপানের ক্ষমতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জাতি সকলের চোখ ফুটিয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে জাপানকে সম্মান করিতে তাহাদের প্রবৃত্তি হইত না। তাহারা চীনকেই ভয় করিয়া চলিত।

সুতরাং শিমনোসেকি প্রথমতঃ জাপানী জাতিকে তাহাদের দুর্ব্বলতা বুঝাইয়া দিয়াছে—আবার দ্বিতীয়তঃ তাহাদের আত্মশক্তিও জানাইয়া দিয়াছে।

শিমনোসেকির অপর পারে মোজি বন্দর কিউসিউ দ্বীপের উত্তরতম নগর। সমুদ্রের প্রণালী এখানে এক মাইল মাত্র প্রশস্ত। বিদ্যুতের আলোকমালায় মোজিতে দেওয়ালি-উৎসব দেখিতেছি। এক ঘুমে জাপান-সমুদ্রের চুশিমা-প্রণালী পার হইলাম। এই প্রণালীতে ১৯০৫ সালের ২৭শে মে তারিখে জাপানী নেল্‌সন্ য়্যাড্‌মিরাল তোগো রুশিয়ার বাল্টিক ফ্লীট চূর্ণ বিচূর্ণ করেন। ১৮০৫ সালে ট্রাফালগারের পর এত বড় জলযুদ্ধ পৃথিবীতে দেখা যায় নাই। জাহাজে বহুসংখ্যক জাপানী কোরিয়ায় চলিয়াছে। তাহাদের জন্য জাপানী ধরণের কুঠুরি, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদির ব্যবস্থা জাহাজে আছে। দুইজন উচ্চপদস্থ জাপানী কর্ম্মচারী কোরিয়া শাসন করিতে যাইতেছেন। সকালে ফুসান বন্দরে তরুহীন তৃণ-মণ্ডিত সবুজ পাহাড় দৃষ্টিগোচর হইল। তাহার পাদদেশে ক্ষুদ্র নগর।

এই দুইমাস জাপানীদের জন্মভূমি দেখিয়াছি—আজ ইহাদের ভোগ-ভূমিতে পদার্পণ করিলাম। পৃথিবীর সকল স্বাধীন দেশেই যেমন এক নিয়ম তেমনি সকল পরাধীন দেশে নিয়মও একই ধরণের। এক জাতি অপর জাতিকে শাসন করিবার অধিকার

পাইলে যে দৃশ্য হয় তাহা প্রাচীন রোমের আমলে যেরূপ ছিল, বিংশ শতাব্দীর নবীনতম সাম্রাজ্যেও সেইরূপ। রোমীয় সাম্রাজ্য-নীতি, পর্তুগীজ সাম্রাজ্য-নীতি, ফরাসী সাম্রাজ্য-নীতি, ইংরাজ সাম্রাজ্য-নীতি, জার্মাণ সাম্রাজ্য-নীতি আর জাপানী সাম্রাজ্য-নীতি সবই এক। পরাধীনতায় পরাধীনতায় কোন প্রভেদ নাই—ইম্পীরিয়্যালিজ্‌মে ইম্পীরিয়্যালিজ্‌মে কোন প্রভেদ নাই।

ফুসান সহরটা রিকশতে ঘুরিয়া আসিলাম। একজন জাপানী দোভাষীর সাহায্য লওয়া গেল। এই ব্যক্তি এখানকার একটা বড় হোটেলে চাকরি করে। প্রদর্শক প্রথমেই বলিল—"কোরিয়াবাসীরা বড় অলস—কাজ করিতে চাহে না। কোন মতে ৫।৭৲ মাসিক পাইলেই সন্তুষ্ট।" তাহার পর শুনিলাম—"কোরিয়ায় ১২।১৩ বৎসর বয়স্ক বালকের সঙ্গে ২৫।২৬ বৎসর বয়স্কা রমণীর বিবাহ হয়।"

প্রদর্শক ফুসানের চৌরঙ্গি-পাড়ার ভিতর লইয়া গেল। সর্ব্বত্রই জাপানী-দের প্রভুত্ব দেখিলাম। জাপানী সরাই, জাপানী হোটেল, জাপানী থিয়েটার ও চিত্রভবন, জাপানী দোকান ইত্যাদি ছাড়া এ অঞ্চলে আর কিছু নাই। রিকশ আসে জাপান হইতে—রিকশ চালাইবার কুলিরাও জাপানী।

চৌরঙ্গি-পাড়ার পরে কয়েকখানা খ'ড়ো চালার কুটির দেখাইয়া দোভাষী বলিল—"এই যে অপরিষ্কার ছোট ঘরগুলি দেখিতেছেন এই সমুদয়ের নাম কোরিয়ান্-হোটেল!" কোরিয়ার পুরুষেরা পায়জামা ব্যবহার করে—এক বিচিত্র টুপি মাথায় দেয়। রমণীরা পায়জামার উপর নূতন ধরণের ঘাগ্‌রা পরিয়া থাকে। মাল বহিবার জন্য একপ্রকার কাষ্ঠ-ব্র্যাকেট তাহাদের পীঠে দেখিলাম।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্র হইতে ভারতবর্ষ যত দূরে—জাপানী সাম্রাজ্যের

কেন্দ্র হইতে কোরিয়া তত দূরে নয়। পক্ষান্তরে কোরিয়া উপ-দ্বীপকে জাপান দ্বীপপুঞ্জেরই অন্তর্গত একটা দ্বীপ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। জাপানের প্রধান দ্বীপ হইতে হোক্কাইদো দ্বীপ যত দূরে কোরিয়া প্রায় তত দূরে। কাজেই বৃটিশ ভারতে ইংরাজ নরনারীর সংখ্যা অত্যল্প —এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। কিন্তু জাপানী-কোরিয়ায় জাপানী-দের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়। হোক্কাইদো দ্বীপকে যে হিসাবে জাপানী-দের দেশ বলা হয় সেই হিসাবে কোরিয়াকেও জাপানী-দেশ বলা যাইতে পারে। ফুসানের রাস্তায় একবার মাত্র ঘুরিয়া আসিয়াই এইরূপ ভাবিতে থাকিলাম। জাহাজেও শিমনোসেকি-মোজি হইতে বহুসংখ্যক জাপানীর আমদানি হইয়াছে। প্রতি দিন দুই বেলা শত শত জাপানী কোরিয়ায় আসিয়া বসতি স্থাপন করিতেছে। কোরিয়া দেখিয়া বোধ হয় জাপানী সমাজেরই এক অংশ দেখিতেছি মনে হইবে। কোরিয়াকে বিজিত পরাধীন দেশ বিবেচনা না করিয়া ক্রমশঃ জাপানী উপনিবেশ বিবেচনা করা সঙ্গত হইতে পারে। আয়র্ল্যাণ্ডের সমান অবস্থা কোরিয়ার হইবে বিশ্বাস হইতেছে। ইংরাজের আইরিশ-সমস্যার মত জাপানীদের কোরিয়া-সমস্যা দাঁড়ানও বিচিত্র নয়।

৯১। 'কিয়োমনো' পোষাকে অধ্যাপক বিনয়কুমার

India Press, Calcutta.

রেলে ২৭৪ মাইল

গ্রীষ্মকালে কোরিয়ায় যত গরম শীতকালে শুনিতেছি তত ঠাণ্ডা। দিবা ভাগের পুরা বার ঘণ্টা গাড়ীতে কাটাইতে হইল।

রেলের জানালায় বসিয়া কোরিয়া দেখিতেছি। ফুসান বন্দরে যে ধরণের পাহাড় দেখিয়াছি সেই ধরণের পাহাড়ই সর্ব্বত্র চোখে পড়িল। সমস্ত পথটাই পর্ব্বতময়। পার্ব্বত্য আবেষ্টন কোথাও এড়াইতে পারিতেছি না। পর্ব্বত-গাত্রে কোনরূপ আবাদের চিহ্ন নাই—এমন কি নৈসগিক উদ্ভিদ বিকাশেরও পরিচয় পাই না। মাত্র ক্ষুদ্র ঘাসের আচ্ছাদন দেখিতে পাইতেছি। পার্ব্বত্য উপত্যকাসমূহের বিস্তৃতি অতি অল্প। এই অল্পায়তন প্রান্তরে ধান, ভুট্টা ইত্যাদির চাষ হইতেছে। রেলওয়ে ষ্টেসনগুলিও এই সমতল ভূমির উপর অবস্থিত।

পথে একটাও সমৃদ্ধিশালী পল্লী চোখে পড়িল না। মাটির দেওয়ালে এবং খ'ড়ো চালায় অমুচ্চ গৃহগুলি নির্ম্মিত। জাপানে খ'ড়ো চালা কদাচিৎ চোখে পড়ে। কোরিয়ার পল্লীজীবন জাপানী পল্লীজীবন হইতে দরিদ্রতর —আমাদের ভারতীয় দারিদ্র্যের চিত্র মনে করাইয়া দেয়।

প্রত্যেক ষ্টেসনে দুইটা চারিটা জাপানী ধরণের এবং জাপানী উপকরণের গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। কোনটা সরাই—কোনটা বা দোকান ইত্যাদি। স্থানীয় কুটিরের তুলনায় এগুলি অধিকতর সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং স্বচ্ছলতার পরিচায়ক। জাপানী নরনারীর সংখ্যা সর্ব্বত্রই বেশ দেখা গেল। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্বত্র যেমন জাপানী দেখা যায় এখানেও সেইরূপ বুঝিতেছি। তবে সেখানে ইহারা পাশ্চাত্য পোষাক

ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। আর এখানে ইহাদিগকে জাতীয় পোষাক পরিচ্ছদে দেখিতে পাইতেছি। হোক্কাইদোর ন্যায় কোরিয়াও একটা জাপানী উপনিবেশে পরিণত হইতে চলিয়াছে। বেশী দিন ইহাকে বিজিত দেশ বলা চলিবে না।

গাড়ীতে বসিয়া প্রাচীন সভ্যতার কোন নিদর্শন দেখিতে পাইলাম না। বর্ত্তমান কোরিয়ার যতটুকু রেল হইতে বুঝিতে পারিতেছি, তাহাতে কোরিয়াবাসীকে জাপানী সভ্যতার প্রবর্ত্তক বিবেচনা করিতে প্রবৃত্তি হয় না। প্যাগোডা, মন্দির, ফটক, স্তূপ ইত্যাদি ধ্বংসরূপেও কোথাও দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল না। শুনিলাম, যে পথে গাড়ী চলিতেছে উহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। খৃষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতেও এই সকল জনপদে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ও শিল্পের নিকেতন ছিল। সেই যুগের মন্দিরাদি পার্ব্বত্য অঞ্চলে আজও দেখিতে পাওয়া যায়। বহু স্থানে ধ্বংস স্তূপ মাত্র বিদ্যমান। বিদেশীয় সৈন্যের আক্রমণে সৌধসমূহ বিনষ্ট হইয়াছে।

একটা বড় সহরের নাম তাইকু। এই নগরের কিয়দ্দূর পশ্চিমে একটা মন্দির আছে। তাহার এক প্রকোষ্ঠে কতকগুলি মুদ্রাঙ্ক সমন্বিত কাষ্ঠ-ফলক দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি নাকি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রস্তুত করা হইয়াছিল। বৌদ্ধ ত্রিপিটক গ্রন্থের কোরিয়ান সংস্করণ এই সকল কাষ্ঠফলক হইতেই মুদ্রিত হইয়াছে।

এই অঞ্চলের আর একটা নগর সম্বন্ধে ফরাসী অধ্যাপক Courant বলেন—"The city is enclosed by walls ; on the S. E. formerly stood four citadels built by four kings of antiquity. Ancient buildings, bonzeries dating back to the 7th century, temples and tombs of rulers yet more acient, sacred walls which witnessed many remarkable deeds

in remote antiquity abound in and around Kyengchu. The soil is redolent of story and legend."

অর্থাৎ "কিয়েংচুনগরের আশে পাশে সকল জনপদই ঐতিহাসিক স্মৃতি-পূর্ণ। সপ্তম শতাব্দীর মঠ, মন্দির, কবর ইত্যাদির ধ্বংস স্তূপ এই সকল স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার ও পূর্ব্ববর্ত্তী কালের নিশানা কিছু কিছু আছে। চারিটা দুর্গ এইখানে ছিল।"

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে (৩৭২) বৌদ্ধ ধর্ম্ম উত্তর কোরিয়ায় প্রবেশ লাভ করে। তাহার প্রায় ৫০ বৎসর পরে দক্ষিণ কোরিয়ায় এই ধর্ম্মের বিস্তার হয়। প্রায় এক হাজার বৎসর কাল ভারতীয় প্রভাব সজীব থাকে। তাহার পর নানা কারণে উহা অবসন্ন হইয়াছে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জাপানী নেপোলিয়ান হিদেয়শি কোরিয়া আক্রমণ করেন। তাহাতে বহু জনপদ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

জাপান-সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় তোকিও

পাঁচ বৎসরের ভিতর জাপানীরা সিউল নগরের বহু উন্নতি সাধন করিয়াছে।

রাত্রিকালে সিউলে পৌঁছিলাম। এখানকার হোটেল সরকারী রেল-কোম্পানীর অধীনে পরিচালিত হয়। জাপানীদের জন্মভূমিতে এরূপ সুশ্রী বিলাসভবন কোন হোটেলের জন্য নাই। সুপ্রশস্ত রাস্তা দেখিয়া অবশ্য তোকিওর নূতনতম মহল্লার দৃশ্য মনে পড়িল। সিউলে রাস্তার নীচে বৃহদাকার নর্দ্দমার ব্যবস্থা আছে—জাপানের কুত্রাপি জল নির্গমের এরূপ সুবিধা এখনও সৃষ্ট করা হয় নাই। সরকারী বাড়ী ঘর ব্যাঙ্ক ইত্যাদি ইয়োরা-মেরিকার নবীনতম ষ্টাইলে অত্যধিক আড়ম্বরের সহিত নির্ম্মিত হইয়াছে। সহরের ভিতর ট্রাম চলিতেছে—তাড়িতের বাতি এবং টেলিফোনও আছে। ফুসান হইতে সিউল পর্য্যন্ত রেলে ও গাড়ীর ভিতর যত আরাম পাওয়া যায় জাপানীদের স্বদেশে যেন তত পাওয়া যায় নাই মনে হইতেছে। দেখিতেছি কোরিয়া শাসন করিতে আসিয়া জাপানীরা তাহাদের সকল প্রকার ক্ষমতার চূড়ান্ত পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

ইতিমধ্যে একবার সমগ্র প্রদেশের সেন্সাস বা লোকসংখ্যা গণনা করা হইয়াছে। সিউল নগরের পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতসমূহে নানা প্রকার উদ্ভিদ লাগান হইতেছে। মোটরকারের জন্য শক্ত প্রশস্ত রাজপথ নানা অঞ্চলে তৈয়ারী সুরু হইয়াছে। চিকিৎসা-বিদ্যালয়, শিল্প-বিদ্যালয়, নিম্ন-বিদ্যালয় ইত্যাদির জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করা হইতেছে। কোন অনুষ্ঠানেরই ক্রটি নাই। এদিকে এখানকার বড়লাট সেদিন বক্তৃতায় ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে,

অল্পকালের মধ্যেই কোরিয়ান ও জাপানী-পরিবারের ভিতর বহু বিবাহ-সম্বন্ধ যেন স্থাপিত হয়। দুই জাতির রক্ত-সংমিশ্রণ গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইতেছে। কোরিয়াকে জাপানীরা একটা বিজিত বিদেশ বিবেচনা করিতে চাহে না। সকল উপায়ে ইহাকে জাপানীদের স্বদেশে পরিণত করিবার প্রয়াস চলিতেছে। এইজন্য সিউল নগরকে জাপানী সভ্যতার অন্যতম গৌরবস্তম্ভরূপে গড়িয়া তোলা জাপান সরকারের লক্ষ্য। সিউল —জাপানীদের দ্বিতীয় তোকিও।

সহরের কোথাও বা সঙ্কীর্ণ গলিকে প্রশস্ত রাস্তায় পরিণত করা হইতেছে —কোথাও বা নূতন নূতন সৌধ নির্ম্মিত হইতেছে। কোন গৃহ জাপানী ধরণের—কোন গৃহ পাশ্চাত্য রীতির। নূতন দিল্লী নির্ম্মাণের যে সকল আয়োজন ভারতবর্ষে দেখা যায় সিউলে সেই সকল আয়োজন সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। চোখের সম্মুখে একটা বিরাট রাজধানী গড়িয়া উঠিতেছে।

এখানকার ডাকঘর, হাঁসপাতাল, সরকারী ব্যাঙ্ক, কাছারী ইত্যাদি দেখিয়াও দর্শকমাত্রেই জাপানী-সাম্রাজ্যের গৌরব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ব্যাঙ্কের কর্ত্তারা যে সকল কার্য্য-বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন সেগুলিও অতি উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্গত। বস্তুতঃ ইয়োরামেরিকান জাতিরা বিদেশ শাসন করিতে আসিয়া যে সকল গুণ প্রদর্শন করে, জাপানীদের কোরিয়া-শাসনে সেই সমুদয় লক্ষ্য করিতেছি। যুদ্ধবিদ্যায় জাপান ফার্ষ্টক্লাস পাওয়ার সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্য-নীতির মাপ কাঠিতেও জাপানীরা যে ফার্ষ্টক্লাশ পাওয়ার তাহা কোরিয়ায় বুঝিতে পারা যায়। মেজি-যুগের আরম্ভ হইতে জাপানী-সমাজে যে সকল রাষ্ট্রীয় গুণ ও নব নব শক্তি বিকশিত হইয়াছে সেই সমুদয়ের প্রয়োগ এই বৃহত্তর জাপানে দেখিতে পাইতেছি। জাপানী-কোরিয়া দেখিয়া কোরিয়া-বাসীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে ধারণাই হউক না কেন, জাপানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হইলাম।

নবীন এশিয়ার জন্মদাতাকে ইয়োরামেরিকানেরা শীঘ্র পিশিয়া ফেলিতে পারিবে না। গুণবান, বুদ্ধিমান ও করিৎকর্ম্মা লোকের সংখ্যা জাপানী-সমাজে বাড়িয়া চলিতেছে। যে জাতি পাঁচ বৎসরের ভিতর বহু সংখ্যক উপযুক্ত লোক প্রদান পূর্ব্বক একটা অস্বাস্থ্যকর শাসনবিহীন দেশকে নবীনতম সভ্যতার অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে তাহার আর মার নাই।

সিউল হইতে একখানা দৈনিক জাপানী কাগজ বাহির হয়। তাহাকে ইংরাজীতে বলা যাইতে পারে "সিউল ডেলী নিউজ"। ইহার দুই সংস্করণ বাহির হয়—একটা জাপানী-ভাষায় আর একটা কোরিয়ান-ভাষায়। সম্পাদক বলিলেন—"কোরিয়ান সংস্করণের সম্পাদক এদেশীয় জনগণের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। ইনি খুব উচ্চ বংশের লোক।" সংবাদপত্রের কার্য্যালয় বেশ জমকাল। বহুসংখ্যক কেরাণী, সম্পাদক, সংবাদদাতা, রিপোর্টার ইত্যাদি কার্য্য করিতেছেন—কয়েকজন মাত্র কোরিয়াবাসীর স্থান আছে। অধিকাংশ কর্ম্মচারীই জাপানী। যে কয়জন কোরিয়াবাসী কর্ম্মচারী আছেন তাঁহারা সকলেই জাপানী ভাষায় সুলেখক। এই কাগজের স্বত্বাধিকারী তোকিওর কোকুমিন-সম্পাদক তোকুতোমি। ইনি জাপানের একজন রাষ্ট্র-নায়ক—প্রায়ই ইনি কোরিয়ায় আসিয়া থাকেন।

একখানা ইংরাজী সংবাদপত্র দৈনিক প্রকাশিত হয়। তাহার নাম "সিউল প্রেস"। ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত য়ামাগাতা আমাদের ৺রমাকান্ত রায়কে চিনিতেন। জাপানীরা কোরিয়াকে সম্পূর্ণরূপে দখল করিবার ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে হইতে এই কাগজ চলিতেছে। জাপানের "জাপান টাইমস্"-পত্রের স্বত্বাধিকারী এই কাগজের স্থাপয়িতা। জাপানে কয়েক খানা ইংরাজী কাগজ ইয়াঙ্কি এবং ইংরাজের দ্বারা পরিচালিত হয়। বিদেশীয় সম্পাদকগণ সুযোগ পাইলেই জাপানকে নানাভাবে তিরস্কার করিয়া থাকেন। জাপানসরকার বিনা বাক্যব্যয়ে এই সমুদয় তিরস্কার এখনও সহ্য

করিতেছেন—কিন্তু এত বাড়াবাড়ি বোধ হয় আর বেশীদিন সহ্য করিবেন না। যাহা হউক "সিউল প্রেস", "জাপান টাইমস্" ইত্যাদি কাগজ এই সকল বিদেশীয় পত্রের সঙ্গে সর্ব্বদা বাকযুদ্ধ করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে "ইংলিস্‌ম্যান," "ষ্টেট্‌সম্যান," "পাইয়নিয়ার" ইত্যাদি যে উদ্দেশ্যে যে ভাবে পরিচালিত হয়, কোরিয়ায় জাপানীদের জাপানী, কোরিয়ান এবং ইংরাজী কাগজসমূহ সেই উদ্দেশ্যে এবং সেই ধরণেই পরিচালিত হইতেছে। কোরিয়ায় জাপানের প্রভুত্ব চিরস্থায়ী করাই এই সমুদয়ের উদ্দেশ্য। কাজেই কোরিয়ার বাণী এই সকল পত্রে প্রচারিত হয় না। বলা বাহুল্য, পরাধীন জাতির যথার্থ হৃদয়-কথা কুত্রাপি প্রচারিত হইতে পারে না—কোরিয়াতেও হয় না।

বড়লাটের বাসভবন এবং কাছারি নগরের দক্ষিণ সীমায় পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। এই পাহাড়ে উঠিয়া সিউলের সম্পূর্ণ দৃশ্য দেখিয়া লইলাম। জাপানী দোভাষী সঙ্গে ছিলেন। সিউল সহরটা কিয়োতোর মত চারিদিকে পর্ব্বতবেষ্টিত। পর্ব্বতের উচ্চতা বেশী নয়—কিন্তু সুদৃঢ় প্রাচীরের ফল পাওয়া যায়। কোরিয়ার অন্যত্র যেমন, এই সকল পাহাড়েও সুদীর্ঘ তরুশ্রেণী জন্মে না—প্রায় বৃক্ষহীন প্রস্তরময় গিরিশৃঙ্গ দেখিতেছি। এই প্রাকৃতিক প্রাচীরের উপরেও মধ্যযুগের রাজারা নগরের দেওয়াল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে এবং উচ্চতায় নিতান্ত নগন্য নয়। আজও সেই দেওয়াল দণ্ডায়মান। বর্ত্তমান পথনির্ম্মাণের জন্য তাহার স্থানে স্থানে ধ্বংস সাধন করা হইতেছে।

পাহাড় হইতে সমস্ত নগরটাকে নূতন বোধ হইল। জাপানী খোলার ঘরে সকল অঞ্চল ভরিয়া গিয়াছে। এই সমুদয় সুশ্রী গৃহে জাপানীরা বাস করে। এতদ্ব্যতীত প্রাসাদতুল্য সরকারী গৃহসমূহের সংখ্যাও কম নয়। এগুলি সহরের প্রায় সকল দিকেই দুই চারিটা দেখা যাইতেছে। সিউলে

কোরিয়াবাসীর স্থান কোথায় বুঝিতে পারা কঠিন। দোভাষী বলিলেন—"একমাত্র পূর্ব্ব অঞ্চলে খড়ো চালার ঘর দেখিতে পাইবেন। ঐদিকে কোরিয়ানদিগের বাস। কিন্তু জাপানীদের বসতিও আছে। কোরিয়ানেরা ক্রমশঃ সহর ছাড়িয়া পল্লীতে যাইতে বাধ্য হইতেছে। সহরের খরচ চালান তাহাদের পক্ষে অসম্ভব।" ফুসান ও সিউল দুইই জাপানী-সহর।

দুইজন ইংরাজ পাদ্রী

ইয়োরামেরিকান জাতিরা জগতের বিভিন্ন দেশে নানা উপায়ে তাহাদের নানা প্রকার আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। তাহার মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক পাদ্রীদিগের কার্য্য অন্যতম। অনেকক্ষেত্রেই পাদ্রীরা পথপ্রদর্শক হইয়াছেন। পাশ্চত্য সমাজে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমূহ পরিচিত করাইবার পক্ষে তাঁহাদের কার্য্য হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। পাদ্রীরা সাধারণতঃ শিক্ষক বা চিকিৎসক বা ধর্ম্মপ্রচারক ভাবে বিভিন্ন দেশে জীবন যাপন করেন। কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যফলে পাশ্চাত্য দেশীয় জনগণের রাষ্ট্র এবং ব্যবসায়ের বিস্তারও বিশেষরূপেই সাধিত হয়।

একজন প্রসিদ্ধ রমণী পর্য্যটক Korea and Her Neighbours গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহার ভূমিকায় সিউলের ইংরাজ কান্সাল-জেনারেল পাদ্রীদিগের কার্য্য সম্বন্ধে বলিতেছেন—"In Korea, at all events, to go no farther, it is to missionaries that we are assuredly indebted for almost all we know about the country. * * * I am tempted to call attention to another point * * * namely, their utility as explorers and pioneers of commerce. They are always ready to place the stores of their local knowledge at the disposal of any one, whether merchant, sportsman or traveller. * * * I venture to think that much valuable information as to channels for the development of British

trade could be obtained by chambers of commerce if they were to address specific inquiries to our missionaries in remote regions. Manufacturers are more indebted to missionaries than perhaps they realise for the introduction of British goods and wares, and the creation of a demand for them, in places to which such would never otherwise have found their way." অর্থাৎ "বেশী দূরে যাইবার আবশ্যক নাই। কোরিয়ার কথা বলিলেই বেশ বুঝা যাইবে। এই দেশের যা কিছু আমরা জানি সবই পাদ্রীদিগের আবিষ্কৃত। পাদ্রীরা কেবল ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের প্রচারক মাত্র নন। ইঁহাদের সাহায্যেই ব্যবসায় বাণিজ্য বিষয়েও আমাদের যথেষ্ঠ লাভ হইয়াছে। পাদ্রীরা বস্তুতঃ বণিকদিগের পথপ্রদর্শক। শিকারী, পর্য্যটক, ব্যবসাদার সকলেই পাদ্রীদের জ্ঞানে বিশেষ উপকৃত হইয়া থাকেন। বিলাতের 'চেম্বার অব কমার্স' গুলি যদি এই সকল পল্লী গ্রামের পাদ্রীদিগের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করেন তাহা হইলে এই দেশের অতি নিভৃত স্থানেও ইংরাজ ব্যবসায়ীদিগের বাজার তৈয়ারি হইয়া উঠিতে পারে। কেবল ব্যবসায়ী কেন, শিল্পীরাও পাদ্রীদের নিকট ঋণী। কারণ পাদ্রীরাই গাঁয়ে গাঁয়ে বিলাতী মালের কাট্‌তি বাড়াইয়া থাকেন।"

ইংরাজ রাষ্ট্রবীরের বিবেচনায় পাদ্রীদের সাহায্যেই কোরিয়ায় এবং অন্যান্য স্থানে বৃটিশ বাণিজ্যের বিস্তার সাধিত হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা ইত্যাদি দেশ হইতে যে সকল ব্যবসায়ী অথবা রাষ্ট্র-নীতিবিশারদ ব্যক্তি বিভিন্ন দেশে আসিয়া থাকেন তাঁহারা স্বজাতীয় স্বার্থ যত পুষ্ট করিতে পারেন তাহা অপেক্ষা পাদ্রীরা বেশী করিয়া থাকেন। পাদ্রীরা প্রকারান্তরে এবং গৌণভাবে যথার্থ কন্‌সাল, য্যাম্বাসাডার বা

রাজদূত ইত্যাদির কার্য্য করেন। একমাত্র রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারী রূপে যাঁহারা নিযুক্ত তাঁহারাও পাত্রীদের সাহায্য না পাইলে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারেন না। এইরূপ কন্‌সাল-স্বরূপ পাত্রী প্রাচ্যজগতের সকল দেশেই বহু সংখ্যক দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষেও হাজার হাজার আছেন। আজকাল রেভারেণ্ড্‌ য়্যাণ্ড্রুজ্‌ প্রসিদ্ধ হইতেছেন!

আমেরিকা হইতে আসিবার সময়ে জাহাজে বহু পাত্রীর সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে ক্যানাডিয়ান চিকিৎসক এভিসন সিউলের লোক। ইনি ২৫ বৎসর যাবৎ কোরিয়ায় বাস করিতেছেন। বলা বাহুল্য, একমাত্র এই কারণেই কোন উচ্চতম রাজদূতের যত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি হইতে পারে তাহা অপেক্ষা ইঁহার প্রভাব বেশী। অধিকন্তু এভিসন একজন কর্ম্মী পুরুষ। ইঁহার অধ্যবসায়ের ফলে সিউলে একটি সুবৃহৎ হাঁসপাতাল ও চিকিৎসাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইয়াঙ্কিস্থানের একজন ধনবান বন্ধু এভিসনের কথায় মুগ্ধ হইয়া প্রচুর অর্থ দান করিয়াছিলেন। তাহার দ্বারা গৃহ আসবাব ইত্যাদির ব্যবস্থা হইয়াছে। বিদ্যালয়ের কার্য্য মাত্র তিন বৎসর হইতে চলিতেছে—হাঁসপাতাল প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত।

এভিসন নূতন আমদানি X Rays যন্ত্রগুলি সাজাইতেছিলেন। বিদ্যালয় ও হাঁসপাতালের সকল বিভাগ দেখিলাম। পাঁচ ছয় জন মাত্র শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপক আছেন—অধিকাংশ আমেরিকান। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষক ও কর্ম্মচারী সকলেই কোরিয়ান। আমেরিকা হইতে এক-জন রমণী আসিয়াছেন—আরও কয়েকজন আসিবেন। ইঁহারা কোরিয়ান রমণীদিগকে ধাত্রী-বিদ্যায় শিক্ষিত করিবেন। এই জন্য নূতন নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে।

বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা বর্ত্তমানে ৭৫ জন। মাসিক বেতন অত্যল্প। খরচ চালাইবার জন্য এভিসনকে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়।

বন্ধুগণের প্রতিশ্রুত চাঁদা হইতে সকল খরচ উঠে না। এইজন্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে ডাক্তারখানা, ঔষধালয় এবং চিকিৎসাযন্ত্রের দোকান খোলা হইয়াছে। বিলাত ও আমেরিকা হইতে নানা দ্রব্য আনিয়া রাখা হয়। ছাত্র এবং অধ্যাপকগণ ফার্মেসী বিভাগে সকল প্রকার ঔষধ, বড়ি, ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। কোরিয়ার মফঃস্বলে এই সমুদয়ের কাটতি আছে। মোটের উপর একটা লাভ থাকে।

আর একজন পাদ্রীর নাম গে'ল্। ইনিও বহুকালাবধি এখানে বাস করিতেছেন। ইনি কোরিয়ার ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম্ম, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। ইঁহার গৃহে বহু প্রাচীন চিত্র, পুঁথি ও বৌদ্ধমূর্ত্তির ফটোগ্রাফ দেখিলাম। কোরিয়া সম্বন্ধে গে'ল্ নানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইঁহার স্ত্রী বলিলেন—"আমার স্বামী কোরিয়ার বৌদ্ধধর্ম্ম আলোচনা করিতে করিতে বুদ্ধ-ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ইনি প্রায়ই বলিয়া থাকেন, আমি যদি খৃষ্টান হইয়া না জন্মিতাম তাহা হইলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি থাকিত না'।" সিউলের খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচার-সমিতির কার্য্যাধ্যক্ষ ১৯১৭ সালের বার্ষিক বিবরণীতে কোরিয়ার বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব সম্বন্ধে বলিতেছেন —"Though this religious cult has by no means the influence it possessed some hundreds of years ago in Korea it is still powerful enough to engage the thoughts of the majority on what might be called the heathen Christmas Day." অর্থাৎ "এই উৎসবের আজকাল আর আগেকার মত প্রভাব নাই সত্য। তথাপি লক্ষ লক্ষ নর নারীর চিত্ত এই দিনে এক বিচিত্র ভাবে পরিপূর্ণ হয়। অখৃষ্টানদের ইহা বড়দিন স্বরূপ।" বুদ্ধদেবের জন্মতিথির কথা বলা হইতেছে।

স্বদেশী কোরিয়া

কোরিয়ার পুরুষেরা পায়জামার উপর একপ্রকার লম্বমান আলখাল্লা বা আচকান পরিধান করে। ইহাদের প্রায় অনেকেরই দাড়ি আছে। রাস্তায় ইহাদিগকে হাঁটিতে দেখিলে ভারতীয় মুসলমানদিগের মত মনে হয়। ইহাদের পোষাক প্রায়ই শ্বেতবর্ণ—টুপি কৃষ্ণবর্ণ জাল-সদৃশ পদার্থে নির্ম্মিত এবং বিচিত্র আকারের। পরিবারস্থ কোন লোকের মৃত্যু হইলে ধামার মত প্রকাণ্ড টুপি মাথায় দেওয়া হয়।

কোরিয়ান রমণীরা পূর্ব্বে কখনও রাস্তায় বাহির হইত না—আজকাল দুই চারি জনকে রাস্তায় দেখা যায়। কোন কোন স্ত্রীলোকের সর্ব্বাঙ্গ আবৃত দেখিতেছি। পূর্ব্বে পর্দ্দার নিয়ম এই সমাজে অত্যন্ত কঠোর ছিল। শুনিলাম—রাষ্ট্রের নিয়মে কোন স্ত্রীলোক দিবাভাগে রাস্তায় বাহির হইতে পারিত না। রাত্রিকালে এক ঘণ্টা বাজান হইত। তাহার পর পুরু-ষেরা ঘরের বাহিরে আসিত না—রমণীরা লণ্ঠন হাতে করিয়া রমণীদের সঙ্গে আলাপ করিতে বাহির হইত। ২০ বৎসর পূর্ব্বেও এই নিয়ম ছিল। Mrs. Bishop প্রণীত Korea and her Neighbour গ্রন্থে ইহা জানিতে পারি।

একটা চিত্র-গৃহের বিজ্ঞাপন প্রচার করিবার জন্য কতকগুলি লোক রাস্তা দিয়া বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া গেল। কোরিয়ানেরা যে যন্ত্র ব্যবহার করিতেছে তাহা অনেকটা আমাদের শানাইয়ের মত।

জাপানীদের চেহারায় একটা কর্ম্মপ্রবণতা যেন মাখা আছে—কোরিয়া-নেরা মৃতপ্রায় নিষ্কর্ম্মার মত চলা-ফেরা করে। যুবক প্রৌঢ় বৃদ্ধ সকল

বয়সের লোকই অনেকটা সংজ্ঞাহীন বোধ হয়। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের "মেজি"যুগে জাপানীদের রং বদলাইয়া গিয়াছে। তাহার পূর্ব্বে বোধহয় জাপানীরা আজকালকার কোরিয়ানদিগের মতই দেখাইত।

প্যাগোডা-পার্কে ৫টার সময়ে যাইয়া দেখি কোরিয়ান জাতীয় বহু-লোক অনর্থক ঘুরা-ফেরা করিতেছে। ইহাদের জীবনে যেন কোন সাধ নাই। ইহাদের চোখ মুখ দেখিয়া ভাবিতেছি যে, উৎসাহ বা উদ্দীপনা বা কর্ম্মানুরাগ কাহাকে বলে তাহা ইহারা জানে না। কোন কাজ করিবার পর ক্লান্তি দূর করিবার জন্য ইহারা বাগানে বেড়াইতে আসিয়াছে কি? বোধ হয় না। জাপানীরা সার্থক জীবন ধারণ করে। দিনের কাজ সমাধা করিয়া নৈশভ্রমণে বাহির হওয়া তাহাদের অভ্যাস। কিন্তু কোরিয়ান নরনারীর জীবন কর্ম্মহীন ও আবেগবিহীন। জীবন্ত জাতির চলাফেরায় এবং মরাজাতির চলাফেরায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

সহরের কোরিয়ান-পাড়ার ভিতর দিয়া কয়েকবার যাওয়া-আসা করা গেল। যেন এলাহাবাদ-কাশীর চক-বাজার দিয়া চলিতেছি। লোক-জনের গতিবিধি ভারতীয়—কিন্তু দারিদ্র্য এখানে অধিকতর। খড়োচালা, মাটির দেওয়াল—জানালার অভাব—সঙ্কীর্ণ গলি—আঁকা বাঁকা পথ—ময়লা ও দুর্গন্ধ ইত্যাদি নাম কোরিয়াবাসীর সিউল। ৫।৭।১০।২০ বৎসর পূর্ব্বে স্বদেশীয় সিউল এইরূপই ছিল—বরং আরও অস্বাস্থ্যকর ছিল। জাপানী আমলে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কোরিয়ান-পাড়াগুলি নূতন গড়া সুরু হইয়াছে। তবে প্রাচীন কোরিয়ার চিত্র এখনও সিউলের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

১৮৯৪—৯৫ খৃষ্টাব্দে সিউলে নব্য জাপানী সৌধ সরাই ইত্যাদির চিহ্ন ছিল না। তখন সিউল কোরিয়াবাসীর স্বদেশী নগর ছিল। ২০ বৎসর পূর্ব্বেকার এই রাজধানী সম্বন্ধে শ্রীমতী বিশপ লিখিয়াছেন:—

"I thought it the foulest city on the earth till I saw Peking and its smells the most odious, I encountered those of Shooshing. For a great city and a capital its meanness is indescribable. Etiquette forbids the erection of two-storeyed houses, consequently an estimated quarter of a million people are living on the ground, chiefly in labyrinthine alleys, many of them not wide enough for two-loaded bulls to pass, indeed barely wide enough for one man to pass a loaded bull, and further narrowed by a series of vile holes or green, slimy ditches, which receive the solid and liquid refuse of the houses, their foul and fetid margins being the favourite resort of half-naked children, begrimed with dirt and of big mangy, blear-eyed dogs, which wallow in the slime or blink in the Sun." অর্থাৎ "পিকিঙ্ দেখিবার পূর্ব্বে সিউলকে আমি দুনিয়ার সব চেয়ে চৌখা সহর বিবেচনা করিতাম। এমন দুর্গন্ধময় অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর নগরে রাজধানী থাকিতে পারে তাহা আমার কল্পনায় আসে নাই। দোতলা বাড়ী তৈয়ারী করার রেওয়াজ এ দেশে নাই। কাজেই আড়াই লাখ লোক একতলা ঘরে বাস করে। ঘরগুলি অতি সঙ্কীর্ণ গলির দুই ধারে অবস্থিত। দুইটা ভারবাহী বলদ এক সঙ্গে এই সকল গলি দিয়া পাশাপাশি যাইতে পারে না। তাহার উপরে, আবার গলির দুইধারে গর্ত্ত, নর্দ্দমা বা পগার। এই গুলি প্রত্যেক বাড়ীর আস্তাকুঁড় বিশেষ। যত জঞ্জাল এই সকল গর্ত্তের ভিতর জমিয়া রহিয়াছে। ইহারই ভিতর ন্যাংটা ছোঁড়াছুঁড়িরা খেলা

ধূলা করে। মাঝে মাঝে কুকুরের পালও এই অকথ্য পথের জঞ্জাল বৃদ্ধি করে।"

কোরিয়ানদের শরীরে যেরূপ অবসাদ এবং চিত্তে যেরূপ স্ফূর্ত্তি-হীনতা লক্ষ্য করিতেছি তাহাদের ঘরবাড়ী আসবাবপত্রে সেইরূপ দীনতা দুঃখ এবং দারিদ্র্যের পরিচয় পাইতেছি। বিগত ৫বৎসরের ভিতর সহরের চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে—কিন্তু জনগণের রূপ-পরিবর্ত্তন এবং চিত্ত-পরিবর্ত্তন ঘটিবে কি? ঘটিত যদি কোরিয়াবাসীরা স্বয়ং এই নগর-সংস্কারের কর্ত্তা হইবার উপযুক্ত হইতে পারিত। সিউলের চেহারা বদলাইতেছে জাপানীদের বিদ্যা বুদ্ধি ও অর্থের সাহায্যে। তাহাতে কোরিয়ানদের চেহারা ও চরিত্র বদলাইবে কেন? বরং যে পরিমাণে সিউলের বাহ্য উন্নতি হইতে থাকিবে সেই পরিমাণে জাপানের গৌরব এবং সঙ্গে সঙ্গে কোরিয়ানের অধোগতি সাধিত হইবে। পরাধীন দেশের সহর, বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট দেখিয়া পরাধীন জাতির আসল জীবন বুঝা যায় না।

কোরিয়ার রাজা আজকাল একটা নূতন প্রাসাদে পেন্সন ভোগ করিতেছেন। প্রাচীন প্রাসাদ দুইটি এক্ষণে অন্যান্য কাজের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। একটাতে পুরাতত্ত্ববিষয়ক মিউজিয়াম দেখিলাম। অপর প্রাসাদের ময়দানে এই বৎসর মহা ধূমধামের সহিত একটা প্রদর্শনী খোলা হইবে। তাহার জন্য মণ্ডপ প্রস্তুত করা হইতেছে। জাপানীরা ৫ বৎসরের ভিতর কোরিয়ায় যে সকল উন্নতি দেখাইয়াছেন তাহার পরিচয় দিবার জন্যই এই প্রদর্শনী।

এই প্রাসাদ দুইটি ছাড়া স্বদেশী কোরিয়ার সৌধসম্পদ সিউলে আর নাই। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন এইখানে রাজধানী সুসজ্জিত হয় তখন নগরের চতুর্দ্দিকে এক বিরাট প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। আটটা চীনা ফটকের ভিতর দিয়া সহর হইতে বাহিরে যাওয়া-আসা করা

হইত। বিশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাত্রিকালে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ফটক বন্ধ থাকিত। প্রাচীরের পরিধি ১৪ মাইল। শুনা যায় প্রায় দুইলক্ষ লোক আটমাস খাটিয়া এই প্রাচীর নির্ম্মাণ করে।

একজন কোরিয়ান দোভাষীর সাহায্য লওয়া গেল। ইঁহার সঙ্গে নগরের পূর্ব্ব ফটক অতিক্রম করিয়া পল্লীগ্রামের দৃশ্য দেখিয়া আসিলাম। একটা মধ্য যুগের কবর দেখাও হইল। পর্ব্বতশৃঙ্গ সদৃশ মাটির ঢিপি একজন রাণীর গোরস্থান। সম্মুখে দুই একটা মন্দির। কবরের চারিদিকে প্রস্তরময় দ্বাররক্ষী এবং গর্দ্দভ, মেষ, কুকুর ইত্যাদির মূর্ত্তি। এই সকল জীবের মূর্ত্তিই গৃহছাদের চারিকোণে দেখা যায়। দোভাষী বলিলেন—"স্থানকে সয়তানের আওতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইহারা নিযুক্ত।"

রাত্রিকালে একটা কোরিয়ান হোটেলে আহার করা গেল। মেজেতে ফরাস বিছান। তাকিয়া ঠেশ দিয়া বসা গেল। একটা বড় জল-চৌকিতে খাবার আসিল। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর লোকেরা পোষাকী খাওয়ার জন্য যেরূপ বন্দোবস্ত করে তাহা দেখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। প্রায় ৩০।৩২ বাটি খাদ্য দ্রব্য। লঙ্কা ভাজা, লঙ্কা বাঁটা ইত্যাদিও দুই বাটিতে ছিল, এক বাটিতে মধু। বেশনে নানাপ্রকার তরি-তরকারি ভাজা। চাউল প্রধান খাদ্য। শুঁটকি মাছ, সামুদ্রিক উদ্ভিজ, ছানা, মুগ, বীজমণ্ড ইত্যাদি বিশেষত্ব। আমাদের সুপরিচিত পাটিশাপটা খাইয়া আনন্দিত হইলাম। জাপানী ধরণের ঝোলও ছিল। একটা বাটির ভিতর আগুন রাখা আছে, তাহার সাহায্যে তরকারি গরম করা হইতেছিল। চপ্‌ষ্টিকের ব্যবহার হয়। জাপানী-খানা অপেক্ষা কোরিয়ান-খানা অধিকতর রুচিকর বোধ হইল।

ভোজনের সময় বাজনা হইল। এইরূপই নাকি নিয়ম। জাপানী

ঝুমঝুমির বড় সংস্করণ, তারের যন্ত্র, বাঁশি ও নাগড়া এই চারিপ্রকার হাতিয়ার লইয়া ওস্তাদেরা বসিলেন। আওয়াজ শ্রুতিকঠোর—রস পাওয়া গেল না। নাচ গানও হইল। জাপানী সুরের ইঙ্গিত পাইলাম। নাচ চলনসই—গান শুনিয়া প্রীত হইলাম না।

কোরিয়ার মধ্যযুগ

সিউলের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল বেড়াইতে বেড়াইতে দোভাষী একটা নবনির্ম্মিত ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"এই দেখুন স্বাধীনতা-তোরণ। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই নামের অর্থ কি?" দোভাষী বলিলেন—"পূর্ব্বে ঠিক এই স্থানে 'গোলামি-তোরণ' ছিল। কোরিয়ান জাতি বহুকাল চীন-সম্রাটকে কর দিত। এই কর সংগ্রহ করিবার জন্য চীনের রাজদূত বৎসরে একবার করিয়া সিউলে আসিতেন। অদূরে পাহাড় দেখিতেছেন—তাহার ভিতর একটা সঙ্কীর্ণ গলি দেখা যাইতেছে। ঐ পথে রাজদূত আসিতেন। আজও এই পথে পিকিঙ পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। পাহাড়ের অপর পারে একটা গৃহ ছিল—তাহাতে রাজদূত আসিয়া কয়েকদিন বাস করিতেন। পরে কোরিয়ার রাজদূত এবং জনসাধারণ এই তোরণে আসিয়া চীন-দূতকে অভিবাদন করিতেন। এই প্রথা বহুকাল চলিয়াছিল। এই কারণে সেই তোরণকে 'গোলামি-তোরণ' বলা অন্যায় নয়।"

কোরিয়া চীনকে কর্ত্তা এবং অভিভাবক বিবেচনা করিতেন—কিন্তু কোন বিষয়ে এদেশের বশ্যতা ছিল না। চীন-সাম্রাজ্য সকল অঞ্চলেই নামে মাত্র অভিভাবকতা করিয়া থাকেন। জাপানীদের গতিবিধি "মেজি"-যুগে এই কোরিয়ায় বিশেষরূপে বাড়িতে থাকে। অবশেষে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কোরিয়া লইয়া চীনে ও জাপানে যুদ্ধ বাধে। সেই যুদ্ধের ফলে কোরিয়াকে জাপান চীন-সাম্রাজ্য হইতে স্বাধীনতা প্রদান করেন। তৎক্ষণাৎ কোরিয়া-বাসিগণ গোলামি-তোরণ ভাঙ্গিয়া তাহার স্থানে নূতন "ইণ্ডিপেণ্ডেন্স

গেট” স্থাপন করিয়াছে। নিউইয়র্কের বন্দরে যেরূপ স্বাধীনতা-দেবীর মূর্ত্তি—এখানে সেইরূপ স্বাধীনতা-ফটক। চীনের দূত কোরিয়ায় আর আশীর্ব্বাদ প্রদান করিতে আসেন না। কিন্তু তাহা বলিয়া কোরিয়ার দুর্দ্দশা ঘুচে নাই। বরং কোরিয়া আজ পুরা গোলাম—চীনের অধীনে নামে মাত্র গোলাম ছিল। পরকীয় সাহায্যে স্বাধীনতালাভের পরিণাম অনেক সময়ে এইরূপই হইয়া থাকে। পরকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করিয়া নিজের স্বাধীনতা অর্জ্জন করা বাহাদুরী সন্দেহ নাই। কিন্তু পরের সাহায্যে স্বাধীন হওয়া পরাধীন থাকারই নামান্তর মাত্র। তাহাতে পুরাণা মনিবের বদলে নয়া মনিবের একৃতিয়ার কায়েম হয়।

কোরিয়ান-পাড়ার ভিতরে একটা বাগানের নাম প্যাগোডাপার্ক। ইহার মধ্যে একটা সুন্দর মর্ম্মর-প্যাগোডা অবস্থিত। শুনা যায় ইহা নাকি ভারতবর্ষ হইতে প্রস্তুত হইয়া চীনে আসিয়াছিল। চীন হইতে ইহাকে কোরিয়ায় আনা হয়। ইহার সকল গাত্রে বুদ্ধদেব এবং অন্যান্য বৌদ্ধ-দেবতার মূর্ত্তি গঠিত রহিয়াছে। দেখিলে উচ্চশ্রেণীর ভাস্কর্য্য বুঝিতে পারি। দোভাষী বলিলেন, “ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জাপানী নেপোলিয়ান হিদেয়শি কোরিয়া দখল করিবার জন্য সিউল পর্য্যন্ত আগমন করেন। তাঁহার আক্রমণে কোরিয়ার সকল প্রাচীন কীর্ত্তি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি এই মর্ম্মর-প্যাগোডাটা স্বদেশে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে শীঘ্র পলায়ন করিতে হয়। এজন্য ইহা জাপানে স্থানান্তরিত হইতে পারে নাই।”

প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শনের সংগ্রহালয় দেখিলাম। প্রাসাদের বারান্দা-গুলিতে মিউজিয়ামের কার্য্য হইতেছে, একটা নূতন গৃহও নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরাতন পাল্কি, ডুলি, পতাকা ইত্যাদি দেখিলাম। দক্ষিণ কোরিয়ার কবর-সমূহে বহু মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পদার্থ, হাঁড়ি-কুড়ি, খেলানার সামগ্রী ইত্যাদি

পাওয়া গিয়াছে। এগুলি খৃষ্টীয় প্রথম দশ শতাব্দীর জিনিষ। এই জনপদের কোন কোন স্থানে বৌদ্ধমন্দিরের ধ্বংসস্তূপ খনন করিতে করিতে নানা প্রকার টালিও পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি খৃষ্টীয় অষ্টম নবম দশম শতাব্দীর পদার্থ বলিয়া বিবৃত রহিয়াছে। জাপানী পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ বিবিধ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন। প্রস্তর-ফলক হইতে লিপি উদ্ধার করা হইতেছে দেখা গেল। কোরিয়ার পুরাতত্ত্ব আলোচনায় জাপানীরা অগ্রসর, কোরিয়ানেরা নয়। ভারতীয় পুরাতত্ত্বের আলোচনায়ও সেইরূপ ইংরাজেরা পথপ্রদর্শক; ভারতবাসীর স্থান উল্লেখযোগ্যই নয়। ইহা দেখিয়া কোন জাতিবিশেষের বিদ্যায়, চরিত্রে, বা পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইবার প্রয়োজন নাই। প্রভুত্বের সুযোগগুলি গোলামজাতি পায় না। কাজেই স্বদেশী তথ্যের আলোচনায়ও পরাধীন জাতি প্রসিদ্ধ হইতে পারে না।

জাপান দেখিয়া আসিলে কোরিয়ার প্রাসাদের গৃহগুলি এবং ফটকসমূহ নূতন বোধ হইবে না। কারণ কোরিয়ার বাস্তু-শিল্পই প্রাচীনকালে জাপানে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। দ্বিতল ছাদ, প্রশস্ত বারান্দা, প্রাঙ্গণ এবং প্রাঙ্গণের অভ্যন্তরস্থিত ক্ষুদ্র-বৃহৎ সৌধ মধ্যযুগের জাপানে যেরূপ দেখিয়াছি সিউলের এই প্রাসাদেও সেইরূপ দেখিতেছি। সুতরাং গৃহ মন্দিরাদি নির্ম্মাণের রীতি সম্বন্ধে কোরিয়ায় নূতন কিছু লক্ষ্য করিবার নাই। তবে এদেশে প্রস্তরের মেজে তৈয়ারী হয়। পাথরের থামও দেখা যাইতেছে—জাপানে কাঠ ছাড়া অন্য পদার্থ গৃহ-নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইত না।

প্রাঙ্গণের ভিতর একটা নব-নির্ম্মিত গৃহে প্রবেশ করিলাম। ইহাই সংগ্রহালয়। সম্মুখের গৃহে এক প্রকাণ্ড লৌহময় বৌদ্ধমূর্ত্তি অবস্থিত। নাম লিখিত আছে শাকা ন্যোরাই। খৃষ্টীয় সপ্তম হইতে দশম শতাব্দীর মধ্যে ইহার রচনাকাল বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় দশম হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বহু পিত্তলময় বৌদ্ধমূর্ত্তি দেখা গেল। নবম দশম শতাব্দীর

লৌহমূর্ত্তিও একাধিক রহিয়াছে। একাদশ শতাব্দীর বিরাট পিত্তল-ঘণ্টা একস্থানে প্রদর্শিত হইতেছে।

মধ্যযুগের কোরিয়ান্ চিত্রকরগণের কতকগুলি রচনা সংগৃহীত হইয়াছে। মানবমূর্ত্তি কয়েকটা বেশ জীবন্তভাবে অঙ্কিত। পশুপক্ষী তরু লতা ইত্যাদির অঙ্কনেও দক্ষতা বুঝা যায়। প্রধানতঃ ষোড়শ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত চিত্র-শিল্পের পরিচয় পাইলাম।

কোরিয়া মধ্যযুগে চীনা মাটির বাসনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। নবম হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বহু কবর খনন করিতে যাইয়া প্রত্ন-তত্ত্ববিদেরা অপর্য্যাপ্ত চীনা বাসন পাইয়াছেন। এই যুগের পিত্তল এবং রৌপ্যের বস্তু অনেক সংগৃহীত হইয়াছে। সংগ্রহের কিয়দংশ কবর হইতে প্রাপ্ত, কিয়দংশ মন্দির হইতে আনীত। কোরিয়ায় কাচ, সোনা, রূপা ইত্যাদি ধাতুর যে সমুদয় অলঙ্কার ব্যবহৃত হইত সে গুলিও কিছু কিছু দেখিলাম। পাথরের কাজ, হাতপাখা, থলে, ছড়ি, ল্যাকারমণ্ডিত বস্তু এবং অন্যান্য শিল্পকর্ম্মেও কোরিয়াবাসীরা সুদক্ষ ছিল। তাহার নিদর্শন এই মিউজিয়ামে মন্দ পাওয়া গেল না।

জাপানের কুত্রাপি প্রস্তর-শিল্প দেখি নাই। এখানে পাথরের বৌদ্ধ-মূর্ত্তিও দেখিতেছি। অষ্টম শতাব্দীর জিনিষ।

পর্য্যটকগণের স্বাক্ষর-বহিতে দেখিলাম, সিংহলের বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত অনাগারিকা ধর্ম্মপালের নাম আছে।

কোরিয়ায় আসিয়া অত্যুচ্চ শ্রেণীর সুকুমার শিল্প বা কারুকার্য্য দেখিতে ইচ্ছা করিলে আশা ফলবতী হইবে না। বস্তুতঃ এখানে দেখিবার উপযুক্ত জিনিষ বিশেষ কিছু বিদ্যমান নাই। জাপানে যত জিনিষ কালের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে এখানে সেই সকল জিনিষ বিদেশীয় শত্রুহস্তে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতীয় ধর্ম্ম, বিদ্যা ও শিল্প কোরিয়ায় কি আকার

গ্রহণ করিয়াছিল তাহা বুঝিবার একমাত্র উপায় জাপান-ভ্রমণ। কোরিয়ায় আসিলে এইমাত্র বুঝিতে পারি যে, দেশটা নিতান্তই বৌদ্ধ-প্রধান ছিল। ভারত-স্মৃতি এই দেশের বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পল্লীগ্রামে বিজড়িত রহিয়াছে। তাহা সম্যক বুঝিবার জন্য কোরিয়ার লোক-সাহিত্য, প্রবাদ-প্রবচন, ধর্ম্মানুষ্ঠান ইত্যাদির পরিচয় লইতে হইবে। তাহার জন্য কোরিয়ান ভাষায় প্রবেশ করা আবশ্যক। বলা বাহুল্য, এইজন্য ইয়োরামেরিকান পর্য্যটক কোরিয়া ভ্রমণে উৎসাহী হইতে পারেন না। ভারতীয় পর্য্যটকেরও এখানে রস পাওয়া সহজ নয়। তবে আজকাল কোরিয়া হইতে দশ বার দিনে সাইবিরিয়ার পথে বার্লিন, প্যারি, লণ্ডন পৌঁছান যায়। এই কারণে জাপান-যাত্রী ইয়োরোপীয়েরা কোরিয়া দেখিতে বাধ্য হন। অধিকন্তু চীন-সমস্যা বর্ত্তমান যুগের একটা প্রধান রাষ্ট্রীয় সমস্যা। এইজন্য কোরিয়া মাঞ্চুরিয়া ইত্যাদি জনপদ ডিপ্লম্যাটদিগের অনুসন্ধান-ক্ষেত্ররূপে জগতে প্রসিদ্ধ হইতেছে। অবশ্য নিতান্ত কেঠো এ্যান্থ্রপলজিষ্ট এবং প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্‌-গণের পক্ষে দুনিয়ার যে কোন দেশই রহস্যময়। তাঁহাদের নিকট মধ্যযুগের কোরিয়া মূল্যবান সন্দেহ নাই।

আজকাল সিউলে যে সৌধ সর্ব্বপুরাতন রাজ-প্রাসাদরূপে প্রদর্শিত হয় তাহা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কয়েকবার অগ্নিসাৎ হইবার পর আবার সংস্কার করা হইয়াছে। দ্বিতল ফটকের ভিতর দিয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখে দরবার-গৃহ। ইহার মধ্যে সিংহাসন। এই গৃহেরও ছাদ দ্বিতল। প্রাঙ্গণের চারিদিকে বারান্দা আছে। প্রাঙ্গণের এবং ঘরের মেজে আগাগোড়া সাধারণ প্রস্তরে বাঁধান। কিন্তু গৃহগুলি কাষ্ঠময়। দরবার-গৃহের ভিতরকার সাজ-সজ্জা দেখিয়া ইহাকে কাঠের "দেওয়ানী খাশ" বিবেচনা করিলাম। ছাদের ভিতর নানা আলঙ্কারিক চিত্র অঙ্কিত—মধ্যস্থলে দুইটি ড্রেগন।

সিংহাসনের পশ্চাদ্ভাগে চীনা ধরণের পর্ব্বত ও প্রাকৃতিক দৃশ্য চিত্রিত রহিয়াছে।

এই প্রাসাদের চতুঃসীমার মধ্যে একটা পুষ্করিণীতে পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে। ইহার ভিতর একখানা দ্বিতল কাষ্ঠসৌধ। এই গৃহে আমোদ-প্রমোদ হইত। রাজ-পরিবারের বাস-গৃহসমূহ এই সমুদয়েরই সংলগ্ন। এই সকল গৃহে পুরাতন রাজকীয় কোন ব্যক্তি আজকাল বাস করেন না।

আর একটা প্রাসাদে পুরাতন সম্রাটের পুত্র আজকাল বাস করিতেছেন। এই সৌধ মাত্র ১০০ বৎসর হইল নির্ম্মিত হইয়াছে।। কোরিয়া জাপানের দখলে আসিবার পর জাপানীরা গৃহসমূহ পাশ্চত্য কায়দায় সুসজ্জিত করিয়াছেন। জার্ম্মাণ আসবাবে ঘরগুলি ভরা দেখিলাম এবং প্রাচীন জাপানী এবং কোরিয়ান্ চিত্র সম্বলিত কাকেমনো এবং পর্দ্দাও কতকগুলি রহিয়াছে। এই প্রাসাদেরই এক অংশে মিউজিয়াম স্থাপিত হইয়াছে। উহার তত্ত্বাবধায়ক এবং পরিদর্শক সকলেই জাপানী। প্রাসাদের সর্ব্বত্র জাপানী পাহারাওয়ালা—প্রাসাদে প্রবেশ করিতে হইলে পাশের দরকার হয়।

কোরিয়াতে ফটক এবং গৃহের ছাদসমূহের উপর চারি কোণে কতকগুলি বানর, কচ্ছপ ইত্যাদি জন্তুর মূর্ত্তি দেখিতে পাই। জাপানে এই দৃশ্য দেখি নাই—অন্যান্য বিষয়ে জাপানী বাস্তুশিল্প এখানকার অনুকরণ।

কোরিয়ায় চীন, জাপান ও ভারত

ইয়োরোপের কুরুক্ষেত্রে আজ একবৎসর হইতে পরস্পর ধ্বংসসাধনকারী মহাযুদ্ধ চলিতেছে। ইংরাজজাতি জার্ম্মাণ-রাষ্ট্র নষ্ট করিতে কৃতসঙ্কল্প—জার্ম্মাণ রুশ ও ফরাসীর সর্ব্বনাশ করিতে বদ্ধপরিকর। অথচ দেখিতেছি, জার্ম্মাণ বিজ্ঞানবীরের আবিষ্কৃত যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতে শত্রুপক্ষীয়দিগের কোন আপত্তি নাই। আবার ইংরাজের উদ্ভাবিত কলকব্জাও তাঁহার শত্রুগণ কাজে লাগাইতে ছাড়েন না। বিদ্যা, বুদ্ধি, বিজ্ঞান ইত্যাদি যে যেখানে পায় সেখান হইতেই লইয়া আসে। এগুলি শত্রুপক্ষীয় বা মিত্রপক্ষীয় বিবেচনায় উপেক্ষিত বা সমাদৃত হয় না। ইয়োরোপে আজ যাহা দেখিতেছি জগতের ইতিহাসে চিরকাল তাহা ঘটিয়াছে। এশিয়ায়ও তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কোরিয়ায় আসা অবধি এই কথাটা বারে বারে মনে উঠিতেছে।

জাপান আজ কোরিয়ার প্রভু—সকল বিষয়েই প্রভু। রাষ্ট্রীয় জীবনে কোরিয়ানেরা জাপানীদের গোলাম, আবার "কাল্‌চার" বা বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা ইত্যাদি হিসাবেও ইহাদের শিষ্য ও ছাত্র। কিন্তু এই কোরিয়াই প্রাচীনকালে জাপানী সভ্যতার জন্মদাতা এবং জাপানীদের গুরু ছিল। জাপানের বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে কাকেমনো, হাতপাখা, চপষ্টিক পর্য্যন্ত সবই কোরিয়া হইতে রপ্তানি।

অথচ কোরিয়ার সঙ্গে জাপানের সদ্ভাব কোন দিনই ছিল না। আজ জার্ম্মাণে ইংরাজে যতটা খাওয়া-খাওয়ি চলিতেছে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত ইংরাজে ফরাসীতে যেরূপ দ্বন্দ্ব ছিল, কোরিয়ায় আর জাপানে চিরকাল

সেইরূপ ঠোকাঠোকি এবং রেষারেষি বিদ্যমান ছিল। কোরিয়াবাসী কোনকালে জাপানীদের রাষ্ট্রীয়বন্ধু হইতে পারে নাই। শেষ পর্য্যন্ত আজ কোরিয়া জাপানের দাস। পূর্ব্বে জাপানে কোরিয়ায় সৌহার্দ্দ ছিল না, অথচ কোরিয়া হইতে জাপানে "কাল্‌চারের" সকল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান আমদানি করা হইত। আজ কোরিয়া বাধ্য হইয়া জাপান-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। জাপানীদিগকে কোরিয়ানেরা ভাল বাসুক আর নাই বাসুক, উহারাই এখন কোরিয়ায় জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচারক হইয়াছে।

জগতের রাষ্ট্রমণ্ডল চিরকালই অসংখ্য পরস্পর-বিদ্বেষী খণ্ডে বিভক্ত —কিন্তু বিজ্ঞান-মণ্ডলে অনৈক্য বেশী দেখা যায় না। ভবিষ্যতেও সেই-রূপই থাকিবে। জ্ঞানবিজ্ঞান সভ্যতা ইত্যাদি ক্রমশঃ "ইণ্টার্ন্যাশন্যাল" বা "ইউনিভার্স্যাল" বা সার্ব্বজনীন হইতে থাকিবে সত্য। তথাপি রাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতা কোন দিনই হয়ত জগৎ হইতে বিদূরিত হইবে না।

অন্যান্য জনপদের মত কোরিয়াও প্রাচীনকালে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ব-স্ব প্রধান রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রথম দ্বিতীয় শতাব্দীতে চীনারা এই সকল অঞ্চলে মাঝে মাঝে আধিপত্য করিতেন। কিন্তু এই আধিপত্য বেশী দিন স্থায়ী হইত না এবং সমগ্র জনপদে বিস্তৃত থাকিত না। কোরিয়া চীনসাম্রাজ্যের সংলগ্ন—কাজেই এইরূপ সংঘর্ষ স্বাভাবিক।

আশ্চর্য্যের কথা—খৃষ্টীয় প্রথম দ্বিতীয় শতাব্দীতে নাকি জাপান দ্বীপের লোকেরা কোরিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রকে উৎপীড়িত করিত। এমন কি জাপান-সম্রাজ্ঞী জিঙ্গো ২০০ খৃষ্টাব্দে সমগ্র কোরিয়া উপদ্বীপ দখল করিয়াছিলেন বলিয়া জাপানী ঐতিহাসিকগণ প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু কোরিয়ার সাহিত্যে জাপানী আধিপত্য, প্রভুত্ব, এমন কি উপনিবেশ স্থাপন ইত্যাদিরও কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। যাহা হউক, জাপানী নরপতিগণ এবং শোগুণেরা সকলেই কোরিয়াকে তাঁহাদের বিজিত ও

করদ প্রদেশরূপে বিবেচনা করিতে ছাড়িতেন না। জাপানে এবং কোরিয়ায় রাষ্ট্রীয় শত্রুতা আজকার কথা নয়—ইহার ধারা স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কোরিয়ান এবং জাপানী আজন্ম শত্রু।

হয়ত কোন কোন সময়ে কোরিয়ার কোন ক্ষুদ্র প্রদেশরাষ্ট্র অপর প্রদেশরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাপানের সাহায্য গ্রহণ করিত। এই সুযোগে জাপানীরা কোরিয়ায় উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিতে পারিয়াছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে তাহাদের আসা-যাওয়া এবং বসতি-স্থাপন করা কিছু দ্রুত হইতে থাকে। এই সময়েই তাহারা কোরিয়াবাসীদিগের নিকট রেশমকীট-পালন, তন্তুবায়ের কার্য্য, চর্ম্মপরিষ্কার করণ, চিত্রাঙ্কন এবং মূর্ত্তিগঠন ইত্যাদি শিক্ষা করে। কোরিয়ানেরাও দলে দলে জাপানীদের সঙ্গে জাপানে যাইয়া বসতি-স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অধ্যাপক Courant বলেন—"Koreans, voluntary immigrants or pioneers, settled in Japan and formed whole villages, were organised into special castes and some of them took rank in the nobility" অর্থাৎ "জাপানের নানা নগর ও পল্লী কোরিয়ান নরনারীতে ভরিয়া গিয়াছিল। জাপানী সমাজে কোরিয়ান উপনিবেশিক বা প্রবাসীরা একটা স্বতন্ত্র শ্রেণীরূপে বিবেচিত হইত। ইহাদের মধ্যে অনেকেই জাপানী কুলীন বা জমিদার বা সম্ভ্রান্ত বংশের অন্তর্গতও হইয়া পড়ে।" এই উপায়ে সম্রাজ্ঞী সুইকোর আমলে বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানে প্রবেশ করে (৫৫২ খৃঃ অঃ)। কোরিয়ায় প্রচলিত লিপিপ্রণালী এবং চীনা সভ্যতার বিবিধ অনুষ্ঠানও এই সূত্রে প্রবর্ত্তিত হয়। ফলতঃ, জাপান কোরিয়াবাসীদের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও উহাদের নিকট যে জাপানীদের শিক্ষা ও দীক্ষার সূত্রপাত হয় সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ষষ্ঠ সপ্তম শতাব্দীতে কোরিয়া জাপানেরও অধীন নয়, চীন-সাম্রাজ্যেরও করদরাজ্য নয়। ইতঃপূর্ব্বে দুই অঞ্চলের অধিবাসিগণই কোরিয়াবাসীকে পদানত করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। বরং সমগ্র কোরিয়া এক অখণ্ডরাজ্যে পরিণত হইয়া দৃঢ় হইতে থাকিল। অথচ এই রাষ্ট্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও গোলমালের যুগেই চীনা সভ্যতার সকল অঙ্গ কোরিয়ায় স্থান পাইয়াছে এবং জাপানীরা আবার কোরিয়া হইতে এই সমুদয়কে স্বদেশে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। ঘোরতর অনৈক্য এবং বাদ-বিসম্বাদের সময়েও বিদ্যা, ধর্ম্ম, শিল্প ইত্যাদির ঐক্য স্থাপিত হইয়াছিল। রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্বে সভ্যতার ঐক্য বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। এই গেল কোরিয়ার ইতিহাসের প্রথম যুগ। এই যুগে ভারতীয় ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, ধর্ম্মপদ্ধতি এবং অন্যান্য সুকুমার শিল্প অর্দ্ধ এশিয়ায় ছড়াইয়া পড়িল। সে ভারত প্রবল প্রতাপ সমুদ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, কালিদাস, ও বরাহমিহিরের ভারত (খৃঃ ৩০০—৬০০)।

চীনা রাষ্ট্রীয় প্রভাব কোরিয়ায় আর রহিল না। কিন্তু চীনা "কাল-চারের" আধিপত্য দিন দিন বাড়িতে লাগিল। প্রতি বৎসর অসংখ্য কোরিয়ান ছাত্র চীনে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য প্রেরিত হইত। নবম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ কোরিয়ান-সাহিত্যসেবিগণের রচনায় চীনা-চিন্তা-পদ্ধতির প্রকৃষ্ট প্রভাব দেখিতে পাই। পরীক্ষা-নিয়ন্ত্রিত কর্ম্মচারি-সম্প্রদায় চীনা-শাসনপদ্ধতির বিশেষত্ব। এই শ্রেণীর লোক কোরিয়ায় তৈয়ারী হইতে লাগিল। বস্তুতঃ একটা চীনা সমাজই যেন কোরিয়া জনপদে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। চীনের কন্‌ফিউসিয়াস্‌-প্রবর্ত্তিত মতবাদ এদেশে আসিয়া পৌঁছিল। সঙ্গে সঙ্গে চীনা বৌদ্ধধর্ম্মের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানও কোরিয়ায় যথোচিত পুষ্ট হইতে থাকিল।

চীনা রাজধানীর রাষ্ট্রীয় প্রভাব কোরিয়ায় রহিল না সত্য—কিন্তু দুই

দেশের মধ্যে দূত-প্রেরণ এবং দূত-গ্রহণের সম্বন্ধ কখনও বন্ধ হয় নাই। পরে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোগলেরা চীন দখল করিবার পর কিছু কালের জন্য কোরিয়া দখল করে। কোরিয়ার রাজা কর দিতে স্বীকার হইয়া স্বাধীনতা রক্ষা করেন—কিন্তু চীনকে অভিভাবক বিবেচনা করিতে বাধ্য হন। কোরিয়ার উপর চীনাদের অভিভাবকত্ব মোগল আমল হইতে রহিয়াছে।

অপর দিকে জাপানীরা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কোরিয়ার নিকট কয়েকটা বন্দরে বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। দুএকটা ক্ষেত্রে এই অধিকার-ভোগে জাপানীরা বাধা পাইয়া কোরিয়ার উপর বিরক্ত হইয়া উঠে। কোরিয়ায় ও জাপানে দূত-ব্যবহার বন্ধ হইয়া যায়। অবশেষে জাপানী নেপোলিয়ান হিদেয়শি চীন বিজয়ের মানসে কোরিয়ারাজের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া পত্রের দ্বারা জিজ্ঞাসা করেন—"আপনি চীনের অভিভাবকত্ব প্রত্যাখ্যান করিয়া আমাকে চীনের বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন কি?" বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় কুরুক্ষেত্রে জার্ম্মাণেরা বেলজিয়ামকে এইরূপ প্রশ্নই করিয়াছিল। সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া হিদেয়শি কোরিয়া আক্রমণ করেন। কোরিয়ার সকল প্রাচীন সম্পদ ছারখার হইয়া যায়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত চীন ও কোরিয়া সমবেতভাবে জাপানী শত্রুকে স্বদেশে পলায়ন করিতে বাধ্য করেন। এই গেল ১৫৯২ খৃষ্টাব্দের কথা।

তাহার কিছুকাল পরে জাপানীদের তোকুগাওয়া-যুগ আরম্ভ হয়। এই সময়ে ইয়োরোপীয় খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা পাইবার জন্য জাপানী-সমাজে আইন দ্বারা বিদেশ-গমন বন্ধ করা হয়। সুতরাং জাপানীরা কোরিয়ায় আর জুলুম করিতে আসিত না। আড়াইশত বৎসর এই দুই দেশে কোনপ্রকার আদান-প্রদান ছিল না। জাপানে যুগান্তর সাধিত হইবার কিছুকাল পরে কোরিয়া জাপানকে বাণিজ্যাধিকার প্রদান করিতে বাধ্য হয়।

ক্রমশঃ ১৮৯৪।৯৫ খৃষ্টাব্দে জাপান চীনকে পরাস্ত করিয়া কোরিয়াকে চীন হইতে স্বাধীনতা প্রদান করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে কোরিয়ায় চীনের যে অভিভাবকত্ব ছিল তাহা বিলুপ্ত হইল। কোরিয়া স্বাধীনতা হজম করিতে অসমর্থ, এদিকে চীনও কোরিয়াকে বশ্যতা স্বীকার করাইতে অসমর্থ। ইয়োরোপের এক প্রবল শক্তি কোরিয়াকে গ্রাস করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু তিনিও টিকিলেন না। জাপান রুশিয়াকে পরাস্ত করিলেন (১৯০৪-৫)। কাজেই এক্ষণে কোরিয়া জাপানের সম্পত্তি।

কোরিয়া চীনের সংলগ্ন—জাপানেরও অতি নিকটে। কাজেই রাষ্ট্র ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্বন্ধ এই তিন দেশে অতি সহজেই নিষ্পন্ন হইত। মারামারি কাটাকাটি ইত্যাদির সুযোগ এই তিন দেশের লোক প্রায়ই পাইত। কিন্তু ভারতবর্ষ একমাত্র তিব্বত ও দক্ষিণ চীনের সংলগ্ন—কাজেই সুদূর চীন, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, জাপান ইত্যাদির সঙ্গে দাসত্ব বা প্রভুত্বের সম্বন্ধ ভারতবাসীর পক্ষে সহজ ছিল না। অথচ চীনের ইতিহাসে, কোরিয়ার ইতিহাসে এবং জাপানের ইতিহাসে ভারতবর্ষের মূল্য অত্যধিক। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম কোরিয়ায় প্রবর্ত্তিত হয় (খৃঃ ৩৭২)। তাহার তিন-শত বৎসর পূর্ব্বে চীনারা ভারতবাসীর শিষ্যত্বগ্রহণ করেন (খৃঃ ৬৭)। কোরিয়ার দুইশতবৎসর পরে জাপান ভারততত্ত্ব প্রাপ্ত হন (খৃঃ ৫৫২)। কাজেই খৃষ্টীয় প্রথম ছয় শতাব্দীর এশিয়ায় ভারতবর্ষ যথার্থ গুরুর আসনে বৃত হইয়াছিলেন। ভাতবর্ষের রাজা, সামন্ত, বণিক, মহাজন ইত্যাদি এই সকল দেশে আসুন বা না আসুন, ভারতীয় নেপোলিয়ান এশিয়ায় দিগ্বিজয় করিতে বাহির হউন বা না হউন, হিন্দু চিত্রকর, ভাস্কর, বাস্তুশিল্পী ধর্ম্ম-প্রচারক, অধ্যাপক, পুরোহিত ইত্যাদি যে কত সহস্র আসিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা করা কঠিন। যে যুগে প্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ায় ভারত-

মণ্ডল স্থাপিত হইতেছিল, সে যুগ ভারত-ইতিহাসের গৌরব-যুগ। এই বৃহত্তর ভারতের কথা না জানিলে ভারতবর্ষকে জানা হইবে না।

ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতীয় বৌদ্ধতন্ত্র কোরিয়ায় প্রবলপ্রতাপে বিরাজ করিতেছিল। ইতিমধ্যে কন্‌ফিউসিয়াস্ মতবাদ বৌদ্ধতন্ত্রের প্রতি-দ্বন্দ্বী হইয়া উঠে—শেষ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রের আইনে একচেটিয়া আধিপত্য লাভ করে। তথাপি ভারতপ্রভাব কোরিয়ান সমাজ হইতে সমূলে উৎপাটিত হয় নাই। বৌদ্ধমত ও বৌদ্ধ-পুরোহিতের নির্য্যাতন বহুরাজহস্তে একাধিকবার হইয়াছে। কিন্তু আজও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত মন্ত্রাদি মন্দিরে মন্দিরে খোদিত রহিয়াছে, আজও কোরিয়ান নর-নারী ভারতীয় মন্ত্র জপ করিতেছে।

মুক্‌ডেনের পথে

এইবার কোরিয়ার উত্তরার্দ্ধ অতিক্রম করিতেছি। ১৯০৪ সালে রুশিয়ার সঙ্গে মাঞ্চুরিয়া লইয়া যুদ্ধ বাধিবার পর জাপানীরা এই সকল পথে রেলপথ বিস্তার করিতে থাকে। মাঞ্চুরিয়ায় সৈন্য পাঠাইবার পক্ষে এই রেলে জাপানীদের যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছিল।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে জাপান কোরিয়াকে চীন হইতে স্বাধীন করিয়া দেন। তাহার পর হইতে কোরিয়ায় জাপানের প্রতিপত্তি বাড়িতে থাকে। কাজেই যখন রুশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধে তখন ছলে-বলে-কৌশলে জাপানীরা "স্বাধীন" কোরিয়ার রাজকে স্বপক্ষে যোগ দিতে বাধ্য করেন। কোরিয়ার সাহায্য পাইয়াই জাপান রুশিয়াকে এতশীঘ্র পরাজিত করিতে পারিয়াছিলেন। মাঞ্চুরিয়ার যুদ্ধ চালাইবার জন্য কোরিয়া জাপানের "বেস্" বা খুঁটি স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯০৪ সালে মাঞ্চুরিয়া রুশিয়ার প্রভাবমণ্ডলে অবস্থিত ছিল। বাস্তবিকপক্ষে রুশ-সম্রাট মাঞ্চুরিয়ার এক প্রকার ভাগ্যবিধাতা ছিলেন। যুদ্ধের পর মাঞ্চুরিয়ায় জাপান-সম্রাটের সেই এক্তিয়ার স্থাপিত হইয়াছে। মাঞ্চুরিয়া এখনও কোরিয়ার মত পুরাপুরি জাপান-শাসিত নয়। তবে মাঞ্চুদের কোরিয়াবাসীর দশা প্রাপ্ত হইতে বেশী দেরী নাই। চীন-সাম্রাজ্যের "সংরক্ষিত" প্রদেশগুলি একে একে কোরিয়ার মত পরহস্তগত হইতে চলিয়াছে। ইয়োরোপে তুরস্ক-সাম্রাজ্যের ইতিহাসও এইরূপ। তুরস্ককে ইয়োরোপের "সিকম্যান" বা ব্যাধিগ্রস্ত আদমি বলা হয়—চীন সেইরূপ এশিয়ার মৃতপ্রায় ও গলিত অঙ্গ। আমাদের ভাষায় চীনের "গঙ্গামুখো পা"।

প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনা-বহুল স্থানের ভিতর দিয়া যাইতেছি। একটা নগরের নাম সংতো। এখানে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। প্রাচীন নগর-প্রাচীরের অংশ স্থানে স্থানে দেখা যায়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর কতিপয় রাজ-কবর এখানকার দর্শনযোগ্য অট্টালিকা।

হীজো সহরেও প্রাচীন ইতিহাসের স্মৃতি-চিহ্ন আছে। আজ কাল কোরিয়ার ইহা একটা বর্দ্ধিষ্ণু নগর। ইহার নিকটেই কয়লার খনি আছে। কোরিয়ার সর্ব্বত্রই পাহাড় দেখিতেছি, পাহাড়ে গাছপালা বেশী দেখিতে পাই না। কিন্তু সকল প্রকার মূল্যবান্ ধাতুর আকরে এইদেশ পরিপূর্ণ। সেদিন সিউলের সরকারী ব্যাঙ্কের কর্ত্তারা নদীর জলে প্রাপ্ত বড় বড় সোণার চাপ দেখিতেছিলেন। জাপানী খণিতত্ত্ববিদেরা কোরিয়ার পর্ব্বতসমূহ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতেছেন।

প্রাচীনকালে হীজো নগরে একাধিকবার রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। চীনারা অনেক সময়ে এই নগরকে কেন্দ্র করিয়া কোরিয়াবাসীর উপর প্রভুত্ব করিত। জাপানের হিদেয়শি ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে এই সহরও ধ্বংস করেন।

প্রায়ই কোরিয়াবাসীদের দরিদ্র পর্ণ কুটীরমাত্র দেখিতে পাইতেছি। বর্দ্ধিষ্ণু পল্লীতে ও নগরে জাপানীর ঘর বাড়ী দৃষ্টিগোচর হয়। ধান ও ভুট্টার চাষ সর্ব্বত্র চোখে পড়ে। পাহাড়ের সুড়ঙ্গও অনেকবার অতিক্রম করিলাম।

১৪ ঘণ্টায় গাড়ী ৩১১ মাইল আসিল। রাত্রি আটটার সময়ে কোরিয়ার উত্তরতম সীমায় পৌঁছিলাম। এইখানে ইয়ালু নদী কোরিয়াকে মাঞ্চুরিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। প্রকাণ্ড লৌহ-সেতুর উপর দিয়া গাড়ী চলিল। জ্যোৎস্না-রাত্রিতে সেতু হইতে নদীবক্ষের নৌকাগুলি রমণীয় দেখাইল। সেতুর অন্তেই আণ্টং ষ্টেশন। ১৯০৪ সালের সমরে এইখানেই প্রথম স্থলযুদ্ধ হয়। রুশসৈন্যগণ জাপানীদিগের আক্রমণে

বাধা দিতে পারে নাই। জাপানীরা ইয়ালু পার হইয়া আণ্টং দখল করিয়াছিল।

আণ্টং সহর মাঞ্চুরিয়ায়—সুতরাং চীন-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। কিন্তু চীনারা জাপানীদিগকে এই নগরের খানিকটা জমিতে পূর্ণ অধিকার প্রদান করিয়াছেন। এইরূপ ভূমিকে "কন্‌সেশন" বলে। চীন-সাম্রজ্যের নানা নগরে বিদেশীয় রাষ্ট্র-সমূহ এইরূপ বহু "অধিকার" ভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কন্‌সেশন-ভূমিতে স্বাধীন ও যথেচ্ছভাবে চলাফেরা করেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কমডোর পেরি জাপানকে বিদেশীয় বাণিজ্যের জন্য দ্বার মুক্ত করিতে বাধ্য করিবার পর জাপানেও ইয়োরামেরিকার রাষ্ট্রপুঞ্জ এই ধরণের বহু কন্‌সেশন-ভূমি দখল করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, জাপানের শক্তি বৃদ্ধি হইবার সঙ্গে সঙ্গে কনসেশন-গুলি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু জাপানেও বিদেশীরা বড় সহজে অধিকারসমূহ ছাড়েন নাই। চীন কোন কালে বিদেশীয় জুলুম দূরীভূত করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ।

আণ্টঙে গাড়ী বদলাইতে হইল। চীনা শুল্ক-বিভাগের কর্ম্মচারীরা মাল পরীক্ষা করিলেন। নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু ছাড়া প্রত্যেক জিনিষের উপর মূল্যের শতকরা পাঁচ অংশ শুল্ক আদায় হইয়া থাকে। কর্ম্মচারীরা জাপানী—চীনা সরকারের অধীনে কর্ম্ম করিতেছেন।

ষ্টেসনে চীনা কুলি দুই চারি জন দেখিতেছি। মাথায় লম্বা টিকি বা চুলের বেণী। চীনা সমাজ হইতে ইহা এখনও পুরাপুরি তিরোহিত হয় নাই বুঝিলাম। মাঞ্চুরিয়ার রেলে প্রতিদিন "স্লীপিং কার" থাকে না। আজ নাই। সুতরাং ভারতীয় রেলযাত্রীদের মত সকলকে নিজ বিছানা ব্যবহার করিতে হয়। দুঃখের কথা সঙ্গে শয্যাদ্রব্য কিছুই নাই—দেড় বৎসরের ভিতর কোথাও নিজ বিছানা সঙ্গে বহিবার প্রয়োজন হয় নাই।

রেলে হোটেলে সরাইয়ে সর্ব্বত্র বিছানা, মশারী, গামছা, চটিজুতা ইত্যাদি সবই পাওয়া গিয়াছে।

ভোরে উঠিয়া দেখি কোরিয়ার পল্লীসমূহ হইতে মাঞ্চুরিয়ার পল্লীগুলি যেন অধিকতর শ্রীসম্পন্ন। কোরিয়ান পল্লী কুটীরের খড়ো চালা নিতান্তই দীনতার পরিচায়ক। কোন মতে চালা বাঁধিয়া জল রৌদ্র হইতে আত্মরক্ষার জন্য যেন ঐগুলি তৈয়ারী করা হইয়াছে। ঘর দেখিয়া কোরিয়াবাসীর সৌন্দর্য্যজ্ঞান বুঝিবার জো নাই। রেলপথে পল্লীর পর পল্লীতে সেই একঘেয়ে চলনসই খড়ো চালার আচ্ছাদন দেখিয়াছি। মাঞ্চু-চীনাদের পল্লী-কুটীরে লক্ষ্মীশ্রী আছে। ঘরামিরা একটুকু শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দিবার সুযোগ পাইয়াছে। ভারতীয় গণ্ডগ্রামের চালা ঘর বা টিনের ঘরে যেরূপ গৃহনির্ম্মাণ-রীতি দেখা যায় মুক্‌ডেনের পথে চীনা-সমাজে সেই ধরণের বাস্তুশিল্প দেখিতেছি। ইটের বাড়ীও মাঝে মাঝে দৃষ্টিগোচর হয়। গৃহের চারিধারে উচ্চ প্রাচীরও অনেক স্থানে লক্ষ্য করিতেছি। ঘরের সংলগ্ন বাগান কোরিয়ান পল্লীতে দেখি নাই, মাঞ্চুরিয়ায় পাইতেছি। রেলপথের দুইধারে কৃষিক্ষেত্রও কোরিয়ার কৃষিক্ষেত্র অপেক্ষা বিস্তৃততর ও উর্ব্বর-তর বোধ হইতেছে। ধানের ক্ষেত চোখে পড়িল না—বজরা কাঙ্গুন ভুট্টা ইত্যাদিতে মাঞ্চুরিয়ার এই অংশ শস্য শ্যামল রহিয়াছে। ঘোড়ার সাহায্যে হাল বহা হয়—গো-শকটের তুল্য শ্যাম্পানি ঘোড়ায় টানিতেছে।

ক্রমশঃ পার্ব্বত্য অঞ্চল ছাড়াইয়া সমতল ক্ষেত্রের উপর দিয়া গাড়ী চলিতেছে। মুক্‌ডেনের কয়েক মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে এক ষ্টেশনে একজন সহযাত্রী নামিয়া গেলেন। ইনি জাপানী অর্ণবযান-বিভাগের অন্যতম এঞ্জিনিয়ার ও কমাণ্ডার। এইখানে ১০।১২ মাইল ব্যাপী বিরাট কয়লার খনি আছে। ইহা পরিদর্শন করিবার জন্য ইনি নিযুক্ত।

১০ ঘণ্টায় ১৭০ মাইল আসিলাম। গাড়ী নিতান্ত আস্তে চলিয়াছে। রেল-কোম্পানীর হোটেলে আশ্রয় লওয়া গেল। নীল চাপকান পরিধান-কারী টিকিওয়ালা কুলী, বাবুর্চ্চি, চাকরের মুল্লুকে আসিয়া পড়িয়াছি। ঘরে বসিয়া শুনিতেছি কুলীরা "হেইও" "হেইও" রবে মাল তুলিতেছে নামাইতেছে। এই রব বহুদিন পরে শুনিতে পাইলাম।

প্রথম মাঞ্চু-সম্রাটের কবর

ভারতবর্ষের ইতিহাসে "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী"র আমল নামে একটা যুগ চলিয়াছিল। মাঞ্চুরিয়ায় প্রায় এই ধরণের একটা কোম্পানীর আমল চলিতেছে, সেই কোম্পানীর নাম "দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেল কোম্পানী"। এই কোম্পানীর কর্ত্তারা জাপানী। ১৯০৫ সালে রুশিয়াকে পরাজিত করিবার পর জাপানীরা মাঞ্চুরিয়ায় এই কোম্পানীর আমল চালাইতেছেন। আণ্টাঙ্গ, চাঙ্গুঙ্গ, ডাইরেণ, পোর্ট-আর্থার ইত্যাদি নগরসমূহে এই কোম্পানীর খানিকটা করিয়া মুল্লুক আছে। মুকডেনেও প্রাচীন চীনা সহরের অল্পদূরে এই কোম্পানীর দখলে খানিকটা জমি আছে। এই জমিতে আধুনিক নগর গড়িয়া উঠিয়াছে; এই জাপানী মুকডেনের রাস্তা-ঘাট, বাড়ী-ঘর, পোষ্ট-আফিস, হোটেল, দোকান ইত্যাদি সবই পাশ্চাত্য ধরণে তৈয়ারী। বলা বাহুল্য, ষ্টেশন এবং ষ্টেশনের উপরিস্থিত হোটেলও এই কোম্পানীর মুল্লুকেই অবস্থিত।

একজন জাপানী দোভাষীর সঙ্গে বাহির হইলাম। একটা একঘোড়ার ল্যাণ্ডো লওয়া গেল। সহিস চীনা (মাঞ্চু)। জাপানী-মুকডেনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইলাম। ঘোড়ার ট্রামগাড়ী চলিতেছে। অল্পদূর পূর্ব্বদিকে যাইতে যাইতে দোভাষী বলিলেন—"এই স্থানে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। পোর্ট-আর্থার দখল করিবার পর জেনারেল নোগি দক্ষিণ হইতে এই স্থানে আসিয়াছিলেন। অপর দিকে পূর্ব্ব হইতে অপর জাপানী সৈন্য আণ্টাঙ্গে রুশদিগকে হারাইয়া এইখানে নোগির সঙ্গে সমবেত হয়। তাহার ফলে রুশ ও জাপানীরা ১০০ মাইল বিস্তৃত যুদ্ধক্ষেত্রে শক্তি পরীক্ষা করিয়াছিল।

তাহার পরিণাম সকলেরই জানা আছে।" পোর্ট-আর্থারে জলযুদ্ধ ও স্থলযুদ্ধ একসঙ্গে ঘটে, চুশিমায় জলযুদ্ধ হয়, মুক্‌ডেনে স্থলযুদ্ধ। এই তিন ক্ষেত্রেই জাপানীরা অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিয়াছে। ১৫ দিনের যুদ্ধে মুক্‌ডেনে ২৩০০০ জাপানী মারা যায়। একটা স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে।

সহর ছাড়িয়া ক্ষেতের ভিতর দিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। বজরা, ভুট্টা ও কাঙ্গুনের শস্য প্রচুর জন্মিয়াছে। দোভাষী বলিলেন—"এই ভূমি জাপানী মুক্‌ডেনের বাহিরে—চীনা-মুক্‌ডেনের অন্তর্গত। কিন্তু ইহার মালিক একজন জাপানী।" খানিক পরে চীনাদের সুবিস্তৃত গোরস্থান পার হইলাম। কোন অট্টালিকা নাই—কেবল মাটির ঢিপি মাত্র দেখিতে পাইতেছি। অবশেষে বন-জঙ্গলের মধ্যে একটা প্রাচীর-বেষ্টিত বাগান-বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। এই বাগান-বাড়ীটা রাজ-কবর। প্রাচীরের গাত্রে দুই পার্শ্বে বিরাট ড্রেগণের মূর্ত্তি অঙ্কিত ও খোদিত রহিয়াছে। আশে-পাশে ধুতরা এবং অন্যান্য ভারতীয় ফুলের উদ্ভিদ দেখিলাম। ভিতরে পাইনের কুঞ্জবন।

ইয়োরোপে রোমের সিংহাসন দখল করিয়া রোমান-সম্রাট হইবার সাধ বহু নরপতিরই ছিল। আজ ফরাসী, কাল জর্ম্মাণ, পরশু ইতালীয়ান ইত্যাদি বীরপুরুষগণ রোমান-সম্রাট হইয়াছিলেন। সেইরূপ চীনেও আজ অমুক জনপদের নেপোলিয়ান, কাল অমুক বংশের ধুরন্ধর চীন-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাঞ্চুজাতীয় নেপোলিয়ান পিকিঙের সিংহাসন হইতে মিঙ্‌বংশীয় নরপতিকে বিতাড়িত করেন। তাহার ফলে চীনে মাঞ্চুবংশের সাম্রাজ্য-ভোগ ঘটিয়াছে। এই মাঞ্চুবীরের নাম তাৎসুঙ্‌ বা তাচুঙ্‌। তাঁহার বংশ হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত চীন-সম্রাট উৎপন্ন হইয়াছেন। মুকডেন নগর তাৎসুঙের পিতৃভূমি —কাজেই মাঞ্চু-সম্রাটগণের গৌরবস্থল ও তীর্থক্ষেত্র। তাঁহার গোরস্থানও

ধর্ম্মের নিয়মে পরবর্ত্তী নরপতিদিগের পূজার্হ বিবেচিত হইয়াছে। মুক্‌ডেনের চারি মাইল দূরে আজ সেই পাইনঘেরা রাজ-কবর দেখিয়া আসিলাম। ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে তাৎসুঙ্ প্রাণত্যাগ করেন। অল্প কয়েক দিন মাত্র তিনি পিকিঙের সিংহাসনে বসিতে পারিয়াছিলেন।

তাৎসুঙের পূর্ব্ব-পুরুষগণের মধ্যে তাঁহার পিতা বিশেষ প্রসিদ্ধ। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি মুক্‌ডেনে আসিয়া প্রথম রাষ্ট্র-কেন্দ্র স্থাপন করেন। এই কেন্দ্র হইতে ক্রমশঃ সমগ্র চীনের আধিপত্য লাভ হয়। জার্ম্মাণিতে হোহেন-জোলার্ণ-বংশ যেরূপ ধীরে ধীরে প্রশিয়াকে জার্ম্মাণ-সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ও অধিপতি করিয়া তুলিয়াছে, মুক্‌ডেনের মাঞ্চুবংশও এইরূপে সমগ্র চীন-সাম্রাজ্যে মাঞ্চুরিয়ার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাৎসুঙ্‌কে যদি ফ্রেড-রিক-দি-গ্রেট বিবেচনা করি তাহা হইলে তাঁহার পিতাকে প্রথম উইলিয়াম বিবেচনা করা চলিতে পারে। জার্ম্মাণীর হোহেনজোলার্ণ-বংশ এবং চীনের মাঞ্চুবংশ উভয়েরই শৈশবাবস্থা অতি সামান্য ছিল—উভয়েরই ক্রমবিকাশ একই ধরণে এবং অনেকটা একই কারণে সাধিত হইয়াছে।

প্রথম প্রাচীর-বেষ্টিত ভূখণ্ডে সুপ্রাচীন তরুবরসমূহ দণ্ডায়মান। কয়েকটা প্রস্তরময়ী পশুমূর্ত্তি প্রাচীরের দুইধারে দেখিলাম। দুইটী অশ্ব, দুইটী হস্তী, দুইটী উপবিষ্ট উষ্ট্র এবং চারিটী উপবিষ্ট চীনা-জানোয়ার। চীনা ভাষায় এই জন্তুগুলিকে "চীলিন" বলে। একটা দ্বিতলবিশিষ্ট প্যাগোডা দেখা গেল। ইহার ভিতর কূর্ম্মজাতীয় জলজন্তুর পৃষ্ঠদেশে এক বিশাল শিলাখণ্ড অবস্থিত। ইহাতে চীনা, মোগল এবং মাঞ্চু অক্ষরের লিপি রহিয়াছে। প্যাগোডার ভিত্তি ও প্রাচীর প্রস্তর নির্ম্মিত। ছাদের ব্র্যাকেট ও কড়ি-বর্গা ছাড়া কাঠের ব্যবহার দেখিলাম না। টালিগুলি ইনামেল করা। বাহির হইতে সমগ্র সৌধের বর্ণ রক্তিমাভ অথবা বার্ণিশ করা কাঁঠাল কাঠের মত।

এই প্যাগোডা হইতে অগ্রসর হইয়া আর একটা প্রাচীর-বেষ্টিত ভূখণ্ডে পদার্পণ করিলাম। এই ভূখণ্ড প্রায় সমচতুষ্কোণ। চারিকোণে চারিটী উচ্চ দ্বিতল প্যাগোডা। এই গুলিকে মুসলমানী মস্‌জিদের মিনারেট স্বরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে।

প্রাচীর, প্যাগোডা, গৃহ ইত্যাদি সবই ইষ্টকময় অথবা প্রস্তর-নির্ম্মিত। অলঙ্কার, বর্ণ-সমাবেশ, চিত্রাঙ্কণ, ইনামেলের টালি, ড্রেগণ-নক্‌সা, কাঠের ব্র্যাকেট ইত্যাদি সবই প্রথম প্যাগোডার মত।

প্রাচীরের মধ্যস্থলে একটা সুবৃহৎ ফটক। পুরু কাঠের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। যেন প্রাচীন কালের কোন দুর্গে প্রবেশ করিলাম। মোটা কাঠের অর্গল সরাইয়া দরজার সম্মুখীন হওয়া যায়। ফটক এবং প্রাচীরের প্রস্থ ভিতর হইতে দেখিয়া দিল্লীদুর্গের প্রবেশ-পথই মনে পড়ে।

প্রাঙ্গণের ভিতর পাঁচটা গৃহ—সকলগুলির নির্ম্মাণ-রীতি প্রায় এক-প্রকার—সম্মুখের ঘরে রাজবংশীয় মূল্যবান্ দ্রব্য, পুস্তক ইত্যাদি রক্ষিত হইত। এগুলি এক্ষণে পিকিঙে স্থানান্তরিত হইয়াছে। অপর চারিটী গৃহ দুই পার্শ্বে দুইটি করিয়া দণ্ডায়মান। কবর রক্ষার্থে লোকজন এবং অভ্যাগত-দিগের জন্য এই সকল গৃহ নির্ম্মিত।

সিঁড়ি দিয়া ফটকের উপর উঠিলাম। উঠিয়াই দেখি প্রাচীরের ছাদে আসিয়াছি। ফটক প্যাগোডাকৃতি তিন ছাদের স্তরে বিভক্ত। প্রাচীরের উপর দিয়া প্রাঙ্গণটা প্রদক্ষিণ করিয়া লইলাম। ছাদ এত প্রশস্ত যে ১২ জন লোক পাশাপাশি চলিতে পারে।

ফটকের ঠিক অপর পারের প্রাচীরের মধ্যস্থলে একটা দ্বিতল প্যাগোডা। ইহার ভিতরেও তিন অক্ষরে লিপি খোদিত আছে। এই সকল লিপিতে মাঞ্চুবীর তাৎস্থঙের কীর্ত্তি প্রচারিত হইতেছে। পরবর্ত্তী কোন সম্রাট ইহার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

প্রাচীরের এই অংশ হইতে দেখিলাম, সম্মুখে একটা পর্ব্বতশৃঙ্গ সদৃশ উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ। সিউলে যেরূপ ঢিপিতে রাণীর কবর দেখিয়াছি ইহাও সেইরূপ ঢিপি।

সাধারণ মৃত্তিকার অভ্যন্তরেই তাৎসুঙের শব প্রোথিত রহিয়াছে। কোন প্রকার সৌধ ইহার উপর নির্ম্মিত হয় নাই। সৌধ, উদ্যান, পাগোডা, লাইব্রেরী, লিপি, পশুমূর্ত্তি ইত্যাদি যাহা কিছু দেখিতেছি, সবই কবরের বাহিরে। কবরটা কাঁচামাটির স্তূপ মাত্র। অবশ্য প্রাচীরে বেষ্টিত। সুতরাং তাৎসুঙের কবর দেখিতে আসিলে তিনটা প্রাচীর-বেষ্টিত ভূখণ্ড দেখিতে হয়—তিনটাতে তিনপ্রকার দৃশ্য।

কোরিয়ান অট্টালিকার ছাদে যে সমুদয় জীব-জন্তুর মূর্ত্তি দেখিয়াছি মাঞ্চুরিয়ার রাজ-কবর সন্নিহিত সৌধাবলীর ছাদেও সেই সমুদয় দেখিতেছি, কিন্তু জাপানের কোন গৃহে এই সমুদয় দেখি নাই।

মাঞ্চুরিয়ার প্যাগোডাকৃতি সৌধসমূহের ছাদগুলিতে বক্রিমতা নাই। জাপানী মন্দির, প্রাসাদ ইত্যাদি অট্টালিকার ছাদে বক্রিম আকৃতিই বিশেষ লক্ষ্য করিবার বস্তু। হোরিয়ুজি হইতে নিক্কো, শিবা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সেই ত্রিভঙ্গিম ছাদ দেখিতে পাওয়া যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে যে সময়ে মাঞ্চু-নেপোলিয়ানের সমাধিক্ষেত্র রচিত হইতেছিল, প্রায় সেই সময়েই আগ্রায় তাজমহল এবং জাপানে নিক্কোর সৌধসমূহ স্থাপিত হয়। ভারতীয় মোগল, চীনা-মাঞ্চু, এবং জাপানী তোকু-গাওয়া যুগের বাস্তুশিল্প এবং প্রসাধন-প্রণালী তুলনা করিতে হইলে মুক্-ডেনের স্থান সর্ব্ব নিম্নে হইবে, নিক্কোর স্থান দ্বিতীয়, আগ্রা সর্ব্বপ্রথম আসিবে। এক হিসাবে এইরূপ তুলনা-সাধন অন্যায়—কারণ মাঞ্চুরা এই কবরেই যে তাঁহাদের চরম শিল্পজ্ঞান দেখাইয়াছিলেন অথবা দেখাইবার জন্য অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। যদিও তিনটাই

গোরস্থান বটে, কিন্তু শাজাহানের যে প্রেরণা ছিল সে প্রেরণা মাঞ্চুবংশীয় নরপতির ছিল বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু তোকুগাওয়াবংশীয় শোগুণেরা তাহাদের স্থাপয়িতাদিগের জন্য যে আয়োজন করিয়াছিলেন তাহার দশমাংশও মাঞ্চুবংশীয় নরপতিগণ তাঁহাদের প্রবর্ত্তকের জন্য করেন নাই দেখিতেছি। তাৎসুঙের সমাধিক্ষেত্র নিতান্তই সাদাসিধা আড়ম্বর-বিহীন চলনসই অনুষ্ঠান বলিতে প্রবৃত্তি হয়।

ফিরিবার সময়ে জাপানী মুকডেনের কয়েকটা সুপ্রশস্ত রাস্তা দিয়া আসা গেল। শুনিলাম, প্রায় ৪০০০ জাপানী এইখানে বাস করে। আণ্টুঙ হইতে মুকডেন পর্য্যন্ত রেলপথের ধারে ধারে বহু জাপানী আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে। এই সকল উপনিবেশ বিগত দশ বৎসর ব্যাপী জাপানী আমলের ফল। কিন্তু কোরিয়ায় যেরূপ যেখানে সেখানে জাপানী দেখিতে পাই মাঞ্চুরিয়ায় সেরূপ পাই না। ইহা মাঞ্চুরিয়ানদেরই দেশ—দীর্ঘাবয়ব সবুজ চাপকানপরা, টিকিওয়ালা লোকের মুল্লুক। মাঞ্চুরা দেখিতে মৌলবী সদৃশ—কোরিয়ানদের মতও নয়, হ্রস্বাকৃতি জাপানীদের মতও নয়। কলিকাতার চীনাবাজারে যাহাদিগকে দেখা যায়, এই চীনারাও প্রায় সেই-রূপ। সুতরাং ইহাদের তুলনা ইহারাই। কিন্তু খাকি-পরা এবং পুলিশী বা পল্টনী টুপিওয়ালা চীনাদিগকে এক শ্রেণীর জাপানী বলিয়াই ভ্রম হয়। গুর্খা সৈন্য, জাপানী সৈন্য এবং চীনা সৈন্য দেখিতে অনেকটা এক প্রকার।

হোটেলের নিকটেই একটা প্রাচীন মন্দির দেখা যায়। ইহাকে "লামা-টাওয়ার" বলে। এই প্যাগোডার গঠন কিছু বিচিত্র।

পুরুষ এবং স্ত্রীলোক প্রায় একরূপ পোষাক পরিধান করে। তাহার উপর চুলের বেণী উভয়েরই আছে। কাজেই রাস্তায় স্ত্রী-পুরুষ প্রভেদ করা অনেক সময়ে কঠিন হয়। তবে যে সকল মেয়ে মানুষ খোপা বাঁধিয়া

থাকে তাহাদিগকে চিনিতে বিলম্ব হয় না। মাঞ্চুদের চুল বাঁধিবার রীতি জাপানী রীতি হইতে বিশেষ পৃথক্। মাথায় কাঠের ফ্রেম বসাইয়া তাহার উপর চুলের রকমওয়ারি গড়ন দেওয়া মাঞ্চুমেয়েদের দস্তুর।

মাঞ্চুদের রাজধানী

জাপানী-মুকডেন দশবৎসরের সহর। কিন্তু মুকডেন বলিলে মাঞ্চু-চীনাদের রাজধানী বুঝায়। মাঞ্চুবংশীয় প্রথম চীন-সম্রাট তাৎসুঙের পিতা ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্থাপন করেন। . এই বংশের রাষ্ট্র-কেন্দ্র পূর্ব্বে অন্য স্থানে ছিল। মুকডেনে বসিয়াই তাৎসুঙ চীন-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে পিকিঙে মাঞ্চুবংশীয় রাজধানী স্থাপিত হয়। তখন হইতে মুকডেন চীন-সাম্রাজ্যের একটা প্রাদেশিক নগর মাত্র রহিয়াছে।

এই প্রাচীন মুকডেন দেখিতে গেলাম। নূতন জাপানী-সহর এবং পুরাতন চীনা-সহরের মধ্যে খানিকটা খালি জমি পড়িয়া আছে। এইখানে বিভিন্ন দেশীয় রাষ্ট্রের কন্‌সালেরা আফিস বসাইবার জন্য চীন-সাম্রাজ্যের অনুমতি পাইয়াছেন। এই সকল আফিস দেখিতে দেখিতে দুর্গন্ধময় ধূলি-প্রধান সঙ্কীর্ণ রাস্তার ভিতর আসিয়া পড়িলাম। দুইধারে নানাপ্রকার অপরিষ্কার দোকান। রাস্তার উপরে মালপত্র জমা রহিয়াছে। নর্দ্দমায় মাছি ভন ভন করিতেছে। খাবারের দোকান, তরকারীর দোকান, কামারশালা, মনোহারি দোকান ইত্যাদি ছোট, বড়, মাঝারি দোকানে বহুলোক কেনা-বেচা করিতেছে। জাপানের পাড়াগাঁয়ে এবং সহরে সহরে ভারতীয় দৃশ্য যত পাইয়াছি মাঞ্চু-মুকডেনে তাহা অপেক্ষা বেশী পাইলাম। দিল্লী, আগ্রা, এলাহাবাদ ইত্যাদি নগরের চকবাজার, গলি, হাট, দোকান দেখা থাকিলে আর মুকডেনে নূতন দৃশ্য দেখা অসম্ভব। ইয়োরামেরিকান মাল-পত্র দোকানে দোকানে পাওয়া যায় বটে—কিন্তু সে গুলির পরিমাণ

ও কাট্‌তি এখানকার ধরণ-ধারণ দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন এই নগর স্থাপিত হয় তখন ইহা যেরূপ দেখাইত আজও যেন সেইরূপ দেখিতেছি। ঘরে, বাহিরে, ভিতরে, ছাদে এত ধূলা ময়লা জমিয়াছে যে নগরকে দেখিবামাত্র অতি পুরাতন অতি স্থবির বলিয়া বোধ হইবে। নূতন জীবনের লক্ষণ কোথাও যেন নাই। রাস্তায় ঘোড়ার ট্রাম চলিতেছে এবং ইলেক্‌ট্রিক বাতির স্তম্ভ আছে। এই দুইটী জিনিষ দেখিয়া মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় যে বিংশশতাব্দী মুক্‌ডেনেও উঁকি মারিয়া থাকে।

মধ্যযুগের এশিয়া দেখিতে দেখিতে সুবৃহৎ ফটকের ভিতর আসিয়া পড়িলাম। ইহা অতিক্রম করিবামাত্র খাঁটি মুক্‌ডেনে উপস্থিত হইলাম। এই ফটকের মত আটটা ফটক সহরের চারিদিকে আছে—ফটকগুলি চতুষ্কোণ প্রাচীরবিশিষ্ট নগরের প্রবেশ-দ্বার। যে দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলাম উহাই প্রধান ফটক।

ফটকের উপর উঠিয়া সমগ্র দৃশ্য দেখিয়া লইলাম। এই প্রাচীর তাৎস্থঙ্‌ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। প্রাচীর এত বিস্তৃত যে ১২।১৪ জন লোক একসঙ্গে পাশাপাশি চলিতে পারে। সমস্ত সহরের পরিধি প্রায় চারি মাইল হইবে। প্রাচীরের ছাদ হইতে খোলার ঘরের সমাবেশ অতি সুন্দর দেখাইল। বর্ত্তমান কালে মুক্‌ডেন লক্ষ্মীশ্রীহীন অপরিষ্কার এবং অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িয়াছে সত্য, কিন্তু নগর-স্থাপয়িতা যে যুগে রাজধানী বসাইয়াছিলেন সেই যুগে ইহার সৌন্দর্য্য, পারিপাট্য এবং স্বাস্থ্যকরতা যথেষ্ট ছিল, একথা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সমস্ত প্রাচীরটাই অটুট রহিয়াছে, তবে সংস্কারাভাবে বন-জঙ্গলে পূর্ণ দেখিলাম। তাৎস্থঙের সমাধিক্ষেত্রও এক্ষণে আগাছা-পরগাছায় ভরিয়া রহিয়াছে।

প্রধান ফটকের সোজা পথে খানিক দূর অগ্রসর হইলে একটা ঘণ্টা-গৃহে

উপস্থিত হইলাম। এই ঘণ্টা বাজাইলে চারি প্রাচীরের আটটা ফটক বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত। তাহার পর প্রবেশ-নির্গম নিষেধ। আজকাল অবশ্য আর ঘণ্টা বাজে না। ঘণ্টা-গৃহ চতুষ্কোণ নগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই স্থানে উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব-পশ্চিম পথদ্বয় কাটাকাটি করিয়া বাহির হইয়াছে। প্রধান ফটক পশ্চিম দিকে, ঘণ্টা-গৃহে পৌঁছিয়া দক্ষিণ, পূর্ব্ব এবং উত্তর ফটক পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিলাম। সমস্ত সহরটা অতিঘন-সন্নিবিষ্ট, সর্ব্বত্র লোকে লোকারণ্য, সহরের ভিতর কোথাও বাগান বা বেড়াইবার স্থান নাই। প্রধান দুইটি রাজপথ ছাড়া অন্যগুলি সবই সঙ্কীর্ণ গলি। প্রত্যেক দোকানে কেনা-বেচা সর্ব্বদা চলিতেছে—কোথাও কেহ বসিয়া নাই। কিন্তু সবই যেন মামুলি ধরণের গতিবিধি।

এক দোকানে প্রবেশ করিয়া এখানকার প্রধান খাদ্যদ্রব্য দেখিয়া লইলাম। প্রায় আমাদের ধরণেই মাঞ্চুরা রুটি প্রস্তুত করে, তরকারীও অনেকটা আমাদের মত। স্যানফ্র্যান্‌সিস্কোর প্রদর্শনীতে দেখিয়াছিলাম, মেক্সিকোর লোকেরাও ভারতীয় রুটিই ভক্ষণ করে।

তাৎসুঙ্‌ যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দের পর তাহা আর ব্যবহৃত হয় নাই। কারণ পরবর্ত্তী মাঞ্চু-সম্রাটগণ পিকিঙে বাস করিতেন। প্রাসাদের প্রাচীর-গাত্রে ড্র্যাগন-চিত্র অসংখ্য দেখিলাম।

মুক্‌ডেনের সর্ব্বত্র ড্র্যাগন-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। রাস্তায় রাস্তায় দেখিতেছি, দোকান-গৃহের বিজ্ঞাপন বা নোটিশ ড্রাগণাকৃতি স্তম্ভে ঝুলান হইয়া থাকে।

অধিকাংশ মাঞ্চুর দেখিতেছি, মস্তকের সম্মুখাংশ কামান। পশ্চাৎভাগে হয় কেশগুচ্ছ না হয় চুলের বেণী। দেখিয়া উড়িয়াবাসী অথবা সরযু-পারীণ অথবা দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণের কথা মনে পড়ে। কোন কোন

চাপকান-পরা দাড়িওয়ালা মাঞ্চু-চীনাকে দেখিলে ভারতীয় মুসলমানের আকৃতি স্মরণে আসে।

নগরের প্রাচীর প্রধানতঃ মৃত্তিকা-গঠিত। তবে দুই ধারেই কয়েক ফিট করিয়া ইটের গাঁথনিও আছে। প্রাচীরের বাহিরে চারিদিকেই সুবিস্তীর্ণ জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছে। মোটের উপর মুক্‌ডেনে লোকসংখ্যা দুইলক্ষ মাত্র।

জাপানের রাস্তায় "চারখানা"র ছিটের বাহার দেখিয়াছি। কোরিয়ান নরনারীর পোষাক সাধারণতঃ শ্বেতবর্ণ। মাঞ্চু-চীনে নীল ফতুয়া ও চাপকানের প্রাচুর্য্য লক্ষ্য করিতেছি।

জাপানী-মুক্‌ডেনে ফিরিয়া আসিয়া একটা চীনা-হোটেল দেখিতে গেলাম। ষ্টেসনের সম্মুখে একটা সুশ্রী অট্টালিকা। ইহার মধ্যে মাঞ্চু-চীনাদের স্বদেশী হোটেল। এখানকার বন্দোবস্ত অনেকটা জাপানী ধরণের। বস্তুতঃ, প্রাচীন জাপানী সরাইগুলিই কোরিয়ান ও চীনা-প্রতিষ্ঠানের অনুকরণে গঠিত। আজ অবশ্য চীনাদের সে গৌরবযুগ নাই।

জাপানীদের মুখে শুনিতে পাই, চীনাদের মত অপরিষ্কার স্বাস্থ্যজ্ঞান-হীন জাতি দুনিয়ায় নাই,—জাপানীরা চীনাকে সভ্য ও শিক্ষিত করিতে আসিয়াছে। মুক্‌ডেনের জাপানী-সহর দেখিলে একথা সত্য বলিয়াই বোধ হইবে। কালের কি বিচিত্র গতি! কাল প্রভাবে চীনারা আজ-কাল একটা "ফসিল্‌," নিস্পন্দ, অসাড়, অস্থিকঙ্কাল বা জীবাশ্ম মাত্র। ইহাদের ভিতর জীবন-স্পন্দন সৃষ্টি করিবার জন্য, চীনাসমাজে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা জাগাইবার জন্য বাহিরের খোঁচা অত্যধিক আবশ্যক বোধ হইতেছে। "প্রাচীনযুগে আমি তোমার গুরু" একথা বলিয়া চীনারা জাপানীর নিকট গৌরব করিলে লাভ কিছুই হইবে না। অথবা "তোমরা যখন অসভ্য ছিলে তখন আমরা বারুদ হইতে মুদ্রাযন্ত্র পর্য্যন্ত বহু দ্রব্য

আবিষ্কার করিয়াছিলাম” একথা বলিলেও ইয়োরামেরিকাকে জব্দ করা যাইবে না।

রাত্রিকালে একটা চীনা-থিয়েটার দেখা গেল। অনেকটা আমাদের যাত্রা-গানের মত। চীনাদের গানের স্বর শুনিয়া প্রীত হইলাম। সেইদিন সিউলের একজন কোরিয়ান কালোয়াতের কণ্ঠস্বরে ভারতীয় ওস্তাদের রীতি অনুভব করিয়াছি। দুইখানা কাঠি বাজাইয়া তাল দিবার প্রথা চীনাথিয়েটারে দেখিলাম। জাপানী সঙ্গীত-কলা এই হিসাবে নিকৃষ্ট বোধ হইয়াছিল। জাপানে সুমিষ্ট গলার আওয়াজ অথবা তালজ্ঞান পাই নাই। চীনা-গায়কগণকে ভারতীয় গায়কগণের নিকট-আত্মীয় মনে হইতেছে। মিশরীয় সঙ্গীতেও ভারতবর্ষের নৈকট্য এতটা বুঝি নাই। অবশ্য দুএকবারের সামান্য অভিজ্ঞতার জোরে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় সঙ্গীত কলার আলোচনা করিতে বসা ধৃষ্টতা মাত্র।

যুবক-জাপানের রক্তমাখা চরণ-চিহ্ন

জাপানকে নবীন-এশিয়ার জন্মদাতা বলিতেছি। এই এশিয়ার জন্ম-ভূমি মাঞ্চুরিয়া—মাঞ্চুরিয়ার পর্ব্বতে পর্ব্বতে নদীতে নদীতে পল্লীতে পল্লীতে যুবকজাপানের গৌরব-কাহিনী অঙ্কিত রহিয়াছে। মাঞ্চুরিয়াকে নবীন এশিয়ার সূতিকাগার বলা যাইতে পারে। রুশিয়ার সর্ব্বনাশ এবং জাপানের বিজয়গৌরব এই নদী-মাতৃক পর্ব্বত-সমাকুল শস্য-শ্যামল জন-পদেই সাধিত হইয়াছিল। ঠিক ১১ বৎসর পূর্ব্বে এই আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে মাঞ্চুরিয়ার সকল অঞ্চলে রক্তগঙ্গা বহিতেছিল।

মুকডেনে ২৪ ঘণ্টা কাটাইলাম। আণ্টুং হইতে মুকডেন পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-মাঞ্চুরিয়ার সকল স্থানেই জাপানী-বীরের গৌরব-স্তম্ভ পাইয়াছি। আজ মুকডেন হইতে দক্ষিণে যাত্রা করিয়াছি। এই পথের ২৫০ মাইলও জাপানীক্ষত্রিয়ের ধারাবাহিক বিজয়-পথ। মুকডেন স্বয়ংই জাপানের ওয়াটারলু। এই যুদ্ধে রুশসৈন্য পরাজিত হইবার পর সন্ধি-স্থাপনের উদ্যোগ হয়। ১৯০৫ সালের ১৪ই মার্চ্চ রুশ-সেনাপতি প্রায় একলক্ষ সৈন্য মৃত আহত ও বন্দীভাবে ফেলিয়া মুকডেন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই যুদ্ধে জাপানীদের মৃত এবং আহত সৈন্যগণের সংখ্যাও পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক। ১৮১৫ সালের ওয়াটারলু এবং ১৯০৫ সালের মুক-ডেন জগতের ইতিহাসে এক শ্রেণীর অন্তর্গত। মুকডেন এই কারণে নবীন-এশিয়ার তীর্থক্ষেত্র।

জাপানীরা এক সঙ্গে দুই দিক হইতে মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে। ১৯০৪ সালের ১লা মে তারিখে সেনাপতি কুরোকি আণ্টুং দখল করিয়া কোরিয়া

হইতে মুক্‌ডেনের পথে আসিতে থাকেন। প্রায় সেই সময়েই সেনাপতি নোগির অধীনস্থ সৈন্যগণ পোর্ট-আর্থারের কিছু দূরস্থিত ভূখণ্ড দখল করিয়া দক্ষিণ হইতে মুক্‌ডেনের দিকে অগ্রসর হয়। নোগি উত্তরে না আসিয়া পোর্ট-আর্থার অবরোধ করিতে থাকিলেন। তাঁহার সহকারী সেনাপতি ওকু উত্তরের দিকে চলিলেন। ওকু এবং কুরোকি উভয়কেই প্রত্যেক ছটাক জমির উপর রুশসৈন্য পরাজিত করিতে হইয়াছে। আজ যে সকল স্থানে রেল-ষ্টেশন দেখিতেছি তাহার প্রত্যেকটাই ভীষণ যুদ্ধের ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। এক এক পা অগ্রসর হইবার জন্য জাপানী সৈন্যগণের রক্ত জলের মত খরচ হইয়াছে। একটা বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা এই যে, কোন ক্ষেত্রেই জাপানীদিগের সামান্য মাত্র পরাজয় হয় নাই। আজ ইয়োরোপের মহাকুরুক্ষেত্রে দেখিতেছি এক বৎসরের ভিতর জার্ম্মাণি ওয়ার্স দখল করিল—তাহার গতি কোন উপায়ে কিঞ্চিন্মাত্রও বাধা পায় নাই। সেইরূপ রুশযুদ্ধে জাপানীরা অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হইয়াছিল।

ওকু মুকডেনে আসিয়া উপস্থিত হইতে হইতে নোগি পোর্ট-আর্থার দখল করিয়া ফেলেন। পরে নোগি মুক্‌ডেনে অন্যান্য সেনাপতির সঙ্গে যোগ দিতে সমর্থ হন। কাজেই মুক্‌ডেনে ১০০ মাইল ব্যাপী বিরাট যুদ্ধক্ষেত্র সৃষ্ট হইয়াছিল। মুক্‌ডেনে রুশিয়ার পরাজয় না হইলে যুদ্ধ আরও কিছুকাল চলিত। বস্তুতঃ জাপানের রুশসমরে পোর্ট-আর্থার বিশেষ স্মরণীয় কি মুক্‌ডেন বিশেষ স্মরণীয় ইহা বিচার করা সুকঠিন। উভয়কেই সমানভাবে এশিয়ার ম্যারাথন ও থার্ম্মপলি এবং মাঞ্চুরিয়ার হল্‌দিঘাট বলা যাইতে পারে।

রেলপথের প্রত্যেক পল্লী ও নগরই ১১ বৎসর পূর্ব্বে এক একটা যুদ্ধক্ষেত্র ছিল। কাজেই রেলে বসিয়া জাপানীদের রক্তমাখা চরণ-চিহ্ন দেখিতে

দেখিতে দক্ষিণে যাইতেছি। যুদ্ধাবসানের পর হইতে দশ বৎসরের ভিতর এই অঞ্চলে প্রায় ৫০ হাজার জাপানী আসিয়া বাস করিতেছে। প্রত্যেক ষ্টেসনেই জাপানীদের প্রভুত্ব লক্ষ্য করিতেছি—জাপানী সৈন্য প্রত্যেক ষ্টেশনে পাহারা দিতেছে। দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেল-কোম্পানী একটা সাধারণ বণিক-কোম্পানী মাত্র নয়। ইহা বিলাতী, ফরাসী, ওলন্দাজ ও পর্ত্তুগীজ "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর" মত একটা শাসক-সম্প্রদায়ও বটে। এই রেল-কোম্পানীর অধীনে রাজ্য চলিতেছে বলা যাইতে পারে।

এশিয়ার ম্যারাথন

রাত্রিকালে পোর্ট-আর্থার পৌঁছিলাম। আজ ১৯শে আগষ্ট। এগার বৎসর পূর্ব্বে ১৯০৪ সালে ঠিক এই দিনে জাপানী সৈন্যগণ পোর্ট-আর্থার দুর্গ আক্রমণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতেই এ্যাডমিরাল তোগো দুর্গের সন্নিহিত পোতাশ্রয়ে জলযুদ্ধ চালাইতে ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতি নোগির জনগণ স্থলপথের কতকগুলি প্রধান স্থান দখল করিয়া মাঞ্চুরিয়ার উত্তরপ্রদেশ হইতে পোর্ট-আর্থারের সংযোগ ছিন্ন করিতেছিলেন। সাড়ে সাত মাস ধরিয়া দুই দিকে শক্তিশালী হই-বার পর সেনাপতি দুর্গ অবরোধের জন্য প্রস্তুত হন।

দুর্গ আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে নোগি রুশ-সেনাপতিকে লিখিয়া পাঠান— "দুর্গ ও সহর হইতে নন্-কম্বাটাণ্ট অর্থাৎ সাধারণ জনগণকে বাহিরে আসিতে অনুমতি দিন। তাহাদের ক্ষতি না করা আমাদের ইচ্ছা। অধিকন্তু দুর্গ আমাদের হস্তে সমর্পণ করুন। কারণ বেশী দিন অপনারা ইহা রক্ষা করিতে পারিবেন না।" রুশ-সেনাপতি ষ্টোশেল দূত পাঠাইয়া জানাইলেন —"আমরা জাপান-সম্রাটের কৃপা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। অনুগ্রহ প্রদর্শনের কোন প্রয়োজন নাই। দুর্গ, সহর, এবং সশস্ত্র, অশস্ত্র, সৈনিক ও সাধারণ সকলকেই রক্ষা করিবার ক্ষমতা আমাদের আছে।" উত্তর আসিলে পর নোগি ১৯শে আগষ্ট কামান দাগিলেন। চারি মাস পরে এমন এক দিন আসিয়াছিল, যে দিন ষ্টোশেল নোগির কৃপাপ্রার্থী হইয়া লিখিয়া পাঠান— "দুর্গের যে যে স্থানে লালক্রশ পতাকা উড়িতেছে সেই দিকে আক্রমণ করিবেন না।" কিন্তু আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত তাঁহার রক্ত গরম ছিল।

খৃষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে ম্যারাথনের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে গ্রীস-আক্রমণকারী পারসীকগণ গ্রীককর্ত্তৃক পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে গ্রীকেরা পরাজিত হইলে ইয়োরোপের কি অবস্থা হইত—এই বিষয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ অনেক সময়ে কল্পনার আশ্রয় লইয়া থাকেন। মোটের উপর ধারণা এই যে, তাহা হইলে ইয়োরোপ এশিয়া হইয়া যাইত। বিগত ২০০০ বৎসরে জগতে যে সভ্যতা ক্রমশঃ উন্নতির পথে উঠিয়াছে তাহার গতি রুদ্ধ হইত। সেইরূপ পোর্ট-আর্থারে জাপানীরা পরাজিত হইলে এশিয়ার কি অবস্থা হইত এই বিষয়েও কল্পনা চালান যাইতে পারে। বেশী দূর ভবিষ্যতে যাইবার প্রয়োজন নাই—এই মাত্র সহজেই বোধগম্য যে, তাহা হইলে জাপানের অস্তিত্ব থাকিত না,—তাহা হইলে চীন এত দিনে ইয়োরামেরিকার মধ্যে ভাগাভাগি হইয়া যাইত—পারস্য এবং আফগানিস্থানের বাটোয়ারা কার্য্যও সম্পূর্ণ হইত—এশিয়া ইয়োরামেরিকা হইয়া পড়িত। আজ সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশে শ্বেতাঙ্গের যে স্থান, প্রাচীন সভ্যতার অধিকারী এশিয়ারও জনপদে জনপদে শ্বেতাঙ্গের সেই স্থান হইত। একথা এশিয়াবাসী সম্যক্ বুঝিতে পারেন কিনা জানি না, কিন্তু ইয়োরামেরিকানেরা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছেন। অবশ্য মাত্র দশ বৎসর হইল এশিয়ার ম্যারাথনে জাপানী-ক্ষত্রিয়েরা কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। ইহার যথার্থ মূল্য বুঝিতে কিছু সময় আবশ্যক।

রেল হইতেই দেখিতে পাইয়াছি যে, পোর্ট-আর্থার অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ পর্ব্বতবেষ্টিত উপত্যকায় ও উপসাগরে নির্ম্মিত। রুশেরা ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে চীন-সাম্রাজ্য হইতে এই স্থান অধিকার করিবার পর প্রত্যেক গিরিশৃঙ্গে একটা করিয়া দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। দুর্গসংখ্যা ২৫। দুর্গ হইতে জলপথ, স্থলপথ উভয় পথই রক্ষা করা যায়।

এক একটা দুর্গ অধিকার করিতে জাপানীদের কিরূপ সাহসিকতা

দেখাইতে হইয়াছিল, সেনাপতি নাকামুরার নিম্নলিখিত আদেশ হইতে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়—

"আমরা কেল্লাটাকে তুফাঁক করিয়া দিতে চাই। কেহই জ্যান্ত ফিরিবে আশা করিও না। আমি মারা গেলে কর্ণেল ওয়াতানাবে কর্ত্তা হইবেন। তিনি মারা গেলে লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল ওকুবো কর্ত্তা হইবেন। প্রত্যেক সেনাপতিই এইরূপ প্রত্যেক উচ্চতর সেনাপতির উত্তরাধিকারী। আমরা সঙ্গীনের জোরে কেল্লা দখল করিতে চাই। আমরা গোলাগুলি একদম খরচ করিব না। রুশেরা অতি ভীষণ ভাবে কামান দাগিতে থাকিলেও আমরা একবারও তোপ ছাড়িব না।"

আর একটা পাহাড় দখল করিতে জাপানীদের ৩১৫৪ জন সৈন্য মৃত এবং ৬৮৫৩ জন সৈন্য আহত হইয়াছিল। রুশপক্ষে ৫৩৮০ জন সৈন্যের মৃত দেহ দুর্গের ভিতর পড়িয়াছিল। সেনাপতি নোগি এই দুর্গ দখল করেন। এই পাহাড়ের নাম ২০৩ মিটার বা ৬০০ ফিট উচ্চ পাহাড়। নোগি দুর্গ অধিকার করিবামাত্র জাপানী ভাষায় এক কবিতা রচনা করেন। তাহার ইংরাজী অনুবাদ এই :—

203 Metre Hill is steep
But the steepest hill has been climb'd
By warriors bold with a will to dare
And victory firm set in their mind.

No fame without effort ever was won,
And to do a glorious deed
A man must be ready to bear all ills
And to hardships give no heed.

Shells, corpses, and blood covered the Hill.
Its contour was moulded afresh ;

Such tragedy never was known on earth
Since the gods descended in flesh.

This Hill has thus become sacred to all
As long as the ages shall roll.
To-day I give it a new name to bear :
The glorified "Hill of my Soul."

"দু'শ তিন মিটার" পাহাড় খাড়া উচ্চশির,
বীরেরা দখল ক'রেছে সেই শুভ্র ধরিত্রীর।
যায় প্রাণ থাকে মান বীরদের ছিল পণ,
বিজয় নিশ্চিত তাদের জেনেছিল মন।

বিনা কষ্টে কেষ্ট মিলে না কোন কালে,
জান্ না দিলে গৌরব জুটে না কপালে।
সাধনায় সিদ্ধি লাভ কর্‌তে যারা চায়,
নাই তাদের মৃত্যু ভয়, সাথী অধ্যবসায়।

পাহাড় গেছে ঢেকে রক্তে শবে গুলি গোলায়,
দাঁড়িয়ে রয়েছে এটা এক নয়া চেহারায়।
এমন ভীষণ রক্তকাণ্ড ঘটেনি পৃথিবীতে,
দেবতারা যেদিন হ'তে এসেছে মানব মূর্ত্তিতে।

আজ হ'তে পবিত্র থাক্‌বে এই পাহাড়,
যতকাল রয় ধরায় মানুষের সংসার।
নয়া নামে ভূষিত তোমায় করি, গিরিবর,
পুণ্য-ভূমি পাহাড় এই "নোগির অন্তর"।"

এই গেল ৫।৬ই ডিসেম্বরের ঘটনা। ইতিপূর্ব্বে প্রায় বৎসর খানেক এ্যাড্‌মিরাল তোগো পোর্ট-আর্থার হইতে ৫।৬ মাইল দূরে সমুদ্রের ভিতর

থাকিয়া রুশ-অর্ণবযানসমূহের গতি রুদ্ধ করিয়া বসিয়াছিলেন। বহু জাপানী বাণিজ্য-জাহাজ ডুবাইয়া পোতাশ্রয়ের সঙ্কীর্ণ প্রবেশ-পথ বন্ধ করা হইয়াছিল। সমুদ্রকূলস্থিত দুর্গ হইতে কামান দাগিয়াও রুশ-সৈন্য জাপানী বাণিজ্য-জাহাজগুলি পুরাপুরি জখম করিতে পারে নাই। ফলতঃ চারি-মাসের মধ্যে জাপানীরা রুশ-অর্ণবযানগুলিকে পোতাশ্রয়ের ভিতর আটক রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১০ই আগষ্ট কতিপয় রুশ-রণতরী ভীষণবেগে বাহির হইয়া আসে। তখন এক প্রহর কাল যুদ্ধ হয়—কিন্তু রুশের পরাজয় হয়। তাহার পর হইতে রুশ-জাহাজগুলি পোর্ট-আর্থারের বন্দরের ভিতর পাহাড় ও দুর্গের পশ্চাতে লুক্কায়িত থাকে। অবশেষে নোগি যখন পোর্ট-আর্থারের উচ্চতম পার্ব্বত্যদুর্গ দখল করিলেন, তখন প্রথমেই ইহার উপর একটা পর্য্যবেক্ষণ-মন্দির নির্ম্মিত হইল। এই কেন্দ্র হইতে পোর্ট-আর্থারের সকল দুর্গ, পাহাড়, নগরের প্রত্যেক অংশ, পোতাশ্রয়ের প্রত্যেক বিভাগ, রণতরী ইত্যাদি সবই অতি সহজে দেখা যায়। নোগি এই সমুদয় দেখিয়া তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী সহকারীকে তারহীন টেলিগ্রাফে সংবাদ পাঠাইতে লাগিলেন। সেই সকল সঙ্কেত-অনুসারে সহকারী পোতাশ্রয়ের ভিতর গোলা বর্ষণ সুরু করেন। ১১ই হইতে ২২শে ডিসেম্বরের মধ্যে সকল রুশ-জাহাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। আর দু-একটা দুর্গ অধিকৃত হইলে পর ১লা জানুয়ারি ১৯০৫ সালে রুশ-সেনাপতি পরাজয় স্বীকার করিয়া নোগির নিকট পত্র লিখিলেন।

১৯০৫ সালের প্রথম দিবস নবীন-এশিয়ার জন্মতিথি। ১৪ মার্চ্চ মুক্‌ডেনে জাপানীর ওয়াটারলু-কীর্ত্তি। এই বৎসরই ২৭ মে চুশিমা সাগরে রুশ-বাল্টিক-ফ্লীটের সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। সুতরাং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ বর্ত্তমান জগতে যুগান্তর আনিল।

এশিয়া-পর্য্যটক কাউণ্ট ওতানি

ষ্টেশন হইতে দেখিয়াছিলাম, পর্ব্বত-শৃঙ্গে মৃত জাপানী ক্ষত্রিয়গণের স্মরণার্থে নির্ম্মিত মনুমেণ্ট-স্তম্ভের শিরোদেশে বৈদ্যুতিক দীপাবলী জলিতেছে। সকালে হোটেল হইতে দেখি, সম্মুখেই উপসাগর একটা সাধারণ সুপ্রশস্ত দীর্ঘিকার মত দেখাইতেছে। ম্যানেজার বলিলেন—"রুশ-গবর্মেণ্ট প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া এই উপসাগরে বৃহত্তম মানোয়ারি ও বাণিজ্য-জাহাজের পোতাশ্রয় নির্ম্মান করিয়াছিলেন।" নিকটেই কয়েকখানা সুবৃহৎ অট্টালিকা অসম্পূর্ণ অবস্থায় দেখিলাম। গৃহগুলি জাপানীরা সম্পূর্ণ করিতে আবশ্যক বোধ করেন নাই। রুশ-সাম্রাজ্যের পক্ষে পোর্ট-আর্থার আকাশের তারাস্বরূপ ছিল। ইয়োরোপে কন্‌ষ্টাটিনোপল দখল করিবার সম্ভাবনা একপ্রকার নাই বুঝিয়া রুশ-গবর্মেণ্ট, ছলে বলে কৌশলে চীন-সম্রাটের নিকট হইতে পোর্ট-আর্থার ও ডাইরেণ পল্লীদ্বয় ভাড়া করিয়া লন। এশিয়ায় তাঁহাদের বিরাট বন্দর ও রাষ্ট্রকেন্দ্র ব্লাডিবষ্টকে আছে—কিন্তু সেখানে বৎসরের অল্প কয়েক মাস মাত্র স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করা যায়। বরফ জমিয়া সমুদ্রপথ রুদ্ধ করিয়া রাখে। পোর্ট-আর্থার ও ডাইরেণ এই দুই সমুদ্র-পল্লীর ন্যায় স্থান সমগ্র রুশ-সাম্রাজ্যের কুত্রাপি নাই। কাজেই এই অঞ্চল পাইবামাত্র রুশ-গবর্মেণ্ট অপর্য্যাপ্ত অর্থব্যয় সুরু করিলেন। ডাইরেণ অপেক্ষা পোর্ট-আর্থার অধিকতর পর্ব্বতসমাকুল। সুতরাং অন্যান্য অসুবিধা সত্ত্বেও পোর্ট-আর্থারকেই রুশ-সমর-বিভাগ সকল প্রকার কেন্দ্ররূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। কিন্তু জাপানীরা পোর্ট-আর্থারকে বিশেষ মূল্যবান্ বিবেচনা করিতেছেন না। ইঁহারা ডাইরেণকে জাপানী

মাঞ্চুরিয়ার রাজধানীতে পরিণত করিতেছেন। সুতরাং রুশ-আমলে পোর্ট-আর্থারের যে গৌরব ছিল আজ তাহা নাই।

অধিকাংশ অট্টালিকাই বিরাট রাজধানীর উপযুক্ত দেখিতেছি। রুশ-জাতি এখানে একটা দ্বিতীয় মস্কো বা পেট্রোগ্র্যাড গড়িয়া তুলিতেছিলেন—তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। শুনিলাম, রুশ-আমলে শেতাঙ্গ নরনারীর সংখ্যাই ছিল তিন হাজারেরও অধিক। আজ এখানে ৩০ জনও নাই। এক্ষণে একটি মাত্র হোটেলে বিদেশীয়গণের বসবাস সম্ভব—তাহাতেও কখন ৫।৬ জনের বেশী ইয়োরামেরিকান থাকেন না।

রাস্তায় কতকগুলি সৌধে গোলাগুলির চিহ্ন দেখা গেল। পর্ব্বতগাত্রে অবস্থিত একটা গৃহে কিয়োতোর হোঙ্গাঞ্জি-বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের ধুরন্ধর কাউণ্ট ওতানি বাস করিতেছেন। গৃহের বারান্দা হইতে উপসাগর এবং পর্ব্বতশৃঙ্গ ও দুর্গগুলি সবই দেখা যায়।

তারকেশ্বর ইত্যাদি স্থানের দেবমন্দিরাদির মোহন্ত বা গোসাঁইদিগের যে পদমর্য্যাদা, কাউণ্ট ওতানীর স্থানও জাপানী বৌদ্ধ-সমাজে সেইরূপ। বলা বাহুল্য, লক্ষ লক্ষ টাকার জমিদারি এই সকল মোহন্তদিগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। জাপানে অর্থ-বিষয়ক অসাধুতা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায়। মোহন্ত ওতানিও এইরূপ গণ্ডগোলে পড়িয়া এক প্রকার দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বোধ হয় তিনি আর জাপানে ফিরিবেন না। বিদেশে বসিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনায় এবং এশিয়ার পুরাতত্ত্ব-অনুসন্ধানে নিরত থাকিবেন।

ওতানি সর্ব্বসমেত তিনবার ভারতবর্ষ ঘুরিয়া আসিয়াছেন। চীনের উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব্ব-পশ্চিম বোধ হয় ইনি ৫।৬ বার দেখিয়াছেন। সম্প্রতি ইনি তুর্কী-স্থানেও বহুকাল কাটাইয়াছেন। তুর্কীস্থানে প্রাপ্ত নানা পুঁথি, চিত্র, মূর্ত্তি, লিপি ও মুদ্রা ইনি জাপানের নানা মিউজিয়ামে উপহার দিয়াছেন।

কিয়োতোর মিউজিয়ামে কিছু কিছু দেখিয়াছি। বলা বাহুল্য, জাপানী ভাষায় ইঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিত হইয়া থাকে। ওতানি অক্স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন বিভাগে কিছু কাল লেখা পড়া করিয়া ছিলেন। ভারতবর্ষ, চীন, বৌদ্ধধর্ম্ম ইত্যাদি ছাড়াও নানা বিষয়ে ইঁহার দৃষ্টি আছে। এইরূপ বিচক্ষণ এশিয়া-পর্য্যটক এশিয়ায় বেশী নাই। আমাদের সিংহলবাসী বৌদ্ধপ্রচারক আনাগারিকা ধর্ম্মপাল খানিকটা এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

প্রাচীন এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার-সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইল। ভারতীয় কুষাণ-নরপতিদিগের রাজধানী পুরুষ-পুর বা পেশোয়ার নগরে ছিল। তাঁহাদের আমলে মহাযান বৌদ্ধমতের উৎপত্তি হয়। তাহার পর এশিয়ার সর্ব্বত্র এই মতের প্রচার হইয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"জাপানী কোবোদাইশি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে চীনে আসিয়া ভারতীয় বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন। চীনের কোন্ অঞ্চলে তখন বৌদ্ধ-প্রভাবের কেন্দ্র বিরাজ করিত?" ওতানি বলিলেন—"আমি সেই স্থান দেখিয়া আসিয়াছি। সে চীনা তাঙ্‌বংশীয় সম্রাট্‌গণের রাজধানী সিন্দান-নগর। পিকিঙের বহুদূর দক্ষিণ-পশ্চিমে এই নগর অবস্থিত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে এই স্থানে চীন-সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রকেন্দ্র হয়। হুয়েন্থসাঙ্‌ এই কেন্দ্র হইতেই পশ্চিমে যাত্রা করিয়া তুর্কীস্থানের পথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। আবার হুয়েন্থসাঙ্‌ এই সহরেই ফিরিয়া আসেন। জাপানীরা যখন চীনে ছাত্র হইয়া আসিতেন তাঁহারাও এই নগরে বাস করিতেন।"

এই ত গেল সপ্তম শতাব্দীর পরের কথা। কিন্তু ভারতীয় ধর্ম্ম চতুর্থ শতাব্দীতে চীন হইতে কোরিয়ায় প্রবেশ করে। তাহার দুইশত বৎসর পরে জাপানীরা কোরিয়ায় এই ধর্ম্ম পায়। ওতানিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোরিয়ায় যখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হয় তখন চীনে কোন্ কেন্দ্র সুপ্রসিদ্ধ

ছিল?" ওতানি বলিলেন—"আমি সেই কেন্দ্রও দেখিয়া আসিয়াছি। উহাই চীনের প্রাচীনতম বৌদ্ধ-কেন্দ্র। তাহার নাম হোনান। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে (৬৭ খৃঃ অঃ) তুর্কীস্থান হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম এই নগরে প্রবেশলাভ করে। তুর্কীস্থানের সঙ্গে মধ্যচীনের সংযোগ প্রাচীনকালে যথেষ্ট ছিল।"

সুতরাং প্রাচ্য এশিয়ায় বৃহত্তর-ভারতের ইতিহাস বুঝিতে হইলে মধ্য এশিয়ার পথে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য। এই জনপদের প্রধানতঃ দুই কেন্দ্রে "ভারতমণ্ডল" সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল—উত্তরে কুচা, দক্ষিণে খোতান। এই দুই নগর হইতেই মধ্যচীনে যাওয়া-আসা হইত। পেশোয়ার হইতে খোতান, খোতান হইতে হোনান, এবং হোনান হইতে হরিযুজিনারা —এইরূপ সোপান-পরম্পরায় ভারত, চীন ও জাপান ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে জলপথে এবং স্থলপথে অন্যান্য সংযোগসূত্র প্রস্তুত হইয়াছিল এবং কেন্দ্রও স্থাপিত হইয়াছিল।

ওতানি কিয়োতো হইতে তাঁহার সমগ্র গ্রন্থশালা আনাইয়া ডাইরেনের রেলওয়ে-লাইব্রেরীতে দান করিয়াছেন। কিছুকাল পোর্ট-আর্থারে কাটাইয়া আবার চীনে যাইবার ইচ্ছা আছে।

জাপানী শিক্ষকেরা বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে এখানকার পাহাড়ে পাহাড়ে লইয়া যাইয়া বক্তৃতা করেন। নোগি-অধিকৃত পর্ব্বতশৃঙ্গের মণুমেণ্ট দেখিতে আসা জাপানী মাত্রের একটা সাধ। আজ দেখিলাম, একজন মেজর জেনারাল তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণকে এই পাহাড় দেখাইতে আসিয়াছেন। নোগি-অধিকৃত পাহাড়, নাকামুরা-অধিকৃত দুর্গ এবং যুদ্ধক্ষেত্রের নানা দৃশ্য দেখিবার জন্য পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া আসিলাম। কোথাও ভগ্নস্তূপ, কোথাও স্মৃতিস্তম্ভ, কোথাও বা অর্দ্ধপ্রস্তুত অসম্পূর্ণ গিরিদুর্গ, কোথাও পার্ব্বত্য-সুড়ঙ্গ দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। "সমর-মিউজিয়ামও" দেখা গেল।

হায় চীন !

চীনারাও পোর্ট-আর্থারের মূল্য বুঝিত। ইহার চীনা-নাম লুশান। একটা সুবৃহৎ চীনা-জনপদ লুশান পাহাড়ের সন্নিহিত ভূখণ্ডে গড়িয়া উঠিয়াছিল। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে চীনের বিরুদ্ধে যখন ইংরাজ ও ফরাসীরা সমবেতভাবে যুদ্ধ করেন তখন ইংরাজ-রাজপুত্র আর্থার এই স্থান হইতে পিকিঙের অধিকার কল্পনা করেন। তাঁহার নামেই লুশান-পাহাড় পোর্ট-আর্থার অভিহিত হইতেছে। যুদ্ধের পর চীনারা এই অঞ্চলকে সুরক্ষিত করিতে সচেষ্ট হন—কিন্তু ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে জাপানীরা ইহা সহজেই দখল করিলেন। রুশ, ফরাসী, জার্ম্মাণ-গবর্মেণ্টত্রয় সমবেতভাবে জাপানকে এই অধিকার ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। কিন্তু ইহার চারি বৎসর পরেই রুশ-সরকার চীনের নিকট কৌশলে পোর্ট-আর্থার ভাড়া করিয়া লন। তাহার পর হইতেই এই নগরের সমৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে।

কিন্তু পোর্ট-আর্থারের সমৃদ্ধিতে চীনা-অধিবাসীদিগের বিশেষ কোন লাভ হয় নাই। তাহারা তাহাদের পর্ণকুটিরে নিরানন্দ জীবন অতিবাহিত করিয়া আসিতেছে। নূতন রাজধানীর বাহিরে তাহাদের জন্য আস্তানা দেওয়া হইয়াছে। রুশ-আমলে যেরূপ ছিল, চীনাদের অবস্থা জাপানী-আমলেও তাহাই দেখিতেছি। নিতান্ত অপরিষ্কার মহল্লায় অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় জীবনধারণ করা চীনাদের ভাগ্যে ঘটিতেছে। চীনা-সহরে যাইয়া দেখি—একটা নর্দ্দমার জলে হাত মুখ ধুইয়া এবং কাপড় কাচিয়া চীনারা সন্তুষ্ট থাকিতেছে। জাপানী নরনারীর এরূপ দুর্দ্দশা কোথাও দেখি নাই। কোরিয়ান এবং মাঞ্চু-চীনা উভয়েই ন্যূনাধিক পরিমাণে এক অব-

স্থায় রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, যে কারণে কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়া আজ জাপানের আওতায় এবং কাল রুশিয়ার আওতায় থাকিতে থাকিতে শেষ পর্য্যন্ত জাপান-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এবং জাপানী-প্রভাবমণ্ডলের অধীন হইয়াছে; সেই কারণেই কোরিয়াবাসী এবং মাঞ্চু-চীনার দারিদ্র্য, দুঃখ, অস্বাস্থ্যকর জীবন-ধারণ দেখিতে পাইতেছি।

জাপানীরা প্রায়ই বলিয়া থাকেন—"মহাশয়, চীনাদের চরিত্র বুঝা কঠিন। উহারা একে একে সকল প্রদেশই হাতছাড়া করিতে বাধ্য হইতেছে। তথাপি এখনও উহারা ভাবে যে চীনাদের সমান বুদ্ধিমান, শক্তিশালী এবং সুশিক্ষিত জাতি জগতে আর নাই।" এই চরিত্র ভারতবাসীর পক্ষে বুঝা কঠিন নয়। কারণ চীনারা যেমন আজও চীনদেশকে দুনিয়ার কেন্দ্র বিবেচনা করে, আমরাও সেইরূপ ভারতবর্ষের আর্য্যসন্তানকে আজও জগতের গুরু বিবেচনা করি। অবশ্য জগতের ইহাতে কিছু আসে যায় না —জগৎ বসিয়া নাই, আমাদের আত্মাভিমান তুচ্ছ করিয়া দ্রুতগতিতে চলিয়া যাইতেছে। প্রাচীন জাতি মাত্রেরই আত্মাভিমান একটা বিষম ব্যাধি। এই ব্যাধি সহজে কাটাইয়া উঠা কঠিন। বোধ হয় চীন কাটাইয়া উঠিতে পারিবে না। কাজেই চীনকে ভারতবর্ষের দশায় আসিতেই হইবে।

মাঞ্চুরিয়ার বুকের উপর, কোরিয়ার বুকের উপর ১৮৯৪ হইতে ১৯০৫ সাল পর্য্যন্ত দুইবার মহাযুদ্ধ হইয়া গেল। বিদেশীয় সৈন্যগণ লক্ষে লক্ষে আসিয়া সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা ভূমি ছারখার করিতে করিতে শক্তি পরীক্ষা করিতে থাকিল। কিন্তু কোরিয়ান বা চীনা-মাঞ্চুদের তাহাতে কোন স্বার্থাস্বার্থ বোধ দেখা গিয়াছিল কি? বোধ হয় না। "বেল পাক্‌লে কাকের কি?" ব্যাপারটা বুঝিবার ক্ষমতাই তাহাদের ছিল না। জাপানীরা বলেন—চীনারা কেবল টাকা চিনে। রুশ-সেনাপতির টাকা পাইলে

তাহারা রুশ-সৈন্যগণের সেবক হইত। জাপানী-সেনাপতির টাকা পাইলে তাহারা আমাদের চাকর হইত। ইহারা আমাদের যুদ্ধের সময়ে জলের ভারী, বেহারা, বাবুর্চি, কুলী এবং ঘরামি রূপে দুইপক্ষের গোলামি করিয়াছে। উহাদের মাতৃভূমি যে উহাদের দখল হইতে খসিয়া পড়িতেছে তাহা ভাবিবার বা বুঝিবার অবসর উহাদের ছিল না।"

যাহা হউক, কোরিয়া আজ পুরাপুরি জাপানের অধীন। এই অধীনতার কবল হইতে উদ্ধার পাওয়া কোরিয়াবাসীর সাধ্যাতীত। মাঞ্চুরিয়ার কিয়দংশ কোরিয়ার মত জাপান-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। অপরাংশে জাপানীরাই সর্ব্বেসর্ব্বা, যদিও চীন-রিপাব্লিকের কর্ম্মচারীরা এখনও এই সকল অঞ্চলে কর্ম্ম পরিচালনা করিতেছেন। জাপানের প্রভাব মাঞ্চুরাও ছাড়াইয়া উঠিতে পারিবে না। কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়া নানাবিধ মূল্যবান্ এবং অত্যাবশ্যক ধাতুর আকরে পরিপূর্ণ। অধিকন্তু ভূমি সর্ব্বত্রই উর্ব্বর। জাপানের শাসনে এই সকল অঞ্চলে প্রচুর ধনোৎপাদন হইবে। তাহাতে স্বদেশী-জনগণের কোন উপকার নাই নিঃসন্দেহ। "পর দীপ শিখা নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।" জাপানীরা ঘরের অতি সন্নিকটে একটা বৃহত্তর-জাপান গড়িয়া বিশ বৎসরের মধ্যে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইবে। আজ জাপানের যে অর্থাভাব দেখিতে পাইতেছি এই অর্থাভাব একপুরুষ কালের ভিতর অতীত কাহিনী মাত্র হইয়া পড়িবে। যুবক-জাপান সবেমাত্র দৌড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার দৌড় কতদূর তাহা ভবিষ্যদ্দর্শী রাষ্ট্রবীরগণ বুঝিতেছেন।

জাপানী-ধুরন্ধরগণের মধ্যে খেলোয়াড় ধড়িবাজের সংখ্যা মন্দ নয়। জাপান আজ যাঁহাকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতেছেন—কাল তাঁহার সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন ভাবিতেছেন। আজ জাপানের যে চরম শত্রু, কাল সেই পরম মিত্র বিবেচিত হইতেছে। এই সকল দেখিয়া

শুনিয়া মনে হইতেছে, জাপানের আর মার নাই—জাপান-সরকারের কর্ত্তারা অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিবার জন্ত সর্ব্বদা মত-পরিবর্ত্তন ও কৌশল-পরিবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত। এইরূপ বিচক্ষণ রাষ্ট্রবীরের সংখ্যা জাপানী-সমাজে শীঘ্র কমিবার আশঙ্কা নাই। সুতরাং আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রমণ্ডলে জাপানের জয়জয়কার চলিতে থাকিবে।

বৃহত্তর-জাপানের ভিত্তি-স্থাপন দেখিয়া পুলকিত হইতেছি। অন্ততঃ একটা প্রাচ্য-জাতি জগতে দাঁড়াইয়া গেল। কিন্তু অপরপক্ষে ভাবিতেছি, হায় কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়া! তোমাদের স্বাধীনতা-লাভ এক্ষণে স্বপ্নেরও অতীত! বর্ত্তমানযুগে এরোপ্লেন, ড্রেড্‌নট, তারহীন টেলিগ্রাফ ইত্যাদির আমলে বিজ্ঞানহীন শিল্পহীন জাতি একবার পরাধীন হইলে তাহার স্বাধীনতা লাভ একপ্রকার অসম্ভব।

বন্দে পোর্ট-আর্থারম্

এশিয়ার ম্যারাথন, জাপানী মাঞ্চুরিয়ার হলদিঘাট, পোর্ট-আর্থার নবীন এশিয়ার জন্ম দিয়াছে। নোগি-তোগোর পরাক্রম ভূমি, শিশু জাপানের পরীক্ষাক্ষেত্র, এই পোর্ট-আর্থার এশিয়াবাসীর চোখের ঠুলি খুলিয়া দিয়াছে। ইহার নীল জলধিজলে এবং নির্মম গিরিপৃষ্ঠে যুবক-এশিয়ার উৎপত্তি হইয়াছে। নব্য জাপানী সামুরাইগণের এই বীরত্ব-নিকেতন রুশদর্প হরণ করিয়া জগতে শ্বেতপ্রাধান্যে বাধা দিয়াছে। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের পর উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া দুনিয়ার সর্ব্বত্র ইউরোপ-আমেরিকার আস্ফালন বাড়িয়া চলিয়াছিল। ১৯০৫ সালে পোর্ট-আর্থারে শ্বেতাঙ্গ-প্রাধান্য সর্ব্বপ্রথম কঠোর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বৎসর মানবসমাজে এক যুগান্তর সৃষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর এশিয়া সম্বন্ধে ইতিহাস রচিত হইবার কাল যখন আসিবে, তখন পোর্ট-আর্থারের ১৯০৫ সালের ১লা জানুয়ারির ঘটনা যুগপ্রবর্ত্তকরূপে বিবৃত হইবে।

পোর্ট-আর্থার, মানবেতিহাসের সর্ব্ব নূতন পরিমাপ-প্রস্তর; উহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে জগৎ যে ভাবে চলিত, তাহার পরে ঠিক সেই ভাবে চলিতেছে না। ইহা জগতে নব নব কর্ম্মশক্তি ও চিন্তাশক্তির সৃষ্টি করিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র প্রাচ্য জগৎ নিতান্ত নিষ্প্রভ ও ঘৃণ্য ছিল। পোর্ট-আর্থার বিশ্ববাসীকে উচ্চকণ্ঠে জানাইয়াছে—"প্রাচ্য জনগণও 'বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধরে স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত' হইতে জানে। বীরভোগ্যা বসুন্ধরায় বিশেষ কোন মহাদেশের একচেটিয়া প্রভাব থাকিবে না। যাহারা এখনও প্রধান আছে ক্রমশঃ সাবধানতার সহিত তাহাদিগকে

এশিয়ায় বিচরণ করিতে হইবে। ইয়োরামেরিকায় এশিয়াবাসীর যে স্থান হইবে, এশিয়ায়ও ইয়োরামেরিকানের সেই স্থান থাকিবে!"

যুগপ্রবর্ত্তক পোর্ট-আর্থার কত জাতির কত কু-সংস্কার একসঙ্গে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে! ইহার ফলে ইয়োরামেরিকার দাম্ভিকতা অপসৃত হইতেছে, এশিয়াবাসীর আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস দূরীভূত হইতেছে। ইহা সকলকেই শিখাইয়াছে, "আত্মবিস্মৃতিই সকল অনর্থের মূল।" ইয়োরামেরিকা এই শিক্ষা পাইয়া আত্মসংযম অভ্যাস করিতেছে, এশিয়াবাসীও স্বকীয় ক্ষমতার অনুশীলন করিতেছে। এইরূপে মানবেতিহাসে নূতন এক নবজীবন বা রেঁনেসাঁসের আয়োজন হইতেছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যেরা ভাবিত—"প্রাচ্য নরনারীগণের ধাতে সাংসারিক জ্ঞানবিজ্ঞান লাগিবে না। ইহারা মায়াবাদী ও অলীক কল্পনায় নিরত।" প্রাচ্যেরাও ভাবিত—"পাশ্চাত্যেরা ইহজগৎ লইয়া মায়ামুগ্ধ রহিয়াছে। আমরা উচ্চতর আধ্যাত্মিক জীবনের কর্ম্ম করিতেছি।" পাশ্চাত্যেরা প্রাচ্যকে অশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত ও অসভ্য বলিয়া ঘৃণা করিত; প্রাচ্যেরা পাশ্চাত্যকে ভোগী নিষ্ঠুর বর্ব্বর বলিয়া নিন্দা করিত। ১৯০৫ সালের পোর্ট-আর্থার উভয়েরই অজ্ঞান অবিদ্যা ও কুসংস্কার দূরীভূত করিয়াছে। পাশ্চাত্যেরা দেখিল, প্রাচ্যেরা পাশ্চাত্যদিগের মতই ড্রেডনট্ এরোপ্লেন চালাইতে পারে। সুতরাং প্রাচ্যেরাও সুসভ্য সুশিক্ষিত। এদিকে প্রাচ্যেরাও বুঝিল, তাহারাও বৈষয়িক শিল্পবিজ্ঞানে সুদক্ষ হইতে জানে। পরলোকের তত্ত্বই তাহাদের একমাত্র ধ্যানধারণার বিষয় নয়। পোর্ট-আর্থার এই বলিয়া বিংশ শতাব্দীর মূল সূত্র প্রচার করিয়াছে যে—"রক্তমাংসের মানুষ মাত্রেই এক প্রকার—মানব সমাজে প্রাচ্য পাশ্চাত্য প্রভেদ সত্য নয়। যিনি East is East এবং West is West বলিয়াছেন, তিনি ঘোরতর কুসংস্কারে অন্ধ ছিলেন।"

পোর্ট-আর্থার সকলের চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়াছে যে, এই প্রভেদ-জ্ঞান মাত্র এক শতাব্দীর বস্তু। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ইত্যাদি শব্দ মানবসমাজে প্রচারিত হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে প্রাচ্য জগতে পাশ্চাত্য জাতির প্রভাব বিস্তৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চজাতি নিম্নজাতি, প্রাচ্যসমস্যা, পীতাঙ্গ বিভীষিকা ইত্যাদি শব্দ সুপ্রচলিত হইয়াছে। অথচ প্রাচীনকালে এবং মধ্য যুগে এশিয়াবাসীর সঙ্গে ইয়োরোপীয়ানের আদানপ্রদানে এইরূপ জাতিসমস্যা (race problem) দেখা দিত না। সেই সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পরস্পর পরস্পরকে সম্মান করিয়া চলিত। এশিয়ায় ইয়োরোপে একটা দাগ টানিয়া মানবজাতিকে উচ্চ নীচ স্তরে বিভক্ত করা হইত না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য মানবের ভ্রম হইয়াছিল। ১৯০৫ সালের লুশান পাহাড় ইয়োরামেরিকাকে বুঝাইয়া দিয়াছে যে, মানচিত্র দেখিয়া কোন জাতিকে উত্তম কোন জাতিকে মধ্যম কোন জাতিকে অধম বিবেচনা করিতে নাই, আজ যে অধম কাল সে উত্তম হইতে পারে, আবার আজ যে উত্তম কাল সে অধম হইতে পারে। সাময়িক সফলতা দ্বারা কোন জাতির চরিত্র ও কার্য্যক্ষমতা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে নাই। সাময়িক অকৃতকার্য্যতা দেখিয়াও কোন সমাজের কোষ্ঠি গণনায় প্রবৃত্ত হইতে নাই। তাহা হইলে পদে পদে বিড়ম্বিত হইতে হয়। কেন না চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।

পোর্ট-আর্থারের কীর্ত্তি প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে ইয়োরামেরিকার পণ্ডিত, দার্শনিক এবং সমাজ-তত্ত্ববিদগণও কুসংস্কারে মত্ত ছিলেন। রাষ্ট্রমণ্ডলের কৃতকার্য্যতা অকৃতকার্য্যতা দেখিয়া তাঁহারা জগতের জাতি-পুঞ্জের চরিত্র-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইতেন। ডিপ্লম্যাট এবং রাষ্ট্রবীরগণের "Nothing succeeds like succes"-তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক মহলেও প্রবিষ্ট

হইয়াছিল। ইহার প্রভাবে পণ্ডিতগণ অন্ধভাবে সমাজবিজ্ঞানের ও নৃ-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপীয়েরা যখন বিজয়শীল এবং এশিয়াবাসী যখন ক্রমশঃ অবনতির পথে অগ্রসর তখন একজাতি নিশ্চয়ই চিরকাল সকল বিষয়ে গুণবান্ এবং অপর জাতি নিশ্চয়ই চিরকাল সকল বিষয়ে গুণহীন—এইরূপ ধারণা স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় গৃহীত হইত। সাময়িক জয়-পরাজয়ের অতিরিক্ত তথ্য সমালোচনার জন্য দার্শনিকগণ সচেষ্ট ছিলেন না। কাজেই প্রাচ্য দেশীয় ধর্ম্ম, সাহিত্য, সুকুমার শিল্প ইত্যাদি সভ্যতার সকল অঙ্গ নিকৃষ্ট বিবেচিত হইত, এমন কি এইগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ পর্য্যন্তও অনাবশ্যক বোধ হইত। পোর্ট-আর্থার পণ্ডিত মহলে চৈতন্য সঞ্চার করিয়াছে। রাষ্ট্রবীরগণ প্রাচ্যমণ্ডলের এক "inferior race"কে 'ফাষ্ট ক্লাস পাওয়ার' রূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তৎক্ষণাৎ ইয়োরামেরিকার পণ্ডিত-পরিষৎও তাঁহাদের পুরাতন স্বতঃসিদ্ধগুলি সংশোধন করিতে অগ্রসর হইলেন। প্রাচ্য মানবের চরিত্র, প্রাচ্য মানবের বিদ্যা, প্রাচ্য মানবের সভ্যতা বিশ্ববাসীর উপেক্ষণীয় নয়, বৈজ্ঞানিকেরও উপেক্ষণীয় নয়—এই ধারণা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছে। বরং উল্টাদিকেই ঝোঁক দেখা যাইতেছে। ইয়োরামেরিকা ভরিয়া প্রাচ্যদেশীয় সাহিত্য কলা দর্শনের চর্চ্চা ও সমাদর আরব্ধ হইয়াছে।

পোর্ট-আর্থার দুনিয়ার চিন্তায় এশিয়ার বাণীকে স্থান দিয়াছে। আজ ইয়োরামেরিকান সমাজের তথ্য ও তত্ত্বসমূহ এশিয়ার তথ্য ও তত্ত্বসমূহের সঙ্গে সমান আদরের সহিত একত্র আলোচিত হয়। যথার্থ তুলনামূলক আলোচনা-প্রণালীর (comparative method) প্রবর্ত্তনে ইহা সাহায্য করিয়াছে।

বিগত দশ বৎসরের ভিতর জগতের যে-কোন ক্ষেত্রে যে-কোন

ঘটনা দেখিতেছি তাহার প্রত্যেকটাতেই ইহার প্রভাব বুঝিতে পারি। ইহা সপ্রমাণ করিয়াছে যে, এসিয়াবাসী নব্য ইয়োরামেরিকান বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া জগতে যশস্বী হইতে পারিবে। খৃষ্টীয় ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইয়োরামেরিকানেরা এশিয়াবাসী অপেক্ষা কোন বিজ্ঞানে শিল্পে বা দর্শনে উন্নত ছিলেন না। বরং এশিয়াবাসীই পাশ্চাত্য নরনারীর নিকটে বহুশতাব্দী পূর্ব্ব হইতে "জ্ঞান ধর্ম্ম কত কাব্যকাহিনী" প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর পর হইতে প্রাচ্য জগতে বিদ্যার ভাটা পড়িয়াছিল। তাহা অস্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু নবীন জাপানে "মেজি"-যুগের পর এশিয়ায় বিদ্যার জোয়ার আবার বহিয়াছে। তাহা বিশ্ববাসীকে জানাইবার জন্যই পোর্ট-আর্থারের আবির্ভাব। বিংশশতাব্দীর মধ্যেই এশিয়ার জনসাধারণ নব্য জ্ঞানবিজ্ঞানের অধিকারী হইয়া জগতে আবার মানুষের মত বিচরণ করিবে। খৃষ্টীয় ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রাচ্যমানব যে উপায়ে বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার করিয়া সংসারে বিরাজ করিত একবিংশশতাব্দী হইতে তাহাদের আবার সেইরূপ পদমর্য্যাদা হইবে।

সমাপ্ত।

গৃহস্থ-গ্রন্থাবলী

১। বিশ্ব-শক্তি—সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্র 'গৃহস্থে' প্রকাশিত আলোচনা ও প্রবন্ধাবলী হইতে সঙ্কলিত। মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

২। রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী—কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতার বিস্তৃত সমালোচনা। মূল্য ৷৶০ দশ আনা।

৩। শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম (দ্বিতীয় সংস্করণ)—কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নির্গত শিক্ষাষ্টকের মূল, টীকা, পদ্যানুবাদ, ভাবার্থ প্রভৃতি সমেত প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ।০ চারি আনা।

৪। কমলা—ধর্ম্মমূলক গার্হস্থ্য উপন্যাস। গীতার উপদেশানুযায়ী চরিত্রগঠন ও তাহার পরিনাম। স্ত্রী কন্যার হাতে দিবার উপযুক্ত পুস্তক। মূল্য ১।০ আনা মাত্র।

৫। পাগল—মহাপুরুষমুখে উপন্যাসের ভাষায় উপনিষদের সনাতন তত্ত্বকথার অভিনব বিবৃতি। তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পক্ষে উপাদেয়। মূল্য ৷৶০ দশ আনা।

স্বনামধন্য কর্ম্মীশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ প্রণীত

৬। নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর—(চতুর্থ সংস্করণ)।

(টেক্‌ষ্ট্‌বুক কমিটী কর্ত্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে মনোনীত)।

আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষা-প্রচারক বুকার ওয়াসিংটনের আত্মজীবন-চরিতের বঙ্গানুবাদ। সাধনা ও অধ্যবসায়ের বলে কেমন করিয়া সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিতে পারা যায়, প্রকৃত কর্ম্মবীর হইতে হইলে কিরূপে জীবন-যাত্রা-প্রণালীকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়, ইঁহার আত্ম-জীবন-চরিত তাহার জলন্ত উদাহরণ। সুন্দর বাঁধাই—মূল্য ১।০ মাত্র।

Amrita Bazar Patrika—"It furnishes delightful and stimulating reading. A distinct acquisition to the Bengalee literature."

Bengalee—"Every Bengalee who wants to serve his mother land ought to carefully read and reread it."

বাঙ্গালী—"নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর'কে আমাদেরই 'কর্ম্মবীর' বলিয়া মনে হয়।

আমাদের দেশে এখন এই শ্রেণীর জীবন-চরিত যত বেশী পঠিত হয়, ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গল।"

নায়ক—"অনুবাদ প্রাঞ্জল ভাষায় সুন্দরভাবে হইয়াছে।"

সাহিত্য—"কোনও বাঙ্গালী যেন 'নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর' পড়িতে না ভুলেন।"

রায় শ্রীযুক্ত রসময় মিত্র এম, এ বাহাদুর বলেন—"নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর" সময়োপযোগী হইয়াছে ও ইহার উদ্দেশ্যও অতি সাধু। অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠতা শত বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া সঙ্কল্পসিদ্ধি লাভ করে, এই গ্রন্থবর্ণিত মহাপুরুষ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।"

উক্ত গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

বর্ত্তমান জগৎ—বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব্ব ও অভিনব ভ্রমণ-কাহিনী। সুবৃহৎ পাঁচটি খণ্ডে সমাপ্ত। বিদেশে অনেকেই গিয়াছেন, এবং ভ্রমণ-কাহিনী অনেকই লেখেন কিন্তু বিনয়বাবুর মত এমন অন্তর্দৃষ্টি দিয়া দেশকে দেখিয়া ও বুঝিয়া তাহার কাহিনী কেহই এ পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করেন নাই। আমাদের দেশের সহিত তুলনা করিয়া অন্যান্য দেশের প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়টির আলোচনা পর্য্যন্ত ইহাতে স্থান পাইয়াছে। এই ভ্রমণ-কাহিনীর ভিতর দিয়া পাশ্চাত্য জগতের অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস, সমাজ-চিন্তা, শিক্ষা-সমস্যা, শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতির কথা জানিতে পারিবেন। এক কথায় দেশকে ভিতর ও বাহির দিয়া জানিতে হইলে, যাহা জানিবার প্রয়োজন হয় তাহা এই গ্রন্থে আছে।

৭। প্রথম ভাগ—মিশর (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

ইহাতে মিশরের পুরাকাহিনী, আচার ব্যবহার, রাজনীতি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির কথা বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। বহু ছবি সম্বলিত সুন্দর বাঁধাই—মূল্য ২৲।

৮। দ্বিতীয় ভাগ—ইংরাজের জন্মভূমি (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

ইহাতে ইংলণ্ড, স্কট্‌ল্যাণ্ড ও আয়র্লণ্ডের কথা আছে। আর আছে গ্রেটব্রিটেনের ধীমান পণ্ডিতমণ্ডলীর বিশেষত্বমূলক আলোচনাসমূহ, ইংরাজের দেশের কথা, তাঁহাদের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও সমাজতত্ত্বের কথা, তাঁহাদের গবেষণামূলক আবিষ্কারের বার্ত্তা—এক কথায় যাহা জানিলে দেশ ও জাতিকে জানা যায়—বর্ত্তমানে তাহাই সুন্দর সংযতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুন্দর ছাপা, সুন্দর কাগজ, সচিত্র, মনোরঞ্জন বাঁধাই, প্রায় ছয়শত পৃষ্ঠা—মূল্য ৩৲ টাকা মাত্র।